

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধকথা, বৌদ্ধযুগ : রাজনীতি, মতাদর্শ

পিএইচ. ডি. (কলা অনুষদ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক সত্যবতী গিরি

গবেষক
বীথিকা সাহানা

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা
২০২১

Certified that the Thesis entitled

বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধকথা, বৌদ্ধযুগ : রাজনীতি, মতাদর্শ

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Satyabati Giri, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor

Candidate

Satyabati Giri 08.07.2021

*Bithika Sahana
08-07-2021*

Prof. Satyabati Giri

Bithika Sahana

Dated: 9th July, 2021

Dated: 9th July, 2021

স্বীকৃতি

আমাদের পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত এই গবেষণা সন্দর্ভটির নাম, *বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধকথা, বৌদ্ধযুগ : রাজনীতি, মতাদর্শ*।

গবেষণাটির যোগ যেমন আধুনিক উপন্যাসের সঙ্গে তেমনি এর পূর্বসূত্র আছে, প্রাচীন এবং মধ্যযুগে। এই গোটা কাল প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা আছে, সমকালে এমন গবেষক, আলোচক খুব কমই আছেন। তাঁদের মধ্যে সমকালের উল্লেখযোগ্য নাম, অধ্যাপক সত্যবতী গিরি। সত্যবতীদিকে ধন্যবাদ আমার মত নবীন গবেষককে তিনি সুযোগ দিয়েছেন, তাঁর অধীনে গবেষণা করার। গবেষণার দীর্ঘ সময় জুড়ে, সমগ্র পরিকল্পনার, প্রতি পদে, তিনি যেভাবে সহযোগিতা, প্রশ্ন এবং উৎসাহ দিয়েছেন, তারজন্য কোনোরকম স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়।

মূলত উনিশ শতক এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের সীমিত পরিসর নিয়ে এই বিষয়ের ওপর এম ফিল উপাধির জন্য গবেষণা করেছি। তার, তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক আব্দুল কাফি। ফলে গবেষণা সন্দর্ভের প্রাথমিক ভিত্তি, পরবর্তী ভাবনার বিবর্তনে তিনি ইন্ধন দিয়েছেন, সমৃদ্ধ করেছেন। এই দুজন অধ্যাপকের কাছে ঋণের কোনো সীমা নেই, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই, গবেষক এবং ২০০৬ সাল থেকে ছাত্র হওয়ার সুবাদে।

ঠিক কী কী বাংলা বিভাগের কোন কোন ক্লাসে শিখেছি, তা আর আলাদা আলাদা করে মনে করতে পারিনা। এই দুই অধ্যাপকের পাশাপাশি বাংলা বিভাগের সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের জানাই অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের, অধ্যাপক সুচেতনা চট্টোপাধ্যায়কে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রীতা ভট্টাচার্যকে এই গবেষণায় সাহায্য করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। অধ্যাপক সত্য গিরি, অসুস্থতা সত্ত্বেও, যেভাবে গবেষণায় মতামত দিয়েছেন, অমূলক তর্ক শুনেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। সম্পূর্ণ গবেষণা তাঁর জীবদ্দশায় শেষ না করতে পারার খেদ চিরদিন থাকবে। স্যরকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাই।

অধ্যাপক সনৎ নস্কর, দেবীকোট ; অধ্যাপক বরেন্দ্র মণ্ডল, করুণাঘন, অধ্যাপক সুমিত কুমার বড়ুয়া শ্রামণ গৌতম, অধ্যাপক সুব্রত সিন্হা থেরীগাথা ইত্যাদি বইগুলি তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পড়তে দিয়েছেন। অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধেয় তরুণ পাইন, শ্রদ্ধেয় অশোক রায় গবেষণায় প্রভূত উৎসাহ দিয়েছেন। সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধু- অনল, অমৃতেশদা, হাসনারা, রাকিব, সর্বজয়া, সমন্বয়, প্রলয়, শিঞ্জিনি নানাভাবে সাহায্য করেছে, এদের সকলের জন্য কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা রইল।

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের, অধ্যক্ষ ড: সুকোমল দত্ত, বিভাগীয় প্রধান ড: আবদুস সাত্তার- সহ সকল সহকর্মীকে, কলেজের দায়িত্বের পাশাপাশি এই গবেষণা পরিসর প্রদান করার জন্য শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদবপুরের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সুশান্তদা, কমলদা, বিদ্যুতদা, বিভাগীয় গ্রন্থাগারের আইভিদি (আদক), হরিশদা (মণ্ডল); কলেজ লাইব্রেরির রঞ্জনদা, রূপকের কাছে ঋণস্বীকার করে ধন্যবাদ জানাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার (গোলপার্ক), জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগার, সাহিত্য অকাদেমি গ্রন্থাগার, স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট অ্যান্ড রেকর্ডসের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মা, দিদি, ভাই, বৈদেহী এবং সঙ্গীর সূত্রে পাওয়া মা, বাবা এই সম্পর্ক গুলি, দীর্ঘ সময় জুড়ে আমার আধার, শক্তি হিসেবে, পাশে থেকেছে; সমস্ত বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা করে, নিরবিচ্ছিন্ন লেখাপড়ার পরিসর তৈরি করে দিয়েছে এবং দেবে। পরিবারকে ভালোবাসা জানানোর ভাষা নেই। অনেকেই বলেছিলেন, কাহন (সন্তান)-এর জন্য গবেষণা, লেখাপড়া আর সম্ভব হবে না! বলে রাখি কাহনের জন্যই পেরেছি, পারবো। আরেকজনের অবিচল, ধীর, শান্ত, গভীর পাশে থাকা, প্রেরণা অনুল্লিখিতই থাক।

সূচিপত্র

ভূমিকা	১-১০
প্রথম অধ্যায়	১১-৪৪
উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বুদ্ধকথা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধযুগের চর্চা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৪৫-১০৯
কবির ধর্ম: বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা, রাজনীতি, মতাদর্শ	
তৃতীয় অধ্যায়	১১০-১৬৮
আধুনিকের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস': 'আত্মপরিচয়' নির্মাণের অভিপ্রায়	
চতুর্থ অধ্যায়	১৬৯-২১৬
খেরীগাথা থেকে মেয়েদের লেখা উপন্যাস: আধুনিকতার মাত্রা	
পঞ্চম অধ্যায়	২১৭-২৬৮
পীতাতঙ্ক : ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, আখ্যানের তথ্য-তত্ত্ব	
ষষ্ঠ অধ্যায়	২৬৯-৩৩৬
পীতাতঙ্ক এবং বাংলা উপন্যাসের উত্তরাধিকার	
উপসংহার	৩৩৭-৩৪৭
গ্রন্থপঞ্জি	৩৪৮-৩৬৪

ভূমিকা

উনিশ বিশ শতকের ধর্মীয় রাজনীতির প্রভাব বাংলা উপন্যাসে খেয়াল করলে দেখা যাবে- সব থেকে চর্চিত এবং জনপ্রিয় ধরণটি হল, হিন্দু মুসলমান এই দুই ধর্মাবলম্বী মানুষ; আর প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের বাইনারিতে তার চর্চা এবং আলোচনা। কিন্তু ভারতবর্ষে উদ্ভূত এবং একটি বিরাট কালপর্ব জুড়ে বিরাজমান বৌদ্ধযুগ এবং বৌদ্ধধর্ম বাংলা উপন্যাসকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার চর্চা বেশ কম। এই জিজ্ঞাসা থেকেই আমাদের গবেষণা প্রকল্পের অবতারণা। এই বিষয়ক উপন্যাস খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, মোটেই তার সংখ্যা নগণ্য নয়। ফলে শুধু পাঁচ দশটি উপন্যাসের নিবিড় পাঠ ও তার আলোচনায় না গিয়ে, কিছু প্রবণতা এবং চিহ্ন আমরা নির্ণয় করেছি। এই প্রবণতা নির্ণীত হয়েছে দেশ-কালের রাজনীতির সাপেক্ষে। তার প্রভাবগুলি, বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে আমাদের গবেষণা এগিয়েছে। এই বিবর্তনের ধারাকে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

ভারতবর্ষে ধর্ম দর্শনের মূল এবং লোকায়ত ধারায় বহু ধর্ম দর্শন প্রস্থানের উল্লেখ, প্রভাব এবং ধর্মাবলম্বী মানুষের কথা পাই। কখনও কখনও এই দর্শন প্রস্থানগুলি একে অপরের সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে থাকে যে তাদের বৈশিষ্ট্য 'নির্দিষ্ট' করে নির্ধারণ করা মুশকিল হয়। বুদ্ধের প্রচলিত ধর্মে যেমন, তাঁর আগে বর্তমান ধর্ম-দর্শনের প্রভাব আছে তেমনি বুদ্ধের পরবর্তীকালে মূল ধারা ও লোকায়ত ধারার সঙ্গে, বৌদ্ধধর্ম মিশে বহুভেদে রপান্তরিত হয়েছে। এইসব গবেষণা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, প্রবোধচন্দ্র সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, রাধাকৃষ্ণন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, আশ্বেদকর প্রমুখদের আলোচনায় পাবো। শুধু ভারতীয় পণ্ডিতরাই নন বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তর্ক করেছেন, সহমত হয়েছেন; মতভেদও রয়েছে। আমাদের গবেষণায় এই দর্শন নিয়ে আমরা তেমন আলোচনা করিনি। উপন্যাসের আলোচনায় যতটুকু প্রসঙ্গ এসেছে, উল্লেখ করেছি মাত্র; উপন্যাসিকদের ওপর প্রভাবকে,

বিশ্লেষণ করেছি। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতিকে- 'ফিক্সনে' (উপন্যাসে) তাঁরা কীভাবে নির্মাণ করেছেন সেগুলি পর্যালোচনা করে আমরা তাঁদের অবস্থানকে পড়তে চেয়েছি।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শন এবং বৌদ্ধকালকে ব্যবহার করে উনিশ বিশ শতকে অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। পরাধীন ভারতবর্ষে, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার, 'বীর নায়ক', বীরের উপযুক্ত 'সতী-সঙ্গিনী', 'ধর্মীয় প্রতিপক্ষ' নির্মাণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যই ছিল এই উপন্যাসগুলির কেন্দ্রীয় ঝোঁক। স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ বাঁক বদল করেছে, সমকালীন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সমালোচনা করার জন্য লেখকরা বৌদ্ধকাল, বুদ্ধকথা, ধর্ম-দর্শনকে, মেটাফর বা রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ তৈরি করেছেন; তাকে প্রভাবিত করেছেন এবং প্রভাবিত হয়েছেন।

আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলি- প্রাচীন চর্যাগানের এই লাইনকে বুদ্ধিজীবীরা 'বাঙালির আত্মপরিচয়ের' সঙ্গে যুক্ত করেছেন; চর্যাগানের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি। ভুসুকু বৌদ্ধ সহজযানী, কবি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসিকরাও বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, ইতিহাস, বৌদ্ধ-উপাদানকে বিচিত্র পদ্ধতিতে 'বাঙালির আত্মপরিচয়' এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ইতিহাস, গবেষণায় জানা যায়, এটাই সঠিক পদ্ধতি; শুধু বৌদ্ধ নয় আরও নানান ধর্মের প্রভাব এই 'আত্মপরিচয়' এর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু 'একরৈখিক, অভিজাত, মান্য, হিন্দুপ্রধান আত্মপরিচয়' নির্মাণ প্রচেষ্টায় গবেষণা, ইতিহাসকে এড়িয়ে গিয়ে, বদলে দিয়েও 'কল্পকাহিনি (উপন্যাস)' নির্মিত হয়েছে। ফলে সমকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে, পরিবর্তিত রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের নির্মাণ-রাজনীতিরও বিবর্তন হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কেন সব উপন্যাসই রাজনৈতিক উপন্যাস; তাতে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ই উপস্থাপিত এবং পুনর্নির্মিত হয়। আমরা বুদ্ধকথা ও বৌদ্ধযুগ ধর্ম দর্শন কেন্দ্রিক উপন্যাসে এই অভিপ্রায় গুলিকে চিহ্নিত করবো।

বিশ শতকের রাজনৈতিক পালাবদল- উপনিবেশ এবং উত্তর উপনিবেশ পর্ব, দেশভাগ, স্থানচ্যুতি, ভাষা, লিঙ্গ, আত্ম এবং অপর পরিচয়ের- রাজনীতি, ক্ষমতার পক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে নির্মাণ এই সময়ের কথাসাহিত্যে সুস্পষ্ট, এনিয়ে দ্বিধার কোনো অবকাশ নেই। বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম-দর্শন এবং বৌদ্ধকাল- আসলে, সংঘাত, পরিবর্তন, ক্ষমতার অনুসরণ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিহ্ন হিসেবেই বহু বৈচিত্রে, জটিলতায় ব্যবহৃত।

প্রসঙ্গ অনুযায়ী অন্যান্য সাহিত্য সংরূপের ভাবনা, সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা, উপন্যাসের বিভিন্ন প্রবণতাগুলি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই। স্বাভাবিক ভাবেই বিশ শতকের কালপর্বে অঙ্কের নিয়মে সীমাবদ্ধ থাকতে পারিনি। প্রবণতাগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার আগে এবং পরের সময়কাল, আলোচনায় এসেছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে, ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়, উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বুদ্ধকথা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধযুগের চর্চা।

উপনিবেশপর্বে ভারতবর্ষে, একেবারে প্রথম দিকে ইংরেজদের অনুপ্রেরণায়, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের অনুসরণে, ব্যক্তিগত এবং এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে বাঙালি, বাংলা ভাষায় এই বিষয়ক গবেষণা এবং চর্চায় মনোনিবেশ করে। এই অধ্যায়ে, তার একটা সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণী প্রাথমিক ভাবে হাজির করেছি। আলোচনাসূত্রে দেখেছি, এই প্রক্রিয়া একমুখী এবং সরলরৈখিক নয়, বেশ জটিল। ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় শুরু হলেও এর বাঁকবদল ঘটে, ক্ষমতা বিরোধী জাতিয়তাবাদী স্বর নির্মাণে, ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায়। ইতিহাসবিদ গবেষকরা আবিষ্কার করেন, বৌদ্ধকাল জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনচর্চায়, কৃষি, বাণিজ্যে, শিল্পভাবনায়, স্থাপত্যে ভাস্কর্যে ‘গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়’ ছিল। ফলে জাতিয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাঙালি, সাহিত্যে বিভিন্নভাবে এই কালকে ব্যবহার করার অনুপ্রেরণা পায়।

আবার সমস্যা দেখা যায়, অতীত গৌরবে বৌদ্ধধর্মকে মান্যতা দিলে হিন্দুধর্ম-প্রাধান্যের কী হবে? ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধরণ অনুযায়ী ধর্মীয় বাইনারি তৈরিতেও চেনা হিন্দু-মুসলমান ছকের পাশাপাশি

হিন্দু-বৌদ্ধ ছক ব্যবহৃত হয়েছে। এই ছক ব্যবহারে বাঙালির মধ্যে একটি ‘কিন্তু’ থেকে গেছে বৌদ্ধধর্ম বহিরাগত কী না সেই প্রশ্নে। যত সহজে ইসলামধর্মকে তাঁরা ‘বহিরাগত এবং বিতাড়নযোগ্য’ বলে দাগিয়ে দিতে পারছিলেন; বুদ্ধ জন্মভূমি এবং বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে, বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে এই কাজ তত সহজ ছিল না। ফলে সেই দ্বন্দ্ব, জটিলতা তৈরি করেছে, যার ছাপ পড়েছে সাহিত্যে।

আবার বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অংশ, না কী তার থেকে পৃথক; বুদ্ধ অবতার না ‘অসাধারণ মানুষ’; গোঁড়া হিন্দুত্ববাদ, লিবারাল, স্যেকুলার এবং মানবতাপন্থী ধর্ম দর্শনে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের গ্রহণযোগ্যতা ঠিক কেমন; এই সমস্ত বিতর্কের সূত্রপাত কী উনিশ বিশ শতকেই; না কী আরও অতীতে প্রোথিত তাঁর বীজ?

আমরা গোটা অধ্যায় জুড়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গক্রমে উনিশ বিশ শতকের গুরুত্বপূর্ণ নন-ফিক্সন এবং ফিক্সনের ‘পাঠ’ কে ব্যবহার করেছি। এই দ্বন্দ্বগুলি লেখকদের প্রভাবিত করেছিল। সেগুলি নিয়ে চলতে থাকে জটিল, সচেতন বিতর্ক, দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ প্রচেষ্টা-প্রকল্প। সীমাবদ্ধ মান্য-কেন্দ্রিক ঝোঁককে লেজিটিমাইজ বা ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার চেষ্টা, পাঠকের ভাবনা, রুচি, চাহিদাকে ‘ম্যানিউপুলেট’ করার চেষ্টা, প্রভাবিত হওয়া এবং প্রভাবিত করতে চাওয়ার সাহিত্যিক-রাজনৈতিক সমীকরণ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মদের বিভিন্ন উদ্যোগ, নবীনচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রামদাস সেন, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের বিভিন্ন রচনা প্রসঙ্গত ব্যবহার করেছি। পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী প্রয়োজন, স্বাধীন ভারতে, এই তৃতীয় ধর্মের চর্চার ক্ষেত্রে বন্ধ না হয়ে গিয়ে, খানিক দিক বদল করেছিল মাত্র। স্বাধীন ভারতে, নব্য জাতীয়তাবাদ, ম্যাপের বদলের সঙ্গে সঙ্গে ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ এর নবনির্মাণ শুরু করে। মূলত এই সময়ের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের প্রবণতাগুলির বিবর্তন। ফলে উপন্যাস প্রথমেই আলোচনা না করলেও আমাদের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাগুলি এই অধ্যায়ে আমরা চিহ্নিত করতে চেয়েছি; কারণ এই প্রবণতাগুলি উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়, কবির ধর্ম: বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা, রাজনীতি, মতাদর্শ।

আমাদের গবেষণার পরিসরকে উপন্যাসের সংরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি, একথা ঠিক। কিন্তু এই বিষয়ের ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রবল। প্রথম অধ্যায়ের অনুসরণেই এই অধ্যায়টির পরিকল্পনা। রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ প্রকল্পকে বিশ্লেষণের জন্য আলাদা পরিসরের প্রয়োজনেই। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব, বুদ্ধকথা, বুদ্ধযুগ, ধর্ম-দর্শন নিয়ে কোনো উপন্যাস না লিখলেও, বাকি সমস্ত সংরূপেই তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন- কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, চিঠিতে, বক্তৃতায়, নাটকে। তিনি এবিষয়ে কোনো উপন্যাস লেখনি- শুধু এই যুক্তিতে তাঁকে, তাঁর ভাবনাকে কিছুতেই বাদ রাখা চলেনা। কারণ বাংলা সাহিত্যে তাঁর সমকালে এবং পরবর্তীকালের সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন; গ্রহণ না করলেও একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথকে কোনো নির্দিষ্ট সংরূপে বাঁধা যায় না, তাই হয়ত, রাধাকৃষ্ণন তাঁর বইয়ের নাম দিয়েছেন- “দ্য রিলিজিয়ন অফ আন আর্টিস্ট”। কিন্তু কবি নিজেই তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম, জীবনদেবতার- ভাবনার কথা বলতে গিয়ে, তার নাম দিয়েছেন - “দ্য পোয়েট’স রিলিজিয়ন”। এই প্রবন্ধ অনুসরণেই, অধ্যায়ের নামকরণ। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধধর্ম, বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ সংক্রান্ত ভাবনা দ্বারা শুধু প্রভাবিতই নন, তিনি এই ভাবনাগুলিকে নির্মাণ করেছেন উনিশ বিশ শতকের সমকালীনতার প্রেক্ষিতে। তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরের তত্ত্বে উপনিষদের ‘ব্রহ্ম’, ব্রাহ্মধর্মের ‘একমেবোদ্বিতীয়ম ঈশ্বর’, ভক্তি আন্দোলনের, চৈতন্যসহ অন্যান্যদের প্রেমধর্ম, সহজিয়া-বাউল-সুফীদের, ‘মনের মানুষ, ব্যক্তিগত ঈশ্বর’ তো আছেই, তার সঙ্গে মিশে আছে “সর্বশ্রেষ্ঠমানব বুদ্ধদেব” ও তাঁর ধর্ম-দর্শন। সব মিলে তৈরি করেছে ‘কবির ধর্ম’।

তাঁর লেখায় খ্রিষ্ট, দাদু, চৈতন্যের কথা এসেছে; কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছেন বুদ্ধকেই। কারণ বুদ্ধ, এদের সকলের থেকেই প্রাচীন; তাঁর দর্শন, বৌদ্ধধর্মের এতকাল ধরে স্বমহিমায় টিকে থাকা, নিজ উৎপত্তি-দেশ থেকে সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশের মানুষের কাছে প্রধান হয়ে ওঠা, তাঁকে বিস্মিত করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে গ্রহণ করেননি। তিনি তাকে সংস্কার করেছিলেন, সম্পাদনা করেছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে এই ব্যক্তিগত রূপদানকে তিনি জগতের দরবারে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। সেই সম্পাদনার (গ্রহণ এবং বর্জন উভয়ই) ধাপগুলিকেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি।

বঙ্কিমের জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, ধর্ম বিষয়ক তর্কে বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করেছি। ঠাকুরবাড়ির বুদ্ধকথা চর্চার উত্তরাধিকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি। তাঁর বিশ্বভারতী পরিকল্পনায় বৌদ্ধবিহারগুলির প্রভাব, ভাষা সংক্রান্ত বক্তব্যে বুদ্ধের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় বৌদ্ধসাহিত্য- সম্পাদনা, অনুবাদ, মৌলিক রচনা, গবেষণার বিবরণ- ইত্যাদি মূল ঝোঁক গুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে বুদ্ধকথা নির্মাণের মৌলিকতাগুলি এই অধ্যায়ে খুব বেশি আলোচিত হয়নি; কারণ বহু গবেষক এই নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিছু মৌলিক প্রবণতা উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। গোটা বিশ্বের দরবারে যখন রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের প্রতিনিধি, ‘কবি’ হয়ে উঠলেন, তিনি বুদ্ধকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন, ঐক্যের- মানবতার বার্তা দিতে। বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রবন্ধে তাঁর মতামতগুলি আমরা পাই। সমসাময়িক কালে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শন বিষয়ক যে চর্চা হচ্ছিল তার থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রকল্প স্বতন্ত্র।

তৃতীয় অধ্যায়, আধুনিকের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’: ‘আত্মপরিচয়’ নির্মাণের অভিপ্রায়।

এই অধ্যায়ে সরাসরি উপন্যাসের মধ্যে উপরোক্ত প্রবণতা গুলি খুঁজে দেখেছি। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত প্রবণতাগুলি যেমন এই উপন্যাসগুলিকে প্রভাবিত করেছে; তেমনই আছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। ভাষা, আত্ম এবং ‘অপর’এর আত্মপরিচয় নির্মাণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তি এবং সমষ্টির স্থানচ্যুতি আশ্রয়চ্যুতির যন্ত্রণা, রাষ্ট্রের ক্ষমতা, হেজিমনি ও ক্ষমতার পক্ষ এবং বিরুদ্ধ স্বর নির্মাণ, প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবতাবাদী ধর্মের দ্বন্দ্ব, বাজার এবং চাহিদা অনুযায়ী সাহিত্য-পণ্যের নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নকে সামনে রেখে, উপন্যাসের গল্পের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধকাল বুদ্ধকথাকে ব্যবহার করে, সমকালকে নির্ধারণ

করার, সমালোচনা করার, উপস্থাপন করার বিভিন্ন প্রকল্প এই সময় জুড়ে তৈরি হয়েছে। চেরবাটস্কি, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ আলোচক মনে করেছেন,- বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন উদ্ভবের কারণ, সেইসময়ের রাজনৈতিক-অরাজকতা, সাম্রাজ্যলোভ, মাৎস্যন্যায়ের কারণ অনুসন্ধান নিহিত। তার থেকেই বুদ্ধের ‘মধ্যপন্থা, সংযমনির্ভর, উপশমকারী ধর্ম’ –এর অবতারণা। আমরা খেয়াল করবো, এই রাজনৈতিক চিহ্নগুলিকেও পরবর্তী ঔপন্যাসিকরা গ্রহণ করেছেন, বিনির্মাণ করেছেন। আধুনিক উপন্যাসে, কথকের আত্মসমীক্ষার আধার হিসেবেও বুদ্ধের বৈচিত্রময় জীবনীর প্রতিফলন ঘটেছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস পালিত, দীনেশচন্দ্র সেন, শিবশিস মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, সত্যেন সেন, শওকত আলি, বিপ্রদাস বড়ুয়া, সমরেশ মজুমদার, নারায়ণ সান্যাল প্রমুখের উপন্যাস প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়, খেরীগাথা থেকে মেয়েদের লেখা উপন্যাস: আধুনিকতার মাত্রা।

এখানে লিঙ্গ রাজনীতি-প্রসঙ্গে ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’এর পরিচিতি এবং অবস্থানের নিরিখে অনুরূপা দেবী, দীপ্তি ত্রিপাঠী, বাণী বসু এবং সেলিনা হোসেনের উপন্যাসগুলি আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গ অনুযায়ী খেরীগাথার বিভিন্ন গাথা এবং প্রসঙ্গ ব্যবহার করে মেয়েদের বয়ানে নিজেদের কথা, অন্য মেয়েদের কথা কীভাবে উঠে এসেছে তার তুলনামূলক আলোচনা করেছি। বুদ্ধের কালে মেয়েদের অবস্থান ঠিক কেমন ছিল, এবং উপন্যাসগুলিতে সেই ঐতিহাসিক সত্য তথ্য কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা ব্যাখ্যা করেছি। আধুনিকতা কালনির্ভর, না বিষয় নির্ভর এই প্রশ্ন তুলেছি,- প্রাচীন খেরীগাথা আর মেয়েদের লেখা এই আধুনিক উপন্যাসগুলির বয়ানকে সামনে রেখে। আধুনিক সংস্করণের বয়ান এবং অভিপ্রায়ও কি সবসময় ‘আধুনিক’ হয়? প্রাচীন খেরীগাথায় কোনো আধুনিকতা থাকা সম্ভব? বৌদ্ধযুগকে ব্যবহার করে স্রষ্টারা মেয়েদের কোন স্বাভাবিক, স্বাধীনতা দাবী-দাওয়ার কথা তুলতে চেয়েছেন? ‘মেয়ে’ এই লিঙ্গ পরিচয়ের অবস্থান থেকে তাঁরা বৌদ্ধযুগকে কীভাবে নির্ণয় এবং নির্ধারণ করতে চাইছেন? ‘পুরুষতান্ত্রিক চিরাচরিত ফেমিনিন’ এর ভাবনা প্রতিষ্ঠা করছেন না কি প্রতিবাদী স্বর তৈরি করছেন? মেয়ে লেখকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের ইতিহাসে এঁদের বক্তব্য কতখানি দায়িত্বপূর্ণ? আমরা মূলত এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেছি চতুর্থ অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়, পীতাতঙ্ক : ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, আখ্যানের তথ্য-তত্ত্ব

বেশিরভাগ উপন্যাসে, আমরা বৌদ্ধধর্মকে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মানবতা ঊদার্য, ক্ষমাশীলতা, শোষিতের ক্ষমতাবিরোধী স্বর, শিক্ষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ইত্যাদি ইতিবাচক প্রবণতায় ব্যবহৃত হতে দেখে এসেছি। কিন্তু উপন্যাসে বৌদ্ধতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা, বৌদ্ধমঠ-গুম্ফা ক্রিমিনালের আড্ডা, ব্যভিচারের আখড়া, কাষায় পরিহিত ক্ষমাশীল-উদার-পণ্ডিত-ধ্যানী-গম্ভীর শ্রমণেরা আসলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, ব্যভিচারি ক্রিমিনাল এরকম ভুরিভুরি কল্প-কাহিনিও আমরা পড়ি। সম্প্রতি এই ধরনের উপন্যাস বাজারে খুবই জনপ্রিয়। নগর-সমতলের গোয়েন্দা ‘বীর নায়কে’রা, বিপদসংকুল বৌদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে গিয়ে এদের শায়েস্তা করে; গোঁড়া বৌদ্ধদের কবল থেকে তাদের ধর্মের দলিল-ঐতিহাসিক মূল্য যুক্ত দামী দ্রব্য, ‘উদ্ধার’ করে আনে...

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ, একটি ‘অভিজাত, সমতল এবং নগরকেন্দ্রিক হিন্দু আধিপত্য এবং প্রাধান্য (হেজমনি এবং ডমিন্যান্স) থেকে- ‘জাতি-ধর্ম-বর্ণ-এথনিসিটি-ভাষা-দেহ-বর্ণ’ ইত্যাদিকে ‘অপর’ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। তা আমরা আগের অধ্যায় গুলিতে আলোচনা করেছি। দেব-মূর্তি এবং মানুষকে ‘অপর’ বলে- ‘বিকট দর্শন’ বলে দাগিয়ে দেওয়া; ‘বেঁটে, ছোটো চোখ, হলুদ বর্ণ’... ইত্যাদি দৈহিক আকার থেকে এথনিসিটিকে ‘অপর’ করা। পার্বত্য এলাকা, চীন, জাপান, তিব্বত ইত্যাদি প্রাচ্যের বা ভারতের ভেতরের অংশ হলেও, প্রাচ্যে, ভারতে, বসেই তাকে ‘অপর’ এবং ‘ব্যঙ্গ’ করা, আমরা খেয়াল করব।

জটিল, ভৌগোলিক অবস্থান, জানার অসুবিধে, ‘অজানা- বিদেশ’ সম্পর্কে কৌতূহল থেকে কল্পনা এবং তা থেকে সন্দেহের সূত্রপাত। পাঠকও ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা, প্রাধান্যকামী, নগর-সমতলের ভ্রমণবিলাসী। ফলে তাদের ‘স্বপ্নপূরণের’ খোরাক জোগানো হয় এই গল্পগুলির মাধ্যমে। ফেরার সময়, ঘর সাজানোর জন্য সুন্দর মূর্তি কিনে আনে তারা। আর অন্তরে বহন করে, ‘অপর’ সম্পর্কে ভালো অথবা মন্দ এই বোধ, এবং সন্দেহ। অথচ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাশ, প্রবোধচন্দ্র

বাগচী, অলকা চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখের সেখানে গিয়ে পুথিচর্চার গবেষণার যে অভিজ্ঞতা, তার সঙ্গে এই ভাবনাগুলি তেমন মেলে না। সত্য এবং কল্পনায় সচেতনভাবে এই ফারাককে নির্মাণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যাতে পারে, রাহুল সাংকৃত্যায়নের, *তিনটে সওয়া বছর*, বইটির মান এবং সত্যের কাছে এই উপন্যাসগুলি বেশীরভাগই নগণ্য মানের।

হঠাৎ সাহিত্যে এই প্রবণতা এল কোথা থেকে; এবং তা কি হঠাৎই এল, উপনিবেশের ছাপ কীভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করেছে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্মীয় বিদ্বেষের বাইনারির সঙ্গে যোগ- ইত্যাদি প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে, ইতিহাস বিশ্লেষণ করে- ইউরোপ সৃষ্ট ‘পীতাতঙ্ক’ এর প্রকল্পের মধ্যে এর বীজকে খুঁজে পেয়েছি। পীতাতঙ্ক প্রভাবিত হয়ে, চীন জাপান, বার্মা ভারতবর্ষ অন্যান্য ‘প্রাচ্যভূমিকে’ তারা যে ‘নেতিবাচক অপর এবং সন্দেহের’ এর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছে সেই প্রভাব সরাসর উপনিবেশ এবং উত্তর-উপনিবেশ পর্বের সাহিত্যিকদের ওপর পড়েছে। বরং দেশীয় স্মৃতিকথা, ভ্রমণসাহিত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তাঁরা এড়িয়ে গেছেন।

ফলে এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আমরা ইউরোপের ‘পীতাতঙ্ক’ প্রকল্পের ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, তথ্য সত্যকে বিশ্লেষণ করেছে। এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যের কথা খুব কমই এসেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়, পীতাতঙ্ক এবং বাংলা উপন্যাসের উত্তরাধিকার

পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত ইতিহাস, তথ্য ও সত্য, চিহ্ন এবং প্রবণতাগুলি ধারাবাহিকভাবে কীভাবে এই ধরনের বাংলা উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে, সেই প্রভাবকে টিকিয়ে রাখার রাজনীতি কীভাবে ক্ষমতার, মান্যতার পক্ষেই কথা বলে, সেগুলি বিশ্লেষণ করেছি। প্রসঙ্গক্রমে আছে, দীনেন্দ্রকুমার রায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শশধর দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, প্রমুখের এই ধরনের উপন্যাসের বিশ্লেষণ। আমরা একেবারে বিশ শতকের কালপর্বে সীমাবদ্ধ না থেকে এই রাজনৈতিক প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করতে করতে প্রায় সমকালের দু-একটি উপন্যাসেও উল্লিখিত হয়েছে।

পরিভাষা

Discourse	বয়ান
Text	পাঠ
Secular	না-ধর্মীয়
Liberal	উদার-ধর্মীয়
Yellow Peril	পীতাতঙ্ক
Manipulation	নিজমতের সাপেক্ষে চালিত করা
Legitimise	বৈধতা প্রমাণ বা ন্যায়সঙ্গত করা
Ethnicity	জাতিগত
Fiction	কল্প-কাহিনি
Eternal Feminine	চিরন্তন নারীরূপ
Detribalisation	উপজাতি-বিতাড়ন

প্রথম অধ্যায়

উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বুদ্ধকথা বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধযুগের চর্চা

উনিশ শতক ও বিশ শতকে যে জাতীয়তাবাদের চর্চা হয়েছিল তা মূলত হিন্দুপ্রধান বা হিন্দুত্ববাদী, একথা প্রমাণিত। হিন্দুদের বীরত্বের কাহিনি বা গৌরবময় যুগের কাহিনি তখন খোঁজা হচ্ছিল; তা বঙ্কিম কথিত ‘ঐতিহাসিক স্মৃতির’ খোঁজ। নিতান্তই না পাওয়া গেলে, তার কাল্পনিক নির্মাণ-প্রকল্প গড়ে উঠছিল। এই নির্মাণে সমকালীন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করতে, ভারতবর্ষের অতীতের গৌরবময় উপাদান গুলিকে পুনরুদ্ধারের ওপর জোর দেওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সময়েই আসে এক নতুন সাহিত্যিক জঁর, ঐতিহাসিক উপন্যাস। সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলিতে, মূলত লেখা হয় রাজপুত রাজাদের বীরত্বের কাহিনি; এবং মোটামুটিভাবে দুটি প্রধান প্রতিপক্ষের অবস্থান - হিন্দু এবং মুসলমান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলমানেরা হীন চরিত্রের এবং হিন্দুরা নায়ক, বীর। এই প্রকল্পে ব্রিটিশ সরকারের মদতেরও অভাব ছিল না।

১৮২১ সালের ‘এশিয়াটিক জার্নাল’ এ জনৈক ইংরেজ লিখেছেন-

আমাদের ভারতীয় শাসননীতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা।

আরেকজন ব্রিটিশ সামরিক অফিসার লিখেছেন,

বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় ও জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ না করে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।^২

তার তিনটি কারণকে প্রধান বলে মনে করা যেতে পারে, এক, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে (বিভিন্ন ধর্ম পক্ষকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে) ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। দুই, পৃথিবী ব্যাপী খৃষ্টান ধর্মের প্রচারের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় প্রতিপক্ষ ইসলাম এবং বৌদ্ধকে, যেকোনো উপায়ে হীন

প্রমাণের চেষ্টা। তিন, প্রাচ্য তথা এশিয়াকে সবরকমভাবে প্রতিহত করা; যাতে পৃথিবীব্যাপী পাশ্চাত্যের আধিপত্য-কায়েম থাকে। এই দিকটি সম্পর্কে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

এভাবেই বৃটিশের অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, ধর্মীয়-ভেদ, ক্ষমতার রাজনীতির প্রবণতা হিসেবে আরও দৃঢ় হল। আমাদের আলোচ্য বিষয়, বহু আলোচিত হিন্দু-ইসলাম ছাড়া, ভারতবর্ষের আরেকটি ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম। গোটা রাজনৈতিক-সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে তার অবস্থান কেমন, সেই প্রশ্ন।

সেসময় জাতীয়তাবাদী ঝোঁকে, অতীতকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টাতেই এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে(প্রধানত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাস প্রমুখের উদ্যোগে) একের পর এক বৌদ্ধধর্ম, এই ধর্ম সংক্রান্ত পুথি, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধযুগ নিয়ে নানান তথ্য আবিষ্কৃত হতে থাকল। এডুইন আর্নল্ডের (১৮৩২-১৯০৪) *The Light of Asia*, Mr. & Mrs. Rhys Davis, Oldenburg প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসাহিত্যের গবেষণা, অনুবাদ আলোচনা শিক্ষিত বাঙালিকে আরও আগ্রহী করে তোলে। ১৮৪৬ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১) এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হন। নেপাল থেকে যে বৌদ্ধ সংস্কৃত পুথিগুলি সোসাইটিতে জমা ছিল তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহায্যে তার ক্যাটালগ তৈরি করেন। ১৮৭৮ সালে *Bodhgaya, The Hermitage of Sakya Muni*^১ এবং ১৮৮২ সালে *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*^২ প্রকাশ করেন। এছাড়াও ইংরাজি বাংলা দুই ভাষাতেই একাধিক প্রবন্ধ লেখেন। *বিবিধার্থ সংগ্রহে* ১৩৭৩ শকের চতুর্থ সংখ্যায় *অশোক রাজার বিবরণ* এবং ১৭৭৬ শকের ৪৪ সংখ্যায় *শাক্যমুনির জীবনবৃত্তান্ত* প্রকাশিত হয়। একই সময় প্রকাশিত অন্য প্রবন্ধে *শিবাজীর চরিত্র*, *মোহম্মদের জীবনচরিত* ও অন্যান্যদের জীবন নিয়েও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শরচ্চন্দ্র দাশের (১৮৪৯-১৯১৭) গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, বৌদ্ধধর্ম যে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত তাকেই বারবার প্রমাণ করা; যুক্তিক্রমও সেইভাবেই সাজিয়েছেন তিনি।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র যেমন বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের সারসংগ্রহরূপে রচনা করিয়াছেন, তদ্রূপ চারুচর্যাশতক গ্রন্থও সনাতন আর্থধর্মের সার উপদেশসংগ্রহরূপে রচনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্ষেমেন্দ্র সনাতন আর্থধর্মাবলম্বীই ছিলেন এবং বৌদ্ধ অনুশাসনকেও তিনি আর্থধর্মের অন্তর্গত বিবেচনা করতেন।^৫

শেষ বাক্যটির প্রমাণ সেভাবে পাওয়া যায়নি। তিনি নবীনচন্দ্র সেনের অমিতাভ এরও ভূয়সী প্রশংসা করেন, পরে ব্যাখ্যা করেছি। শরচ্চন্দ্র মহাশয় বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার পুথিটি ১৮৮৩ সালে সংগ্রহ করেন, এবং অনুবাদ করতে শুরু করেন। উনিশ শতকে লিবারেল এবং সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গিতেই, বাঙালি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভাবে ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করে।

এই উত্তরোত্তর বেড়ে চলা আলোচনায় এবং আবিষ্কারে দেখা গেল, যে ‘গৌরবময় অতীতের’ খোঁজ তারা করছিলেন ‘বুদ্ধকাল’ সেই আদর্শের যথাযথ উদাহরণ। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ জানতে পারে, অশোক, ধর্মপাল, বিম্বিসার প্রমুখ মহান বৌদ্ধসম্রাটদের কালে ভারতের গৌরবময় কালের কথা। জানতে পারে, সেই যুগের জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, কুমারজীব প্রমুখদের সম্পর্কে। পালি ভাষায় বৌদ্ধধর্ম-দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন- নাগসেন, বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ, ধর্মপাল এবং সংস্কৃত ভাষায় আলোচকেরা হলেন- অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বুদ্ধপালিত, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাঙ, ধর্মকীর্তি প্রমুখ। এঁরা প্রাচ্যের দর্শনের ধারায় অত্যন্ত উজ্জ্বল ব্যক্তিবর্গ।

একটু খেয়াল করলেই যদিও দেখা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনের চর্চায় খুব বেশি আগ্রহ জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের ছিল না। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের সীমাবদ্ধ, বিশেষ ধারার আলোচনাতেই বেশি আগ্রহী, বৌদ্ধধর্মকে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির খাতে কোন ‘খোপে’ আবদ্ধ করা যাবে সেই নিয়েই তারা বেশি চিন্তিত। উনিশ-বিশ শতক জুড়ে বৌদ্ধধর্মের জন্য কতকগুলি ‘খোপ’ নির্মাণ-প্রকল্প গড়ে তোলা হয়। আমরা আমাদের গবেষণায় ধীরে ধীরে সেইদিকগুলি বিস্তারিত আলোচনা করব। উনিশ-বিশ শতকের বাঙালির বুদ্ধ-বৌদ্ধধর্ম চর্চার সার্বিক পটভূমিকে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করব আমরা এই

অধ্যায়ে, কারণ এই আবহেই ফিক্সনের রচনা। সেই ফিক্সনগুলির মধ্যে আমরা বেছে নিয়েছি উপন্যাস।
তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা সরাসরি উপন্যাসের আলোচনায় চলে যাবো।

(১)

বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, দর্শন, কথা, নতুন করে আবিষ্কার এবং চর্চায়, গৌরব, পাণ্ডিত্য সবদিক থেকেই বাঙালি সবচেয়ে উজ্জ্বল বিস্মৃত অধ্যায়ের খোঁজ পেল। শুধু মাত্র একমুখী হিন্দু জাতীয়তাবাদ নয়; বিকল্প আরেকটি জাতীয়তাবাদী প্রকল্প তারা প্রচার করতে চেষ্টা করলেন। বৌদ্ধ-সংস্কৃতি দর্শনের খোঁজ তাদের নতুন পথের দিশা দেয়। কিছু সংবেদনশীল শিক্ষিত, গবেষক এবং ইতিহাসবিদ বাঙালি এই সত্য, উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস আসলে নানা ধর্মের, বর্ণের মানুষের মিশ্রণের ইতিহাস। সেই চেতনা থেকেই তাদের এই ভাবনা ‘যথার্থ ভারত’ নির্মাণ প্রকল্পকে প্রভাবিত করে। ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের আগেই বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন, *বৌদ্ধধর্ম* (১৯০১)। উৎসর্গ করেন, *আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত* (১৮৯৯), প্রণেতা, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে। এই বইয়ের প্রথমে, তিনি একটি ছয় লাইনের কবিতা রচনা করেন। প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় এবং তার বাংলায় অনুবাদ। বৌদ্ধধর্ম- বিষয়ক বইয়ে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক কবিতাই আমাদের কাক্ষিত। কিন্তু এই কবিতাটি আসলে প্রায় “ode to ভারতের অতীত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়” হয়ে উঠেছে। এর ছত্রে ছত্রে এই ‘অধ্যায়’ কে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ছলকে উঠেছে। এখানে উদ্ধৃত করছি বাংলা অনুবাদটি-

জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান

সে কোথা গোপন আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ,

পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,

হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর।

ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,

সংস্কার- বিগত চিত্র, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।^৬

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত সেই গৌরবময় ঐতিহাসিক স্মৃতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ‘গৃহ’ অর্থে ‘যথার্থ ভারত’ নির্মাণ প্রকল্প। এই বইয়ের ভূমিকাতে আছে-

আজ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে প্রধানত বৌদ্ধযুগের ইতিহাসই বুঝি। আমরা হঠাৎ আবক্ষার করেছি যে, ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগ হচ্ছে এ দেশের সভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবমণ্ডিত যুগ। (বৌদ্ধধর্ম, পৃ ৩)

উনিশ শতকেই ধর্মচর্চার রাজনীতি অনুযায়ী, দুটি প্রধান মত অনুসারে দুটি দলে তাঁরা ভাগ হয়ে যান। এক, যারা শুধু হিন্দুধর্ম নয়, ভারতের গৌরবময় যুগের সন্ধান করছিলেন, ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণা করছিলেন। যদিও এঁদের দর্শন (Historiography) আলোচনা করলে তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য, জটিলতা চোখে পড়বে। অপর পক্ষের, শুধুমাত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদমুখী, যথার্থ ভারত, কাম্য ছিল। অন্য ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়ার একেবারেই বিপক্ষে ছিলেন তারা। কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে অস্বীকার করাও সম্ভবপর হচ্ছিল না। এই দলের পুরোধা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বলা বাহুল্য দ্বিতীয় দলটি সাহিত্যে, জনমানসে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়। প্রথম দলকে এক অর্থে গ্রাস করে, তাদের স্বতন্ত্রতার চিহ্ন গুলিকে মুছে দেয়। তার প্রধান কারণ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখরা নিজেদের পথ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহান ছিলেন, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, যা তাঁদের সমকালের অত্যন্ত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তারা নিজেদের ধর্ম, হিন্দুধর্মের প্রাবল্যে নিজেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার শ্লাঘা বোধে আচ্ছন্ন ছিলেন। হিন্দুধর্মাক্রান্ত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। ফলে উনিশ শতকীয় দ্বন্দ্ব, জনপ্রিয়তার নিরিখে তাদের একটি অপ্রধান শাখায় রূপান্তরিত করেছিল মাত্র। কিন্তু ইতিহাস দর্শন, ধর্ম সমাজতত্ত্বের গবেষণায় তাঁরা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, তাঁদের প্রতিটি আবিষ্কার অবদান উল্লেখ্য। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের প্রাবল্যে তাদের গবেষণা খুব একটা জনপ্রিয় হতে পারেনি। তাঁদের ভাবনা-চিন্তা সিলেবাস এবং

পণ্ডিতদের গবেষণা পরিসরেই আবদ্ধ রয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যেই উপরোক্ত নানান স্তর বর্তমান, বিশেষত ধর্ম নিয়ে অবস্থানের ক্ষেত্রে। আমরা প্রধানত বাংলায় বৌদ্ধধর্ম চর্চা নিয়েই এখানে আলোচনা করছি।

এখন সমস্যা দেখা গেল, এই যে *গৌরবময় বৌদ্ধকাল*, একে কীভাবে উপস্থাপিত করা হবে? এই ধর্ম বা দর্শন কি হিন্দু ধর্মের বাইরের? নাকি, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তার সহাবস্থান সম্ভব? এটি যদি একটি ‘তৃতীয় ধর্ম’ হয় তাহলে এর গুরুত্ব ‘হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের প্রকল্পে’ ঠিক কতখানি? বাংলা সাহিত্য চর্চায় হিন্দুধর্মের হেজিমনির প্রভাব কতটা পড়েছিল? বৌদ্ধধর্ম বাংলা সাহিত্যকে কতখানি প্রভাবিত করেছে? বাংলা সাহিত্য এই সংক্রান্ত মতকে কতখানি ‘ম্যানিউপুলেট’ করেছে? এর সম্ভাবনাগুলি কেমন ছিল? রাজনীতির সঙ্গে তা কীভাবে যুক্ত।

অপর ধর্ম সম্পর্কে নিষ্ঠুর রকমের বিমুখ হওয়ার চেয়ে মনে হতে পারে উদার হওয়া ভালো। কিন্তু আমাদের মত, তা মন্দের ভালো বা কম খারাপ। ইংরাজিতে দুটি শব্দ আছে লিবারাল এবং সেকুলার। লিবারাল অর্থে নিজের বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠ মনে করার পর যে, ‘অপর’ সম্পর্কে সহিষ্ণু। যেখানে নিজের ধর্ম সম্পর্কে স্লাম্বা আছে সেখানে অন্য ধর্মকে সমান সম্মান দেওয়া যায়না, অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকেও নয়। ধর্মে সংখ্যাগুরু লঘু অনুযায়ী ক্ষমতার শ্রেণিকরণ তো থাকেই। একটি ধর্মের মধ্যেও থাকে বিভিন্ন শ্রেণিগত ক্ষমতার বিন্যাস। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই বিভেদমুক্ত নয়। ফলে ধর্মের ভিত্তিতে সমতার প্রস্তাবটিও অলীক।

আর সেকুলার এর অর্থ, ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতি ইন্ডিফারেন্ট মানে অনাসক্ত হওয়া। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সেকুলার এর বাংলা করেছেন- ‘না-ধর্মীয়’ বা ‘না-ধর্মীয় ভাবনা-চিন্তা-বিষয়’। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি সেকুলার মানে, তার বন্ধুত্ব, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার আইন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে উল্টোদিকের ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয়, তার জন্য, বাড়তি কোনো সুবিধে বা অসুবিধের কারণ হবে না। তাই রাজতন্ত্রে রাজার

ধর্ম মান্যতা রাখলেও, গণতান্ত্রিক সেকুলার দেশে ধর্মীয় পরিচয় নিতান্তই ব্যক্তিগত। কিন্তু বেশিরভাগ লেখকেরা হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন, তারপর প্রাতিষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্মকে বুঝতে চেয়েছেন। পরাধীন এবং স্বাধীন দুই রাজনৈতিক অবস্থানেই এর বদল খুব বেশি ঘটেনি।

তৎকালীন সাহিত্যিক ও সামগ্রিক বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যুক্ত বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা এই প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখেই এই ‘তৃতীয় ধর্মের’ আলোচনা করেছেন বা এড়িয়ে গেছেন। যার মধ্যে দিয়ে আসলে আমরা উনিশ বিশ শতকের দ্বন্দ্বিক রাজনৈতিক মতাদর্শকেই বুঝতে পারি। অনেক সময় একজন ব্যক্তির মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব, স্ববিরোধ তৈরি করেছে। কিন্তু প্রতিটি চর্চাই ধর্মীয় রাজনীতি এবং সমাজতত্ত্বের চর্চায় উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিকভাবে একথা বলা যায়, জনপ্রিয় ধারায়, যাঁরা বুদ্ধদেব কে নিয়ে চর্চা করেছেন, তাঁরা সকলেই বুদ্ধকে হয় ঈশ্বর, অবতার বা ঈশ্বরপ্রতিম করে তুলেছেন।

(২)

উনিশ শতকে যখন বৌদ্ধধর্ম-দর্শন, বুদ্ধদেব সম্পর্কে এত আলোচনা চলছিল তখন সবথেকে কাজক্ষিত ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা। কারণ তিনি তাঁর সমকালের প্রায় সকল বিষয় এবং ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাময়িকপত্রের সম্পাদক। তাঁর উপন্যাসেও সমকালীন জাতীয়তাবাদের সমস্ত যুগলক্ষণই সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে উপস্থিত। হিন্দুপ্রধান জাতীয়তাবাদের সফল প্রচারক তিনি। কিন্তু বুদ্ধ, বুদ্ধকাল, বৌদ্ধযুগ বিষয়ে তাঁর উপেক্ষা চোখে পড়ার মত। তাঁর প্রবন্ধের কিছু কিছু জায়গায় খুব বিক্ষিপ্ত ভাবে আমরা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গ পাবো। প্রথম থেকে শেষের দিকে ধারাবাহিকভাবে এর আলোচনা করলে, আমরা তাঁর বিবর্তিত মনোভাবেরও হদিশ পাবো। এই স্বল্প পরিসর থেকেই আমরা তাঁর দৃষ্টিকোণ বোঝার চেষ্টা করব।

সাংখ্যদর্শন প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি সাংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ব্যক্তিত্বের দিক থেকে খ্রিস্টের চেয়ে বুদ্ধকে আগে রেখেছেন।

সহস্র বৎসরকাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের মধ্যে যে সময়টি সর্বাপেক্ষা বিচিত্র এবং সৌষ্ঠব-লক্ষণযুক্ত, সেই সময়টিতেই এই বৌদ্ধধর্ম এই ভারতভূমির প্রধান ধর্ম ছিল।... কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, তত সংখ্যক কোন ধর্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্যা সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা তৎপরবর্তী। সুতরাং কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ মনুষ্যমধ্যে কে সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের জীবনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন, তখন আমরা প্রথমে শাক্যসিংহের, তৎপরে খ্রীষ্টের নাম করিব।^৭

প্রথমদিকে ভারতবর্ষের গৌরবময় যুগ হিসেবে বৌদ্ধযুগকে, মহত্বের দিক দিয়ে বুদ্ধের কথা বেশ কয়েকবার বলেছেন। বিশেষত সাম্য প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ এ বলেছেন-

বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত হইল- বর্ণবৈষম্য কতক দূর বিলুপ্ত হইল। প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিল। পুরাবৃত্তজ ব্যক্তির জ্ঞানেন যে, সেই সহস্র বৎসরি ভারতবর্ষের প্রকৃত সৌষ্ঠবের সময়। যে সকল সম্রাট হিমালয় হইতে গোদাবরী পর্যন্ত যথার্থই একচ্ছদ্রে শাসিত করিয়াছেন- অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য প্রভৃতি-এই কালমধ্যেই তাঁহাদিগের অভ্যুদয়। এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরব পশ্চিম রোমকে, পূর্বে চীনে গীত হইয়াছিল-তদ্বংশীয় রাজারা ভারতবর্ষীয় ধর্মপ্রচারকেরা ধর্মপ্রচারে যাত্রা করিয়া অর্ধেক আশিয়া ভারতীয় ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার এই সময়ে বিশেষ উন্নতি হয় প্রমাণ আছে। দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলনের বৌদ্ধোদয়ের আনুষঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের কালনিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু শাক্যসিংহের সম্পাদিত ধর্মবিপ্লবের সহিত যে সে সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে...। শাক্যসিংহ এবং যীশুখ্রীষ্ট পবিত্র সত্যকথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য মনুষ্যলোকে তাঁহারা যে দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহা যথাযোগ্য। (সাম্য, তদেব, পৃ ৩৩০-৩৩২)

সাম্য প্রবন্ধের এত বড় উদ্ধৃতিটি পড়ে মনে হবে যে, তিনি বুদ্ধ, বৌদ্ধকাল কে গৌরবময় যুগ হিসেবেই স্বীকার ও প্রচার করেছেন, একথা আপাত ভাবে ঠিকও। কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই প্রবল হিন্দুত্ববাদ প্রচরকেই তিনি উদ্দেশ্য বলে মনে করেন। যখন থেকে তিনি কৃষ্ণচরিত্র কে আদর্শ করতে চেয়েছেন তখন আগের মতামতগুলিও বদলে গেছে। বঙ্কিম প্রথমদিকের মতগুলিকে তিনি কৃষ্ণচরিত্র প্রকল্পের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। তাঁর ‘হিন্দুপ্রধান যথার্থ ভারত’ এর আদর্শ হিসেবে তিনি খাড়া করেন মহাভারতের, গীতার, কৃষ্ণকে। এছাড়া আর কোনো আদর্শ, ইতিহাস, সত্য কে তিনি গ্রহণ করেননি, স্বীকার বা প্রচার ও করেননি। সাম্য প্রবন্ধটিকেও তিনি মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন-

... শেষ কয় বৎসর তিনি ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত ‘সাম্য’ নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তাঁহার শেষ প্রচারিত এই নবধর্মের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃত্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্য এবং শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার আদর্শ পুরুষ। এই নবভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।^৮

বঙ্কিমের উক্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষী দিয়েছেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার -

এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে। ... ‘সাম্য’টা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।

(বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃ ১৯৮)^৯

এর পর যখনই সুযোগ পেয়েছেন বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তীব্র নিন্দা করেছেন।

ভারত কলঙ্ক এর ভারতবর্ষ পরাধীন কেন? প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ভারতের পরাধীনতার মূল কারণ ঐক্যহীনতা। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল বৌদ্ধধর্মের আগে ভারতবর্ষে একটাই ধর্ম প্রচলিত ছিল তার অন্তর্গত ছিল সমাজভেদ, আচার-ব্যবহার ভেদ, ভাষাভেদ, জাতিভেদ ইত্যাদি। কিন্তু বুদ্ধ আসার ফলেই নাকি ধর্মভেদ শুরু হয়! এবং পরে মুসলমান ও খ্রীস্টানরা তাকে প্রকট করে তোলে। তাই অনৈক্যের মূল এবং শুরুর কারণ, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম। উদ্ধৃতি-

...আর্য্যবংশীয়েরা বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড সমাজে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার ভেদ, আচার ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ, শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল।... পরিশেষে, কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহের হস্তে এক অভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইলে, অন্যান্য প্রভেদের উপর ধর্মভেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন রাজ্য, ভিন্ন ধর্ম; আর একজাতীয়ত্ব কোথায় থাকে? সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ ভারতবর্ষীয়েরা একতাপূন্য হইল। (তদেব, পৃ ২০৯)

খেয়াল করা যাক, ‘যথার্থ ভারতে’র উপমা হিসেবে, গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে মনে করিয়ে দিতে, ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনে, যেখানে বৌদ্ধকালকে ব্যবহার করা হচ্ছিল; অন্যদিকে, বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের অনৈক্য, পরাধীনতার অন্যতম কারণ হিসেবে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মকে অভিযুক্ত করছেন।

এছাড়াও লোকশিক্ষা প্রবন্ধে বলেছেন-

শংকরাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দ্বিধিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম শিখাইলেন। (তদেব, পৃ ৩২৪)

তিনি বুদ্ধ অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার কারণ হয়ত, হিন্দুধর্ম প্রচার মাহাত্ম্য। এছাড়াও কৃষ্ণচরিত্র এর অষ্টম পরিচ্ছেদে ‘কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা’ য় তিনি কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে, বলেন, বৌদ্ধদের প্রাচীন শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ নামে ব্যক্তি সত্যিই ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধের আগেকার। আর বৌদ্ধরা যেহেতু নাস্তিক ও হিন্দুধর্ম বিরোধী তাই তারা কৃষ্ণকে মার বা অসুর বলেছেন। যদিও বঙ্কিমের এই অনুমানের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Bournouf বলেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্র প্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্তিত হয় বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অসুর বিবেচনা করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসুর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছে “মার”। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব নিকামধর্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময় মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (তদেব, পৃ- ৩৬৯)

একটু আগেই আমরা দেখেছি প্রথমদিকে তথাকথিত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দার্শনিক পার্থক্যকে তিনি সসম্মানে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সাংখ্যদর্শন প্রবন্ধটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সেখানে তিনি বলছেন-

বেদে অবজ্ঞা, নির্বাক, এবং নিরীশ্বরতা, বৌদ্ধধর্মে এই তিনটি নূতন; এই তিনটিই ঐ ধর্মের কলেবর। উপস্থিত লেখক কর্তৃক ১০৬ সংখ্যক কলিকাতা রিবিউতে “বৌদ্ধধর্ম এবং সাংখ্যদর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, এই তিনটিরই মূল সাংখ্যদর্শনে। (তদেব, পৃ

১৯৫)

আমরা এই উদ্ধৃতি দিলাম কারণ, কৃষ্ণচরিত্র প্রকল্প নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আগের মত প্রায় সব বাতিল করে দেন। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ যে বঙ্কিমের কৃষ্ণ নন তা তার পাঠক মাত্রই জানেন। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র, তাঁর স্বতন্ত্র প্রকল্পের অংশ; যদিও এ বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য পৃথক পরিসর প্রয়োজন। আমরা শুধু বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁর বিবর্তিত মনোভাবের একটি ধারার পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি মাত্র।

এবং কৃষ্ণচরিত্র প্রকল্পকালে তিনি অনায়াসে “নাস্তিক ও হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধেরা” শব্দবন্ধ জুড়ে দিচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি। যেখানে সাংখ্যদর্শন প্রবন্ধে বুদ্ধ এবং কপিলের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করতে বলেছিলেন। (তদেব, পৃ ১৯৫)

এর পরের বিবর্তনগুলি আরও প্রকট। দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম তে তিনি আগেকার নিজের সব বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে নিজেই ঘোষণা করেন,

পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম, ইসলামধর্ম এবং খৃষ্টধর্ম, এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে; কেহই হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ... ভারতীয় আর্য্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। (তদেব, পৃ ৭০৯)

বঙ্কিমের উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি থেকে যা জানা যায় তাহল তিনি বৌদ্ধধর্মের কোনো প্রচার একেবারেই পছন্দ করতেন না। সুযোগ পেলেই তার তীব্র নিন্দা করতেন। এই একই মনোভাব এবং যুক্তি আমরা লক্ষ্য করব পরবর্তী আরেকজন বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তব্যের মধ্যে, তিনি- স্বামী বিবেকানন্দ। যদিও ধারণা এক নয়, সকলেই স্বতন্ত্র কিন্তু কিছু সূত্র তার মধ্যে আছে,- হিন্দুধর্মের প্রাধান্য প্রমাণ করতে গিয়ে অপর ধর্মকে নস্যাৎ করা। আবার পাঠকমাত্রেই একমত হবেন দুজনের “হিন্দুধর্ম” সম্পর্কিত মত-ভাবনা-প্রকল্প ও স্বতন্ত্র। বঙ্কিমের অনুসারী আরও কয়েকজনের কথা আলোচনা করব।

(৩)

কোনো বিপরীত মতকে নস্যাৎ করার জনপ্রিয় দুটি প্রধান পদ্ধতি হল- এক, অন্য মতকে অনবরত নিন্দা করে যেভাবে পারা যায় নস্যাৎ করা। আর দুই, অন্য মতটি, আসলে, আমার পছন্দের মতই, এরকম একটি ভ্রম উৎপাদনের সাহায্যে সেই মতটির আত্মীকরণে, গৌণ প্রতিপন্ন করা। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে উনিশ শতকে এই দুটি ‘আচরণই(treatment)’ ঘটেছিল। আমরা সেই প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি তার আগে বলে নেওয়া দরকার যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ যাঁরা ইতিহাসনিষ্ঠ ভাবে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে

গবেষণা করছিলেন, বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁদের মতান্তর ও মনান্তর ঘটে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দুটি উপন্যাসে বৌদ্ধধর্ম পটভূমি ও বিষয় হিসেবে উপস্থিত। বঙ্কিম হরপ্রসাদ প্রসঙ্গে এবং উপন্যাসদুটি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করবো। এছাড়াও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমাণ করেন যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ প্রান্তিক মানুষের মধ্যে নানা ভাবে (ধর্মদেবতা ইত্যাদি নিদর্শন দিয়ে ব্যাখ্যা করেন) রয়ে গেছে সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়নি, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় বিনা যুক্তিতে তাকে বহিরাগত ধর্ম হিসেবে দাগিয়ে দিয়েছেন, সেকথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ধর্মঠাকুর আসলে বৌদ্ধদেবতার অবশেষ এই বিষয়ক প্রবন্ধটির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে, হরপ্রসাদ নিজেই বলেছেন-

অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন,- “ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ! ছিঃ!”^{১০}

এর থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিরূপ গোষ্ঠী যে ‘তৃতীয় ধর্ম’ টিকে একেবারেই পছন্দ করছিলনা তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু একদল সমস্ত ঐতিহাসিক সত্যকে মেনে নিয়েই শুধুমাত্র হিন্দুপ্রধান নয় হিন্দুধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের ইতিহাসকেও স্বীকৃতি দিলেন। আর বৌদ্ধযুগকে ‘গৌরবময় যুগ’ হিসেবে কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি ছিলেননা। তারা এক ‘বিরাট বা মহান হিন্দুধর্মের ডাক দিলেন’ সেখানে তারা বিশেষত ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম ছাড়া বৌদ্ধ জৈন ইত্যাদি সকল ধর্মকেই বৃহৎ হিন্দুধর্মের আয়ত্তে আনতে চাইলেন। আর ইসলাম খ্রিস্টান ধর্মমতকেও রাখা হল হিন্দুধর্মের পাশে ‘অপর’ ধর্ম হিসেবে; কখনও আবার উপনিবেশ হিসেবে, শাসকের মনোভাবকে আপন করে একমাত্র, ইসলামকে প্রতিপক্ষ হিসেবে রাখা হল। রাজনারায়ণ বসু এবিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, মহাহিন্দু সমিতিতে- এরকম নানান প্রস্তাব দেন।^{১১}

ব্রাহ্মরা, নববিধান বা সমন্বয় ধর্ম ঘোষণা করেন। তাঁদের দৃষ্টিকোণ ছিল মূলত লিবারেল। ব্রাহ্মদের ‘লিবারেল’ নামে একটি পত্রিকাও ছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা, আমাদের মতের স্বপক্ষে অঘোরনাথ গুপ্ত (১৮৪১-১৮৮৬) রচিত “শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব” বইয়ের প্রকাশকের নিবেদন অংশের লেখক শ্রী সতীশকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করব-

ঐ সময়ে কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে দুর্নীতি জড়তা এবং সাম্প্রদায়িকতা এই তিন ব্যাধি জীবনের সকল উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই কারণে জাতীয় ঐক্য ও উন্নতি কল্পনার অতীত ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরিণাম তাহাই জানাইয়াছিল। তাহার চল্লিশ বৎসর পূর্বে, রাজা রামমোহন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ দুর্নীতি, জড়তা ও সাম্প্রদায়িকতাকে আক্রমণ করলেন; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য আধ্যাত্মশক্তি সঞ্চয় ও বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠার নানাবিধ আয়োজন করতে লাগিলেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ‘নববিধান’ বা সমন্বয় ধর্ম ঘোষণা করেন, নব্য বিধির বিজয়-নিশান উড়িয়ে।...এই সূত্রে ব্রহ্মানন্দকে ‘নব অধ্যয়নের’ প্রবর্তন করেছিলেন। ‘নব অধ্যয়ন’এ নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ঐ সময় ব্রহ্মানন্দ এক একজনকে এক একটি ধর্মের যথা- অঘোরনাথকে বৌদ্ধধর্মের, গৌরগোবিন্দকে হিন্দুধর্মের, প্রতাপচন্দ্রকে খৃষ্টধর্মের, গিরিশচন্দ্রকে ইসলাম ধর্মের অধ্যোতার পদে নিয়োগ করেন।^{১২}

ব্রহ্মানন্দ(?-১৮৮৪), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এই দুজন ‘নববিধান’ প্রকল্পের খুবই উল্লেখযোগ্য নাম। ‘নববিধান’এ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রচর্চার ওপর তাঁরা গুরুত্ব দেন। ১৮৮০ সালে এই ধারাতেই ‘সাধু সমাগম’ উৎসব চালু করা হয়। সেখানে ‘শাক্যসমাগম’ উৎসবও পালিত হয়। কেশবচন্দ্রের ভাই, কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-১৮৯৫) *বুদ্ধচরিত*^{১৩} ও *অশোকচরিত* নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কন্যা, সুনীতি সেন ১৯২৯ সালে *The Life of Princess Yasodhara*^{১৪} গ্রন্থটি লেখেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) লেখেন *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ*।^{১৫} ব্রাহ্মদের এই ধারটির মনোভাব এবং পরিচয় আমরা নবীনচন্দ্র সেনের মন্তব্য থেকেও পাই-

ব্রাহ্মদের ‘লিবারেল’ পত্রিকায় মনস্বী কৃষ্ণবিহারী সেন ‘খৃষ্টের’ অনুবাদের ও ভূমিকার একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে ধর্মের সামঞ্জস্য (*Harmony of Scriptures*) ব্রাহ্মরা অনেকদিন ধরেই প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুপক্ষ হইতে উহা আমার দ্বারা এই ভূমিকায় বিচক্ষণতার সহিত প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছে।^{১৬}

‘হিন্দুপক্ষের’ নবীনচন্দ্রের এই সিরিজের *অমিতাভ* নিয়ে একটু পরেই আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব। কিন্তু এই নববিধানের ধারাটি খুব বেশিদিন তাদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পারেননি। ব্রাহ্মধর্মের মতই তাদের এই বিধানও হিন্দুপ্রধান জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। উপরে নবীনচন্দ্রের উদ্ধৃত মতে আমরা তার স্বরূপ খানিকটা উপলব্ধি করতে পারি। *অমিতাভ* প্রশংসাই তার প্রমাণ। তাদের নিজস্ব হিন্দুধর্মীয় শ্লাঘাও এর একটা বড় কারণ ছিল। যা উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধের মূল যুগ বৈশিষ্ট্য দ্বন্দ্বিকতাকেই প্রকট করে। আমরা প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু পাঠগুলিকে(text) বিচার করে তার আলোচনা করব।

(8)

হিন্দুত্ববাদীরা বুদ্ধকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিষ্ণুর অবতার বলে বর্ণনা করতে শুরু করেন। এবং একথাও বলেন যে তাঁর মতবাদ হিন্দু ধর্ম-দর্শন থেকে আলাদা কোনো মতবাদ নয়। এবং এই পথের হৃদিশ তারা পায় ধ্রুপদী সাহিত্যগুলি থেকেই, ধর্মীয় দর্শনের রাজনৈতিক ইতিহাসে উনিশ শতকের বহু আগে থেকেই বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মকে আত্মীকরণের চেষ্টা চলছিল, উনিশ শতকে সেই মতই আরও পুষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁরা *ভাগবত*, *গীতগোবিন্দ* থেকে উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করলেন বুদ্ধ, বিষ্ণুর অবতার। *সাহিত্যদর্পণ*কার বলেছেন-

মৎসঃ কূর্মো বরাহঃ নৃসিংহোহথ বামনঃ

রামো রামশ্চ রামশ্চ বৌদ্ধঃ কঙ্কী চ তে দশ।।^{১৭}

অর্থাৎ মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ, কঙ্কী- এই দশ অবতার। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুর ২৪ টি অবতারের কথা আছে। সেখানে বলা হয়েছে- একুশ নম্বর অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করবেন বুদ্ধ।

তারপর, কলিকালে অসুরদের মোহিত করতে আসবেন বুদ্ধ অবতার। অঞ্জনের পুত্ররূপে তিনি গয়াধামে অবতীর্ণ হবেন।^{১৮}

এই অধ্যায়েই আরেকটু পরে, আলোচনা করবো সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তাঁর বইয়ে, ভাগবতের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যি প্রমাণ করতে গিয়ে, আবেগসর্বস্ব হয়ে বলেছেন, লুম্বিনী নয়, গয়াতেই বুদ্ধের বোধিলাভের ফলে বুদ্ধের, সত্যিকারের জন্ম হয়েছে! এবং তার মায়ের নাম অঞ্জনা!

বিষ্ণুপুরাণ-এর তৃতীয় অংশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধ মায়া-মোহ নামে অভিহিত হয়েছেন। বল্লাভাচার্য্য বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় পাদের ষড়্বিংশ সূত্রের ব্যাখ্যায় আছে- ভগবান দৈত্যগণকে বিমূঢ় করতে প্রবৃত্ত হবেন। জয়দেব গীতগোবিন্দতে লিখেছেন-

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং/ সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম/ কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর/ জয় জগদীশ হরে।” (হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করে দয়াদ্রিচিতে পশুহত্যার অপকারিতা দেখিয়ে শ্রুতি বা বেদ এবং যজ্ঞের নিন্দা করেছ। জগদীশ হরি তোমার জয় হোক।)^{১৯}

বুদ্ধ তাঁর সময়ে প্রচলিত যাগ-যজ্ঞ আড়ম্বর যুক্ত বৈদিক ধর্মকে এবং বেদকে অস্বীকার করে জাতিভেদ বর্ণভেদের উর্ধে এক নতুন ধর্ম-দর্শনের কথা প্রচার করেন। যার মূল কথা মধ্যপন্থায় সাধনার মাধ্যমে সততা ও সংযমের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করা। এর ফলেই তার সুদূরপ্রসারী জনপ্রিয়তা তৈরি হয়। পরবর্তীকালে তার শিষ্যরা এই দর্শন প্রস্থানকে আরও বিস্তৃত করেন। হিন্দুধর্মের কাছে বৌদ্ধধর্ম ছিল চিরকালীন আশঙ্কার কারণ। ফলে তাকে পরবর্তীকালে বিষ্ণুর অবতারভুক্ত করে তার স্বতন্ত্রতাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার এক দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা হল উপরোক্ত ধ্রুপদী সাহিত্য গুলি। বলাবাহুল্য এগুলো সব এককালের রচনা নয়। আলোচকদের মতে এর মধ্যে প্রক্ষেপও আছে যথেষ্ট পরিমাণে। তাহলেও তা আমাদের মতটিকেই পুষ্ট করে যে অতীতেও এই “বৌদ্ধধর্ম” তাদের কাছে এতটাই আশঙ্কার ছিল যে দীর্ঘকাল ধরে তারা এই ধর্ম এবং প্রবক্তা বুদ্ধকে কোথায় অধিষ্ঠিত (situate) করবেন তাই ভেবেছেন। উনিশ শতকেও আমরা একই প্রবণতা লক্ষ্য করব, শুধু তাই নয় বর্তমান ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও সেই কথাই বলবে; এই সমস্ত ধারাগুলির উত্তরাধিকার বর্তমান রাজনৈতিক প্রস্থানগুলিতেও উপস্থিত। এই

প্রসঙ্গে বলে রাখি, বঙ্কিমচন্দ্র এই অবতারবাদের ধারাটি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তিনি বৌদ্ধধর্মকে স্বতন্ত্র ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করেই তার প্রতি বিরূপ ছিলেন। কারণ এই ধারাটি সম্পর্কে তিনি জানতেন না, তা কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। যখন তাঁরই বন্ধু, শিষ্য, অনুগামী নবীনচন্দ্র ওই ধারার একজন অন্যতম প্রচারক। বঙ্কিম নিজে *কৃষ্ণচরিত্র* বিশ্লেষণ করছেন, অথচ বিষ্ণুর অবতার হিসেবে বুদ্ধের কোন প্রসঙ্গই আসেনি।

উনিশ শতকে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আগে বলেছি, যিনি বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পরিশেষে ভাববাদী যুক্তিতে নেতিবাচক মন্তব্য করেই তাকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। তেমনি অতীতেও সকলে বুদ্ধকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রমাণে তৎপর ছিলোনা, নেতিবাচক সমালোচনায় তাকে ‘অপর’ করার প্রচেষ্টাও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই ধারারও উত্তরাধিকারী।-

যা হি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধঃ/ তথাগতং নাস্তিকম্ অত্র বিদ্ধি।।^{২০}(রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯। ৩৪)

অনেক পরে, চৈতন্যচরিতকারগণও চৈতন্যদেবকে কাশীতে বৌদ্ধদের ধ্বংসকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে বৌদ্ধদের প্রতি অশ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। চূড়ামণি দাস, গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতই বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর রামায়ণ প্রণেতা, রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।^{২১} একথা আমরা সকলেই জানি পুরীতে বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থার বহু নিদর্শন প্রমাণ আছে। সুধাংশুবিমল বড়ুয়া তাঁর, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*-তে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে, বৌদ্ধদের প্রতি ব্যবহারের বিস্তৃত উদাহরণ দিয়েছেন (পৃ ১০-১৪)। হিন্দুধর্ম এবং তার প্রধান ও অপ্রধান মান্য ধারা গুলি চিরকালই বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে আশঙ্কিত হয়েছে।

(৫)

আমরা আবার ফিরে আসব উনিশ এবং বিশ শতকের আলোচনায়। উপরোক্ত গ্রন্থ গুলির প্রমাণের ভিত্তিতে বাঙালি শিক্ষিতসমাজের একটি ধারা বুদ্ধকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রমাণে জোর দিলেন। সর্বপ্রথম আমরা বঙ্কিমের দুই শিষ্য, অনুগামী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের কথা উল্লেখ করব। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ভাবনায় বঙ্কিমপন্থীই ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ইতিহাসবিদ। তাই ইতিহাস-নিষ্ঠতা ছিল তাঁর ভাবনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক তিনটি উপন্যাসে তিনি বৌদ্ধদের যথাসম্ভব হীন চরিত্র হিসেবেই এঁকেছেন। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে সেই নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর মনোভাবের প্রকাশই ঘটেছে তাঁর *বাল্মীকির ইতিহাস* গ্রন্থে শশাঙ্ককে অত্যাচারী রাজা বলায় তিনি ফা-হিয়েন সম্পর্কে বলেছেন-

চৈনিক শ্রমণের ধর্মমত অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল এবং তিনি স্বধর্মীগণের প্রতি সর্বত্র অযথা পক্ষপাত নিদর্শন করিয়াছেন।^{২২}

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুদ্ধ রচনার উদ্দেশ্য ছিল, বুদ্ধ বিষয়ক অলৌকিকতাকে প্রশ্ন করা, ভ্রান্ত প্রমাণ করা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ ছিলেন তা আমরা বলেছি; তিনি একে স্বতন্ত্র ধর্ম বলেই স্বীকার করতেন। এই বইটির স্বতন্ত্র গুরুত্ব তাঁর ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করার জন্য। প্রথম পরিচ্ছেদ *জন্ম*। সেখানে আছে-

যীশুর জন্মের পরে বুদ্ধদেব জন্মান এই ধারণা ভুল। বুদ্ধের মৃত্যুর দুই তিন শত বছর পরে তাঁর ধর্ম ভারতবর্ষে বিখ্যাত হয়ে পড়লে লোকে তাঁর সম্পর্কে অলৌকিক কথা রটায়। ...যাহারা বুদ্ধের ধর্ম মানিয়া চলে তাহারা এই সমস্ত অলৌকিক প্রবাদে বিশ্বাস করে, এবং বুদ্ধের জন্মের দুইশত বৎসর পরেও ভারতবর্ষের লোকে এই সমস্ত জন প্রবাদ বিশ্বাস করে।^{২৩}

মায়াদেবীর গর্ভে শ্বেত হাতি প্রবেশ, পৃথিবীর পাপ বেড়ে যাওয়ায় দেবতাদের অনুরোধে জন্মগ্রহণ, জন্মের পরে সাত পা হেঁটে ফোয়ারা ওঠা, সাতটি ধর্মের সূত্র পাঠ, পাঠশালায় গিয়ে একদিনে ৬৪ অক্ষর শেখা, সমবয়সী সকল বালক অপেক্ষা দূরে তীর ছোঁড়া ইত্যাদি উল্লেখ করে রাখালদাস বাবু বার বার বলেন-

এই সমস্ত ঘটনা সত্যি হতে পারে না। (তদেব, পৃ ৮)

এই সকল প্রবাদও বিশ্বাস করা যায় না। (তদেব, পৃ ১০)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ *গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস* এও তিনি একইভাবে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে তার অসারতা প্রমাণ করতে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্ত-

রাজবংশে জন্মিয়াও গৌতম সিদ্ধার্থ কেবল মানুষের দুঃখে দুঃখিত হইতেন বলিয়া আজ প্রথিবীতে দেবতার মত সম্মান পাইতেছেন। (তদেব, পৃ ২৭)

আমরা আগেই বলেছি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বই খুবই ইতিহাসনিষ্ঠ। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন থেকে যায় বিষয় নির্বাচনে। আমরা জানি, লেখকের বিষয় নির্বাচন তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের চিহ্ন। তিনি আর কোন হিন্দু ধর্মপ্রবক্তাদের অলৌকিকতা খণ্ডন করেননি। হঠাৎ বুদ্ধ কেন? বুদ্ধ বিষয়ক তাঁর সমকালে অতি চর্চায় কী তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন? তাঁর উদ্দেশ্য, উপন্যাসগুলির আলোচনায় আরও স্পষ্ট হবে। বলাবাহুল্য, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ভাবনা জনপ্রিয় হয়নি। তখন বুদ্ধ হিন্দুধর্মের একজন, এবং কৃষ্ণের অবতার, এই তত্ত্ব ভুরিভুরি প্রধান অপ্রধান লেখকদের দ্বারা, দিকদিকে প্রচারিত। এরপর আমরা আলোচনা করব নবীনচন্দ্র সেন ও তাঁর “অমিতাভ” নিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে নবীনচন্দ্র এই সময় কৃষ্ণকে নায়ক করে হিন্দুধর্মের আদর্শের নতুন ব্যাখ্যা তৈরি করতে চাইলেন; লিখলেন *রৈবতক*(১৮৮৬), *কুরুক্ষেত্র*(১৮৯৩), *প্রভাস*(১৮৯৬)। এই কাব্য গুলি রচনার মাঝেই নবীনচন্দ্র নববিধানের মতই তিন জনকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন- *অমিতাভ*(১৩০২), *খৃষ্ট*(১২৯৭), *অমৃতভ*। তিনি বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য তিনজনকেই কৃষ্ণের অবতার হিসেবেই বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই বইগুলি লেখার উদ্দেশ্যই বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের মহিমাকে আরও বিকশিত করা। ফলে নবীনচন্দ্র বঙ্কিমের

ভাবনার যোগ্য উত্তরসূরী। যদিও তাঁর ধরন ভিন্ন। এখন আমরা, *অমিতাভ* লেখার পেছনে তাঁর রাজনৈতিক অভিপ্রায়টি বোঝার চেষ্টা করব।

অমিতাভ এর ভূমিকাতে, লেখকের সমকালে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে মনোভাবের একটি পরিষ্কার ধারণা আমরা করতে পারি-

...এ পর্যন্ত বুদ্ধদেব হিন্দুদিগের কাছে ঘোরতর বিদ্বেষভাজন ছিলেন। বিদ্বেষ এতদূর যে, পশ্চিমদেশীয় হিন্দুগণ বুদ্ধদেবের নাম করিলেই তাঁহাদের সকল পুণ্য ক্ষয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন।^{২৪}

স্বাদেশিকতা এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এতটাই প্রবল ছিল, যে হিন্দু ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম যে স্বতন্ত্র ধর্মমত সেই সত্যটিকে বিদেশী বলে প্রচার করা হয়।

ইংরেজী-শীক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে, বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম এবং এতাদৃশ বিপরীত-মতাবলম্বী যে, ব্রাহ্মণগণ যষ্টির আঘাতে উহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এ বিশ্বাসের যে মূল- কি, তাহা আমি বড় বুঝিতে পারি নাই।

(তদেব, পৃ ১০১)

এই মত প্রচারের উদ্দেশ্যও ছিল এই বই লেখার পেছনে। বলাবাহুল্য এই বই লেখার সমস্ত যুক্তিগুলিই দ্বন্দ্বিক, ভাবসর্বস্ব এবং আবেগমূলক।

অমিতাভ রচনার একটি ঘোষিত উদ্দেশ্যও ছিল। নবীনচন্দ্র সেন, তাঁর আত্মজীবনী, *আমার জীবন* এ *অমিতাভ* সম্পর্কে বলেছেন- এডুইন আর্নল্ডের *Light of Asia* পড়ে, বিহার ভ্রমণ করে এবং কিছু বৌদ্ধপুথি পাঠ করে তাঁর বুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি হয়। বুদ্ধচরিত্রকে যেভাবে অতিরঞ্জিত অলৌকিক এবং অতিমানুষিক ভাবে দেখানো হয়েছে, তা তিনি একেবারেই সমর্থন করেননি; তাই তাঁর উদ্দেশ্য, বুদ্ধের মানবিক রূপকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া।

অতি-মানুষিকের কার্য্য মানুষে করিতে পারিবে কেন? অতএব আমরা যেভাবে বুদ্ধদেবকে চক্ষের উপর দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধারণা করতে পারি, সেভাবে চিত্র করাই।^{২৫}

এর থেকে আমাদের ধারণা হয়, তিনি মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের আলোচনার পক্ষপাতি, বুদ্ধর অবতারত্ব নয়, ইতিহাসনিষ্ঠভাবে মানুষ হিসেবেই দেখতে চাইছেন, প্রচার করতে চাইছেন। কিন্তু পরক্ষণেই বারবার তিনি বুদ্ধের ধ্যান করেছেন ঈশ্বররূপে। তাঁর লেখা যখন আর এগোচ্ছিল না তখনই-

বুদ্ধদেবের ধ্যান করিয়া বলিলাম, “তোমার ধর্ম তুমি লেখাইয়া দাও। আজ যাহা লিখিব, আমি আর ছিঁড়িব না।” তাহাই হইল। সে দিনই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা ও ‘অমিতাভ’ শেষ করিলাম। (তদেব, পৃ ৩৪-৩৫)

এখানে তাঁর ঘোষণা আর ঈশ্বরত্ব আরোপ দুই বক্তব্য স্ববিরোধিতা তৈরি করেছে। এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে দেব-দেবীরা স্বপ্নের মাধ্যমে রচয়িতাকে কাব্য রচনার আদেশ দেয়, এরকম একটি ফর্ম জনপ্রিয়, এবং সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বাসীদের মনে আস্তা উৎপাদনেও তা সাহায্য করত। এখানেও সেই একই ছক এবং চিহ্ন বর্তমান, নবীনচন্দ্র বারবার বলেছেন, তিনি নন বুদ্ধই তাকে দিয়ে এই লেখা গুলো লিখিয়ে নিয়েছে; তিনি সেই বক্তব্য ধ্যানে পেয়েছেন। কিন্তু দেখা যাবে তাঁর লেখায় এবং বক্তব্যে অত্যন্ত সচেতন ভাবে যুগ স্বর এবং রাজনীতিই বর্তমান। আরও অনেকেই যে কথাগুলি মানতে বা মানাতে চাইছেন তাঁদের লেখায় সেই ‘ম্যানিউপুলেটিভ’ সুরই বর্তমান। নবীনচন্দ্র বলেছেন, গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী, পরধর্ম বিদ্বেষী পত্রিকা ‘অমিতাভ’ ছাপতে চাওয়ায় তিনি ভীষণ অবাক হয়েছিলেন।

এই কাব্যের কয়েক অধ্যায় “জন্মভূমি” নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, “জন্মভূমি” “বঙ্গবাসী” প্রমুখ হিন্দু-সম্প্রদায়ের মুখপত্রিকা। গুনিয়াছি, উক্ত কয়েক অধ্যায় “বঙ্গবাসী” অধ্যক্ষগণের ও সাধারণ হিন্দু পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। যদি তাহা সত্য হয়, তবে আমার পক্ষে ততোধিক সুখের ও সৌভাগ্যের কথা আর কিছুই হইতে পারে না।^{২৬}

আমরা অবাক হওয়ার কোনো কারণ তেমন দেখিনা। নবীনচন্দ্রের যা উদ্দেশ্য পত্রিকাগুলির ও তাই উদ্দেশ্য- হিন্দুধর্মের মধ্যে ভিন্নধর্মমত এর আত্মীকরণ, তাদের গোঁণ করা। নবীনচন্দ্রের নিজের কথায়-

আমি দেখাইয়াছি যে, বুদ্ধ নিজে হিন্দু ছিলেন, হিন্দু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং যোগশাস্ত্রমতে যোগসাধনা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সম্প্রসারিত হয়ে বৌদ্ধধর্মে পরিণত হয়েছে।^{২৭}

অমিতাভতে তাঁর যুক্তি, বুদ্ধ যেহেতু ঈশ্বর বিষয়ে নিশ্চুপ, তাই নবীনচন্দ্র সেন এই মৌনতার মানে সমর্থন করা বলতে চেয়েছেন। আমরা আগেই অবতারকল্পের ধারাটির উল্লেখ করেছি, নবীনচন্দ্র এই ধারারই সমর্থক। বলেছেন-

আমরা আরও দেখিতেছি, বুদ্ধদেব আমাদের দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার। তিনিই শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথরূপে পূজিত হইতেছেন।

(অমিতাভ, পৃ ১০২-৩)

তাঁর ভাবপ্রবণ যুক্তিতে তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণাকেও সরলীকৃত করে দেন। গয়ার বিষ্ণুপদ যে আসলে বুদ্ধপদ তা রাজেন্দ্রলাল মিত্র যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র আশ্চর্য যুক্তিতে তাকে আবার বিষ্ণুপদ বানিয়ে দিয়েছেন!

বঙ্গের কৃতী পুত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখাইয়াছেন, শ্রীক্ষেত্রের অদ্ভুত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্তি, বৌদ্ধদিগের মধ্যে যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ নামক তিনিটি মণ্ডল ছিল, তাহারই প্রতিরূপ মাত্র। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বুদ্ধগয়ার সমীপবর্তী বিষ্ণুপদ বুদ্ধপদ মাত্র। বুদ্ধ আমাদের বিষ্ণু অবতার, কাজেই উহা বিষ্ণুপদ। (অমিতাভ, পৃ ১০৩)

অদ্ভুত যুক্তি! কিন্তু এইরকম যুক্তিতেই, পুরাণ, কল্পনা, ইতিহাস, গবেষণার স্বাতন্ত্র্যকে জনমানসে ‘গুলিয়ে’ দেওয়া হয়েছে। আমাদের গবেষণায় বারবার এই ধরণটি ঘুরেফিরে আসবে। সুতরাং পত্রিকার সঙ্গে বা উনিশ শতকের প্রবল হিন্দুত্ববাদী-পরধর্ম বিদ্বেষীদের সঙ্গে বিরোধের কোনো কারণই নেই, উভয়ের উদ্দেশ্যই এক।

অমিতাভের প্রথম অংশ অবতার,-

প্লাবি সপ্ত স্বর্গ শান্তির ত্রিদিব

বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ-পতির শ্রবণে,

জন্ম-জরা-ব্যাধি মৃত্যু-হাহাকার

পশিল নরের করুণ স্বনে।

কাঁদিল তাঁহার করুণ হৃদয়,

ব্যথিত হইল কোমল প্রাণ,

কহিলা- 'লভিব এক জন্ম আর,

জগতের দুঃখ করিব নিৰ্ব্বাণ।”

গাইল আনন্দে দেবতা সকল,

স্বর্গে, স্বর্গে, স্বর্গে ছুটিল গান,-

“লভিবেন হরি এক জন্ম আর

জগতের দুঃখ করিতে নিৰ্ব্বাণ।”

(তদেব, পৃ ৫)

উদ্ধৃতিটির ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বারবার অবতারের প্রসঙ্গে এসেছে।

নবীনচন্দ্র সেনের এই কাব্য লেখার উদ্দেশ্য বিফলে যায়নি। তিনি নিজেই বলেছেন-

কলিকাতার যেখানে যাই সেখানেই ‘কুরুক্ষেত্রের’ ও ‘অমিতাভের’ প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। ...এতকাল সকলের বিশ্বাস ছিল যে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী, এবং বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে নিষ্কাশিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন আমি এ সকল ভ্রম-সিদ্ধান্ত দূর করিয়া ধর্মজগতের ইতিহাসে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছি। (আমার জীবন, ৫ম ভাগ, পৃ ৩৭)

এভাবেই কল্পনা, ইতিহাস হয়ে উঠছে; গবেষণালব্ধ প্রমাণ হয়ে পড়ছে, গৌণ। উপরের আলোচনায় আমরা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারব আপাত ভাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়(অন্তত ইতিহাসনিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে নেতিবাচক প্রমাণ করছেন। ঠিক কি ভুল সেটি পরের আলোচ্য), শরচ্চন্দ্র দাস প্রমুখদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেনের একটি পার্থক্য আছে। পরবর্তী নাম গুলি ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কে অস্বীকার করে নানান ধর্মগ্রন্থ পুরাণকে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করছেন, কখন ব্যক্তিগত আবেগকে যুগ-আবেগে পরিণত করে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই

সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন (যেমন বুদ্ধপদকে বিষুপদরূপে প্রমাণ নয় প্রচার)। আর পরবর্তীকালে বহু বিখ্যাত লেখকও এই একই পথে হেঁটেছেন। ইতিহাস স্বীকৃত সিদ্ধান্তেরও বিরোধিতা করেছেন। আর তার ফলেই তাঁদের উদ্দেশ্য বুঝতে আর কোনো দ্বিমত থাকেনা। উপন্যাসে এই প্রবণতাগুলি গভীর ছাপ ফেলেছে।

(৬)

পরবর্তীকালেও এই আবেগনির্ভর সিদ্ধান্তের জনপ্রিয়তাই আমরা লক্ষ্য করব। ১৩১৬ সালে প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বুদ্ধবাণী* নামক একটি বই লেখেন। এটি তাঁর কথা অনুযায়ী,-

কবিবর এডুইন আর্ল্ড প্রণীত *লাইট অফ এসিয়া* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ হইতে অনূদিত।^{২৮} মুখবন্ধতে তিনি ‘ভগবান বুদ্ধ’ কথাটি উল্লেখ করেছেন। এই বইটি উত্তরপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায়ক নিবেদিত। এই মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় “বৈরাগ্য-সোপান” নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা চালাতেন, তা ভাগবত কথায় পূর্ণ থাকত ও বিনামূল্যে বিতরিত হত। এর থেকে সহজেই বুঝতে পারি অবতারকল্প-প্রকল্পেই বইটির অবতারণা। এই বইয়ের নিবেদন অংশে আছে-

...শিখেছি তোমারি কাছে

মরণের ভাদাভেদ কালাকাল নাহি আছে।

ছাড়ি জীর্ণ-বাস, করি’ নব বস্ত্র পরিধান,

জানিনা কোথায় তুমি করিতেছ অধিষ্ঠান;

(তদেব, পৃ ২)

এঁদের মধ্যে, উল্লেখযোগ্য সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। হিন্দুধর্ম নিয়ে বহু বই লেখার পাশাপাশি বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম নিয়েও আলোচনা করেছেন। জনপ্রিয়, *বুদ্ধদেব* বইয়ে বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করেছেন। এই

বইয়ের ভূমিকা অংশটি উদ্ধৃত করবো। তিনি প্রথমেই তাঁর আগের বুদ্ধ-জীবনচরিত প্রণেতাদের নাম করেছেন। রামদাস সেন, অঘোরনাথ সাধু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

এতদ্ব্যতীত অশোকচরিত প্রণেতা কৃষ্ণবিহারী সেন, মহাপরিনির্বাণসূত্রের অনুবাদক শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী, ধর্মপদের অনুবাদক ও সম্পাদক চারুচন্দ্র বসু। কতিপয় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম সম্পাদক পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি মহোদয়গণ স্ব স্ব গ্রন্থ প্রকাশনা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম আলোচনার পথ অনেক পরিমাণে উন্মুক্ত করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি আই ই মহোদয়ই বোধহয় এদেশে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মের আলোচনার দ্বার সম্যক উন্মোচিত করেন। শরচ্চন্দ্র দাস কলিকাতা Buddhist Text Society র প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের গোচরীভূত করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি লোকের যে চিরন্তন বিদ্বেষ ছিল তাহা যিনি সম্পূর্ণরূপে উন্মূলন করেছেন তাঁর নাম নরেন্দ্রনাথ সেন। তিনি স্বীয় “ইণ্ডিয়ান মিরর” নামক সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় নানা বৌদ্ধতত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া ঐ সকলের প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের শ্রদ্ধা সঞ্চয় করিয়াছেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত ধর্মবংশ ভিক্ষু পালি গ্রন্থ অধ্যাপনায় ব্রতী হইয়াও শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ ভিক্ষু কলিকাতায় একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। সিংহল দ্বীপের অনাগরিক ধর্মপাল মহোদয় গয়ায় বিশ্রামভবন ও কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটি সংস্থাপিত করিয়া বঙ্গে বৌদ্ধভাব জাগরিত রাখিয়াছেন। বর্তমান সময়ে বঙ্গে এরূপ সুলেখক অতি অল্পই আছেন যাঁহারা কোন না কোন প্রকারে বৌদ্ধ মতের আলোচনা করিতেছেন না। বস্তুতঃ বৌদ্ধ পুরাতত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

অধুনা এতদ্দেশে বৌদ্ধসাহিত্য পুনরুজ্জীবিত করিবার পক্ষে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে এক ক্ষুদ্র ব্যক্তি। বৌদ্ধ পুরাতত্ত্ব অবিকৃতভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করাই আমার মুখ্যতম উদ্দেশ্য।^{২৯}

এতবড় উদ্ধৃতির কারণ, বিংশ শতাব্দীর বৌদ্ধচর্চার পরিসর সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া সমকালীন লেখকের জবানিতেই। এত আলোচনা সত্ত্বেও এমন কী বলার ছিল যার জন্য সতীশচন্দ্রও এতবড় দলে সামিল হতে চাইলেন? কোন কথাটি বলা হচ্ছেনা বা কম বলা হচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়েছিল? আমরা আরেকটি অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর মতটি স্পষ্ট করার চেষ্টা করব-

হিন্দু পুরাণ শাস্ত্রে বুদ্ধদেব ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আজকাল কেহ কেহ বুদ্ধ শাক্যসিংহের অবতারত্ব স্বীকার করেন না। প্রায় এক বৎসর পূর্বে সাহিত্যসভার কোন অধিবেশনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি ছিলেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধের অবতারত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। মন্তব্য প্রকাশকালে লেখকের বক্তব্য- বুদ্ধ শাক্যসিংহ কখনও আপনাকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া, পরিচয় দেন নাই বটে, কিন্তু যখন বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয় হয় তখন হিন্দুগণ প্রার্থিত না হইয়াও স্বয়ংই শাক্যসিংহকে ‘অবতার’ এই উপাধিটি প্রদান করেন। শাক্যসিংহ কপিলবস্তুর জন্মেছিলেন বটে কিন্তু গয়ায়

তাঁহার বুদ্ধত্বলাভ ঘটয়াছিল। যে দিন গয়ার বোধিচক্রমূলে ষড়বর্ষব্যাপিনী তপস্যার পর শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সেদিনই বুদ্ধের প্রকৃত জন্ম হইয়াছিল বলিতে হইবে। সুপ্রসিদ্ধ মহাবংস গ্রন্থের মতে বুদ্ধের মাতামহের নাম অঞ্জন। অঞ্জনের কন্যা বলিয়া মায়াদেবী অঞ্জনা নামে পরিচিতা। (তদেব, পৃ ৬)

তাঁর সিদ্ধান্ত- বুদ্ধ নিশ্চিতরূপেই বিষ্ণুর অবতার, শাক্যবংশ, রামের বংশ সূর্যবংশের শাখামাত্র, এবং ব্রহ্মা আসলে অনেক বুদ্ধের মধ্যে একজনকেই মনোনীত করেন তিনিই গৌতম বা বুদ্ধ। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যা কিছু ভালো সবকিছুরই উৎপত্তি ভারতবর্ষে এরকম একটি ভাবনা নির্মাণ করার চেষ্টা চলছিল। ফলে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক মন্তব্য করেন-

পালি ভাষার জাতকগ্রন্থ অতি প্রাচীন পালি জাতকই বোধহয় পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শুকসপ্ততি ইত্যাদি গ্রন্থের মূল ভিত্তি। পালি জাতকের ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে পাঠকগণ ইসপ্স ফেবলের উৎপত্তি বিবরণ দেখিতে পাইবেন। ভারতবর্ষের গল্প সমূহ ইউরোপে প্রবেশ করিয়া ইসপ্স ফেবলের সৃষ্টি করিয়াছিল। (তদেব, পৃ ২২)

রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেন সেগুলি ভারতরহস্য নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও রচনা করেন- ঐতিহাসিক রহস্য, ৩ ভাগ (১৮৭৬-৭৯), বৌদ্ধধর্ম, শাক্যসিংঘের দিগ্বিজয়, পালিভাষা ও তৎসমালোচনা, বুদ্ধদেবের দত্ত, বুদ্ধদেব(১৮৯১)। তাঁর *Buddhdeva-His Life & Teachings* এও একই কথা বলেছেন-

শাক্যবংশ “আমাদিগের পৌরাণিক সূর্যবংশের একটি পৃথক শাখা মাত্র।”^{১০}

তাঁর বইয়ের ভূমিকা-লেখক কালীবর শর্মার সিদ্ধান্ত-

বুদ্ধ বেদের নিন্দা করেননি, হিংসা বাদ দিয়ে বেদ ও যজ্ঞকে মান্যতা দিয়েছিলেন। তাই ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে ‘নারায়ণের অবতার’ বলে গ্রহণ করেন।

(তদেব, পৃ ১)

আমরা দেখবো, অনুরূপা দেবী প্রমুখের উপন্যাসে সরাসরি এই ভ্রান্ত মন্তব্যগুলি ছাপ ফেলছে, সেই অনুযায়ী প্লট, সংলাপ কল্পিত হয়েছে।

(৭)

আমরা এই তালিকায় আর দুজনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করব- বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে তাঁর মতামতও এই তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, উদ্দেশ্যও এক। তাঁর গুরু বিবেকানন্দ, হিন্দুধর্ম বিরোধী যেকোন মত দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে তিনি বেশিরভাগ সময়ে এড়িয়েই গেছেন। অনেক খুঁজলে দু-একটি মন্তব্য পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ তাঁর *Prabuddha Bharat* পত্রিকায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মহামিলনের স্বপ্নের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, I want the intellect of Sankara and the heart of Buddha. কিন্তু এই মহামিলন, লিবারাল দৃষ্টিভঙ্গিতেই। হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্মকে আত্মীকরণের ধারাতেই তাঁর মত ছিল। বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য-

যখন বৌদ্ধরাজ্য এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম, এটি মস্ত ভুল... তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বিশেষ আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর- একথা বলেছেন হিন্দুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই।^{৩১}

বৌদ্ধধর্মে এরকম নিয়ম যে ছিল না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিবেকানন্দের বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত ভাবনা স্পষ্ট বুঝতে পারি, নিবেদিতার আলোচনাতেই। নিবেদিতার মধ্যেও আমরা নবীনচন্দ্র, সতীশচন্দ্র প্রমুখের ভাবনার অনুসরণ লক্ষ্য করব। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল বুদ্ধ আসলে হিন্দু ধর্ম গুরু। বিহার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ‘বিহার’ নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন, সেখানে তাঁর মন্তব্য-

বড় রাস্তার ধারে ধারে গাছের তলায় বা ঝোপের পাশে আচমকাই দেখা যায় তিনটি মাটির ঢিবি যা ইঙ্গিত দেয় জগন্নাথের বা জগতের নাথের, যে নাম ও চিহ্ন আসলে বুদ্ধেরই। ...গৌতম বুদ্ধের জন্যই বিহারের এই কৃষকেরা হিন্দুধর্মে তাদের স্থান পায়। এর মাধ্যমেই তারা স্বাদেশিক হতে পারে।^{৩২}

শেষের দুলাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খেয়াল করে দেখুন ‘স্বাদেশিক’ শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুধর্মের সঙ্গে স্বাদেশিকতা অনায়াস শব্দবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্বাদেশিকতা লাভের জন্য হিন্দুধর্মের আশ্রয় জরুরি বলে প্রচার চলছে। ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ গঠনে, শুধুমাত্র হিন্দুধর্মই এঁদের কাছে স্বীকৃত, সেভাবেই,

ম্যানিউপুলেশন। উপন্যাসের নির্মাণেও জনপ্রিয় হয়েছে এই মত। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ প্রবন্ধটি খুবই আকর্ষণীয়। এই উদ্ধৃতিটিতে বিবেকানন্দের মন্তব্যও পাবো-

ভারতবর্ষে কোনওদিন বৌদ্ধধর্ম নামে কোনও ধর্ম ছিল না, ছিল না তার নিজস্ব কোনও মন্দির বা পুরোহিতকূল'- এই লেখাটির শীর্ষনামে যে প্রশ্ন আছে তার শ্রেষ্ঠ উত্তর বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তমূলক দাবির মধ্যে নিহিত বলে আমি মনে করি। সামাজিকভাবে ভারতবর্ষে কোনওদিন কোনও সাংগঠনিক কাঠামো ছিল না, শুধু ধর্মীয় সংঘ ছিল। এর অর্থ এতদিন যে জ্ঞান ও উপদেশাবলি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সীমিত ছিল, তা এবার বৃহত্তর জনমানসে ছড়িয়ে গেল। ...এখানেই এই তথ্য পরিস্ফুট হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে কোনও ধর্মসম্প্রদায় ছিল না। ...তেমনই আজকে হিন্দু ধর্মে যে কোনও সময়ে এক মহান সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হতে পারে যাঁর পূর্ণ নিবেদিত ভক্তরা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, কিন্তু অগণিত গৃহী যাকৈ গুরু ও মহান শিক্ষক বলে ভক্তি করে। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে হিন্দু গুরু রূপে বুদ্ধের অবস্থান ও স্মৃতি এই দিক দিয়ে বর্তমানকালের শ্রীরামকৃষ্ণ বা সগুদশ শতকে মহারাষ্ট্রের রামদাস থেকে কিছু পৃথক নয়। (তদেব, পৃ ৮৩-৮৬)

‘হিন্দুর অজ্ঞতা’ (তদেব, পৃ ৯) নিয়েও তিনি গর্বিত বোধ করতেন। ১৯০৪ এর ১লা এপ্রিল হিন্দুধর্মে বুদ্ধগয়ার স্থান বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন; এটি বুদ্ধগয়া: হিন্দুধর্মে স্থান নামে প্রবন্ধে আছে। এখানে তাঁর বক্তব্য এবং সিদ্ধান্ত আরও স্পষ্টভাষায় আমরা পাবো-

হিন্দু হিসেবে প্রথম যে জিনিস বুঝতে হবে তা হল এই দেশে কখনওই নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিতকূল সম্বলিত বৌদ্ধ-ধর্ম বলে স্বতন্ত্র ধর্ম ছিল না। ইউরোপীয়দের ভুল ধারণা সত্ত্বেও তখন হিন্দুদের মধ্যে ছিলেন বিশেষত ব্রাহ্মণেরা, যাঁরা ধর্ম ও পড়াশোনার ব্যাপারে বর্ণ বিভাজনকে আঁকড়ে থাকতেন... যেহেতু এই পর্বে এক মহাপরাক্রমী সম্রাট বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাই এই পর্বে হিন্দুত্ব অসম্ভব গরিমা ও ক্ষমতা অর্জন করে। ...আর ছিলেন অন্য হিন্দুরা যাঁরা বুদ্ধকে নিজেদের গুরু বলে মেনেছিলেন এবং বর্ণ বিভাজন মানতে নারাজ ছিলেন। এ ছাড়া ছিল বৌদ্ধ সংঘ। ...ভারতবর্ষে কিন্তু এটা সবসময়ই হিন্দু ধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। ...শঙ্করাচার্যকে বৌদ্ধরাও নিজেদের একজন প্রবক্তা বলে বুঝতে পারবেন যে মুহূর্তে এশীয়রা ইতিহাস লিখতে শুরু করবে।...বুদ্ধগয়া হল হিন্দুত্ব নামে যে মহাসমস্বয় তার প্রকাশ। এই হিন্দুত্বের এক অপরিহার্য অংশ হল বৌদ্ধ ধর্ম।(তদেব, পৃ ১৩১-১৩৬)

বুদ্ধগয়া ভ্রমণ প্রবন্ধে আছে-

তিনি বলতেনঃ ‘প্রথমেই বুঝতে হবে যে বৌদ্ধ ধর্ম কোনও নতুন ধর্ম নয়। বুদ্ধ ছিলেন সমসাময়িক সাধুদের তুলনায় অনেক অনেক উচ্চস্তরের এক হিন্দু প্রবক্তা। তাঁর অনুগামীরা এসেছিলেন হিন্দু সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে; ঠিক যেমন রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যরা হিন্দুত্বকে ত্যাগ না করে

তার মধ্যেই থেকে গিয়েছিলেন তেমনই; ...বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রণেতারা নীরব থাকলেও বৌদ্ধযুগ জুড়ে হিন্দু ধর্ম জীবন্ত হয়েই ছিল। (তদেব, পৃ

১৩৭-৩৮)

উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে দিয়ে উনিশ-বিশ শতকে বৌদ্ধধর্ম চর্চার যে ধারাগুলি ছিল তাতে ভগিনী নিবেদিতার অবস্থান আশা করা যায় স্পষ্ট করা গেছে।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'* (১৩৪৩) বইয়ে বুদ্ধদেবকে চরমভাবে আস্তিক প্রমাণ করেছেন। বেদ এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী দুইয়ের পক্ষেই তিনি যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর বইয়ের নাম পৃষ্ঠায় হীরেন্দ্রনাথের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা আছে- ‘গীতায় ঈশ্বরবাদ ‘বেদান্ত পরিচয়’ ‘কর্মবাদ ও জন্মান্তর’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। এখানে তিনি দর্শনের চর্চার মধ্যে দিয়ে আস্তিক-নাস্তিক বিষয়ে একটি তর্ক উপস্থাপন করে, নাস্তিকতার চরম সীমায় রাখেন চার্বাকবাদকে আর বৌদ্ধদর্শনকে বারবার উপনিষদ বেদ, গীতা (গীতার সঙ্গে ধর্মপদের মিল দেখিয়েছেন) ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে অমিলের চেয়েও মিলগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আস্তিক প্রমাণ করেন। বেদে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যে যথাক্রমে আস্তিক এবং নাস্তিক নামকরণ তা পরে গিয়ে হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বুদ্ধকে আস্তিক প্রমাণ করতে গিয়ে পরের মতটিকেও নিক্ষেপ করতে চেয়েছেন-

শেষ কথা। বুদ্ধদেব কি ঈশ্বর মানিতেন? যদি না মানিতেন তবে তাঁহাকে ‘নাস্তিক’ বলা অসঙ্গত নয়। বস্তুত নাস্তিকতা প্রসঙ্গে ‘বুদ্ধদেব নিরীশ্বরবাদী ছিলেন’- ইহাই চরম ও পরম অপবাদ। ...বুদ্ধদেব সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানিতেন। ...প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যাঁহাকে ‘হিরণ্যগর্ভ’ বলা হইয়াছে, বেদান্তে যাঁহাকে ‘জন্য’ ঈশ্বর বলা হয়, যিনি মহাপ্রলয়ে তুরীয় ব্রহ্ম কর্তৃক এসিত হন- ... বুদ্ধদেবের বর্ণিত ঈশ্বর অনেকটা তাঁহার অনুরূপ।^{৩৩}

‘ব্রহ্মজাল’ সূত্রের উল্লেখমাত্র ছাড়া, বুদ্ধ সম্পর্কে এই মন্তব্যের কোন স্পষ্ট প্রমাণ তিনি দেননি।

উপসংহারে লেখকের সিদ্ধান্ত-

আমরা আদর্শ-নাস্তিক চার্বাকের মতবাদ আলোচনা উপলক্ষে দেখিয়াছিলাম, চার্বাক একাধারে জড়বাদী, উচ্ছেদবাদী, দৃষ্টবাদী(Positivist), সংশয়বাদী, হেতু-বাদী, প্রেয়ঃবাদী (Hedonist), দেহবাদী, আনান্দবাদী এবং ইহসর্বস্ববাদী। চার্বাকের বৈনাশিক দৃষ্টিতে পাপপুণ্য নাই, ধর্মধর্ম নাই, স্বর্গ নরক নাই, পরলোক নাই, পুনর্জন্ম নাই, ঋষি নাই, দেবতা নাই, ঈশ্বর নাই, মোক্ষ-নির্বাণ নাই। বুদ্ধদেবের মতের বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা আমরা অবগত হইয়াছি, তাঁহার অভিমত প্রত্যকে বিষয়ে চার্বাকমতে বিপরীত। অতএব চার্বাক যদি আদর্শ নাস্তিক হয় তবে বুদ্ধদেব আদর্শ আস্তিক। (তদেব, পৃ ১৩৯)

চার্বাক বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সবমত গ্রহণযোগ্য নয়। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের চার্বাক-এর গবেষণায় এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। চার্বাকমত আমাদের আলোচ্য নয় কিন্তু চার্বাকের সাপেক্ষে বুদ্ধদেবের আস্তিকতা প্রমাণ চেষ্টাও প্রশ্নাতীত নয়। বঙ্গীয় থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি (আন্তর্জাতিক সংগঠনটির সহ সভাপতি) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এই বইয়ে হিন্দুধর্ম দর্শনের মধ্যেই বৌদ্ধদর্শনকে আত্মীকরণের চেষ্টা করেছেন বলা চলে। যদিও পূর্বের লেখকদের তুলনায় তাঁর দর্শন আলোচনা অনেক বেশি অ্যাকাডেমিক।

এঁরা ছাড়াও বহুপূর্বে আচার্য পুণ্ড্রাচার চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৮৮৫ এবং ১৯০২ সালে পালি টোল স্থাপন করেন। ১৯০৮ এবং তার আশেপাশের সময়ে, চট্টগ্রাম কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ ইত্যাদিতে- ধর্মবংশ মহাস্থবির, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অমূল্যচরণ ঘোষ, নীরদরঞ্জন মুৎসুদী, প্রাণকৃষ্ণ ভিক্ষু প্রমুখ পালির অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৯৯ এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিবিভাগ খোলা হয়। সেখানে পালি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন- বেণীমাধব বড়ুয়া, নলিনাক্ষ দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র মজুমদার, সুকুমার সেনগুপ্ত, কানাইলাল হাজরা, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মাধার মহাস্থবির প্রমুখ। তাঁরা অনুবাদ ও চর্চার মাধ্যমে বৌদ্ধসাহিত্য দর্শনের সঙ্গে বাঙালি ছাত্র পাঠকদের পরিচিত করেন।

রেঙ্গুনে ১৯৩০ সালে বুদ্ধিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং সুধাংশু বিমল বড়ুয়া প্রমুখের চর্চা উল্লেখযোগ্য। ফুলচন্দ্র বড়ুয়া এবং রামচন্দ্র বড়ুয়া বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য

বাংলায় অনুবাদ করেন। শান্তপদ মহাথের (১৯১৫-১৯৮৭) বাংলাদেশ সুপ্রীম সজ্জ কাউন্সিলের সম্পাদক ছিলেন, তাঁর *মিলিন্দপ্রশ্ন*, *অঙ্গুত্তরনিকায়* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সুকুমার দত্ত লেখেন, *আর্লি বুদ্ধিস্ট মনাকর্জম* ১৯২৪, *বুদ্ধিস্ট মংক্স এন্ড মনাস্টারিজ অফ ইণ্ডিয়া*, ১৯৬২; নীহাররঞ্জন রায়ের, *স্যান্সক্রিট বুদ্ধিজম ইন বার্মা*, ১৯৩৬, *এন ইন্ট্রোডাক্সন টু দ্য স্টাডি অফ থেরবাদ বুদ্ধিজম ইন বার্মা*, ১৯৪৬ প্রভৃতি বাঙালি সাহিত্যিকদের তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটক *বুদ্ধদেবচরিত* (১৮৮৭), শরৎচন্দ্র দেবের *শাক্যসিংহ প্রতিভা ও বুদ্ধদেবচরিত* (১৮৮৮) নাটকদ্বয়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) *অশোক*, মন্মথ রায়ের *অশোক* (১৯৩৩) উনিশ-বিশ শতকের নাট্যচর্চার ইতিহাসে উল্লেখ্য। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের (১৮৬১-১৯৪২) *খেরীগাথা* ও *উদান* এর কাব্যানুবাদ উল্লেখ্য। ছাত্র, এবং সাধারণ মানুষকে নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য বুদ্ধ-জীবনী নির্ভর বই বিপুল জনপ্রিয় ছিল। এছাড়াও বিভিন্ন সাময়িকপত্রে নিয়মিত এই বিষয়ক আলোচনা চর্চা চলত। যেমন- *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, *দি মহাবোধি* (১৮৯২, কলকাতা), *রহস্য সন্দর্ভ*, *জ্ঞানাকুর*, *আর্যদর্শন*, *বঙ্গদর্শন*, *নবজীবন*, *নারায়ণ*, *বঙ্গবাণী*, *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, *বৌদ্ধ পত্রিকা* (১৯০৬, চট্টগ্রাম), *ভারতী*, *সাধনা*, *মানসী*, *মানসী ও মর্মবাণী*, *বালক*, *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, *সাহিত্য*, *প্রবাসী*, *নব্যভারত*, *দাসী*, *প্রদীপ*, *ভারত মহিলা*, *বিচিত্রা*, *পরিচয়*, *জগজ্জ্যোতি* (১৯০৮, কলকাতা), *বৌদ্ধবন্ধু* (১৯১১, চট্টগ্রাম), *বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া* (১৯৩৪, কলকাতা), *মৈত্রীবাণী*, *নালন্দা*, *অন্তদীপ*, *প্রভৃতি*। আমাদের আলোচ্য মূলত এই বিষয়ক উপন্যাস।

এখানে আরেকটি প্রবণতার কথা আমরা উল্লেখ করবো, নেড়া-নেড়ি বিতাড়ন প্রসঙ্গে আমরা তার খানিকটা আভাস দিয়েছি। এই অধ্যায়ে, যাঁদের কথা আলোচিত হয়েছে- বেশীরভাগ লেখক আলোচনা করেছেন, স্বয়ং বুদ্ধকে নিয়ে বা কোথাও অশোক, বিম্বিসার যশোধরা ইত্যাদি চরিত্রগুলি নিয়ে। বৌদ্ধধর্মকে অপছন্দ করার কারণ হিসেবে, এই সময় থেকেই আরেকটি পন্থাকে জনপ্রিয় করা শুরু হয়-

ব্যাপারটা এরকম, বুদ্ধ ভালো তার প্রচারিত ধ্রুপদী ধারা ভালো; কিন্তু পরেই বৌদ্ধধর্ম যখন বিভিন্ন ভাগে ভাগ(তন্ত্র, মন্ত্র, কালচক্র, সহজযান ইত্যাদি) হয়ে যায়, তা ভালো নয়! যখন বৌদ্ধধর্ম প্রান্তিকের ধর্ম হয়ে ওঠে অন্যান্য অনেক ধারার সঙ্গে মিশে যায়... সেসব ভালো কথা নয়। বৌদ্ধধর্ম এবং সঙ্ঘ-ব্যভিচার, ষড়যন্ত্র, দুর্নীতির আখড়া হয়ে ওঠে; এবং তাদের ‘নিশানা’ হয়ে ওঠে শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্ম। এবং সেগুলির দমনকর্তা হিসেবে তারা আবার, স্বাধীন ভারতবর্ষে, ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ নির্মাণে একমাত্রিক সংস্কৃতি, একটি ধর্ম-কে নিশ্চিত করে দিতে চান। লেখা হয় ‘ম্যানিউপুলেশনের আখ্যান’। পরে এই মতটি ‘বাজার নিয়ন্ত্রিত’ এবং জনপ্রিয় হয়। এইরকম পরিণতি নাথ এবং সহজিয়া বৈষম্যবাদের ক্ষেত্রেও পাবো। কিন্তু সেগুলিকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত করে, বৌদ্ধদেরকেই আক্রমণ করা হয়। শশীভূষণ দাশগুপ্ত অবস্কিওর রিলিজিয়াস কাল্ট বইয়ে এনিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে, উপন্যাসের আলোচনায় উপরোক্ত মতামত গুলির ‘ফিক্সনাল প্রতিফলন’ দেখতে পাবো। এই বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব, তার রাজনৈতিক অভিপ্রায় বোঝার চেষ্টা করবো।

লক্ষ্য করলাম, পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক তথ্য, যখন বারবার বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করতে থাকল বৌদ্ধধর্মের স্বতন্ত্র অবস্থানের কথা; তখন পাশাপাশি সমান্তরাল পরিসরে দশচক্রে বুদ্ধকে হিন্দু গুরু বানানো হয়েছে এবং সুদূর অতীতকাল থেকে তাঁর অবতারত্বের ভিতকেই শক্ত করা হয়েছে ক্রমপর্যায়। এই মতটিকেই সচেতনভাবে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রয়োজনে। এর সঙ্গে উনিশ ও বিশ শতকের হিন্দুপ্রধান জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রত্যক্ষ যোগ বর্তমান। এখানে মূলত উনিশ শতক, বিশ শতকের প্রথমার্ধের কিছু বইয়ের কথা এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। যখন, পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী প্রয়োজন খানিকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতে, এই ‘তৃতীয় ধর্মের’ চর্চা বন্ধ না হয়ে খানিক দিক বদল করেছিল মাত্র; জাতীয়তাবাদ, ম্যাপের বদলের সঙ্গে ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ এর নবনির্মাণ শুরু হল। আমাদের আলোচনার বিষয় আমরা

বলেছি- শুধুমাত্র উপন্যাস। আসলে উপন্যাসে যা বলতে চাওয়া হয়েছে সেগুলি এই বক্তব্যগুলিরই ফিক্সনাল অভিব্যক্তিমাত্র। তাই এই ইতিহাসের ধারা, বা তত্ত্বগুলির ধরণ চিহ্নিত করা উপন্যাসগুলি সমালোচনা করার উদ্দেশ্যেই প্রয়োজনীয় ছিল। উপন্যাসগুলি তার সমকালের সমাজ- রাজনীতিরই ছবি তুলে ধরেছে। তাই উপন্যাসের পাশাপাশি এই আলোচনা আমাদের গবেষণার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। উনিশ থেকে বিশ, বিশ থেকে বর্তমান কাল অর্থাৎ এই চর্চার বিবর্তন পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখব, উপরোক্ত মতগুলি ছাড়াও বুদ্ধ ঈশ্বর থেকে মানুষ হয়েছেন বা তার আদর্শ, ধর্মের থেকে বেশি সমকালীন প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদী স্বর হিসেবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছে; বৌদ্ধযুগ, বুদ্ধকথা বৌদ্ধদর্শন আধুনিকতার, সমাজ বিবর্তনের রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্ন গুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। প্রবণতাগুলি জটিল হয়েছে। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করিনি, কারণ, পরবর্তী অধ্যায়ে, বিস্তৃত পরিসরে তাঁর বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম- দর্শন প্রকল্প বিশদে আলোচনা করবো।

তথ্যসূত্র

- ১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল(সম্পাদিত), বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৯০-২৯৩
- ২। বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৯, পৃ ৭১
- ৩। Rajendralal Mitra, *Bodhgaya, The Hermitage of Sakya Muni*, Calcutta, Govt. Of Bengal, 1878
- ৪। Rajendralal Mitra, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Asiatic Society of Bengal, 1882
- ৫। রায় শরচ্চন্দ্র দাশ বাহাদুর (অনূদিত), *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ২০০০, পৃ ফ
- ৬। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বৌদ্ধধর্ম*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০, পৃ ২

- ৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্রঃ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, *বঙ্কিম রচনাবলী*, যোগেশচন্দ্র বাগল, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৯৫
- ৮। শিবনাথ শাস্ত্রী, বারিদবরণ ঘোষ(সম্পাঃ), *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯০৪, পৃ ১৮৯
- ৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল(সম্পাঃ), *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ২২
- ১০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯, পৃ ৪
- ১১। অমর দত্ত, *উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২য় সং, ২০০১
- ১২। সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, *শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব*, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির, ৪র্থ সং, ১৮৮১, পৃ ২-৩
- ১৩। কৃষ্ণবহারী সেন, *বুদ্ধচরিত*, কলকাতা, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির
- ১৪। Suniti Devi, *The life of Princess Yasodhara*, London, E. Mathews & Marrot, 1929
- ১৫। কৃষ্ণকুমার মিত্র, *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ*, কলকাতা ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১৮০৪ শকাব্দ
- ১৬। নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন*, ৫ম ভাগ, সান্যাল এন্ড কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩২
- ১৭। বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ এবং সম্পাঃ), *সাহিত্যদর্পণ*, পুস্তক, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ ৩০
- ১৮। রণব্রত সেন (সম্পাঃ), *শ্রীমদ্ভাগবত*, হরফ, কলকাতা, ১৮৯৮, পৃ ৬
- ১৯। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৫৬, পৃ ২৩২
- ২০। রাজশেখর বসু, *বাল্মীকি রামায়ণ*(সারানুবাদ), এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২০, পৃ ১৪০
- ২১। দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০২, পৃ ৪৮-৫০
- ২২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, অখণ্ড তৃতীয় সং, দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮, পৃ ১৭১

- ২৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বুদ্ধ*, বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা, পৃ ২
- ২৪। নবীনচন্দ্র সেন, *অমিতাভ*, সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ ১০১
- ২৫। নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন*, ৫ম ভাগ, পৃ ৩৪
- ২৬। নবীনচন্দ্র সেন, *অমিতাভ*, সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ ১০১
- ২৭। নবীনচন্দ্র সেন, *আমার জীবন*, ৫ম ভাগ, পৃ ৩৭
- ২৮। প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বুদ্ধবাণী*, কে.পি. মুখার্জি এণ্ড কোং, ১৩১৬, পৃ ১-৩
- ২৯। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, *বুদ্ধদেব*, বসুপ্রেস কলকাতা, ১৩১২, পৃ ঘ-ঙ
- ৩০। রামদাস সেন, *Buddhdeva-His Life & Teachings*, Published by Hara Lal Ray, বহরমপুর, পৃ ১৪
- ৩১। স্বামী বিবেকানন্দ, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬
- ৩২। ভগিনী নিবেদিতা, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌমেন পাল (সম্পাদ: ও টীকা), *প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম*, সিগনেট প্রেস, ২০১৫, পৃ ৫০
- ৩৩। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা'*, কারিগর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ ১৩৩-১৩৭
- ৩৪। সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবির ধর্ম : বৌদ্ধদর্শন সম্পাদনা, রাজনীতি, মতাদর্শ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে, বোধহয় কাব্য শব্দটি বেশি উপযুক্ত। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে। সাহিত্য বলতে ‘কাব্য’ শব্দটিই ব্যবহৃত হত। রবীন্দ্রনাথ নিজেও কাব্য শব্দটি পছন্দ করতেন। তাঁর নিজের কাছেও আসলে নিজস্ব কবিসত্তাটিই ছিল প্রকট; বিভিন্নভাবে বারবার তিনি একথা নিজেই বলেছেন। কবি, বিশ্বাসী ছিলেন ‘কবিসত্তার প্রতিভা’য়; আর তাঁর চালিকাশক্তি হিসেবে এসেছে, ‘জীবনদেবতা’ ভাবনা। বিভিন্ন সাহিত্যিক সংরূপের সীমানা অতিক্রম করে, তাঁর অবাধ যাওয়া আসা, সংরূপের সীমাকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়ায় দক্ষ তিনি। *লিপিকা* কে কোনো সংরূপের নাম দিতে না চাওয়া; এবং *কথা ও কাহিনী* র লেখাগুলি মনে পড়বে। *ছন্দের প্রকৃতি* প্রবন্ধে ছন্দ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনায়াসেই বলেছেন- গদ্যেও ছন্দের আবশ্যিকতার কথা; গদ্য ছন্দোময়। ছন্দ কে যোগ করছেন সৃষ্টির সঙ্গে। কাব্যের জন্যই শুধু ছন্দ জরুরি এই জল অচল বাঁধুনিকে তিনি অস্বীকার করেছেন; অস্বীকার করেছেন সাহিত্যের সংরূপগত যেকোনো বন্ধনকেই। *রক্তকরবী* নাটকেও এই সংরূপের মিশেল খুব সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি চিঠিতে জানান ‘নাটকের গোচের’ কিছু লিখছেন। এই নাটকটির শেষ সংস্করণে ‘নাট্য পরিচয়’ নামে একটি অংশ আছে। সেখানে কথক, নাম পরিচয়হীন এবং সর্বস্ত সর্বগ কথক নন, যার যাতায়াত জানা-শোনা সীমাবদ্ধ। কথক মাঝে মাঝেই সন্দেহ প্রকাশ করেন নাটকের স্রষ্টার অভিপ্রায় নিয়ে। কিন্তু আমরা যেকথাটি বলার জন্য এত প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম তা হল, নাট্যকার নয়, *রক্তকরবী* র স্রষ্টাকে ‘কবি’ বলে সম্বোধন-

এই নাটকটি সত্যমূলক... এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, কবির জ্ঞানবিশ্বাসমতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।^২ (নাট্যপরিচয়)

আমরা জানি তিনি শিল্পী; কোনো নির্দিষ্ট সংরূপে তাঁকে আমরা বাঁধতে পারবোনা, তাই রাধাকৃষ্ণন বলেছেন- “দ্য রিলিজিয়ন অফ আন আর্টিস্ট”। কিন্তু কবি নিজেই তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম, জীবনদেবতার কথা বলতে গিয়ে, বলেছেন- *দ্য পোয়েট’স রিলিজিয়ন*।^৭

(১)

এতক্ষণ ধরে আমরা যা বললাম, তাকে গবেষণার সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা করবো। আমাদের গবেষণার পরিসরকে উপন্যাসের সংরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি, একথা ঠিক। কিন্তু বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রভাব পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ, বুদ্ধকথা, বুদ্ধযুগ নিয়ে কোনো উপন্যাস না লিখলেও, বাকি সমস্ত সংরূপেই তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন- কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, চিঠিতে, বক্তৃতায়, নাটকে...। তিনি এ বিষয়ে কোনো উপন্যাস লেখেননি- শুধু এই যুক্তিতে আলোচনা থেকে তাঁকে, তাঁর ভাবনাকে কিছুতেই বাদ রাখা চলেনা। তাঁর উপন্যাসও তো শুধু বাঁধাধরা উপন্যাস নয়, মাত্র দুটি প্রথমদিকের ঐতিহাসিক উপন্যাস- *বউ-ঠাকুরানীর হাট*, নাটক হয় *প্রায়শ্চিত্ত* নামে; ১৩৩৬এ পরিবর্তিত রূপ *পরিদ্রাণা* রাজর্ষি-র কাহিনি নিয়ে হয় *বিসর্জনা চোখের বালি* কে বলেছেন, ‘মহাকায় গল্প-সৃষ্টি’। সূচনা অংশে, *চোখের বালি*, *গোরা*, *ঘরে বাইরে*, *চতুরঙ্গ*, *নষ্টনীড়*, *শান্তি* সবকেই বলেছেন ‘গল্প’, ‘পদ্ধতি’।^৮ *চোখের বালি* নয়, বরং উপন্যাসের মধ্যে শুধু *ঘরে-বাইরে* তে একবার সন্দীপের মুখে বুদ্ধের নামোল্লেখ আছে। আমরা *চোখের বালি*” প্রসঙ্গে বলতে চাইছি- ‘কবি’ই আসলে তাঁর সাহিত্যের সব সংরূপেরই স্রষ্টা, তাঁর আলাদা উপন্যাসিক, নাট্যকার ইত্যাদি নামকরণের দরকার নেই, সব লেখাই তাঁর কাছে ‘পদ্ধতি’-বিশেষ, তাই তাদের মধ্যে এরকম অনায়াস যাতায়াত। গল্প-কবিতা-উপন্যাস থেকে নাটক, নাটক থেকে নৃত্যনাট্য, থেকে চিঠিতে দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা, সব মিলে মিশে একাকার হয়ে ‘কবির ধর্ম’।

উপরের আলোচনায় কবিসত্তা নিয়ে কথা বলেছি; এই কারণেই যে, উপন্যাস না লিখলেও এই বিষয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা, বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধ- বিষয়ে যত কথা হয়েছে তার প্রাণকেন্দ্র বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ

এই বৌদ্ধধর্ম, বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ সংক্রান্ত ভাবনা দ্বারা শুধু প্রভাবিত তাই নয়, তিনি একে নির্মাণ করেছেন সমকালীন প্রেক্ষিতে। তাঁর ব্যক্তিগত ঈশ্বরের তত্ত্বে উপনিষদের 'ব্রহ্ম', ব্রাহ্মধর্মের 'একমেবোদ্বিতীয়ম ঈশ্বর', ভক্তি- আন্দোলনের প্রেমধর্ম, সহজিয়া ধর্মের 'মনের মানুষ' তো আছেই, তার সঙ্গে মিশে আছে 'সর্বশ্রেষ্ঠমানব বুদ্ধদেব' ও তাঁর বৌদ্ধধর্মদর্শন। সব মিলে তৈরি করেছে 'কবির ধর্ম'।

আপাতত "কবির ধর্ম" কে ব্যাখ্যা করবো। চীনে গিয়ে বিভিন্ন বক্তৃতা দেওয়ার সময়- তিনি *দ্য পোয়েট'স রিলিজিয়ন* নামে একটি বক্তৃতা দেন; যার বাংলা আমরা করেছি 'কবির ধর্ম'। এছাড়াও চীন থেকে ফেরার কিছু আগে ডঃ রিইডের অনুরোধে *রিলিজিয়স এক্সপিরিয়েন্স* নামে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন-

My religion essentially is a poet's religion, Its touch comes to me through the same unseen and trackless channel as does the inspiration of my music. My religious life has followed the same mysterious line of growth as has my poetic life. Somehow they are wedded to each other; and though their betrothal had a long period of ceremony, it was kept secret from me. ^৫

রোমান্টিক কবি বারবার তাঁর অন্তরে প্রকাশিত চালিকাশক্তিকেই 'প্রতিভা'র উৎস বলেছেন। কিন্তু এই ভাবনা, তাঁর ধর্ম দর্শন সাহিত্য ও সমকাল সম্বন্ধে গভীর চিন্তা-ভাবনা- সাধনার পরিশ্রমের ফল। এটা কোনো অলৌকিক, আকস্মিক, এককালীন ঘটনা নয়; ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে থাকা অবিচ্ছিন্ন, অবিশ্রান্ত নির্মাণ, তাকে তিনি নিজে যতই রহস্যময় বলতে চাননা কেন! এই 'ধর্মের' নির্মাণে বিভিন্ন প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন।

এই বক্তব্যে 'কবির ধর্মের' দুটো বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন- 'unity of vision', এবং 'unity of truth' দুই মিলে তৈরি করেছে, তাঁর spiritual reality' যার প্রকাশ আছে কবির শিল্পে, যা তাকে বিশ্ববোধের ঐক্যের সঙ্গে যুক্ত করে-

I have already confessed to you my religion is a poet's religion: all that I feel about it, is from vision and not from knowledge... and the man whose inner vision is bathed in an illumination of his consciousness, at once realizes the spiritual unity reigning supreme over all differences of race and his mind no longer awkwardly stumbles over individual facts of separateness in the human world, accepting them as final; he realizes that peace is in the inner harmony which dwells in truth, and not in any outer adjustments; that beauty carries an eternal assurance of our spiritual relationship to reality, which waits for its perfection in the response of our love. (Religious Experience, Page No. 677)

আমাদের সিদ্ধান্ত ‘কবির ধর্ম’ বিমূর্ত ভাবনা হলেও, এর মুখ বুদ্ধ, যাকে তিনি নির্মাণ করেছেন। ‘কবির ধর্ম’ কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধর্ম-দর্শন সম্মিলিতভাবে নির্মাণ করেছে একথা সত্য। এর পরিচয় সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাগজগৎ* সিরিজে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম-দর্শন “কবির ধর্মকে” অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। অন্যান্য যেসব ধর্মের প্রভাবের কথা আছে, সেই ধর্মপ্রস্থানের ঈশ্বররা নিরাকার; সে ব্রহ্ম বা সহজ মানুষ (মনের মানুষ) যাই হোক, অন্তরে উপলব্ধি করতে হয়। একমাত্র বুদ্ধই তাঁর কাছে ইতিহাসসম্মত, বাস্তব, জীবিত ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ’। যে সত্যিই মানুষের স্বার্থে, ভোগ বিলাসের নিশ্চিত নিরাপদ রাজকীয় আশ্রয়, রাজপদ হেলায় অস্বীকার করে পথে নেমেছেন। রবীন্দ্রনাথের সত্য সুন্দরের যে বোধ, বৃহত্তর মানুষের মঙ্গলের স্বার্থে নিবেদিত, তার স্বরূপ তিনি খুঁজে পান বুদ্ধের মধ্যে। তাঁর লেখায় খ্রিষ্ট, দাদু, চৈতন্যের কথা এসেছে; কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছেন প্রধানত বুদ্ধকেই। কারণ বুদ্ধ, এদের থেকে প্রাচীন; তাঁর দর্শন, বৌদ্ধধর্মের এতকাল ধরে স্বমহিমায় টিকে থাকা, নিজ উৎপত্তি-দেশ থেকে সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশের মানুষের কাছে প্রধান হয়ে ওঠা, তাঁকে বিস্মিত করেছিল। চৈতন্যও আছেন একথা সত্য কিন্তু বুদ্ধের তুলনায় তার ব্যাপকতার মাহাত্ম্য কম। তাছাড়াও খৃষ্ট নিজেকে ‘ভগবানের পুত্র’ বলেছেন, স্বর্গের কথা বলেছেন; চৈতন্যের ধর্মের পূজ্য কৃষ্ণ (কৃষ্ণের পৌত্তলিক মূর্তিও বলা যায়), ঈশ্বর এদের কাছে পূর্ণত উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধি, কৃষ্ণের স্বরূপ জনমানসে বিভিন্ন রূপে স্বীকৃত; তুলনায় বুদ্ধ অনেক বেশি মানবিক, মৃত্যুর পরবর্তী কথা তিনি বলতে অস্বীকার করেছেন, কোনোরকম ঈশ্বরের উপসনার কথা তাঁর দর্শনের উপদেশের বৈশিষ্ট্য নয়; প্রাতিষ্ঠানিক পূজা আচার অনুষ্ঠান বিমুক্ত। তাছাড়াও আমরা মনে করি, যীশু পাশ্চাত্যের উপাস্য। পাশ্চাত্যের আধিপত্য কামী প্রকল্পে, খৃস্টধর্ম মূল উপাদান। প্রাচ্য তথা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত মহানুভব হিসেবে তিনি বুদ্ধকেই উপযুক্ত মনে করেছিলেন। খৃষ্টের কথা বলতে গিয়েও বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন-

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে। কিন্তু সে তো মন্ত্র ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেননা শাস্ত্রবাক্য তো কথা বলেনা, মানুষ বলে। ... শাস্ত্রবাক্যকে তো

আমরা ভালোবাসতে পারি নে। সহজ হয় আমাদের পথ, যদি ভালোবাসতে পারি তাঁদের যাঁরা মানুষকে ভালোবেসেছেন। বুদ্ধ যখন অপরমেয় মৈত্রী মানুষকে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাস্ত্র প্রচার করেন নি, তিনি মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন ভক্তি।^১(শান্তিনিকেতন

২৫ ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

বুদ্ধের উৎপত্তি ভারতবর্ষ হলেও, প্রাচ্যের সংস্কৃতি-সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে তিনি বুদ্ধ নির্দিষ্ট, পথের যোগ দেখেছিলেন। ভারতবর্ষ পরাধীনতা থেকে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যান্য প্রাচ্যদেশ গুলিকে সঙ্গী করেই এগিয়ে যাবে, একথাও তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় ছিল। তিনি প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার সব রকম চেষ্টা করেছেন। এই রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সাযুয্যপূর্ণ করেই তিনি তাঁর নিজস্ব ‘কবির ধর্মে’র সঙ্গে যুক্ত করে- বুদ্ধ, বুদ্ধকথা বৌদ্ধদর্শনকে নির্মাণ করেছেন। এই নির্মাণকে আমরা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার চিহ্ন বলেই মনে করি।

(২)

আমরা ক্রমে আমাদের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করবো। তার আগে একটি সমকালীন তাগিদের প্রসঙ্গ আলোচনা করবো। রবীন্দ্রনাথের আগে এইরকম প্রকল্প বাংলাদেশে খুব সফলরূপ নিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে। বঙ্কিমের প্রকল্পও রাজনৈতিক চিন্তাপ্রসূত। রবীন্দ্রনাথের আগেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণতত্ত্ব কে নির্মাণ করেছেন হিন্দুপ্রধান জাতীয়তাবাদের এজেন্ডা হিসেবে। সঙ্গে ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ; এঁদের বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত মনোভাবের কথা আগের অধ্যায়ে বলেছি। রবীন্দ্রনাথ শুধু হিন্দুধর্ম নয় যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের এবং জাতীয়তাবাদের বিরোধি ছিলেন। আমাদের মনে হয় কৃষ্ণতত্ত্ব র প্রভাবের কালে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মকে নির্মাণও রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পাদ্য।

বঙ্কিমের কৃষ্ণতত্ত্বে হিন্দুধর্ম আছে, ঈশ্বর কৃষ্ণ আছে, জাতীয়তাবাদ আছে। আর রবীন্দ্রনাথের এজেন্ডায় ধর্ম (প্রতিষ্ঠান অর্থে) নেই, মানুষ আছে, জাতীয়তাবাদ নেই (ন্যাশনালিজম প্রবন্ধ) কারণ তা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। বিশ্ববোধে যুক্ত মানুষ; তাঁর উদ্দেশ্য, দেশ-কাল নির্বিশেষে মানুষকে সংকীর্ণতার উর্ধে মানবিক মঙ্গল ও ঐক্যের বোধে উন্নীত করা। রবীন্দ্রনাথের মানবিক ধর্মের সাকার রূপ হিসেবে তিনি

বুদ্ধকেই গ্রহণ করেছিলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা নিশ্চয় আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দেবো।

আশীষ লাহিড়ী তাঁর উপনিষদের ব্যক্তিগত পাঠ ও মহাজাগতিক সংশয়বাদ প্রবন্ধে বলেছেন-

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথকে গড়েছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এও মানতে হবে যে রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপনিষদকে গড়েছেন, সম্পাদনা করেছেন।^৭

আমরাও একই কথা তাঁর কাছ থেকে ধার করে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে বলছি।

তিরিশের দশকঃ মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-

মানুষের মননের ইতিহাসে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। একদিকে যেমন মানবতা-বিরোধী ফ্যাসীবাদ চরম শক্তি অর্জন করে, তেমনি তাকে প্রতিরোধের মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষের মধ্যে এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে ওঠে। সেই বন্ধনের মধ্যে ঐক্যসঞ্চারী সূত্রটি ছিল প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিরোধী, বিজ্ঞানমুখী মানবিক সংস্কৃতি।^৮

আমাদের বক্তব্য তিরিশের দশকের অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে মানবিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজ চলছিল। আগে যে নবপর্যায়ের (নবপর্যায় বঙ্গদর্শন বিষয়ে) কথা বলেছি, এই ভাবনা তার সঙ্গে অস্থিত। দেশে তখন প্রবল হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য চলছিল, প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার অংশ ছিলেন। যা থেকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন, এর পর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার পর, তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের পথ বদল করেন। তারপর, নোবেল পুরস্কার তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি দেয়, সঙ্গে বিপুল দায়িত্ব বর্তায়। আইনস্টাইন, হলডেন, জোলিয়ো, নীডহাম, বার্নাল, রঁলা, পিকাসো প্রমুখ শিল্পী, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগ দেন ‘কবি’। ফলে সমকালীন দেশ ও বিশ্বজোড়া পরিস্থিতির সাপেক্ষে তিনি ‘কবির ধর্ম’ কে ‘মানুষের ধর্মে’ রূপ দিতে দিতে অগ্রসর হন। এখানেই মানবিকতার শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ হিসেবে আসেন বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম।

বুদ্ধকে কবি মানুষের ধর্ম এর সঙ্গে মেলাতে গিয়ে প্রথমেই তাঁর অলৌকিকতাকে বাদ দিয়েছেন। অলৌকিকতাকে বাদ দিয়েছেন বুদ্ধবিষয়ক প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনি থেকেও। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লন্ডন থেকে লেখা একটি চিঠিতে (অক্টোবর, ১৯১২) ‘কবি’ লিখছেন-

অয়কেনের সঙ্গে আমার মতের যথেষ্ট মিল আছে;... অয়কেন খৃষ্টের দিব্যত্ব মানেন না, ত্রিত্ববাদ মানেন না, মধ্যস্থবাদ মানেন না, খৃষ্টের পুনরুত্থান মানেন না, বাইবেলের বর্ণিত অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করেন না, অথচ তিনি বলেন তিনি খৃষ্টান এবং খৃষ্টধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মকে অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেখেন এবং তার সঙ্গে এমন একটা ধর্মের তুলনা করেন যেটাকে তিনি নিজের আদর্শের দ্বারা গড়ে তুলেছেন। (সত্যেন্দ্রনাথ রায়, দর্শনচিন্তা, পৃ ১৮৫)

রবীন্দ্রনাথের নিজের ধর্মের ক্ষেত্রেও একই বক্তব্য প্রযোজ্য। ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজিতে *Sadhana (The Realization of Life)* লেখেন। তার অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি হল- *The Relation of the Individual to the Universe, Soul consciousness, The Problem of Evil, The Problem of Self, Realization in Love, Realization in Action, The Realization of Beauty, The Realization of the Infinite*। প্রবন্ধগুলির নাম দিলাম কারণ, প্রতিটি প্রবন্ধ পাঠ করলে আমরা ‘কবির ধর্মের’ নির্মাণের স্বরূপকে ধারাবাহিক ভাবে বুঝতে পারবো। আমরা এখানে শুধু এর ‘প্রিফেস’র অন্তর্গত একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করবো-

To me the verses of the Upanishads and the teachings of Buddha have ever been things of the spirit, and therefore endowed with boundless vital growth; and I have used them, both in my own life and in my preaching, as being instinct with individual meaning for me, as for others, and awaiting for their confirmation, my own special testimony, which must have its value because of its individuality. ^৯

১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজিতে লেখেন, *Creative Unity* এর প্রথম প্রবন্ধ- *The Poet's Religion* এবং চতুর্থ প্রবন্ধ, *An Indian Folk Religion*। এখানে প্রথমেই শুরু করেছেন, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গ দিয়েই, তারপর বাউলতন্ত্রের সহজ মানুষের কথা বলেছেন, দেখবো বুদ্ধের প্রভাব কত প্রকট এই ভাবনার নির্মাণে-

IN HISTORICAL TIME the Buddha comes first of those who declared salvation to all men, without distinction, as by right man's own... It was the unique significance of the event, when a man came to men and said to them, 'I am here to emancipate you from the miseries of the thralldom of self.' This wisdom came, neither in texts of scripture, nor in symbol of deities, nor in religious practices sanctified by ages, but through the voice of a living man and the love that flowed from a human heart.

And I believe this was the first occasion in the history of the world when the idea of the Avatar found its place in religion... a religion that roused in its devotees an inextinguishable fire of enthusiasm and carried them to lifelong exile across the mountain and dessert barriers. To say that philosophy of suicide can keep kindled in human hearts for centuries such fervour of self sacrifice is to go against all the laws of sane psychology. ^{১০}

এই ধর্ম, প্রাতিষ্ঠানিকতার ওপর নির্ভরশীল নয়, রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন, বহু শতাব্দীব্যাপী এই ধর্মের উদ্দীপনার কারণ, প্রেমধর্ম এবং এর হিতসাধনের ধর্ম। যার কেন্দ্র বুদ্ধ নিজে, তাঁর জীবনদর্শন, তাঁর ত্যাগের আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ তাই হীনযান নয় মহাযানকেই আদর্শ বলে স্বীকার করেছেন, কারণ মহাযানীরাই, শুধু ব্যক্তিগত নির্বাণলাভ নয়; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাযানীদের পার্থক্য আছে, নির্বাণকে তিনি “বিশুদ্ধ আত্মহত্যা” বলে কটাক্ষ করেছেন, তাঁর আগ্রহ সেখানে নয়। তাহলে তাঁর আগ্রহ কী সে? রবীন্দ্রনাথ নিজেই এখানে কতকগুলো প্রশ্ন করে তার উত্তর দিতে চেয়েছেন; যেমন- বুদ্ধ কোন পথ আমাদের দেখাতে চেয়েছেন? এই পথ কী ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্দশা থেকে মুখ ফিরিয়ে কোন ভ্রান্ত নিরাপত্তার ভান করে নাস্তির দিকে যাত্রা করা? কারণ বেশিরভাগ ধর্মই বলে মৃত্যুর পরের কথা, মোক্ষ লাভে বর্তমানকে ভুলে সাত্ত্বনার কথা; রবীন্দ্রনাথ নিজেই উত্তর দিচ্ছেন-

On the contrary, his path was the path of sacrifice- the utmost sacrifice of love. The meaning of such sacrifice is to reach some ultimate truth, some positive deal, which in its greatness can accept suffering and transmute it into the profound peace of self-renunciation. True emancipation from suffering, which is the inalienable condition of the limited life of the self, can never be attained by fleeing from it, but rather by changing its value in the realm of truth-the truth of the higher life of love. (তদেব, Page No. 520-21)

বুদ্ধের দর্শন দুঃখবাদী, নাস্তিবাদের দর্শন কী না এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্যের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে নাগার্জুনের দর্শনকেই মান্যতা দিয়েছেন, যদিও বিশ্লেষণ একেবারেই তাঁর নিজস্ব, ‘কবির ধর্মে’র সঙ্গে যুক্ত। এই প্রবন্ধেই তিনি বলছেন-

In the time of Buddha the individual discovered his own immensity of worth, first by witnessing a man who united his heart in sympathy with all creatures, in all worlds, through the power of a love that knew no bounds; and then by learning that the same light of perfection lay confined within himself behind the clouds of selfish desire, and that the Bodhi-hridaya - ‘the heart of the Eternal Enlightenment’- every moment claimed its unveiling in his own heart. Nagarjuna speaks of this Bodhi-hridaya (another of whose name is Bodhi-citta) as follows: One who understands the nature of the Bodhi-Hridaya, sees everything with a loving heart; for love is the essence of Bodhi-hridaya. (Outlines of Mahayana Buddhism by D.T. Suzuki) [Suzuki, সাহিত্য আকাদেমীর বইটিতে এখানে মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটেছে।] (Page No. 522)

নিয়ম অনুযায়ী, কোনো উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে, সেখানে ইচ্ছেমত শব্দ বা বাক্যের বদল ঘটানো যায়না। রবীন্দ্রনাথ শব্দবন্ধ বদলে দিয়েছেন, এবং তার কারণ হিসেবে কোনো ব্যাখ্যাও দেননি; সেই শব্দবন্ধ হল ‘বোধিচিত্ত’ থেকে ‘বোধি-হৃদয়’। ডি.টি. সুজুকির বই থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে আসলে ‘Bodhicitta’ কথাটিই আছে।”

আমরা আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে সম্পাদনা করেছেন, নির্মাণ করেছেন। তার প্রমাণ এম্ফুনি পেয়েছি, সর্বসম্মত ও পরিচিত “বোধিচিত্ত” শব্দটিকে তিনি অবলীলাক্রমে বদলে দিয়ে “বোধি-হৃদয়” করেছেন। বোধিচিত্ত- বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিধর্ম পিটকে চিত্ত(মন বা যার দ্বারা চিন্তা করা যায়), আর চৈতসিক(মনোবৃত্তি) সম্পর্কে আলোচনা করা আছে, বাহ্যিক প্রকার চৈতসিক মনের সাথে যুক্ত হয়ে ৮৯ প্রকার চিত্ত উৎপত্তির হেতু হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই, এর যোগ ‘কবির ধর্মে’র স্বরূপের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ শব্দ, শব্দের বানান নিয়ে এরকম পরিবর্তন করেছেন বহু জায়গায়, অর্থও বদলে দিয়েছেন সর্বসম্মত ব্যাকরণের তোয়াক্কা না করেই একথা আমরা সকলেই জানি, (‘বেদনা’ শব্দের অর্থ ব্যথা নয় ‘সংবেদন’, কোথাও ‘হু হু’ কোথাও ‘হু হু’ বাতাসের শব্দ ইত্যাদি)। এখানেও ‘হৃদয়’ শব্দটিই তার বিশেষ পছন্দ। কারণ শুধু ‘জানা’ নয় তাকে হৃদয়ঙ্গম করে বিশ্ববোধে প্রকাশ করাই, ‘বোধি-হৃদয়’। এর সঙ্গে মিলেছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উদ্ধৃতি- ‘হৃদা মনীষা মনসা...’ রবীন্দ্রনাথ এই উদ্ধৃতি বহুবার ব্যবহার করেছেন তার বিভিন্ন বক্তৃতায়, লেখায়।

আধুনিক সাহিত্য এর অন্তর্গত নিরাকার উপাসনা প্রবন্ধটিতে লিখছেন (১৩০৫)-

যিনি আমাদের একমাত্র অন্তরের ধন যিনি অন্তরের অন্তরতম তাঁহাকে বস্তুরূপে মূর্তিরূপে মনুষ্যরূপে বাহিরে না পাইলে কি আমাদের পাওয়া হইল না? যিনি চক্ষুষ্যচক্ষুঃ, চক্ষুর চক্ষু, তাঁহাকে কি চক্ষুর বাহিরে দেখিব? যিনি শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, কর্ণের কর্ণ, তাঁহাকে কি কর্ণের বাহিরে শুনিব? যাঁহার সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন,
ন সন্দ্ৰশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং
হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌শ্যে

য এনমেবং বিদুরমৃতান্তে ভবন্তি—

ইহার স্বরূপ চক্ষুর সম্মুখে স্থিত নহে ইহাকে কেহ চক্ষুতে দেখে না; হৃদিস্থিত বুদ্ধি দ্বারা ইনি কেবল হৃদয়েই প্রকাশিত, ইহাকে যাঁহারা

এইরূপেই জানেন তাঁহারা অমর হন।^{১২}

সাহিত্যের পথে প্রবন্ধ সংকলনের সাহিত্যতত্ত্ব (১৩৪০) প্রবন্ধে লিখেছেন—

আমাদের শাস্ত্র বলেন—

তং বেদাং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো যাতে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেয়।

বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ দিয়েই যাকে জানা যায় জানো সেই পুরুষকে অর্থাৎ পার্সোনালিটিকে। আমার ব্যক্তিপুরুষ যখন অব্যবহিত অনুভূতি দিয়ে জানে অসীম পুরুষকে, জানে হৃদা মনীষা মনসা, তখন তাঁর মধ্যে নিঃসংশয়রূপে জানে আপনাকে। তখন কী হয়। মৃত্যু অর্থাৎ শূন্যতার ব্যথা চলে যায়, কেননা বেদনীয় পুরুষের বোধ পূর্ণতার বোধ, শূন্যতার বোধের বিরুদ্ধ।^{১৩}

এই যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা এতে কী আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এতে শুধু উপনিষদের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নেই? রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে বলেছেন, প্রেম। নতুন দিগন্তের সূত্রপাত, শুধু নাটকের উদাহরণ দিলেও প্রতিটি মৃত্যু জীবনের নতুন ভাবনার উন্মেষের পথ খুলে দিয়েছে। স্বার্থপরদের উদার করে ঐক্যবদ্ধ করেছে, অহঙ্কারের বিনাশ ঘটিয়েছে— সুপ্রিয়র মৃত্যু, জয়সিংহ, উত্তীয়, নটী শ্রীমতি, অমল, রঞ্জনের মৃত্যু সবই প্রায় এভাবেই এসেছে; ‘জন্মদিনে’ প্রায় মৃত্যুশয্যাতে গুয়ে নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও একইরকমের কথা বলেছেন। মৃত্যু ‘ব্যথা দেয়নি’, ‘বেদনা অর্থাৎ হৃদয়বোধ’ বা সংবেদনকে জাগিয়ে দিয়েছে। আর নাগার্জুনের শূন্যতার তত্ত্ব আসলে নাস্তি নয় পূর্ণতার তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজের মত করে, ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থনও করেছেন।

১৯২৬ সালের ২৫ এ ডিসেম্বর “খৃষ্ট” সম্পর্কে লেখেন ‘মানবসম্বন্ধের দেবতা’(চারিত্রপূজা); সেখানে লিখেছেন—

যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি ‘হৃদা মনীষা মনসা’ সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখেছেন... খৃষ্ট বলেছেন ‘আমাতে তিনি আছেন।’ আগের উদ্ধৃতির ‘বেদনীয় পুরুষ’ই খৃষ্টের পিতা, উপনিষদের পুরুষ এবং বন্ধু।^{১৪}

(৮ই আশ্বিন, ১৩৪৩)এ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে, যা পরে “সাহিত্যের পথে”র ভূমিকা হিসেবে যুক্ত হয়েছে, লিখেছেন—

Truth is beauty, beauty truth (আসলে উদ্ধৃতিটি হল- “Beauty is truth, truth Beauty”) অর্থাৎ, যে সত্যকে আমরা ‘হৃদা মনীষা মনসা’ উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমি আপনাকে পাই।^{১৫}

আগের উদ্ধৃতিগুলির ‘বেদনীয় পুরুষ’, ‘পিতা’ এবং ‘বন্ধু’ হয়ে উঠেছে ‘আমি’। আমাদের এবিষয়ক শেষ উদ্ধৃতি হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ৫ নম্বর চিঠি (২৩জুন, ১৯৩১)-

একদিন হঠাৎ এক পল্লীবাসী বাউল ভিখারীর মুখে গান শুনলুম, ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।’ আমি যেন চমকে উঠলুম, বুঝতে পারলুম, এই মনের মানুষকেই, এই সত্য মানুষকেই আমরা দেবতায় খুঁজি, মানুষে খুঁজি, কল্পনায় খুঁজি, ব্যবহারে খুঁজি, “হৃদা মনীষা”- হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে কর্ম দিয়ে।^{১৬}

এখানে ‘বেদনীয় পুরুষ’ ই ‘মনের মানুষ’। ১৯৩৬ এর চিঠিটি ক্রমের একটু আগে রেখেছি, যদি ক্রম অনুসারে দেখি দেখব, উপনিষদের ‘পুরুষ’ কীভাবে পিতা বন্ধু, মনের মানুষ হয়ে শেষ পর্যন্ত ‘আমি’ই হয়ে উঠেছে। হেমন্তবালা দেবী চিঠিতে বাউলের গানের সঙ্গে তাঁর দর্শনের যোগস্থাপন করেছেন, যে প্রবন্ধ নিয়ে কথা বলছিলাম সেটির নামও *An Indian Folk Religion*. এই বৃত্তি সম্পূর্ণ করবো বলেই কালক্রম ভেঙে চিঠিটি শেষে রেখেছি।

এতক্ষণ ধরে আসলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি, কেন ‘বোধিচিত্ত’ নয় ‘বোধি-হৃদয়’ এর সচেতন ব্যবহার। আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি রবীন্দ্রনাথের (উপনিষদের নয়!) “হৃদা মনীষা মনসা”- ই আসলে তাঁর “বোধি-হৃদয়”।

আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই প্রবন্ধ থেকে আরেকটু উদ্ধৃতি দেবো-

My object in writing this paper is to show, by the further help of illustration from a popular religious sect of Bengal, that the religious instinct of man urges him towards the truth, by which he can transcend the finite nature of the individual self. Man would never feel the indignity of his limitations if these were inevitable. Within him he has glimpses of the Infinite, which give his assurance that... this truth can be attained by love. For love is the positive quality of the Infinite, and love's sacrifice accordingly does not lead to emptiness, but to fulfilment, to Bodhi-hridaya, 'the heart of enlightenment'. (An Indian Folk Religion, Page No. 522) ‘কবি’র হৃদয়ই ‘বোধিহৃদয়’ যার মধ্যে ‘আমি’ কে উপলব্ধি করে তা প্রকাশিত হয় ‘বিশ্বভাবে’র ‘বড় আমি’ তে।

(৩)

আগে বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর হিন্দুপ্রধান জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে অন্য যেকোনো ধর্ম এমনকি হিন্দুধর্মের অন্যান্য শাখার প্রতি কটাক্ষ করেছেন, যৌক্তিক এবং অযৌক্তিক আক্রমণ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আমরা আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ ‘চিত্ত’ শব্দের বদলে ‘হৃদয়’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমরা তার কারণ উপরে ব্যাখ্যা করেছি। তা সত্ত্বেও অন্য আরেকটি কারণ এক্ষেত্রে আছে বলে আমাদের মনে হয়।

সেটি হল- রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের বহুল প্রচারিত ও সেই সময়ে বহুল জনপ্রিয় ‘অনুশীলন ধর্ম’র ‘চিত্তবৃত্তি’ সঙ্গে একটি প্রকট পার্থক্য রাখবেন বলেই, হয়ত, ‘হৃদয়’ শব্দটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা আসলে বঙ্কিমের ‘কৃষ্ণচরিত্র’ ও ‘হিন্দুধর্ম’ সংক্রান্ত হিন্দুধর্মপ্রধান জাতীয়তাবাদের পালটা একটি নির্মাণ। যদিও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই নির্মাণের স্বরূপ ও প্রকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় একেবারেই বিপরীত। আমরা আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ‘কবি’র মতবিরোধকে একেবারে গোড়ার থেকে তুলে ধরবো।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম এর প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন শিরোনামে, প্রচার পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ধারাবাহিক ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন। এই বিতর্ক শুরু হয় যখন হিন্দুধর্ম নামে একটি প্রবন্ধে, কুসংস্কার এবং দৈনিক, অর্থহীন, ধর্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মে আড়ষ্ট হিন্দুর তুলনায়, তাঁর কাজিত সত্যিকারের ‘হিন্দু’র পরিচয় কতখানি ন্যায্য প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন-

আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই... যবন ও স্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেননা। সন্ধ্যা আফ্রিক ক্রিয়াকর্ম কিছুই করেননা। কিন্তু কখন মিথ্যা কহেন না। যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা-নিতান্ত প্রয়োজনীয়- অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।^{১৭}

তাঁর মতে সেরকম লোক আচারভ্রষ্ট হলেও ‘ধার্মিক হিন্দু’ ও দেশিয় লোকেদের আদর্শ স্বরূপ। ধর্মের আদর্শ এবং মানুষের আদর্শ বলতে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলতে চেয়েছেন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র

মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে, যার অবসান ঘটেনি। পরের দিকের মতপার্থক্যে, সুরের তীব্রতা কমেছে ক্রমশ। একথা বলছি কারণ এবার আমরা যে উদ্ধৃতি গুলো দেবো সেগুলি বিভিন্ন সময়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই (প্রত্যক্ষ আক্রমণ গুলো) বর্জন করেছেন। প্রথম মতপার্থক্যের চড়া সুর আমরা লক্ষ্য করি এই প্রবন্ধের পালটা রবীন্দ্রনাথের *একটি পুরাতন কথা* প্রবন্ধে। বঙ্কিমের ‘মিথ্যা-সংক্রান্ত’ বাক্যটি উদ্ধৃত করে বলেন-

২ ছত্রের পর বর্জিত অংশঃ

...“কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না। বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু ঈশ্বরের লোকহিত সীমাবদ্ধ নহে- তাঁহার অখণ্ড নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। (পৃ ৯৭৬)

২৫ ছত্রের অনুক্রমে ছিল

...প্রথর বিজ্ঞতার প্রভাবে মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস না থাকিলে কেহ মনে করিতে পারে না যে উদরের মধ্যেই সাহিত্যের মূল, হৃদয়ের মধ্যে নহে। লেখার উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে লেখা মহৎ হইবে না।

যেমন করিয়াই দেখি, সঙ্কীর্ণতা মঙ্গলের কারণ নহে।”

প্রবন্ধটির বর্জিত শেষাংশঃ

...যিনিই যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদের উপহাসই করুন, *sentimental* বলিয়া আমাদের অবজ্ঞাই করুন, বা শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনোই ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জন দিয়া আসিব। সুবিধাই হউক লাভই হউক, আত্মহিতই হউক লোকহিতই হউক, মিথ্যা বলিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, সত্যের ভান করিব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করিব না- সত্যকে আশ্রয় করিয়া মহত্বে উন্নত হইয়া সরল ভাবে দাঁড়াইয়া ঝড় সহ্য করিব সেও ভাল, তবু মিথ্যায় সঙ্কুচিত হইয়া সুবিধার গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ সুখ অনুভব করিবার অভিলাষে আত্মার কবর রচনা করিব না।^{১৮}

আমরা স্বীকার করি, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত কমবয়সের লেখা এটি, এরপর বা সঙ্গে সঙ্গেই ‘কবি’ নিজেকে ভেঙে গড়ে মানবতার ধর্মে বিনয় আর উদারতাকে সম্বল করে পৌঁছবেন। কিন্তু ‘মানুষের ওপর বিশ্বাস না হারানো’র কথা, সত্যের মহৎ উদ্দেশ্যের কথার সূত্রপাত তো এখান থেকেই ঘটছে।

The Mahatma and The Poet^{১৯} বইটিতে আমরা দেখব, বঙ্কিমের পরে বিহারের ভূমিকম্প নিয়ে যখন গান্ধীজি, বিহারের দরিদ্র মানুষের পাপ কে দায়ী করেন, রবীন্দ্রনাথ একই রকম তীব্রতায় গান্ধীজিকে চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানান।

ফিরে আসি, আগের প্রসঙ্গে, বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠির উত্তর দিয়েছেন; ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে নয়, ‘নিরন্তর কুৎসাকারী’ আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে, যার মধ্যে ‘ব্রাহ্ম’ পরিচয়টিই মুখ্য রেখে তার পালটা বক্তব্য রেখেছেন- *আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব্য হিন্দু সম্প্রদায়* প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায্য প্রশ্নগুলির বঙ্কিম কোনো উত্তর দেননি। ফলে রবীন্দ্রনাথও এর পালটা *কৈফিয়ৎ* প্রবন্ধে জানিয়েছেন বঙ্কিম সম্পর্কে তার মতামতের কোনো বদল ঘটেনি। কারণ তিনি তাঁর কোনো প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমের প্রবন্ধে পাননি। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের মধ্যে এই বিরোধের বীজ টি ‘উৎপাটিত’ হয়েছিল কিন্তু আমাদের সাক্ষ্য তার বিপরীত কথা বলে। বীজটি সুফলা মহীরুহ হয়ে, রবীন্দ্রনাথের দর্শনের ভিত নির্মাণ করেছিল। এখানেই শেষ নয়, এই মতপার্থক্য পরেও জারি ছিল, বিনয়ের সঙ্গে।

১৩০১ সালে (১৮৯৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ *বঙ্কিমচন্দ্র* (বৈশাখ, ১৩০১। সাধনা) এবং *কৃষ্ণচরিত্র* (মাঘ, ফাল্গুন, ১৩০১, সাধনা) নামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটি, বঙ্কিমের মৃত্যুর পর তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে লেখা। কিন্তু এত বিরোধের পর একাজ সহজ ছিলো না, সমকালীন পরিস্থিতিতে। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যোগ আছে ‘সংযোজন’ এর ‘শোকসভা’ প্রবন্ধটির। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভার আয়োজন করা হলে, বক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নিজে প্রথমে নবীনচন্দ্র সেনকে এর সভাপতিত্ব করতে অনুরোধ করেন, তিনি রাজি হননি। পরে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু পরে এই শোকসভায় বঙ্কিমের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোকপ্রকাশ কে নবীনচন্দ্র সেন তীব্র কটাক্ষ করেছেন। নবীনচন্দ্র “আমার জীবন” এ লেখেন-

সভা-শ্রাদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে এখন ইংরাজের অনুকরণে ‘শোক-সভা’ পর্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে... সভা করিয়া কীভাবে শোক করা যায়, আমি হিন্দু তাহা বুঝি না... আমার স্মরণ হইল, বঙ্কিমবাবু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ‘রবির ছায়া’ নামক একটি প্রবন্ধ ‘প্রচারে’ প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে রবিবাবু এবং তাঁহার মধ্যে বড় সদ্ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল না। অতএব শোকসভাতে শোকটা রবিবাবু করিবেন, আমার কেমন কেমন লাগিল... যাহা হউক, শোকসভা শেষ হইল, রবিবাবু বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ শোক করিয়া যখন অশ্রু মুছিয়া বসিলেন।

তখন শ্রোতার রবীন্দ্রনাথকে গান করতে বলায়, গুরুদাসবাবু এবং নবীনচন্দ্র উভয়েই বিরক্ত হন।- এই মতের বিরুদ্ধে ‘শোকসভা’ নামে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সাধনাতে লেখেন।^{২০}

জীবনের ঝরাপাতা-য় সরলা দেবী, ছয় নম্বর অধ্যায়ে, ‘রবীন্দ্র-বঙ্কিম বিতর্ক’ এ লিখেছেন-

রবিমামার সঙ্গে ছেলেবেলায় একটি সভায় যাওয়া আমার মনে পড়ে।... সভাটি আদি ব্রাহ্মসমাজের হলে আহূত। উদ্দেশ্য সে সভায় বঙ্কিমের একটি মতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ পাঠ। বঙ্কিমের যশ ও কীর্তি তখন মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত আর রবি সবেমাত্র উদীয়মান। লোকদের মধ্যে একটা হুলচল পড়ে গেল।...সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই- রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য এই যে, মিথ্যা কোন অবস্থাতেই কোন সময়েই কথনীয় নয়। এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রাকারকৃত ব্যতিক্রম বিধিগুলি তিনি সমর্থন করেন না, বঙ্কিম করেন- এই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ও বঙ্কিমের পক্ষাবলম্বী হলেন, তাঁরা বক্তৃতা-সভায় যোগদান করলেন না।

যদিও পরে সরলাদেবী মনে করেছেন- সেদিন মাতুল-ভক্তিতে অযথা বঙ্কিম-মতদ্বৈষী হয়ে পড়েছিলুম। এবং কৃষ্ণতত্ত্ব ও বিভিন্ন বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বঙ্কিমের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে প্রসঙ্গ পৃথক।^{২১}

সমকালে নবীনচন্দ্র এবং সরলাদেবীর মতামতের উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম কারণ, (এরপর) রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমের যে তীব্র ‘মতপার্থক্য’ ছিল, এবিষয়ে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু সুরের পার্থক্য আছে আমরা বলেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত, সাহিত্য বা সাহিত্যিকের মতের সমালোচনা কীভাবে করতে হয় এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার গঠনমূলক ‘পদ্ধতি’ও নির্মাণ করেছেন। প্রথম জীবনের ‘মেঘনাদবধ’ এর সমালোচনা, বঙ্কিমের সঙ্গে তার মতপার্থক্য, সজনীকান্ত বা কল্লোলীয়দের সঙ্গে তার মত পার্থক্যের ধারা যদি বিশ্লেষণ করা যায়, এই গঠনমূলক সমালোচনা পদ্ধতির স্বরূপ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো। তা পৃথক গবেষণার বিষয় হতে পারে। তাঁর কাছে সাহিত্য সমালোচনায় ব্যক্তি-আক্রমণ বা ব্যক্তির প্রতি অশ্রদ্ধাভ্রাণন কোনো পদ্ধতিই হতে পারেনা। মতপার্থক্য আলোচিত হবে, তार्কিক যুক্তির সাপেক্ষে; এবং তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল- বিনয়। যাকে নবীনচন্দ্র ‘বিনাইয়া বিনাইয়া’ বলে কটাক্ষ করেছেন। প্রথমদিকে তীব্রতা, রুঢ়তা যে ছিলোনা তা নয়, কিন্তু পরের দিকে এই বিনয় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। প্রথম ‘মেঘনাদবধের’ সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর পরবর্তী মতের কথা আমরা সকলেই জানি। আমরা একটু আগেই একটি পুরাতন কথা থেকে যা উদ্ধৃত করেছি তা পরবর্তী সংস্করণে বাদ দেওয়া হয়েছে বিশেষত যেখানে বঙ্কিমকে সরাসরি উদ্দেশ্য করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতের বদল ঘটেনি তাঁর সমালোচনা ‘সবিনয়’-গঠনমূলক হয়েছে। আমরা এখন কথা বলব দ্বিতীয় প্রবন্ধটি বিষয়ে, কৃষ্ণচরিত্র।

বঙ্কিমের “অনুশীলনধর্ম” তার অন্তর্গত বৃত্তিসমূহ, বিশেষ করে চিত্তবৃত্তি এবং কৃষ্ণতত্ত্ব – কোনোটির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ একমত ছিলেন না। বঙ্কিমের ‘চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি’ কেমন? “ধর্মতত্ত্বের” ২৭তম অধ্যায়ে ‘চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি’ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ‘গুরু’ বলছেন- “...চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি তাহাকে চিৎ শক্তি বলা যাউক... সতে এই চিতের অবস্থানের ফল কি?” উত্তর- ‘জাগতিক শৃঙ্খলা, অনির্বচনীয় ঐক্য’। “জীবের পক্ষে অনির্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি?” উত্তর- “জীবের সুখ, সচ্চিদানন্দ।” এরপর তিনি সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে তাঁর অনুশীলন ধর্মের পার্থক্য করেন – আদিম বৈদিক ধর্মে “আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার অর্থাৎ জ্ঞান বা ধ্যানের অভাব ছিল...উপনিষদের ধর্মে... আনন্দাংশের অভাব আছে...বৌদ্ধ ধর্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং তাঁহাদের ধর্মে আনন্দ ছিল না... এই কারণেই সর্বদা সুন্দর অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই।” এবং তাই হিন্দুধর্ম (তিনি নাম দিয়েছেন ‘সংস্কৃত ধর্ম’; অর্থাৎ যে হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করা হয়েছে) ই একমাত্র যা জাতীয় ধর্ম হওয়ার উপযুক্ত। আর সেই ধর্মের মুখ ‘আদর্শ পুরুষ কৃষ্ণ’।^{২২}

রবীন্দ্রনাথের ধর্মের স্বরূপ এর থেকে অনেক আলাদা, আর এর যদি কোন মুখ বা আদর্শ থাকে তাহলে তা বুদ্ধ (তিনি বুদ্ধের স্বরূপও নির্মাণ করেছেন, ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর)। রবীন্দ্রনাথের ‘বোধিহৃদয়’ রঞ্জিত (চিত্তরঞ্জিনী নয়) করেনা। উপলব্ধির মাধ্যমে বিশ্ববোধে, মানবতার স্বার্থে প্রকাশ করে, সেখানে কোন সংকীর্ণতা নেই, মানুষই তার প্রথম ও শেষ কথা; এবং এই গোটা প্রক্রিয়াটি অনবরত চলতে থাকে, মানুষের চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত হয়। তবে ধর্মকে নির্মাণের এই পাঠের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের সঙ্গে অয়কেনের মিলের কথা বলেছেন তা আমরা আগেই বলেছি। আমাদের মনে হয়, ধর্মের এবং আদর্শের সম্পাদনা সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বঙ্কিমের কাছেও তিনি পাঠ নিয়েছিলেন। আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশও বঙ্কিমচন্দ্র; তাঁকে গ্রহণে এবং বর্জনে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন যুক্তি-অযুক্তিতে প্রমাণ করেছেন হিন্দুধর্মই শ্রেষ্ঠ (এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়েই তিনি বার বার বাকিদের হীন প্রমাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এই চেষ্টা নেই।)

তেমনি আদর্শ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তাঁর যুক্তি একইরকম, “ধর্মতত্ত্বে” বলছেন-

জনকাদি রাজর্ষি নারদাদি দেবর্ষি বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ, তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিদ্ধ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মম ধর্মবেত্তা। কিন্তু ইহারা তা নয়...কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আরেক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ ছোট হইয়া যায়... যাঁহার তুলল মহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্তিত হয় নাই। আইস আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি। (বঙ্কিম রচনাবলী, পৃ ৫১২)

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শুরু হয়েছে এই ঐতিহাসিকতার বিরোধিতা করেই, কারণ এই প্রবন্ধে এবং নানান লেখায় বারবার তিনি রামায়ণ মহাভারত যে ফিক্সন, তার চরিত্রগুলি কাল্পনিক এ বিষয়ে সর্ব হয়েছেন। আমাদের মনে হয় এই ইতিহাসের অপলাপের পালটা; জাতি নয় সমগ্র মানুষের আদর্শরূপেই তিনি ভারতীয় এবং ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে বুদ্ধকে, বুদ্ধের কালকে বেছে নিয়েছিলেন। আর বৌদ্ধদর্শনকে নিজের দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমের ব্যাখ্যার জন্যই বৈষ্ণব দর্শন বা চৈতন্যের দর্শন নিয়ে খুব বেশি কাজ করেননি, এক কৃষ্ণকে মুখ হিসেবে তাঁর পছন্দ ছিলো না (গান্ধীর ‘রাম’ কেও নয়)। যদিও চৈতন্য ও বৈষ্ণব দর্শনকেও তিনি সম্পাদনা করেছেন, সেখান থেকে ঈশ্বরকেই বিলুপ্ত করে দিয়ে, কবি এবং মনুষ্যত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (বৈষ্ণব কবিতা, বিদ্যাপতির রাধা ইত্যাদি)। দুই, ‘যথার্থ ভারতের গৌরবময়কাল’ নির্মাণে বুদ্ধের কাল অনেক বেশি ইতিহাস সঙ্গত, সত্য। এই কাজের ধারা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হয়ে তাঁর পরিবারেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখরা করছিলেন এ বিষয়ে আমরা আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা পুরোপুরি এই ধারার অনুসারীও নয়, স্বতন্ত্র। জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তার ভাবনায় বুদ্ধের উপস্থিতি। আগে বঙ্কিমের সঙ্গে বিরোধের প্রসঙ্গে শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা প্রবন্ধে লিখেছেন-

আমাদের মতে ‘কৃষ্ণচরিত্র’ গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিন্তাবৃত্তি... তিনি যে কৃষ্ণের অশ্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে-কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাজাত। সমস্ত চিন্তাবৃত্তির সম্যক অনুশীলনে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুলচিত্তে সন্ধান

করিতেছিলেন, তাঁহার ধর্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বভাবে পাইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাকেই সজীব সশরীরীভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিঃসন্দেহে তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল... ‘কৃষ্ণচরিত্র’ পাঠ করিতে সর্বদাই মনে এই খেদ উপস্থিত হয় যে, সাহিত্যে যে প্রণালীতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় বঙ্কিম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই...তিনি বিস্তর অবাস্তর তর্কের উত্থাপন করিয়া পাঠকের মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

তাই “কৃষ্ণচরিত্র” বইটি ‘মনোহরণ’; ‘শ্রমসাধ্য চিন্তাসাধ্য বিচারসাধ্য’ হয়ে ওঠেনি।^{২০}

দুটি প্রশ্ন জাগে- এক, ‘সাহিত্যে’ তাহলে কোন ‘প্রণালীতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়’? দুই, কীভাবে তাকে ‘মনোহরণ’ মাত্র না রেখে ‘শ্রমসাধ্য চিন্তাসাধ্য বিচারসাধ্য’ করতে হয়?

(৪)

আগে বলেছি, ‘কবি’ সংরূপে লেখা বাঁধেননি, ‘পদ্ধতি’ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ আদর্শ বলতে, চরিত্র বোঝেন না, তিনি বলেন *চারিত্রপূজা* (১৯০৭)। জীবনচরিত রচনায় তাঁর ঘোর আপত্তি; ফিক্সন কে ইতিহাস বানানোর চেষ্টায় আপত্তি তো বটেই। *চারিত্রপূজা* র ভূমিকায়-

...জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন...টেনিসন কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসনকে যত বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র... মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্তব্যসাধনার চেষ্টা লজ্জাকর এবং নিষ্ফল... আমরা বলি কীর্তিস্য স জীবতি...এমন প্রত্যক্ষপূজা আর কিসে হইতে পারে।^{২৪}

রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের সঙ্গে তাঁর *বুদ্ধদেব* (বৈশাখী পূর্ণিমা, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২) প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়েছে। বলা বাহুল্য বুদ্ধের ‘চারিত্র’ই ছিল তাঁর কাছে বিশেষ আগ্রহের। সমস্ত অলৌকিকতা, ঈশ্বরত্ব, অবতারত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথমেই তাকে অভিহিত করেছে- “আমি যাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি”। কেন বুদ্ধদেব ‘কবির ধর্মের’ আদর্শ? এই প্রবন্ধে বলেছেন-

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সে প্রকাশের আলোকে সভ্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করেনি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন, ব্রহ্মদেশ, জাপান এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দূস্তর গিরিসমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যাবর্তের কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি- মহাত্মা পুরষং তমসঃ পরন্তাৎ।^{২৫}

আগের অধ্যায়েই আলোচনা করেছি, উনিশ-বিশ শতকে জাতীয় আদর্শ-চরিত্রের পাশাপাশি এক যাপিত গৌরবময় যুগের ও অনুসন্ধান চলছিল। বুদ্ধদেবের সময় ও তারপরেও বহু শতাব্দী ধরে শিল্পে, শিক্ষায়, বাণিজ্যে, স্থাপত্যে নানা দিক থেকে ভারতবর্ষের ‘স্বর্ণযুগ’ ছিল। বুদ্ধের উপলব্ধি এবং প্রচারিত দার্শনিক প্রস্থানের চর্চাও ভারতবর্ষের দর্শনচর্চাকে সমৃদ্ধ করছিল। এই গৌরবময় যুগের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুদ্ধই সকলের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। দাদু, চৈতন্য, যীশু, নানক সকলেই মানবতার আদর্শকে বড় করে দেখেছিলেন, জাত-পাত সম্প্রদায়হীন মানুষের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ এঁদের দর্শন দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব ও তার সময়কাল ছিল ‘যথার্থ ভারতের’ আদর্শ হিসেবে যথোপযুক্ত। ঠাকুরবাড়ির সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বুদ্ধ ও বুদ্ধের কালকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন, তা আগেই বলেছি। রবীন্দ্রনাথও ‘পথের সঞ্চয়’(যাত্রার পূর্বপত্র, আষাঢ়, ১৩১৯) এ বলেছেন-

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করে নিয়েছিল, তখনই সমাজে তার এমন বিকাশ ঘটেছিল। রোগীদের জন্য ঔষধ পথের ব্যবস্থা, এমন-কি, পশুদের জন্য চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হয়েছিল এবং জীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করে দেখা দিয়েছিল।^{২৬}

কিন্তু এই ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভেদ আছে। বঙ্কিম প্রথম বাঙালির ইতিহাস নেই বলে খেদ করেছিলেন, এবং ডাক দিয়েছিলেন সমকালীন হিন্দুপ্রধান জাতীয়তাবাদের আলোকে ইতিহাস-নির্মাণের। পরবর্তীকালে তা শুধু হিন্দুতে সীমাবদ্ধ না থেকে বঙ্কিমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যান্য ধর্মের ইতিহাসেও খোঁজ এবং পুনরুদ্ধার করার ধারা চলছিল। রবীন্দ্রনাথের শুরু হয়ত একই ধারণার বশবর্তী হয়েই, কিন্তু তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবনাকে ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী স্বার্থে সীমাবদ্ধ রাখলেন না, যুক্ত করলেন, দেশ কালের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মানবতা বোধের সঙ্গে। তিনি অন্যদের মত ইতিহাসে আশ্রয় না খুঁজে তাঁর ‘ধর্ম’ কে অস্থিত করলেন সমকালীন অশান্ত রাজনৈতিক সমস্যা বহুল সময়ের সমাধান হিসেবে। সামনে রাখতে চাইলেন এই মানবতার আদর্শকে, যার প্রবাহ ভবিষ্যৎমুখীও। বুদ্ধও তাই করেছিলেন, রাজনৈতিক আগ্রাসনের প্রতিকার খুঁজতে গিয়েই, তাঁর দর্শনের আবিষ্কার। পরবর্তী অধ্যায়ে, এ এবিষয়ে

দেবীপ্রসাদের মত উদ্ধৃত করেছি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে দেশে এবং গোটা পৃথিবীতে ক্ষমতার আগ্রাসন, ফ্যাসীবাদের নগ্নরূপকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দুটো বিষয়ুদ্ব দেখেছিলেন; তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আশাবাদী কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল মানুষের ওপর এবং ইতিহাসের ধারায়; যে ধারাকে সচল রাখে সাধারণ মানুষই। আর এক্ষেত্রেও তাঁর আশ্রয় বুদ্ধ। ব্যক্তি নয়, মানুষের শুভ চৈতন্য কি? আবার উদ্ধৃত করবো “বুদ্ধদেব” প্রবন্ধের শেষের দিকের কিছু অংশ-

আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে; কেননা মানুষ আজ সত্যদ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন...তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছেঃ তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্লেধের দ্বারা ক্লেধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের... বাহুবলের সাহায্যে ক্লেধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না। ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না;...যিনি বলেছিলেন ‘অক্লেধেন জিনে কোধঃ’, আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এলঃ বুদ্ধঃ শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি রাগদ্বৈষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ত বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম রুদ্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।”

(একাদশ খণ্ড, চারিত্রপূজা, পৃ ২৫৭)

কিন্তু প্রথম, এবং তারপরেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটল, এখনও ক্ষমতার আগ্রাসন গোটা পৃথিবীকে অশান্ত করে রেখেছে। এরকারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ “মনোহরণ” ধর্মচিন্তাকেই দায়ী করেছেন। তাদের ভাবনা চিন্তা শ্রম এবং বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মীকৃত হচ্ছেনা। *বাতায়নিকের পত্র* (১৩২৬) প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন-

... বাংলা সাহিত্যে যখন তার অব্যক্ত কারণ-সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রবালদ্বীপের মতো প্রথম মাথা তুলে দেখা দিলে তখন বৌদ্ধধর্ম জীর্ণ হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে নানাপ্রকার বিকৃতিতে পরিণত হচ্ছে... এই শান্তির দেবতা, ত্যাগের দেবতা টিকল না। যুরোপেও আধুনিক শক্তিপূজক বলেছেন, যিশুর মতো অমন গরিবের দেবতা, নিরীহ দেবতা, অমন নেহাৎ ফিকে রক্তের দেবতা নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের এমন দেবতা চাই জোর করে যে কেড়ে নিতে পারে, যেমন-করে-হোক যে নিজেকে জাহির করতে গিয়ে না মানে বাধা, না পায় ব্যথা, না করে লজ্জা। কিন্তু যুরোপে এই-যে বুলি উঠেছে সে কাদের পান-সভার বুলি...আমাদের দেশের মঙ্গলগানের আসরেও ঐ বুলিই উঠেছিল। কিন্তু এ-বুলি কোন্‌খান থেকে উঠল? যাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, সম্মান নেই সেই হতভাগাদের স্বপ্নের থেকে। তারা স্বপ্ন দেখল...স্বপ্নেতেই যে আমাদের চণ্ডীগানের আদি এবং স্বপ্নেতেই যে তার অন্ত তার প্রমাণ কী...হঠাৎ খামখেয়ালী শক্তি বিনা কারণে তাকে এমন-একটা আঙুটি দিলেন যে, ঘরে

আর টাকা ধরে না। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে এই সামান্য ব্যাধ যখন লড়াই করল, তখন খামকা স্বয়ং হনুমান এসে তার পক্ষ নিয়ে কলিঙ্গের সৈন্যকে কিলিয়ে লাথিয়ে একাকার করে দিলে। একেই বলে শক্তির স্বপ্ন, ক্ষুধা এবং ভয়ের বরপুত্র। হঠাৎ একটা কিছু হবে। তাই সেই অতি-অদ্ভুত হঠাতের আশায় আমরা দলে দলে উচ্চৈঃস্বরে মা মা করে চণ্ডীগান করতে লেগে গেছি। সেই চণ্ডী ন্যায় অন্যায় মানে না, সুবিধার খাতিরে সত্যমিথ্যায় সে ভেদ করে না, সে যেন-তেন প্রকারে ছোটোকে বড়ো, দরিদ্রকে ধনী, অশক্তকে শক্তিমান করে দেয়। তার জন্যে যোগ্য হবার দরকার নেই, অন্তরের দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন হবে না, যেখানে যা যেমনভাবে আছে আলস্যভরে সেখানে তাকে তেমনি ভাবেই রাখা চলবে... মানুষ যদি তখনো সমস্ত দুঃখ এবং পরাভবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারে, আমি সব সহ্য করব তবুও কিছুতেই একে দেবতা বলে মানতে পারব না, তা হলেই মানুষের জিত হয়। চাঁদসদাগর কিংবা ধনপতির বিদ্রোহের মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত মানুষের সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল”।^{২৭}

হয়ত, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ‘নাগরিক আভিজাত্য’ মিশেছে কিন্তু এই ‘গোঁজামিলনের’ ধর্মের বিরোধিতা তিনি বারবার করছেন। স্বপ্ন দেখায় এবং দেখানোয় তাঁর চরম আপত্তি; কারণ তা মানুষকেই চরম অবিশ্বাস করে, তাকে ধর্মের মদে মাতিয়ে রাখে। মানুষের স্বাধীন সত্তা, চিন্তাশক্তি লোপ পায়। তারা সকলে নির্জীব ‘রাজার ঐটো’ (রক্তকরবী) তে পরিণত হয়। ‘যক্ষপুরীর’ ক্ষমতার আশ্রাসন থেকে কিছুতেই তার মুক্তি ঘটে না। নাটকটিতে পুরোহিতের ভূমিকা আমাদের মনে পড়বে। বুদ্ধের শরণ নিয়েছেন কারণ- বুদ্ধ বললেন, বস্ত্রই বা কী আর মনই বা কী, কিছুর মধ্যেই নিত্যপদার্থ নাই; অনন্ত বিশ্বমরীচিকা কেবল স্বপ্নপ্রবাহমাত্র। স্বপ্ন দেখিবার বাসনা একবার ধ্বংস করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি হয়।^{২৮}

১৭ ভাদ্র, ১৩৩১ এ বিশ্বভারতী- ১১ নং এ তিনি লিখেছেন-

একদিন বুদ্ধ বললেন, ‘আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।’ দুঃখ তিনি সতাই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি নি সে আমার নিজেরই দৈন্য— আমি যদি সাধক হতুম সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্রে মিলিত হবে।^{২৯}

বিশ্বভারতীর রূপকল্পনায় বৌদ্ধবিহার

তিনি যে শুধু প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, দার্শনিক পরিসরে চিন্তনের মধ্যেই এই নির্মাণকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তেমনটা একেবারেই নয়। তিনি বলেছেন বিশ্বভারতীকে তিনি এই ভাবের অনুবর্তী করেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন; এর রূপকল্পনায় বৌদ্ধবিহারের প্রভাব আছে। “বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ” নামে ভাষণে বলছেন-

এই যুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিকল্প একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যুরোপীয় যুনিভার্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিন্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে...পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদগতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়। নালন্দা বিক্রমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত ক’রে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ ক’রে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত ক’রে দিতে সর্বসাধারণের মানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য। এই ইচ্ছাটি যে কিরকম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন...আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ ক’রে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বত্রই ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরো-একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সজ্জ যাত্রা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সেকালে বৌদ্ধভারতে সজ্জ ছিল নানা স্থানে। সেই-সকল সজ্জ সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যের সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশিলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।^{৩০}

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকেও বৌদ্ধদর্শন চর্চার পীঠস্থান করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে আমরা একটু পরে বিষদে আলোচনা করবো। তার আগে আলোচনা করছি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় (এই শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত আছে। কারণ, ‘বিশ্ব’+‘বিদ্যা’+‘আলয়’। তার প্রতিষ্ঠানের নাম ‘বিশ্বভারতী’) ভাবনার কথা। শান্তিনিকেতনের যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম তার নামকরণ হিন্দুধর্ম অনুসারী হলেও

আবারও সেখানে মিশ্রিত ‘কবির ধর্ম’ ই কার্যকর, বৌদ্ধবিহার এবং সঙ্ঘের ছায়াও সেখানে দেখতে পাবো।

মানুষের ধর্ম এ তিনি বলছেন-

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে গুতে, যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে- একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এত বড় উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন,

তাই বলেছেন অপরিমাণ প্রেমই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।^{৩১}

এই ভাবনারই প্রকাশ আমরা পাবো তার আশ্রম, শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বিশ্বভারতী সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখায় এবং ভাষণে।

আশ্রমে তাদের প্রার্থনার মন্ত্র উপনিষদের মন্ত্র, বা ব্রহ্মসঙ্গীত। কিন্তু আমরা জানি, এই দুই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-দর্শন মতে প্রার্থনার উদ্দেশ্য ব্রহ্মকে বা একমেবোদ্বিতীয়ম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলছেন-

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র... (প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম, পৃ ৫৫০)

ভাষাপ্রসঙ্গ

সাহিত্যের আঙ্গিক-বিষয় নিয়ে তো বটেই তিনি কথা বলেছেন তার ভাষা নিয়েও। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে তাঁর অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিদ্যাসাগরের দানকে বারবার স্মরণ করেছেন (‘বঙ্কিমচন্দ্র’, ‘কৈফিয়ৎ’, ‘বিদ্যাসাগর’ ইত্যাদি প্রবন্ধ গুলিতে আমরা তা পাবো)। সমকালীন ভাষাবিদদের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগ ছিল। আমরা জানি, প্রমথ চৌধুরির সাহায্যে ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার উন্মেষের অন্যতম কারণ সাহিত্যে বাংলা ভাষাকে আরও বেশি সাবলীল করা। ১৯৩৮ এ লিখছেন, *বাংলাভাষা-পরিচয়*,^{৩২} মূল বক্তব্য- সাহিত্যে সাধুভাষার বদলে, তার ভাব, বিষয়, আঙ্গিক, চরিত্রকে বাস্তবানুগ করতে, সাধু নয়, চলিত ভাষার ব্যবহার; এবং একে সচল সাবলীল রাখতে সংস্কৃত-ভাষার নির্ভরতা ছেড়ে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ ব্যবহার করে তার শব্দভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করা।

সাহিত্যের ভাষা অভিজাত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ হবে এই মতাবলম্বীরাও রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছিলেন, এই সমস্যা চিরকালীন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বারবার সংস্কৃতপন্থীদের বপক্ষে কথা বলেছেন, তিনি তার যুক্তি হিসেবে এনেছেন পালিভাষার প্রসঙ্গ-

এক কালে প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় যখন প্রাকৃত ভাষায় পালিভাষায় আপন আপন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন ঠিক এই সমস্যাই উঠেছিল। যাঁরা সমাধান করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন; তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা বোঝার মত চাপিয়ে যান নি জনসাধারণের 'পরে'। (বাংলা শব্দতত্ত্ব-সংযোজন, বানান বিধি-০২, দশম খণ্ড, পৃ ৭৭৪)

আমরা নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তে আসতে পারি, রবীন্দ্রনাথের ভাষা সংক্রান্ত ভাবনায় বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের প্রভাব ছিল। আরেকটি মন্তব্য-

...অতএব কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরিপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র সমীকৃত, অন্তঃপুরে অসূর্যম্পর্শ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করতে পারে,... বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। (শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি, শিক্ষা, পৃ ৪৪২)^{৩৩}

প্রাতিষ্ঠানিক, অভিজাত ভাষার বদলে, সাধারণের পালিভাষাকে ব্যবহার করে উপদেশদান, জনসংযোগ, বুদ্ধের একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত। ১৯৩৮ সালে এই ভাষাপ্রসঙ্গ ব্যবহার করে শ্যামল ও কজ্জল উপন্যাসটি লেখা হচ্ছে। পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গেই আরও বহু উপন্যাস আসছে।

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম চিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথ কতখানি বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তার ভাবনাকে যখন প্রতিষ্ঠানের রূপ দিচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাভাষার স্বরূপ নির্মাণের প্রসঙ্গেও তিনি সরাসরি বৌদ্ধসংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু এই যে প্রতিষ্ঠান, এও স্বরূপগত দিক থেকে উন্মুক্ত একথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, কারণ রবীন্দ্রনাথ একদিকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন তিল তিল করে অন্যদিকে বারবার পথের কথা বলছেন, ঘরের দেওয়াল ভাঙার কথা বলছেন, 'বাহিরে'র সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে যোগের কথা বলছেন। আমাদের মনে পড়বে বুদ্ধের কথা সজ্জ প্রতিষ্ঠা করছেন, একই সঙ্গে পথের কথা বলছেন, ঐশ্বর্যের বদলে ভিক্ষার কথা বলছেন, মৃত্যুও হচ্ছে তারই ইচ্ছা অনুযায়ী পথে, শালবৃক্ষের মাঝখানে। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম দর্শন কে 'সম্পাদনা' করেছেন, পরিমাণের

দিক থেকে এমন সর্বব্যাপী পুনর্নির্মাণ আর কোন ধর্মকেই করেননি। আরও বহু প্রবন্ধ ভাষণে তিনি এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলেছেন। শুধু প্রয়োজন অনুসারে আমরা খুব অল্পই উদ্ধৃত করতে পেরেছি। এই তালিকা বিষয়ে কাজ করেছেন অধ্যাপক পদ্মা মজুমদার, অধ্যাপক সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, অধ্যাপক কল্যাণীশংকর ঘটক প্রমুখরা। তাদের গবেষণায় আমরা এই তালিকা পাবো। তবে আমাদের সঙ্গে এঁদের ব্যাখ্যার কিছু পার্থক্য আছে। আমরা এতক্ষণ, প্রবন্ধে, ভাষণে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান নির্মাণে, বাংলাভাষার স্বরূপ নির্ণয়ে এবং নির্মাণে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের প্রভাব আলোচনা করলাম। এখন আলোচনা করব, বৌদ্ধসাহিত্য সম্পাদনার কথা।

(৬)

বৌদ্ধসাহিত্য সম্পাদনা:

ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য চর্চার ধারায় মৌলিক সাহিত্য রচনা যেমন ছিল, তেমনি অনুবাদ ও সম্পাদনার নিয়মিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারাও কার্যকর ছিলো। পারিবারিকসূত্রেই, অন্যান্য ধর্মদর্শনের বিভিন্ন বইয়ের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের বিভিন্ন বইয়ের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ পরিচিত ছিলেন, এবং সেগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অনুবাদ ও মৌলিক সাহিত্যরচনাও করেছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত ছিলেন; জীবনস্মৃতিতে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁর সাহিত্যের বেশ কিছু গল্প *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* দ্বারা অনুপ্রাণিত। এছাড়াও তাঁর পরিবারেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর “আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত (১৮৯৯)” এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর “বৌদ্ধধর্ম” (১৯০১) রচনা করেছেন। এডুইন আর্নল্ডের “Light of Asia” বইটি বুদ্ধগয়া যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গী ছিল। মহেশচন্দ্র ঘোষের “বুদ্ধপ্রসঙ্গ” এবং “বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ” (প্রবাসী, ১৩১৮ শ্রাবণ), নববিধানের অন্তর্গত ব্রাহ্মদের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মদর্শন আলোচনার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতকের অনুবাদগুলির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। Edmund Holmes এর *The*

creed of Buddha বইটি বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে অবশ্যপাঠ্য বই আমেরিকায় একটি সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন।

তিনি জাপান, চীন, বার্মা, মায়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ ও বক্তৃতার সূত্রে বৌদ্ধধর্মের স্বরূপকে আরও ভালো করে উপলব্ধি করেন, এই সময়ের বক্তৃতা গুলিতে আমরা ‘কবির ধর্মে’ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরও বেশি করে লক্ষ্য করি। তার বেশ কিছু পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধের গোড়ায় উদ্ধৃত করেছি। এই সময় তিনি ‘এশিয়ার ঐক্যের’র ভাবনাই আসলে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদের পথ সেকথা মনে করছিলেন। এইভাবনা তাঁর বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থান-সঞ্চার। এশিয়া, নিজ ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বলে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করতে পারবে এই ভাবনা, সযত্নে লালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম কী?

১৩০৮ এ স্বদেশ এ সমাজভেদ নামে এক প্রবন্ধ লেখেন, সেখানে লিখেছেন,

পূর্বদেশ তার বিপরীত। প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র,- তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে।^{৩৪}

পলিটিক্স শব্দটি খেয়াল করবো। এই প্রবন্ধে তিনি ধর্মপালের পৃথিবীব্যাপী বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ধর্মপাল ১৮৯১ সালি কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ বলতে, গোটা পূর্বদেশ/প্রাচ্যকে বোঝাতে চাইছেন। তিনিও গোটা প্রাচ্যের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে চাইছেন বুদ্ধকে নিয়েই। এছাড়াও চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞত হওয়ার বিবরণ আমরা *রবীন্দ্রজীবনী* এবং সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি* ইত্যাদিতে পাবো। পম্পা মজুমদারের “রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস” বইটি থেকে আমরা জানতে পারি, সুত্তপিটক (খুদ্ধনিকায়ঃ সুত্তনিপাতঃ করণীমেত্তসুত্ত), খুদ্ধনিকায়ঃ সুত্তনিপাতঃ মেত্তভাবনা, খুদ্ধনিকায়ঃ খুদ্ধকপাঠঃ মঙ্গলসুত্ত, খুদ্ধকনিকায়ঃ ধম্মপদঃ যমকবগ্গো, খুদ্ধনিকায়ঃ ধম্মপদঃ কোধবগ্গো, দীঘনিকায়ঃ আটানাটিয় সুত্ত, কস্মট্ঠানং সীলানুসসতি, রতনত্তয়-পণাম-গাথা, বুদ্ধাভিগীতি, ত্রিশরণ, গাথায় অষ্টশীল বর্ণনা, সুপুৰ্ণহসুত্ত, বুদ্ধ-বন্দনা, ত্রিরত্ন-বন্দনা, পূজাঃফুল-সুগন্ধি-প্রদীপ ও আহার-পূজা,

ইতিবৃত্তকং, ললিতবিস্তর থেকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন লেখায় উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। ধর্মরাজ বড়ুয়ার “হস্তসার” (১৮৯৩) এবং পুন্নানন্দ স্বামীর “রত্নমালা”(১৯১২) বইগুলিও রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এই বইগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন শুধু তাই নয় তিনি বৌদ্ধধর্ম-দর্শন শাস্ত্রগুলির প্রচার ও চর্চায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি লোকসাহিত্য সংকলনে জোর দিচ্ছেন, মান্যসংস্কৃতির পাশাপাশি লোকসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন, তেমনই আরো ব্যাপকভাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রেও।

চারুচন্দ্র বসু, ধম্মপদ (১৯০৪) বাংলায় অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ ধম্মপদং (জৈষ্ঠ্য, ১৩১২ সালে ভারতবর্ষ) নামে এর সমালোচনা করেন। তিনি এই প্রবন্ধে, ধম্মপদ পাঠে, ধর্মবিশ্বাসীদের কী কী পূণ্য হবে তার বদলে ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়েই কথা বলেছেন- একথা তিনি সমালোচনার প্রথমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি শেষে এও উল্লেখ করেছেন যে শুধু চারুচন্দ্রই নয়, ধম্মপদ বাংলায় প্রচারের জন্য হরিহরানন্দ স্বামীও অনুবাদ করেছেন বইগুলি পালিভাষা অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য করবে। (তদেব, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ ১৭৯)

আমরা এবিষয়ে অন্য একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, সেটি হল- চারুচন্দ্র বসুর অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দ হয়নি। প্রবন্ধের শেষের দিকে তিনি বেশ খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করে করে অনুবাদের অসম্পূর্ণতা গুলি ধরিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মনে হয় প্রবন্ধে পরিসর কম বলে, এবং দুই, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ধম্মপদের অনুবাদ হওয়া জরুরি অথচ যে অনুবাদ গুলি হচ্ছিল সেগুলি তার মনোমত হচ্ছিল না, বলেই তিনি নিজেই ধম্মপদ অনুবাদ করতে শুরু করেন।

এই অনুবাদের প্রথম সূত্রপাত “ধম্মপদং” প্রবন্ধটি। এই অংশটি উদ্ধৃত করছি-

চারুবাবুর প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলে ভাল হয়— যেখানে দুর্বোধ হইয়া পড়িবে, সেখানে টীকার সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি স্থানে স্থানে ব্যাখ্যার আকার ধারণ করে, তবে অন্যায হয়— কারণ ব্যাখ্যায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও পারে— এইজন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের যে-সকল কথার অর্থ সুস্পষ্ট নহে, অনুবাদে তাহা যথাযথ রাখিয়া দেওয়াই কর্তব্য মনে করি। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মূলে আছে—

মনোপুস্তকমা ধম্মা মনোসেট্টা মনোময়া—

চারুবাবু ইহার অনুবাদে লিখিয়াছেন—

“মনই ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়।”

যদি মূলের কথাগুলিই রাখিয়া লিখিতেন— “ধর্মসমূহ মনঃপূর্বগম, মনঃশ্রেষ্ঠ, মনোময়”, তবে মূলের অস্পষ্টতা লইয়া পাঠকগণ অর্থ চিন্তা

করিতেন। “মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ” বলিলে ভালো অর্থগ্রহ হয় না, সুতরাং এরূপ স্থলে মূল কথাটা অবিকৃত রাখা উচিত।

অক্লোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।

যে তং ন উপনয়হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি।।

ইহার অনুবাদ আছে—

“আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না, তাহাদের বৈরভাব দূর হইয়া যায়।”

“এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না” বাক্যটি ব্যাখ্যা, প্রকৃত অনুবাদ নহে— বোধ হয় “যে ইহাতে লাগিয়া থাকে না” বলিলে মূলের অনুগত হইত। অর্থসুগমতার অনুরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্র্যাকেটের মধ্যে দিলে ক্ষতি হয় না,— যথা, “আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার (ধন) হরণ করিল, ইহা যাহারা (মনে) বাঁধিয়া না রাখে, তাহাদের বৈর শান্ত হয়। (তদেব, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ

১৭৮-৭৯

প্রবন্ধটিতেই নয়, আরও খানিকটা অংশ তিনি অনুবাদ করেছিলেন। বিশ্বভারতী পত্রিকার সপ্তম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত ধম্মপদ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ধম্মপদের অনুবাদগুলি তিনি চারুচন্দ্র বসুর বইয়ের কপির পাশেপাশেই করেছিলেন। তাই দুটি অনুবাদ আমরা পাশাপাশি তুলে ধরার চেষ্টা করবো এখানে; চারুচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ এই দুটি অনুবাদকেই পাশাপাশি রাখবো।

ধম্মপদ

যমকবঙ্গো/ যুগ্মগাথা (রবীন্দ্রনাথ)

চারুচন্দ্রঃ মন বেদনাদি ধর্ম সমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (প্রধান), এবং ধর্ম মনোময় (অর্থাৎ ধর্ম মন হইতেই উৎপন্ন হয়)। (মনুষ্যের স্বভাব বা চিন্তা মনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়। জীবের চৈতন্যিক ভাবসমূহ মন হইতেই উৎপন্ন হয় ও মনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়)। যদি কেহ দূষিতান্তঃকরণে কথা হয়, বা কার্য্য করে, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে- দুঃখও তাহাকে সেইরূপ অনুসরণ করে।

রবীন্দ্রনাথঃ মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জন্ম হল মনে-

দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভণে

দুঃখ তার পিছে ফিরে চক্রে যথা গোরুর পিছনে।।১

চারুচন্দ্রঃ মনই ধর্ম সমূহের পূর্বগামী, মনই ধর্ম-মধ্যে প্রধান পদার্থ, এবং ধর্ম মন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যদি কেহ যদি কেহ নির্মলান্তঃকরণে কথা কহেন, কিংবা কার্য্য করেন, তবে সুখ তাহাকে সর্বদা ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।

রবীন্দ্রনাথঃ মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জন্ম হল মনে-

যে জন প্রসন্ন মনে কাজ করে কিম্বা কথা ভণে

সুখ তার পিছে ফিরে ছায়া যথা কায়ার পিছনে।।২

চারুচন্দ্রঃ (লোকে) আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল (বিচার, মিথ্যাসাক্ষ্য বা দোষ অস্বীকার দ্বারা)

আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এই চিন্তা যাহারা সর্বদা মনে পোষণ করে, তাহাদের বৈরভাব (ক্রোধ) কখনই শান্ত হয় না।

রবীন্দ্রনাথঃ আমারে রুষিল, আমারে মারিল,

আমারে জিনিল, আমার কাড়িল-

এ কথা যে জনে বেঁধে রাখে মনে

বৈর তাহার কেবলই বাড়িল।। ৩

চারুচন্দ্রঃ আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে

স্থান দেয় না, তাহাদের বৈরভাব দূর হইয়া যায়। ৪

রবীন্দ্রনাথঃ আমারে রুষিল, আমারে মারিল,

আমারে জিনিল, আমার কাড়িল-

এ কথা যে জনে নাহি বাঁধে মনে

বৈর তাহার ছাড়িল ছাড়িল।। ৪

চারুচন্দ্রঃ ইহ জগতে শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা কখনই দমন করা যায় না, পরন্তু শত্রুতা শূন্যতা(অক্রোধ) দ্বারা ইহাকে দমন করা যায়; ইহাই

সনাতন ধর্ম। ৫

রবীন্দ্রনাথঃ বৈর দিয়ে বৈর কত শান্ত নাহি হয়,

অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্মের কয়।।৫।।

চারুচন্দ্রঃ মূর্খ ব্যক্তিরা জানেনা যে, 'আমরা চিরকাল ইহ-সংসারে থাকিব না।' যাহারা তাহা জানেন, তাহাদের সকল কলহ থামিয়া যায়। ৬

রবীন্দ্রনাথঃ হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে,

বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে।।৬

চারুচন্দ্রঃ যে ব্যক্তি কেবল বাহ্য শোভা অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় না, ইন্দ্রিয় সকল সুসংযত রাখেন, যে পুরুষ অমিতাহারী, অলস, হীনবীর্য্য(উৎসাহ হীন), দুর্ব্বল বৃক্ষকে বায়ু যেমন পরাহত করে, মার তাহাকেও সেইরূপ পরাহত করে। ৭

রবীন্দ্রনাথঃ শরীরের শোভা খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত,

ভোজনে রাখেনা মাত্রা বীর্যহীন অলস সতত,

ঝড়ে যথা বৃক্ষ হানে, মার তারে মারে সেইমত।। ৭

চারুচন্দ্রঃ যে ব্যক্তি কেবল বাহ্য শোভা অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, ইন্দ্রিয় সকল সংযত রাখে না, আর যিনি মিতাহারী, শ্রদ্ধাবান এবং কর্মঠ, বায়ু যেমন শিলাময় পর্ব্বত কে পরাহত করতে পারেনা, মারও তাহাকে সেইরূপ প্রতিহত করিতে পারেনা। ৮

রবীন্দ্রনাথঃ অঙ্গশোভা নাহি খোঁজে ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত,

ভোজনের মাত্রা বোঝে শ্রদ্ধাবান কর্মঠ নিয়ত,

মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্ব্বতের মত।। ৮

চারুচন্দ্রঃ যে ব্যক্তি, কামরাগাদি-দোষমুক্ত হইয়াও কাষায় বস্ত্র পরিধান করে, দমহীন ও সত্যহীন সে ব্যক্তি, কখনই কাষায় বস্ত্র পরিধানের উপযুক্ত নয়। ৯

রবীন্দ্রনাথঃ দমহীন সত্যহীন অন্তরে কামন

গেরুয়া কাপড় তার শুধু বিড়ম্বনা।। ৯

চারুচন্দ্রঃ যিনি কামরাগাদিদোষশূন্য এবং শীলসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত, দান্ত ও সত্যবান_ সে ব্যক্তি অবশ্যই কাষায় বস্ত্র পরিধানের উপযুক্ত। ১০

রবীন্দ্রনাথঃ নিষ্কাম, সুশীল, দম সত্য যার মাঝে

গেরুয়া কাপড় পরা তাহারেই সাজে।। ১০

চারুচন্দ্রঃ যাহারা অসার বস্তুকে সার বিবেচনা করে এবং সারকে অসার বিবেচনা করে, মিথ্যাদৃষ্টির প্রশয়দাতা- সেই ব্যক্তি কখন সার প্রাপ্ত হয় না। ১১

রবীন্দ্রনাথঃ অসারে যে সার মানে সারে যে অসার।

মিথ্যা কল্পনায় সার নাহি জোটে তার। ১১

চারুচন্দ্রঃ কিন্তু যাঁহারা, সারকে সার পদার্থ বলিয়া জানেন এবং অসারকে অসার বলিয়া জানেন, সম্যক সঙ্কল্পের প্রশয়দাতা- সেই সকল ব্যক্তিই, সার (পদার্থ) প্রাপ্ত হয়েন। ১২

রবীন্দ্রনাথঃ সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার,

সত্য সঙ্কল্পের কাছে সার মিলে তার।। ১২

চারুচন্দ্রঃ যে গৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত নহে, অর্থাৎ ছিদ্রযুক্ত, তাহাকে ভেদ করিয়া যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করে- যে চিত্ত ভাবনারহিত (ধ্যানপরায়ণতাহীন) তাহাতেও সেইরূপ আসক্তি (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) প্রবেশ করে। ১৩

রবীন্দ্রনাথঃ ভাল ছাওয়া না হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে,

সতর্ক না হলে মন বাসনায় ধরে। ১৩

চারুচন্দ্রঃ যে গৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত, তাহাকে ভেদ করিয়া যেমন বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারেনা- যে চিত্ত ভাবনায়ুক্ত, তাহাতেও সেইরূপ আসক্তি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ১৪

রবীন্দ্রনাথঃ ভাল ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা,

সতর্ক যে মন তারে কী করে বাসনা। ১৪

চারুচন্দ্রঃ যে পাপ করে, তাহাকে ইহলোকে পরলোকে (উভয়-লোকেই) শোক করিতে হয়। সে আপনার ক্লিষ্ট কর্ম বা মলিন কর্ম দর্শন করিয়া শোক করে ও অত্যন্ত কষ্ট পায়। ১৫

রবীন্দ্রনাথঃ হেথা মরে শোকে, সেথা মরে শোকে,

পাপকারী দুখ পায় দুইলোকে-

ব্যাথা বাজে তার হেরি আপনার

মলিন কর্ম আপনার চোখে।। ১৫

চারুচন্দ্রঃ যিনি পুণ্যকর্ম করেন- তিনি ইহলোকে পরলোকে (উভয়লোকেই) আনন্দ লাভ করেন। তিনি আপনার কর্মের (পবিত্রতা) পূণ্যফল দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হন। ১৬

রবীন্দ্রনাথঃ হেথা সুখ তার সেথা সুখ তার

দুই লোকে সুখ পুণ্যকর্তার-

সে যে সুখ পায় বহু সুখ পায়

শুদ্ধকর্ম হেরি আপনার।। ১৬

চারুচন্দ্রঃ যে পাপ করে, (সে আপনার কৃত কর্মের ফলভোগ করে) সে ইহলোকে পরলোকে- উভয় লোকেই তাপ প্রাপ্ত হয়। 'আমি পাপ করিয়াছি' এই চিন্তা করিয়া সে (ইহলোকে) তাপ প্রাপ্ত হয়, এবং দুর্গতি লাভ করিয়া পুনরায় তাপ প্রাপ্ত হয়। ১৭

রবীন্দ্রনাথঃ হেথা পায় তাপ, সেথা পায় তাপ

দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ।

'এই মোর পাপ' এই ব'লে তাপ,

দুর্গতি পেয়ে সেও পরিতাপ।। ১৭

চারুচন্দ্রঃ যে পুণ্য কৰ্ম করে- সে ইহলোকে পরলোকে- উভয় লোকেই আনন্দ লাভ করে। ‘আমি পুণ্যকৰ্ম করিয়াছি’ এই চিন্তা করিয়া, সে (ইহলোকে) আনন্দলাভ করে এবং সুগতি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় আনন্দ প্রাপ্ত হয়। ১৮

রবীন্দ্রনাথঃ হেথা আনন্দ সেথা আনন্দ,

দুই লোকে সুখী পুণ্যবন্ত।

‘পুণ্য করেছি’ বলে আনন্দ,

সুগতি লভিয়া পরমানন্দ।। ১৮

চারুচন্দ্রঃ যেমন কোন গোপ, অন্য ব্যক্তির(বহুসহস্র) গাভী গণনা করিয়াও, তাহার অধিকারী হইতে পারেনা, সেরূপ যে ব্যক্তি(ভিক্ষু) অনেক শাস্ত্র অর্থাৎ যে ব্যক্তি (ভিক্ষু) অনেক শাস্ত্র অর্থাৎ বুদ্ধবচন আবৃত্তি করেন বা শিক্ষা দেন অথচ প্রমত্তাবশতঃ তাঁহার অনুযায়ী কার্য্য করেননা (অর্থাৎ অনিত্য, দুঃখ ও অন্যায় ভাবনা করেন না) তিনিও কখন শ্রামণ্যের (বুদ্ধশিষ্যত্বের) অধিকারী হইতে পারেনা। ১৯

রবীন্দ্রনাথঃ যে কহে অনেক শাস্ত্রবচন

কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি-

অপরের গরু গণিয়া গোয়াল

হয় কি সেজন শ্রেয়ের ভাগী।। ১৯

চারুচন্দ্রঃ যিনি অল্পমাত্র শাস্ত্র আবৃত্তি করিতে পারেন, এবং সেই সকল শাস্ত্রবাক্য জীবনে পালন করেন এবং রাগ, দ্বেষ, মোহও ত্যাগ করিয়া সম্যক জ্ঞান লাভ পূর্বক বিমুক্তচিত্ত হইয়া উপাদানহীন হইতে পারেন, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে শ্রামণ্যের ভাগী হন। ২০

রবীন্দ্রনাথঃ অল্পই কহে শাস্ত্রবাক্য,

ধর্মের পথে করে বিচরণ

রাগ দোষ মোহ করি পরিহার

জ্ঞানসমাপ্ত বিমুক্তমন-

বিষয়হীন ইহপরলোকে

কল্যাণভাগী হয় সেইজন।। ২০

অপ্রমাদবগ্গো/ অপ্রমাদবর্গ

চারুচন্দ্রঃ অপ্রমাদ; অমৃতের পদস্বরূপ। প্রমাদ, মৃত্যুর পথস্বরূপ। অপ্রমত্ত (অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণে তৎপর) ব্যক্তিগণ কখনও মরেন না, আর প্রমত্তব্যক্তিগণ মৃতস্বরূপ। (অলস ও প্রমত্ত ভিক্ষুগণ মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অধীন), এই সত্য যাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া অপ্রমাদপরায়ণ হইয়াছেন এবং আর্য্যগণের জ্ঞানে বিহার করেন, ধ্যাননিষ্ঠ সতত-চেষ্টায়ুক্ত (উদ্যমশীল) এবং নিত্য দৃঢ়পরাক্রম সেই সকল ধীর ব্যক্তিগণ, পরা শান্তিরূপ নির্বাণ (অর্হত্ত্ব) লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথঃ অপ্রমাদ অমৃতের, প্রমাদ মৃত্যুর পথ-

অপ্রমত্ত নাহি মরে, প্রমত্ত সে মৃতবৎ।। ১

অপ্রমাদ করে বলে পণ্ডিত তা মনে রাখি

অপ্রমাদে সুখে রন জ্ঞানীর গোচরে থাকি।। ২

ধ্যাননিষ্ঠ ধীরগণ নিত্য দৃঢ়পরাক্রম

নির্বাপ করেন লাভ যোগক্ষেম মহোত্তম।। ৩

চারুচন্দ্রঃ যিনি সতত জাগরিত, স্মৃতিমান, এবং পবিত্রকর্মা, যিনি বিশেষ বিচারপূর্বক কার্য্য করেন, সংযতেন্দ্রিয় এবং ধর্মপরায়ণ, অপ্রমাদী

সেই পুরুষের যশঃ বর্দ্ধিত হয়। ৪

রবীন্দ্রনাথঃ স্মৃতিমান, শুচিকর্ম, সাবধান, জাগ্রত, সংযত

ধর্মজীবী, অপ্রমত্ত- যশ তাঁর বেড়ে যায় কত।। ৪

চারুচন্দ্রঃ জাগরিত, অপ্রমত্ত, সংযত এবং দান্ত হইয়া মেধাবী পুরুষ, আপনার জন্য এরূপ দ্বীপ (রক্ষাস্থল) প্রস্তুত করিতে পারেন, যাহাকে

জলপ্রবাহও প্রতিহত করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথঃ জাগরণে অপ্রমাদে সংযমনিয়ম দিয়ে ঘিরে

মেধাবী রচেন দ্বীপ, বন্যা ঠেকে যায় তার তীরে।। ৫

চারুচন্দ্রঃ বালস্বভাব মূর্খ ও দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ, (যাহারা পারলৌকিক মুক্তির জন্য পুরাকার্য্যের অনুষ্ঠান করে না), প্রমাদের অনুসরণ করে। কিন্তু

বুদ্ধিমানেরা অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায় যত্নের সহিত রক্ষা করেন।

রবীন্দ্রনাথঃ মূঢ় সে জড়ায় পায়ে প্রমাদের ফাঁদ

জ্ঞানী শ্রেষ্ঠধন বলি রাখে অপ্রমাদ।। ৬

চারুচন্দ্রঃ কখন প্রমাদের অনুসরণ করিবে না, এবং কাম ও রতি সঙ্কোচে আসক্ত হইবে না। অপ্রমত্ত ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ, বিপুল সুখ

(মুক্তি বা নির্বাপন) লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথঃ মোজো না প্রমাদে পড়ি ভজনা কোরো না কামরতি-

বহুসুখ পান তিনি অপ্রমত্ত, ধ্যানে যার মতি।। ৭

চারুচন্দ্রঃ যেমন জ্ঞানী ব্যক্তি, অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে দূরীভূত করেন, সেইরূপ শোকহীন ব্যক্তি প্রজ্ঞারূপ উচ্চপ্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া,

পর্বতশিখরস্থ ধীর ব্যক্তি যেরূপ ভূমিস্থিত মূর্খের প্রতি অবলোকন করেন, তিনিও সেইরূপ শোকশীল মানবগণের প্রতি অবলোকন করেন।

রবীন্দ্রনাথঃ জ্ঞানী অপ্রমাদবলে প্রমাদে ফেলি দিয়া দূরে

প্রজ্ঞার প্রাসাদ হতে অশোক হেরেন শোকাভূলে,

গিরি হতে ধীর যথা দেখেন ভূতলে যারা ঘুরে।। ৮

চারুচন্দ্রঃ যেমন শীঘ্রগামী অশ্ব দুর্বল অশ্বকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রমত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অপ্রমত্ত থাকিয়া এবং নিদ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে জাগরিত থাকিয়া (ধর্মমার্গে) অগ্রগামী হন। ৯

রবীন্দ্রনাথঃ অমত্ত জাগ্রত ধায়,

সুপ্ত মত্তজনে পড়ে থাকে নীচে-

দ্রুত অশ্ব যেইমত দুর্বল অশ্বেরে

ফেলে যায় পিছে।। ৯

চারুচন্দ্রঃ মঘব ইন্দ্র, অপ্রমাদদ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন। প্রমাদ সর্বদাই নিন্দিত হইয়া থাকে। ১০

রবীন্দ্রনাথঃ অপ্রমাদে ইন্দ্রদেবে হয়েছেন দেবতার সেরা-

অপ্রমাদে তুষে সবে, প্রমাদে দুশেন পণ্ডিতেরা।। ১০

চারুচন্দ্রঃ যে ভিক্ষু, অপ্রমাদপরায়ণ ও প্রমাদকে ভয় করেন, তিনি অগ্নির ন্যায়, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত বন্ধন (দশবিধ ইন্দ্রিয়বন্ধন), দগ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হয়েন। ১১

রবীন্দ্রনাথঃ প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত

পুড়িয়ে সে চলে যায় স্থূল সূক্ষ্ম বন্ধ যত।। ১১

চারুচন্দ্রঃ যে ভিক্ষু, অপ্রমাদপরায়ণ এবং প্রমাদে ভয়দর্শী, তিনি কখন ধর্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন না, এবং তিনি নির্বাহকেরই নিকটবর্তী হন।

১২

রবীন্দ্রনাথঃ অপ্রমাদে রত ভিক্ষু প্রমাদে যে ভয় পায়

ভ্রষ্ট নাহি হয় কভু- নির্বাহকের কাছে যায়।। ১২

চিত্তবগ্গো/ চিত্তবর্গ

চারুচন্দ্রঃ যেমন কোন বাণপ্রস্তুতকারী বাণকে সোজা করিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার স্পন্দনশীল, (কায়িক সৌন্দর্য্যে মত্ত) চঞ্চল, দুরক্ষ্য এবং দুর্নিবার্য্য চিত্তকে সরল করেন (অর্থাৎ নিজ বশে আনয়ন করেন)। ১

রবীন্দ্রনাথঃ যে মন টলে, যে মন চলে, যাহারে ধরে রাখা দায়,

মেধাবী তারে করেন সিধা ইষুকারের তীরের প্রায়।। ১

চারুচন্দ্রঃ যেমন জল হইতে উদ্ধৃত এবং স্থলে প্রক্ষিপ্ত মৎস্য ছটপট করিতে থাকে, সেইরূপ পঞ্চকামগুণ বিনির্মুক্ত চিত্ত মারের রাজ্য অতিক্রম করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথঃ এই-যে চিত্ত আকুল নিত্য মারে বাঁধন কাটিতে-

জলের পদ্ম কে যেন সদ্য উপাড়ি তুলেছে মাটিতে।। ২

চারুচন্দ্রঃ দুর্নিগ্রহ, লঘু এবং যথেষ্ট বিচরণশীল চঞ্চল চিত্তকে দমন করাই ভাল; (কারণ) সংযত চিত্ত সুখ প্রদান করে।

রবীন্দ্রনাথঃ চপল লঘু অবশ চিত্ত যেখানে খুশি পড়ে-

সুখে সে রহ, এওমন মন দমন যেরা করে।। ৩

চারুচন্দ্রঃ দুর্বোধ্য, কুটিল এবং যথেষ্টগমনশীল মনোবৃত্তির প্রতি বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্বদা লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; (কারণ), সুরক্ষিত চিত্ত সুখ (নির্ব্যাগানন্দ) প্রদান করে। ৪

রবীন্দ্রনাথঃ নহে সে সোজা, যায় না বোঝা, যেখানে খুশি ধায়,

মেধাবী তারে রক্ষা করে তবেই সুখ পায়।। ৪

চারুচন্দ্রঃ যে সকল ব্যক্তি দূরগামী; একাচারী, অশরীরী; এবং (হৃদয়-রূপ) গুহাশায়ী চিত্তকে সংযত করিবেন, তাঁহারা মারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। ৫

রবীন্দ্রনাথঃ দূরে যায়, একা চরে, অশরীর থাকে সে গুহায়-

হেন মন বশে রাখে মৃত্যু হতে তবে রক্ষা পায়।। ৫

চারুচন্দ্রঃ যিনি অস্থিরচিত্ত, যিনি সত্যধর্ম অবগত নহেন, যাঁহার হৃদয় প্রসাদহীন, তাঁহার প্রজ্ঞা কখন পূর্ণতা লাভ করে না, অর্থাৎ তিনি কখন অর্হত্বের সম্যক ধারণা করিতে পারেন না। ৬

রবীন্দ্রনাথঃ অস্থির যাহার চিত্ত সত্যধর্ম হতে আছে দূরে,

হৃদয় প্রসাদহীন- প্রজ্ঞা তার কভু নাই পূরে।। ৬

চারুচন্দ্রঃ যাঁহার চিত্ত বাসনাবিহীন, যাঁহার মন কখন বিচলিত হয় না, যিনি পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিহার করিয়াছেন, তিনি জাগরিত থাকেন, তাঁহার কোনই ভয় নাই। ৭

রবীন্দ্রনাথঃ বাসনাবিমুক্ত চিত্ত অচঞ্চল পুণ্যাপাহীন-

কোনো ভয় নাই তার জাগিয়া সে রহে যত দিন।। ৭

চারুচন্দ্রঃ এই দেহকে কুন্ডের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর জানিয়া এবং এই চিত্তকে দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া, প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র দ্বারা মারের সহিত যুদ্ধ করিবে, এবং তাহাকে জয় করিয়া আসক্তিশূণ্য হইয়া সর্বদা আপনাকে রক্ষা করিবে। ৮

রবীন্দ্রনাথঃ কুস্তুর মতো জানিয়া শরীর নগরের মতো বাঁধিয়া চিত্ত

প্রজ্ঞা -অস্ত্রে মারিবে মরনে, নিজের যতনে বাঁচাবে নিত্য।। ৮

চারুচন্দ্রঃ হায়! এই শরীর ঘৃণিত ও বিজ্ঞান (চেতনা) হীন হইয়া, একখানি অকিঞ্চিৎকর কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অবলম্বে ভূতলে পড়িয়া রহিবে। ৯

রবীন্দ্রনাথঃ অচিরে এ দেহখানা তুচ্ছ জড় কাঠি

মাটিতে পড়িয়া হায় হয়ে যায় মাটি।। ৯

চারুচন্দ্রঃ একজন হিংসাকারী অপরের, কিংবা একজন শত্রু অপর শত্রুর যত ক্ষতি করিতে পারে, বিপথগামী (দশ অকুশল কর্মপথগামী)

চিত্ত মনুষ্যের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথঃ শত্রু সে শত্রুতা করে যত, যত দ্বেষ করে তারে দ্বেষী-

মিথ্যা লয়ে আছে যেই মন, আপনার ক্ষতি করে বেশি।। ১০

চারুচন্দ্রঃ সম্যক পরিচালিত চিত্ত (দশকুশল কর্মানুষ্ঠান দ্বারা পরিশুদ্ধ) মনুষ্যের যেরূপ উপকার করে, মাতাপিতা কিংবা অন্য কোন আত্মীয়

সে রূপ করিতে পারেন না। ১১

রবীন্দ্রনাথঃ মাতাপিতা জ্ঞাতিবন্ধুজনে যত তার করে উপকার-

সত্যে যার বাঁধা আছে মন বেশি শ্রেয় করে আপনার।। ১১

পুণ্ড্রবগ্নো/ পুষ্পবর্গ

চারুচন্দ্রঃ কে এই পৃথিবী জয় করিবে এবং যমলোক ও দেবলোক জয় করিবে? নিপুণ মালাকারের পুষ্প নির্বাচনের ন্যায় কে সুপ্রদর্শিত

ধর্মের পথ (ধর্মপদ) অবগত হইবে?

রবীন্দ্রনাথঃ কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক আর দেবনিকেতন-

ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুনিয়া ফুলের মতন।। ১

চারুচন্দ্রঃ শৈক্ষ্য (অর্থাৎ সপ্ত আর্ষশ্রাবক) এই পৃথিবীকে জয় করবেন; যেমন নিপুণ মালাকার উত্তম পুষ্প বাছিয়া লয়, সে রূপ তিনিও সুদেখিত

ধর্মপদ(ধর্মবাক্য) অবগত হইবেন। ২

রবীন্দ্রনাথঃ শিষ্য জিনিয়া লইবে পৃথিবী যমলোক আর দেবনিকেতন

নিপুণ শিষ্য ধর্মের পদ চুনিয়া লইবে ফুলের মতন।। ২

চারুচন্দ্রঃ যিনি এই শরীরকে ফেণের ন্যায় ক্ষণবিক্ষণসী জানেন এবং ইহাকে মরীচিকার ন্যায় রূপযুক্ত, অথচ মিথ্যা বিবেচনা করেন, তিনি

মারের বিমান ছিন্ন করিয়া(জীবের তিন প্রকার অবস্থা অর্থাৎ কায় কেশ ও বিপাক বিনাশ করিয়া) মৃত্যুরাজের দর্শন বহির্ভূত হয়েন (নির্বাণ লাভ করেন)। ৩

রবীন্দ্রনাথঃ ফেনের মতন জানিয়া শরীর, মরীচিকাসম বুঝিয়া তারে,

ছিঁড়ি মদনের পুষ্পশায়ক মৃত্যুর চোখ এড়ায়ে যারে।।৩

চারুচন্দ্রঃ যেমন বন্যা কোন সুগুণ্যকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি (কামনারূপ) পুষ্পচয়নকারীর মত ও রূপাদিতে ব্যাসজুড়িত মনুষ্যকে

মৃত্যু অধিকার করিয়া থাকে। ৪

রবীন্দ্রনাথঃ সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়

বন্যায় যেন সুগুপ্তানী মৃত্যু তাহারে ভাসিয়ে লয়।।৪

চারুচন্দ্রঃ অন্তক, রূপাদিতে ব্যাসজুড়িত মনুষ্যকে, (কামনারূপ) পুষ্পচয়নকারীর মত বাসনা তৃপ্ত না হইতেই, বশীভূত করিয়া থাকে। ৫

রবীন্দ্রনাথঃ সুখের কুঞ্জে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনাময়

না পুরিতে তার তৃষা বাসনার মরণ তাহারে ছিনিয়া লয়।। ৫

চারুচন্দ্রঃ ভ্রমর যেমন পুষ্পের, বর্ণ কিংবা তাহার গন্ধ নষ্ট না করিয়া কেবল মধু আহরণ করিয়া পলাইয়া যায়, মুনিগণও গ্রামমধ্যে (লোকালয়ে)

সেইরূপ ভাবে বিচরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথঃ বরণ-সুবাস না করিয়া হানি

ভ্রমর যেমন ফুলরস টানি

যায় সে উড়ে,

সেইমত যত জ্ঞানীমুনিজন

সংসারমাঝে করি বিচরণ

পালান দূরে।। ৬

চারুচন্দ্রঃ পরের পরুষ বা মর্ষচ্ছেদক বাক্যে মনোনিবেশ করিবে না। কিংবা পরে কি করিয়াছে বা করে নাই (সাধু ব্যক্তি) তাহা দেখিবেন

না, আপনি কি করিয়াছেন বা করেন নাই (প্রব্রজিতের) তাহাই দেখা উচিত। ৭

রবীন্দ্রনাথঃ পর কী বলেছে কঠিন বচন পর কি করে বা না করে-

তাহে কাজ নাই, তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখো রে।। ৭

চারুচন্দ্রঃ যেমন সুন্দর বর্ণযুক্ত মনোহর পুষ্প গন্ধহীন হইলে নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ সুভাষিত বাক্য কার্য্যে পরিণত না হইলে গন্ধহীন সুন্দর

বর্ণযুক্ত পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল হয়। ৮

রবীন্দ্রনাথঃ যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে গন্ধ না যদি জাগে

তেমনি বিফল বাণী কাজে যদি নাহে লাগে।। ৮

চারুচন্দ্রঃ যেমন কোন সুন্দর রঙ্গীন মনোহর পুষ্প সুগন্ধযুক্ত হইলে উহা সফল হয়, সেইরূপ উত্তম (সুভাষিত) বাক্য (সুগন্ধপুষ্পের ন্যায়)

যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইলেই সফল হয়। ৯

রবীন্দ্রনাথঃ যেমন রঙিন সুন্দর ফুলে গন্ধও যদি থাকে

তেমনি সফল উত্তম বাণী কাজে খাটাইলে তাকে।। ৯

চারুচন্দ্রঃ যেমন রাশিকৃত পুষ্প হইতে অনেক প্রকার মালা গাঁথা যাইতে পারে, তেমনি যে মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার দ্বারা অনেক সংকল্প সাধিত হওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথঃ ফুলরাশি লয়ে যথা নানামত মালা গাঁথে মালাকর

তেমনি বিবিধ কুশলকর্ম রচনা করিবে নর।। ১০^{৩৫}

আমরা একটু আগেই রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক সমালোচনা ‘পদ্ধতি’ নিয়ে কথা বলেছি। সরাসরি আর কোনো ধর্মগ্রন্থও তিনি অনুবাদ করেননি, একমাত্র ‘ধম্মপদ’। সমালোচনাটিতেও তিনি চারুচন্দ্রের অনুবাদ অপেক্ষা অনেক বেশি কথা বলেছেন, ‘ধম্মপদ’ বইটি নিয়েই। কেন ‘ধম্মপদ’ তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ? তার একটি কারণ ধর্ম বলতে তিনি যে, ‘সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র’ বুঝতেন, ধর্মপদকেই তার একমাত্র আধার মনে করেছেন। এছাড়াও বলেছেন-

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে, ‘ধম্মপদং’ তাহার একটি...এই গ্রন্থে যে সকল উপদেশ আছে তাহা সমস্তই বুদ্ধের রচনা কি না নিঃসংশয়ে বলা কঠিন;... বুদ্ধ এইগুলি চতুর্দিক হইতে সহজে আকর্ষণ করিয়া আপনার করিয়া, সুসম্বন্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিরন্তনরূপে স্থায়িত্ব দিয়া গেছেন- ...ধর্মগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন তাঁহারা যে ফললাভ করিবেন এখানে তার আলোচনা করিতেছি না... সেইজন্য আমরা ধম্মপদং গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা তার সহিত ভারতবর্ষের সংস্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া পাড়িয়াছি...এই ইতিহাসের বহুতরো উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই... (ধম্মপদং, পৃ ১৭৯)

এই ইতিহাসের সঙ্গে এর বিষয়কে মিলিয়ে পড়তেই তিনি আগ্রহী ছিলেন, এবং চারুচন্দ্র কে অনুরোধ করেছিলেন আরো অন্যান্য বৌদ্ধশাস্ত্রগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্য।

উপরের অনুবাদ গুলি লক্ষ্য করবো। চারুচন্দ্রের অনুবাদ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনেক বেশি প্রাঞ্জল, সহজ সরল সাধারণের বোধগম্য, যেমনটি বুদ্ধের উপদেশের অনুবাদের ক্ষেত্রে হওয়ার কথা। কারণ বুদ্ধ নিজে প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেন সকল সাধারণের বোধগম্যতার জন্য। ধম্মপদ ছন্দোবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদও; কিন্তু চারুচন্দ্রের অনুবাদ ছন্দোবদ্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে উপদেশ

দিয়েছেন ‘মূলের সঙ্গে একেবারে কথায় কথায় মিলাইয়া করিলে ভালো হয়।’ রবীন্দ্রনাথ কী নিজেও অনুবাদ করার সময় তা মেনে চলেছেন?

‘যুগ্মবর্ণের’ যে যুগ্মভাব দুটি শ্লোকের মধ্যে, বেশিরভাগ জায়গাতেই চারুচন্দ্রের অনুবাদে তা রক্ষিত হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এর ‘যুগ্ম’ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন।

এখানে ৯ এবং ১০ এই দুটি মিলে যুগ্মবর্ণ তৈরি করেছে, ‘কাষায়’ (কাষায় একাধিক বর্ণের হয়- হলুদ, গেরুয়া এবং লাল; কোথাও কোথাও সজ্জের পদমর্যাদা অনুযায়ী এই নানা রঙের কাষায় বস্ত্র পরার চল আছে), শব্দটি প্রকৃত পালি শ্লোকেও বলা আছে, কাষায় শব্দটি বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি শব্দ। সেই অর্থে চারুচন্দ্রের অনুবাদ অনেকটাই মূলানুগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে বদলে করেছেন, ‘গেরুয়া কাপড়’। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ত্যাগ বা বৈরাগ্যের রঙ গেরুয়া, প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু ধর্ম, সহজিয়া ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি- ‘গেরুয়া কাপড়’এ সকলেরই অধিকার। কাষায়ের বদলে গেরুয়া কাপড়, অর্থকে অনেক বেশি বিস্তৃত করেছে, আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের মনেও এই কথাটিই ছিলো।

এখানে ১৯ এবং ২০ এই দুটি যুগ্মবর্ণ। ধম্মপদে যেসব সামাজিক চিত্র পাওয়া যায় তাতে আমরা অবশ্যই সেইকালের একটি ইতিহাস সম্মত সমাজের ছবি তার প্রেক্ষাপট হিসেবে খুঁজে পাবো, এখানে গরুর পরিমাণে আসলে ধনের পরিমাপ এই মাপকাঠি সমাজে প্রচলিত ছিল এর পরিচয় আমরা পাবো, যেমনটি মহাভারতেও বিরাট রাজার গরু নিয়ে কৌরব এবং অজ্ঞাতবাসে থাকা পাণ্ডবদের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। কিন্তু সেবিষয়ে কথা বলার পরিসর আমাদের এই আলোচনায় কম। আমরা আবারও রবীন্দ্রনাথের শব্দ বদলে দেওয়ার ঝোঁকটি খেয়াল করব।

পালি শ্লোকে আছে ‘সামঞঃএঃস্’ শব্দটি, যার অর্থ ‘শ্রামণ’। চারুচন্দ্রের অনুবাদ ‘শ্রামণ’ ই; রবীন্দ্রনাথ শব্দটিকে বাদ দিয়ে করেছেন- ‘শ্রয়ের ভাগী’ এবং ‘কল্যাণভাগী’। আবারও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই নির্দিষ্টরূপে যুক্ত শব্দটি মানুষের ধর্মের সঙ্গে হিতকর মানবতাবাদের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন।

চিত্তবর্ণের শ্লোকগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে চমৎকার কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই বর্ণের সমস্ত কবিতাতে ‘চিত্ত’ শব্দটি তার গতিপ্রকৃতিই মুখ্য প্রতিপাদ্য। ‘চিত্ত’ শব্দের একঘেঁয়েমি রবীন্দ্রনাথের

অনুবাদে- মন, চিত্ত, চিত; বৈচিত্র্যপূর্ণ। পালি শ্লোকে এবং চারুচন্দ্রের অনুবাদে ২ নং কবিতাতে উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাছের কথা; জল ছাড়া মাছের মত চিত্তের আকুলতা। লক্ষ্যণীয় বহু ব্যবহৃত ‘চিত্তপদ্ম’ অর্থাৎ চিত্তের সঙ্গে পদ্মের তুলনাই রবীন্দ্রনাথ করেছেন, মাছের বদলে। আকুলতার বদলে তার অবস্থান এখানে প্রধান। চিত্তের অবস্থা সদ্য উপড়ানো পদ্মের মতো।

৯ নম্বর কবিতায় জড় কাষ্ঠখণ্ড রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে হয়ে গেছে- ‘মাটিতে পড়িয়া হয় হয়ে যায় মাটি’। পুষ্পবর্গে পুষ্প উপমা রূপে ব্যবহৃত। ৩ নং কবিতায় ‘মারের বিমান’ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে হয়েছে ‘মদনের পুষ্পশায়ক’- বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ণের ব্যঞ্জনকে আরও প্রসারিত করেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। ‘কবির ধর্মে’ মারের বদলে মদন করতে বাধা নেই।

আমরা দেখলাম, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ একেবারেই ‘মূলানুগ’ নয়। তিনি শুধু বৌদ্ধ বা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসী পাঠকের (অন্যান্য সাহিত্য সংস্করণের মতই এর লক্ষ্য পাঠক, যিনি ধর্ম নয় সাহিত্যরস গ্রহণ করবেন) কথা মাথায় রেখে এই অনুবাদ করেননি। তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা তিনি ‘ধম্মপদং’ প্রবন্ধেই বলেছেন; সেকথা আমরা আগেই বলেছি। ‘ধম্মপদে’ সমস্ত মানবতার পক্ষে হিতকর কথাগুলিই বলা আছে, বলা আছে সর্ববিষয়ে সংঘমের কথা, মানুষে মানুষে শত্রুতা নয় অবৈরিতা দিয়ে প্রেম দিয়ে সহজ ভাবে একে অপরকে জয় করার কথা। রবীন্দ্রনাথের ‘মানুষের ধর্ম’ এর কথাগুলিও তাই। কিন্তু ধম্মপদের অনুবাদ তিনি সাহিত্য অনুরাগী পাঠকদের জন্যই করেছিলেন, উপদেশ দিতে নয়, তার অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে এর কোনো প্রকৃতিগত ভেদ নেই, তাই ধম্মপদ (অসম্পূর্ণ) অনুবাদ হয়েও মৌলিক। আমাদের আক্ষেপ থেকে যায়, সম্পূর্ণ অনুবাদ হলে বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও দেবতার মহিমার বাড়বাড়ন্ত না করে বাংলাভাষায় তার সাহিত্যগুণকে অক্ষুণ্ণ রেখে কীভাবে তথাকথিত ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ সম্ভব তার উজ্জ্বল নিদর্শন, ‘পদ্ধতি’ রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রত্যক্ষভাবে তৈরি হতে পারতো। যদিও এই অসম্পূর্ণ অনুবাদের ধারা থেকেও তা অন্যান্য পণ্ডিতের, সাহিত্যিকদের হাতে বিকশিত হতে পারতো, কিন্তু তা আর হয়নি, সে আমাদেরই অক্ষমতা। সাহিত্যে কোনো লোকহিতকর উপদেশ দেওয়া, নীতি

কথা বলা রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন না। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। ‘বাস্তব’ প্রবন্ধে বলেছেন-

কোনো দেশেই সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করেনা। কোনো দেশেই সাহিত্য ইঙ্কুল-মাস্টারির ভার নয় নাই।^{৩৬}

তাই তাঁর ‘ধম্মপদ’ কে তিনি সাহিত্য গুণ দিতেই তিনি বেশি মনযোগ দিয়েছেন, যার প্রমাণ প্রতিটি ছত্রে আছে।

সব সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে ধম্মপদের অত্যন্ত অল্প একটি অংশমাত্র তিনি অনুবাদ করেছেন; তাঁর অনুবাদ অসম্পূর্ণ। তাহলে কি তিনি বৌদ্ধসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন? উত্তর- না। বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে চর্চা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাঁর গঠনমূলক সমালোচনার স্বরূপের কথা আমরা আগে বলেছি। আমরা জানি “জাতীয় সম্পদ” বাংলা লোকসাহিত্য গুলি সংগ্রহ ও সংকলনের প্রকল্পের ভার তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রমুখের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। ঠিক তেমনি বা তার থেকেও বেশি উৎসাহ, আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বৌদ্ধসাহিত্য গুলি সংগ্রহ বা সেগুলির বঙ্গানুবাদ করার ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে তিনি নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁর পরিকল্পনা তাঁর ইচ্ছেমতো রূপায়িত হয়নি। রথীন্দ্রনাথের নিজের এ বিষয়ে খুব বেশি আগ্রহ ছিলোনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র সেন এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচীর বৌদ্ধসাহিত্য অনুরাগের সূত্রপাত মূলত রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই।

(৭)

বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য লেখেন পালিপ্রকাশ, পালিভাষার সুগম ব্যাকরণ পাঠ্যাবলী ও শব্দকোষ। রথীন্দ্রনাথকে পালিভাষায় পারদর্শী করে তোলার জন্যই রবীন্দ্রনাথে বিধুশেখরকে এই বই লিখতে অনুরোধ করেন, শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। ভূমিকায় আছে-

প্রায় সাত বৎসর পূর্ণ হইতে যাইতেছে, আমি কাশী হইতে এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যাপক হইয়া আগমন করি, তখন স্নেহস্পদ শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমান্ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই আশ্রমেই উচ্চশ্রেণীর পাঠ্যাসমূহ পড়িতেছিল,

এবং তাহাদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার আমার উপরে প্রদত্ত হইয়াছিল। পরম শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেইসময় আমাকে বলিয়াছিলেন ‘ভারতবর্ষের বৌদ্ধ যুগের ভালো ইতিবৃত্ত এখনও উদ্ধৃত হয় নাই, এবং তজ্জন্য কেহ সেইরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না, আমার ইচ্ছা আপনার ছাত্রদ্বয়কে আমি সেইদিকেই নিযুক্ত করিব। কিন্তু পালি সাহিত্য না জানিলে ঐ কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। অতএব আপনি পালি অধ্যয়ন করুন, এবং এরূপ একখানি ব্যাকরণ বাঙলায় লিখুন, যাতে আপনার ছাত্রদ্বয়কে আপনি সহজেই পালি শিক্ষা দিতে পারেন’। তদনুসারেই আমি পালি আলোচনা করিতে আরম্ভ করি ও ব্যাকরণখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হই।...

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া বিরত হইতে পারিনা; কেননা তাঁহারই প্রবর্তনা ও উৎসাহে আমি পালি-আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কথা ও পরামর্শ অনুসারে এই বইখানি রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পুস্তকালয়ে তিনি বিবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া না দিলে পুস্তকখানির রচনা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাঁহার সঙ্কল্পিত ব্যাকরণখানি আমার যথাশক্তি রচনা করিয়া আজ তাঁহাকে প্রদান করিতে পারিলাম বলিয়া মনে এক আনন্দ অনুভব করিতেছি। শ্রীমান রথীন্দ্র ও সন্তোষেরই পালি শিক্ষার জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এখন যদিও তাহাদের শিক্ষার গতি অন্যদিকে গিয়াছে, তথাপি যদি কখনো তাহারা ইহা দ্বারা ঐ ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে।^{৩৭}

১৯১১ সালে প্রকাশিত এই বইটির পরিকল্পনাতেও স্পষ্ট রবীন্দ্রনাথের ছাপ আছে। তাঁর পরিকল্পনা মত বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে নিমগ্ন হননি একথা সত্য কিন্তু রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের ‘আদেশে’ বুদ্ধচরিত অনুবাদ করতে শুরু করেন, কিন্তু ‘শিক্ষার গতি পরিবর্তন’ এর ফলে, আমরা বলতে পারি আগ্রহের অভাবে তিনি বইটি প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৪৪ (১৩৫১) সালে। এছাড়া বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে আর কোনো কাজও তিনি করেননি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনূদিত “অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত” বইটির ভূমিকায় জানা যায় ১৯৪২ পর্যন্ত হিন্দি ছাড়া আর অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বইটি ১৯০৫ এর কাছাকাছি সময়ে অনূদিত হলে এতদিন অপেক্ষা করতে হত না। বাংলা ভাষাই প্রথম অনুবাদের কৃতিত্ব পেত। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন-

আমার পিতৃদেবের আদেশে ১৯০৫ সালে বুদ্ধচরিত বাংলাভাষায় তর্জমা করিতে প্রবৃত্ত হই। তখন কেবলমাত্র কাওয়েল সাহেবের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সদ্য আবিষ্কৃত এই কাব্যখানি পড়িয়া তিনি প্রচুর আনন্দ পান ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে তর্জমা করিবার জন্য সে বইখানি দেন। আমাদের দুইজনের তখন ছাত্রাবস্থা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তখন কাহারও এত অধিকার ছিল না যে সাহস করিয়া এই কাজটি গ্রহণ করি। পিতৃদেবকে নিরুৎসাহ করিতে ইচ্ছা করিল না- তর্জমা করিতে লাগিয়া গেলাম। প্রথম তিন সর্গ তিনি নিজে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন...। কিন্তু অনুবাদটি প্রকাশ করার বাধা ঘটিল। অনেকগুলি শব্দের যথার্থ অর্থ বোধ করা তখন সম্ভব হয়

নাই। বহু বৎসর ধরিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণার ফলে এখন সেগুলি বোধগম্য হইয়াছে; অনুবাদের খাতাগুলি আমার নিকটেই অথন্ত্রে পড়িয়া রহিল।^{৩৮}

প্রায় চল্লিশ বছর পর চীনভবনের অধ্যাপক সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে তিনি অনুবাদ সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত বৌদ্ধসাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্যে তিনি চীন জাপান ও বিভিন্ন জায়গার পণ্ডিতদের শান্তিনিকেতনে নিয়া আসেন, চীনাভবনের নির্মাণ করেন। ফলে বৌদ্ধধর্মদর্শন-সাহিত্য সংক্রান্ত তাঁর প্রকল্প কতখানি বৃহৎ ছিল আমরা তা আন্দাজ করতে পারি। আমরা এই প্রকল্পের কথাই আমাদের এই আলোচনায় বলছি।

প্রবোধচন্দ্র সেন নামে ভবতোষ দত্তের বইটির সূচনায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রবোধচন্দ্র সেনকে(১৮৯৭-১৯৮৬) বলেছেন ‘রবীন্দ্রমননে মগ্ন’। এই বইটির ‘ইতিহাসচর্চা’ নামে অধ্যায়ে প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পর্কে, ভবতোষ দত্ত বলেছেন-

তিনি যখন ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বিশেষভাবে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লেন, তখনও তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই কয়টি দিককেই নানাভাবে তাঁর বিচার ও আলোচনার বিষয় করে নিয়েছিলেন। যেগুলি হচ্ছে বৌদ্ধআদর্শ ও অশোক, কালিদাস, রামায়ণ। ...বুদ্ধ এবং বুদ্ধের আদর্শ তাঁর কাছে আর যে-কোন আদর্শের থেকেই ছিল উঁচুতে।^{৩৯}

তিনি *Kapilesvar Version of Asoka's Rummindei Inscription- An Antipation*(Forward, 1929)লেখেন; তাঁর *অশোকের ধর্মনীতি* (১৩৫০শ্রাবণ), *অশোকের ধর্মনীতির পরিণাম*(১৩৫০ কার্তিক), *অশোকের ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি* (পূর্বাশা ১৩৫২ কার্তিক) বইগুলি পরে *ধর্মবিজয়ী অশোক* এ সংকলিত হয়। প্রবোধচন্দ্রের এই বুদ্ধভাবনাও ছিল ‘রবীন্দ্রমননে’ জারিত;-

...জাতি সম্প্রদায় সবকিছুর বাইরে উদারনীতিআশ্রিত ধর্মকে প্রবোধচন্দ্র ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বলে। এই ধর্ম যুক্তিনির্ভর সর্বমানবিক কল্যাণের অভিযুক্ত। ...এরকম ধর্মের লক্ষ্য একমাত্র মানুষ, ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

এই একই নৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবোধচন্দ্র বুদ্ধের ভক্ত। (তদেব, পৃ ৩৩)

১৩৬০ সালে *ধম্মপদ-পরিচয়* প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী থেকে। বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্মদর্শন এবং ধম্মপদের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বারবার রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষে ইতিহাসের দ্বারা এবং *ধম্মপদ* প্রবন্ধ দুটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।^{৪০}

এই প্রকল্পের রবীন্দ্রানুসারী আরেকজন হলেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬)। তাঁর লেখাপড়ার বিশেষ বিষয় ছিল, ধর্মশাখা। তাঁর জীবনী-পুস্তিকায় আছে-

প্রবোধচন্দ্রের তত্ত্বচিন্তা রবীন্দ্রাদর্শে প্রভাবিত। তিনি গবেষণার মাধ্যমে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যের রূপটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন যা তাঁর বিশ্বপ্রেমের আভাস দেয়।^{৪১}

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ, বৌদ্ধসাহিত্যকে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবেই গণ্য করেছেন। ইতিহাসের দৃষ্টিতে তার সঠিক ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণয়েই জোর দিয়েছেন, আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অনুপ্রাণিত যাঁদের কথা বলছি, তাঁরাও একইভাবে কে ব্যাখ্যা করেছেন, গবেষণা করেছেন। প্রবোধচন্দ্রের গবেষক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, নেপালে পর্বে তাঁর গবেষণা। ১৯২২ সালের ৬ জুন নেপাল থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ভারতবর্ষে গবেষণা নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণ। তা বৃথা। প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে গর্ববোধ করলেও আমরা প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ জানার চেষ্টাই করি না।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়- *Studies in the Tantras*, তাঁর *ভারত ও ইন্দোচীন* নামে বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন রবীন্দ্রনাথ; এর পর তিনি জাপানে গবেষণার কাজ শুরু করেন। সিনো ইন্ডিকার প্রকাশনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৭, ১৯২৯, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে যথাক্রমে *Le canon Bouddhique en Chine* বা *চীনদেশে বৌদ্ধ-শাস্ত্র* নামক দুখণ্ড, এবং দুখণ্ডে *Deux Lexiques Sanskrit Chinois* বা *সংস্কৃত চীনা অভিধান* প্রকাশিত হয়। এছাড়াও ১৯২৯ সালে নেপাল থেকে চর্যাগীতি বা বৌদ্ধগান দোহার পুথি গুলি আবিষ্কার করেন। শুধু সাহিত্য আবিষ্কার এবং তার ব্যাখ্যাই নয়, ভারতের দর্শনচর্চা ও ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মদর্শনের গুরুত্বও আলোচনা করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। উল্লেখ্য *Aspects of the Buddhist Mysticism in the Caryapadas, Some technical Terms of the Tantras, The Sandhabhasa & Sandhavaicana* ইত্যাদি। এই কর্মকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগের কথাও আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ যেমন এই প্রকল্পকে ভারতের ইতিহাস ও দর্শনচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে মনে

করেছিলেন প্রবোধচন্দ্রের কথাতেও আমরা তারই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করবো; “প্রবাসে বাংলা সাহিত্য” নামে বইয়ে তিনি লিখেছেন-

...এ দুর্দিনে আমরা যদি আমাদের অতীতের ওপরে শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনতে পারি, প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের মনের যোগসূত্র আবার সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করতে পারি তাহলে... আমরা আবার একটি আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হয়ে উঠব। (তদেব)

বিশ্বমৈত্রীর সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতাবাদের আদর্শে পৌঁছনোই এর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৪৫ সালে চীনাভবনের সিনো-ইণ্ডিয়ান স্টাডিজ এর অধ্যক্ষ হন। ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য হন। মাঝখানে আবার চীনে গিয়ে বৌদ্ধ সাহিত্য, গুফা গুলি নিয়ে গবেষণা করেন।

প্রবোধচন্দ্রের ভাষায়-

ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার যদি প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই হয়ে থাকে, তবে তার ইতিহাস সাহিত্য ও দর্শন উপেক্ষা করে নিজেদের আদর্শকেই যে ক্ষুণ্ণ করছি, সেকথা জোর করেই বলা চলে। বৌদ্ধধর্ম যে নূতন ভাবধারা বইয়ে দিয়ে ভারতের প্রাণকে রসময় করে তুলেছিল সে ধারা কোথায় কি ভাবে নূতন নূতন উৎসের সৃষ্টি করেছিল তা’ আমাদের জানতে হবে, নইলে ভারতের ইতিহাসে অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। (বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, পৃ ৩২)

আমরা এতক্ষণ ধরে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা দীক্ষিত হয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার কথা আলোচনা করলাম। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চীন, জাপান, সিংহল, মায়ানমারে গিয়ে এই চর্চা এবং গবেষণার কর্মকাণ্ডকে আরও ব্যপ্ত করেছেন। শুধু নিজে গেছেন, বা অন্যদের উৎসাহিত করেছেন তাই নয়, বিভিন্ন পণ্ডিতদের (সিলভ্যাঁ লেভি, লিন ও-চিয়াং, জোসেপ তুচ্চি প্রমুখ) দেশে এনে তাঁদের শিক্ষার মাধ্যমে অন্যদের শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। সুখাংশুবিমল বড়ুয়া তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি- তে, ব্রহ্মদেশ, সিংহলে, চীনে, দ্বীপময় ভারতে (মালয়, সুমাত্রা, জাভা বালি), শ্যামদেশে, জাপানে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্মদর্শন-স্থাপত্য প্রীতির বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। আমরা পুনরাবৃত্তি করে আর আলোচনাকে ভারাক্রান্ত করছি না। অথচ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত জ্ঞানচর্চার, আদান-প্রদানের পরিসরকে, বেশিরভাগ রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা গল্প কেমন করে, ‘হীন, সন্দেহজনক, অপর’ করে তুলেছে তা শেষ দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। তিনি এই বইয়ে বলেছেন-

আমাদের এই মন্তব্য অত্যুক্তি বলে মনে হয়না। কিন্তু পার্থক্য, আমাদের আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছি, বৌদ্ধধর্মকে তিনি বিশ্বাসীর মত গ্রহণ করেননি। যুক্তি তর্ক নিজস্ব ভাবনা দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। তাই তিনি প্রতিনিধি; কিন্তু শুধু বুদ্ধের নন, সমগ্র মানবতাপন্থীদের, তবে এই কবির ধর্মের ভিত্তি নিঃসন্দেহে বুদ্ধ, বৌদ্ধদর্শন। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ, ও বৌদ্ধদর্শন সংক্রান্ত প্রকল্প এখানে থামেনি। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখিয়েছি বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত প্রাচ্যের দেশগুলিতে ভ্রমণের সময় যে বার্তা তিনি দিয়েছেন তা মৌলিক। প্রাতিষ্ঠানিক, বিশ্বাসীর বৌদ্ধধর্মের কথা নয়, ‘কবির ধর্মের’ বার্তা; মানবতার বার্তা। এই বিষয়ে শ্রী সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, শ্রীমতি আশা দাশ বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখেছেন। বইগুলি এই আলোচনার তথ্যের ভিত্তি হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এঁরা সকলেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগকে কম-বেশি ‘ধর্মবিশ্বাসীর’ দৃষ্টিতে দেখেছেন। আশা দাশের মতে

উপনিষদের বাণীতে ও বৌদ্ধদর্শনে একদিন এই উচ্চতম আদর্শের চরম অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাহাই যুগোপযোগী ভাষায় পুনরুদ্গীত হইয়াছে।^{৪৩}

এই মতের একাংশের সঙ্গে সহমত ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-প্রকল্পের নির্মাণের ক্রম ও ব্যাখ্যা একটু ভিন্ন ভাবে এই আলোচনায় করার চেষ্টা করেছি। আশা দাশের উল্লিখিত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকা লিখেছেন রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ এতকিছু থাকতে বুদ্ধদেবের প্রতি আকৃষ্ট হলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আশা দাশের আলোচনার মধ্যে খুঁজতে গিয়ে বলেছেন-

রবীন্দ্রনাথ থেকে বারংবার উদ্ধৃতি দিয়ে ড. দাশ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রযুগে হিন্দুধর্ম রিচুয়াল সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল। তার প্রভাব থেকে কাটিয়ে উঠতেই রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের কাছে গিয়েছিলেন। ...রবীন্দ্রনাথের হিন্দুধর্মে অবস্থান মার্জিনাল, তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। তাই ঐ মার্জিনাল সংকীর্ণ জায়গা থেকে হিন্দুধর্মের রিচুয়াল বা অনুষ্ঠান সর্বস্বতা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেজন্যই তো তাঁর বৌদ্ধধর্মের কাছে যাওয়া! (তদেব)

এই যুক্তিকে একেবারেই মেনে নেওয়া যায়না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বারবার যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে সরে এসেছেন নিজের মতের স্বাভাব্য বোঝাতে। একই অবস্থান, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও। তাঁর রাজনীতি এবং মতাদর্শ প্রচারের পথ ভিন্ন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পথ থেকে সরে এসেছিলেন। তাঁর মনোভাবের কথা “ঘরে বাইরে” উপন্যাসে আছে তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তিনি রাজনীতি থেকে সরে আসেননি কখনই। তাঁর রাজনৈতিক মত প্রকাশের পদ্ধতি বদল করেছিলেন মাত্র। প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দু, উপনিষদ, ব্রাহ্ম বা বৌদ্ধ, সহজিয়া কোনোটিকেই তিনি একশ শতাংশ গ্রহণ করেননি। প্রাতিষ্ঠানিকতার বদলে তার মতাদর্শ সাবজেক্টিভ ‘কবির ধর্ম’ যার তাগিদ বিশ্বজনীন। ‘কবির ধর্ম’ই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান।

(৮)

রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের এতক্ষণের আলোচনা বিজ্ঞান, ও ইতিহাসসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মূল প্রভেদ এখানেই। তিনি ইতিহাস আর কল্পনাকে সচেতন ভাবে গুলিয়ে দিয়ে সবটাকেই ইতিহাস ও বাস্তব বানিয়ে তুলতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ দুটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছেন। বৌদ্ধধর্মের যেসব গোঁড়া প্রাতিষ্ঠানিক দিক, ধর্মবিশ্বাসের দিক সেগুলিকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা। অথচ বুদ্ধের মত একজন গুরুত্বপূর্ণ মানবতাবাদে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক মানব, ‘কবির ধর্মে’ মুখ হিসেবে একেবারেই সফল আদর্শ। সুতরাং ইতিহাস, তার চর্চা ও গবেষণাকে তাঁর অনুজদের ওপর খানিকটা ন্যস্ত করে দিয়ে কবি ফিরে এসেছেন আবারও কবিতায়(সাহিত্যে)। আর সাহিত্য ইতিহাস নয়, বিজ্ঞানও নয় সামাজিক ব্যবহারিক দৈনন্দিন বাস্তবতাও নয়। সাহিত্যে জরুরি কল্পনা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সাবজেক্টিভিটিও। তাই তিনি ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। ইতিহাসের বাস্তবতাকে রেখেছেন নিজের জায়গায় যার বর্ণনা এতক্ষন আমরা দিলাম। আর সাহিত্যিক বাস্তবতা নির্মাণ করেছেন অন্য ধারায়, দুই ধারাতেই তিনি সমান দক্ষ। বদলে দিয়েছেন বুদ্ধকে, বুদ্ধের ধর্মকে। প্রাতিষ্ঠানিকতা, অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে মৌলিক ভাবে নির্মাণ করেছেন, তাই অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম-বিশ্বাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ ঘটে গেছে। আর এই ধারাই রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে ও তার পরবর্তীকালে সাহিত্যে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারের ধারাকে পৃথক করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ‘ধর্ম’ ‘মতাদর্শ’ ‘রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা’ পরিভাষাগুলিতে তেমন ভেদ নেই। কারণ সবগুলিরই উদ্দেশ্য মানবতার স্বার্থে, জীবজগতের হিতার্থে। অথচ সমসাময়িক সময়, ক্ষমতার ইতিহাস তাকে একেবারেই বদলে ফেলছিল রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকেই প্রতিবাদের হাতিয়ার করেছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছিলেন সাহিত্যে, বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন ব্যবহার করে। পরবর্তীকালের স্রষ্টারাও এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। তার আগে রবীন্দ্র সাহিত্যের এই রাজনৈতিক চিহ্নগুলি খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধধর্ম, বুদ্ধকথাঃ রাজনৈতিক মতাদর্শ

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালে ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে-
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

(মংপু, বৈশাখ, ১৩৪৭)

রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিনে ‘জন্মদিনে’ নামের সংকলনটি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই সংকলনের ৬ নম্বর কবিতা এটি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্ব থেকে শেষ পর্যন্ত রবি শব্দের ব্যঞ্জনাকে

নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে, সূর্যোদয়, তাঁর প্রকাশ ও সূর্যাস্তের বিভিন্ন ইমেজারিকে তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন; জন্মদিনের বেশির ভাগ কবিতাতেও এই ছাপ আছে। এটি ছিলো তাঁর ৮০ বছরের জন্মদিন, বুদ্ধের জীবনকালও ৮০ বছরের- এই মিল তাঁর মনে ছিল। আমরা তাঁর জীবনের একেবারে শেষের লেখাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আগে ব্যবহার করেছি। বুদ্ধের প্রভাব তাঁর জীবনে কতখানি গভীর একথাই বলতে চেয়েছি। আধুনিক স্রষ্টারা অনেকেই কথকের জীবনের সঙ্গে বুদ্ধের জীবনকে মিলিয়ে, আত্মসমীক্ষা করেছেন বহু উপন্যাসে, গল্পে কবিতায়... এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী।

কল্যাণীশংকর ঘটক, আশা দাশ, পম্পা মজুমদার, সুধাংশুবিমল বড়ুয়া প্রমুখরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নাটকে, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে কোথায় কোথায় বুদ্ধ, জাতক, অবদানের প্রভাব আছে, বিবর্তন ঘটেছে, তার বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন। আমরা তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করবো না। আমাদের মন্তব্যগুলি উল্লেখ করবো। আলোচনার আগে বুদ্ধ-প্রসঙ্গে রচিত কবিতা ও নাটকের একটি তালিকা দেবো।

কবিতা

“কথা” সংকলনের ‘শ্রেষ্ঠভিক্ষা’(৫ কার্তিক, ১৩০৪), ‘পূজারিনী’ (১৮ আশ্বিন, ১৩০৬), ‘অভিসার’(১৯ আশ্বিন, ১৩০৬), ‘পরিশোধ’ (২৩ আশ্বিন, ১৩০৬), ‘সামান্যক্ষতি’(২৫ আশ্বিন, ১৩০৬), ‘মূল্যপ্রাপ্তি’ (২৬ আশ্বিন, ১৩০৬), ‘নগরলক্ষ্মী’ (২৭ আশ্বিন, ১৩০৬), ‘মস্তকবিক্রয়’ (২১ কার্তিক, ১৩০৪)।

“পুনশ্চ” র অন্তর্গত ‘শাপমোচন’(পৌষ, ১৩৩৮)।

“পরিশেষ” এর অন্তর্গত ‘বুদ্ধজন্মোৎসব’ (২১ ফাল্গুন, ১৩৩৩), ‘বোরোবুদুর’ (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭), ‘সিয়াম’ (১১ অক্টোবর, ১৯২৭), ‘বুদ্ধদেবের প্রতি’ (২৪ অক্টোবর, ১৯৩১), ‘প্রার্থনা’ (২৯ জুলাই, ১৯৩৩), সকলকলুষতামসহর (বৈশাখী-পূর্ণিমা, ১৩৩৮)।

“পত্রপুট” এর অন্তর্গত কবিতা সংখ্যা ১৭ (পৌষ, ১৩৪৪)।

“নবজাতক” এর ‘বুদ্ধভক্তি’ (৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮)

“জন্মদিনে” এর ৬ সংখ্যক কবিতা (বৈশাখ, ১৩৪৭)

নাটক

মালিনী(১৮৯৬), রাজা(১৯১০), অচলায়তন(১৯১২), গুরু(১৯১৮), অরুপরতন(১৯২০), নটীর পূজা(১৯২৬) শোধবোধ(প্রাসঙ্গিক উক্তি ১৯২৬), চণ্ডালিকা(১৯৩৩), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা(১৯৩৮), শ্যামা(১৯৩৯), শাপমোচন (কথিকা, ১৯৩১)

আমরা ‘কবির ধর্ম’ কেই তাঁর রাজনীতি বলতে চেয়েছি, এতক্ষণ ধরে আমাদের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন, সেটি আমাদের কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ -

আমার সৌভাগ্য যে অক্সফোর্ড বাসকালে দেখলাম রবীন্দ্রনাথকে ১৯৩০ সালে- বাইবেল-এর ঋষিমূর্তি নিয়ে হিবার্ট লেকচারস দিলেন,...সংবর্ধনা জানাতে গিয়ে মজলিশ-সভাপতি (উত্তরপ্রদেশের মুসলমান), বলে ফেলেনঃ ‘কবি, তোমাকে পেয়ে আমাদের কত আনন্দ কত গর্ব। কিন্তু দেশে আজ তুমুল লড়াই চলছে, আমাদেরও মন চঞ্চল, তুমি এখানে কেন? গান্ধীজির পাশে কি তোমার স্থান নয়?’ একটু আমাদের দিকে ঝুঁকে কবি বললেনঃ ‘আমার কোনো বই কাছাকাছি আছে? ছুটে গিয়ে একখণ্ড ‘চয়নিকা’... নিয়ে আসতে পেরেছিলাম। যেটি হাতে নিয়ে প্রথমে বললেনঃ ‘তোমরা বুঝবে না, কিন্তু গান্ধীজি জানেন আমার নিজস্ব হাতিয়ার নিয়ে একই লড়াইয়ে আমি রয়েছি, দেশ থেকে দেশান্তরে ভারতবর্ষের চারণ আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি’। আর পড়লেন দুঃসময় কবিতাটি।^{৪৪}

সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার ‘প্রতিনিধি’ কথাটির চেয়েও গভীর অর্থবহ তাঁর নিজের কথাটি, ‘ভারতবর্ষের চারণ আমি’। আর তাঁর রাজনৈতিক ‘নিজস্ব হাতিয়ার’ তাঁর সাহিত্য। সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার বইয়েই আমরা জানতে পারি, জাপানে গিয়ে তিনি সেখানেই তাদের আগ্রাসী বিধ্বংসী মানবতা বিরোধী, স্বৈরাচারী শাসনের তীব্র নিন্দা করেন। সেটি স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার আয়োজকদের ভালো লাগেনি। এমনই গভীর তার প্রভাব যে পরদিন কবিকে বিদায় সংবর্ধনা দিতেও কেউ আসেনি। তবুও কবি হার মানেননি। ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধেও জাপানের নিন্দা করেছেন।

কবির জীবনের শেষ পর্যায়ের লেখা “নবজাতক” এর কবিতাগুলি। আমাদের অবাক হতে হয় এর নামকরণে আর এই কবিতাগুলির কাব্যগুণের কাছে। এর মধ্যেই একটি কবিতা “বুদ্ধভক্তি”। ‘পত্রপুট’ সংকলনে কবিতাটির আরেকটি রূপ আমরা পাই, বিষয়বস্তু বাদে তার ছন্দ সজ্জা ভাষা ব্যবহার

সবই আলাদা। বুদ্ধভক্তি কবিতাটি পরিচয় পত্রিকায় পাঠিয়ে সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথকে ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮ এ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন-

বোমা-অর্ঘ্যদ্বারা জাপানী কর্তৃক বুদ্ধপূজার ওপর একটি কবিতা লিখেছি^{৪৫} (চিঠিপত্র ১৬, পৃ ১২)

‘বুদ্ধভক্তি’ কবিতাটির আগে কবি লিখেছেন

জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধ-মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।

বুদ্ধভক্তির এই স্বরূপ কবির কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এরকমই কথা আমরা পাবো ‘বিসর্জন’ নাটকে অপর্ণার মুখে যখন রাণী, একটি মনুষ্য-সন্তান কামনায় দেবীর কাছে ছাগ-শিশু বলি দেওয়ার মানত করে। কবিতা দুটির শেষ লাইনগুলি উদ্ধৃত করলাম; জাপানে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে নিয়ে দুটো সংবাদপত্রে দুটি কবিতা কবি লিখছেন, এর থেকেই বোঝা যায় কত গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন তিনি; একইসঙ্গে প্রতিবাদে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক হাতিয়ারকেই ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি ‘বুদ্ধভক্তি’

...হত-আহতের গনি সংখ্যা
তালে তালে মন্দির হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অটুহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাম্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস—
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধের নিতে নিজ দলে।
তুরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।

(শান্তিনিকেতন, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮)

এটি ‘পত্রপুটে’র ১৭ নম্বর কবিতা

...ওরা হিসাব রাখবে ম’রে পড়ল কত মানুষ,

পঙ্গু হয়ে গেল কয়জনা।

তারি হাজার সংখ্যার তালে তালে

ঘা মারবে জয়ডঙ্কায়।

পিশাচের অটুহাসি জাগিয়ে তুলবে

শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।

ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে

মিথ্যামন্ত্র দিতে,

যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাসে।

সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে

নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।

বেজে উঠছে তুরী ভেরি গরগর শব্দে,

কেঁপে উঠছে পৃথিবী।

(শান্তিনিকেতন, পৌষ, ১৩৪৪)

পরিশেষে এর অন্তর্গত ‘বুদ্ধজন্মোৎসব’ (২১ ফাল্গুন, ১৩৩৩), ‘বোরোবুদুর’ (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭),

‘সিয়াম’ (১১ অক্টোবর, ১৯২৭), ‘বুদ্ধদেবের প্রতি’ (২৪ অক্টোবর, ১৯৩১), ‘প্রার্থনা’ (২৯ জুলাই, ১৯৩৩),

সকলকলুষতামসহর (বৈশাখী-পূর্ণিমা, ১৩৩৮) কবিতাগুলি দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে।

এই সময়ে, সাম্রাজ্যবাদী-ক্ষমতার আত্মফালন চলছে, ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে গোটা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন

মানুষ একজোট হচ্ছেন, একজোট হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন বাকিদের, রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজস্ব

রাজনৈতিক অস্ত্রে প্রতিবাদ করছেন- এর কিছু আগেই ফিরিয়ে দিয়েছেন ‘নাইট’ উপাধি, লিখে চলেছেন

নাটক, গল্প, কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি। ‘ভারতবর্ষের চারণ’ পৃথিবীর নানাপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রেমের মন্ত্র

নিয়ে।

কবিতাগুলিতে বারবার বুদ্ধের শরণ নেওয়ার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু এই ব্যক্তি বুদ্ধ মনে রাখতে হবে একই সঙ্গে ইতিহাসের এবং কবির নির্মিত। প্রার্থনা করেছেন সেই বুদ্ধের কাছে, আহ্বান জানিয়েছেন শাস্ত্রত মানুষকে। এই কবিতাগুলি পড়লে আমাদের মনে হতে পারে তিনিও “ধর্মবিশ্বাসীর” মত বুদ্ধের আরেকবার জন্মের মধ্যে দিয়ে তার অবতারত্বতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছেন- “বুদ্ধজন্মোৎসবে”র

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী,
নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পঙ্খ তার,
লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।...

“সকলকলুষতামসহর” কবিতাটি-

সকলকলুষতামসহর, জয় হোক তব জয়—
অমৃতবারি সিঞ্চন কর’ নিখিলভুবনময়—
মহাশান্তি, মহাশ্রমে, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম।।
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি # ধ্বংস করুক তিমিররাতি—
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর’ ভয়।।
মোহমলিন অতি-দুর্দিন-শঙ্কিত-চিত পান্থ
জটিল-গহন-পথসঙ্কট-সংশয়-উদ্ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ— দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয়।।

এছাড়াও বাকি সব কবিতাগুলির ভাব মূলত একই ধরনের। কিন্তু আবারও মনে রাখতে হবে এই বুদ্ধ
বুদ্ধের আহ্বান আসলে ‘মহামানবের আহ্বান’। সে কোনো দেবতা, অবতার, ঈশ্বরের পুত্র কোনোটাই
নয়-

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অস্বরে

অরণ্যের বন্দনমর্মরে;

নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি

শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী

ধ্যানমগ্ন-আঁধি।

উচ্ছে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাজক্ষাতে,

কী সাহসে চাহিল পাঠাতে

আপন পূজার মন্ত্র যুগযুগান্তরে।

অপরূপ অমৃত অক্ষরে

লিখিল বিচিত্র লেখা; সাধকের ভক্তির পিপাসা

রচিল আপন মহাভাষা—

সর্বকাল সর্বজন

আনন্দে পড়িতে পারে যে-ভাষার লিপির লিখন।

সে-লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,

সে-লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।

সে-লিপির বাণী সনাতন

করেছে গ্রহণ

প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।

অদূরে নদীর কিনারাতে

আলবাঁধা মাঠে

কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে;—

আঁধারে আলোয়

প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়

ছায়ানাটো ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,

লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।

কালের সে-লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার

প্রতিদিন করে মন্তোচ্চার,

বলে অবিশ্বাস,—

‘বুদ্ধের শরণ লইলাম।’

...

অন্তহারা সঞ্চয়ের আত্মতা মাগিয়া

সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া;

তাই আসিয়াছে দিন,

পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,

আবার তাহারে

আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে

গুনিবারে

পাষণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—

কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর

আকাশে উঠিছে অবিরাম

অমেয় প্রেমের মন্ত্র,— ‘বুদ্ধের শরণ লইলাম।’

(বোরোবুদুর [যবদ্বীপ] ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)

এই মহামানব ‘সর্বকালের সর্বজন’, ‘চাষী’, ‘পীড়িত মানুষ’ মুক্তিহীন, যারা এই পাশবিক ক্ষমতার আঘাতের বিপরীতে মানবিকতা আর প্রেমের অস্ত্রে প্রতিবাদ করবে। আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে অক্ষুটে প্রশ্ন তুলেছিলাম “বুদ্ধ” বলতে আসলে মানুষের “চৈতন্য” কেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কী না। এতক্ষণে আমরা মনে হয় জোর দিয়ে তার হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিতে পারি।

আগেও বলেছি রবীন্দ্রনাথের লেখায় তাঁর নামের সঙ্গে, স্বরূপের সঙ্গে মিলিয়ে সূর্যের রেকারিং ইমেজারি আমরা পাবো। বোরোবুদুর কবিতাটিতেও অন্যান্য সমস্ত বক্তব্যের পাশাপাশি নবোদিত প্রকাশিত সূর্যের

ইমেজারি আছে এর ভাব প্রকাশের সহায়ক হিসেবে “প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে”। এই কথাটি বুঝিয়ে বলতে আরেকটি উদাহরণ দেব।

সভ্যতার সংকট প্রবন্ধটি বহু পঠিত, বহু আলোচিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে অবাক হতে হয়- প্রবন্ধের মধ্যেও কাব্যিক গুণের সঞ্চর দেখে। আমাদের মতে, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এর কাব্যিক গুণ। কী সুন্দর এই প্রবন্ধটি! রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রতিবাদী রাজনৈতিক সত্তাটিকে বেশির ভাগ আলোচনায় বাদ দিয়ে রাখা হয়। সমকালের দেশের বিদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ এবং নির্দিষ্ট মতামত আছে। শুধু সভ্যতার সংকট নয় কালান্তরের প্রতিটি প্রবন্ধই সমকালীন প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক মতামত। আমরা বলতে পারি তাঁর সমস্ত লেখাই রাজনৈতিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই কথাটি এত কম উচ্চারিত হয় যে আমরা আরেকবার তা মনে করে নিলাম। ফিরে যাবো সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে। আমরা আগে একবার সূর্যের ইমেজারি নিয়ে কথা বলেছি। এই প্রবন্ধেও সূর্যের ইমেজারির অনবদ্য ব্যবহার আছে। প্রবন্ধটি শুরু হচ্ছে-

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসঙ্গ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।...

আগের কবিতাটি উল্লেখ করেছি সেখানেও বুদ্ধের বন্দনার সঙ্গে আছে সূর্যের প্রসঙ্গ। এখানে তাঁর ব্যক্তি জীবনের কথা বলা হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের দিকে তাঁর জীবনকাল। জীবনের শেষেই কি সব? আমরা জানি রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাব আশাবাদ। এরপর তিনি ব্যক্তিজীবন থেকে চলে যাবেন গোটা বিশ্বজুড়ে চলা অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনায়, সভ্যতার ভয়ঙ্কর সংকট বর্ণনায়, যেন সভ্যতারো অস্তগামী অবস্থা! কিন্তু তারপর আসবে আসবে পাশ্চাত্যের বা পশ্চিমের আগ্রাসনের তীব্র বিরোধিতা, প্রাচ্যের বা পূর্বের ওপর তার আস্থার কথা; ব্যতিক্রমগুলিও বলেছেন অবশ্য। আমরা জানি প্রাচ্যের সংস্কৃতি তাদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। তাঁর জন্য সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান, বিশ্বভারতী এবং চীনাভবনের কার্যকলাপ, তাঁর ভ্রমণ এবং বক্তৃতা সবই

করেছিলেন সেই আস্থা থেকেই। এই প্রাচ্যের প্রতি আস্থার ইমাজারি হল ভৌগোলিক অবস্থানে সূর্যোদয়ের দেশ, বুদ্ধের দেশ গুলির সঙ্গে বৃহৎ একেবারে আশা। আগের কবিতাগুলির বুদ্ধের আস্থান, মহামানবের আস্থান এই প্রবন্ধের শেষের দিকে এক হয়ে গেছে। ব্যক্তিজীবনের সূর্য অস্ত যাবে অথচ সভ্যতার সূর্য নবদিগন্তে উদিত হবে। ব্যক্তি জীবনের অন্তগামী সূর্যের নিরাশা পরিণত হয়েছে সভ্যতার সূর্যোদয়ের আশা দিয়ে; আবর্তন সম্পূর্ণ, ঠিক সূর্যের মতই- প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে (বোরোবুদুরের লাইনটি)। এবার দেখা যাক “সভ্যতার সংকটে”র শেষ লাইনগুলি-

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিদ্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নত্বপূ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মস্তরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মগৈধিতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।

ততঃ সপ্তান্ জয়তি সমূলন্ত বিনশ্যতি।।

ঐ মহামানব আসে,

দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে

মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,

নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,

এল মহাজন্মের লগ্ন।

আজি অমরাত্রির দুর্গতোরণ যত

ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।

উদয়শিখরে জাগে মাঠেঃ মাঠেঃ রব

নবজীবনের আশ্বাসে।

‘জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়’

মন্দি উঠিল মহাকাশে।^{৪৬}

‘পূর্বদিগন্ত’ থেকে ‘পরিব্রাণকর্তা’ ‘মহামানব’ আসবে ‘পরিব্রাণের বার্তা নিয়ে’- মানব, বুদ্ধ সব মিলে গেছে। কবিতাটার ভাবের সঙ্গে বুদ্ধ-সম্পর্কিত ভাবের কোনো পার্থক্য নেই। একই সময়ে লেখা “জন্মদিনে” র সমস্ত কবিতাগুলির ভাব এক। তাতে যে মুখ ব্যবহৃত তা বুদ্ধের। মহামানবের জন্মের আহ্বান “নবজাতকের” কবিতাগুলিও ‘কবির ধর্ম’ ই তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ। আর এইভাবে নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের নির্মাণ।

আশা দাশ, সুধাংশুবিমল বড়ুয়া কল্যাণীশঙ্কর ঘটকের, অবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ বইয়ে কোন কবিতা নাটক, কোন অবদান বা জাতকের গল্প প্রভাবিত, তার বিষদ আলোচনা আছে। আমরা সেই কথাগুলির অল্পই প্রয়োজন অনুযায়ী পুনরাবৃত্তি করবো। গোটা আলোচনাতেই দেখেছি বৌদ্ধধর্মের যা যা প্রাতিষ্ঠানিকতা, অলৌকিকতা, ধর্মপ্রচারের জন্য যেসব কৌশলগত রাজনীতি সেগুলি রবীন্দ্রনাথ একেবারেই বাদ দিয়েছেন। অবদানসাহিত্য বা জাতকের গল্পগুলিকে গ্রহণের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। সেগুলিরও স্বতন্ত্র্য নির্মাণ ঘটেছে সমকালীন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। কথাসংকলনের শ্রেষ্ঠভিক্ষা (৫ কার্তিক, ১৩০৪), কবিতাটি অবদানশতকের ‘বজ্রম্’ থেকে নেওয়া। ‘পূজারিনী’ (১৮ আশ্বিন, ১৩০৬) র কথার উৎস অবদানশতকের “শ্রীমতী”। আমাদের মনে পড়বে “নটীর পূজাতে” নটির নাম, শ্রীমতি”। ‘অভিসার’(১৯ আশ্বিন, ১৩০৬) এর কথা বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার “উপগুপ্তাবদানম্”। ‘পরিশোধ’ (২৩ আশ্বিন, ১৩০৬) এর উৎসকথা মহাবস্তু-অবদানের ‘শ্যামাজাতক’ এর থেকেই ১৩৪৩ সালে ‘পরিশোধ নাট্যগীতি, পরে ১৩৪৬ এ নাটক “শ্যামা”। ‘সামান্যক্ষতি’(২৫ আশ্বিন, ১৩০৬) ‘দিব্যাবদানমালা’র অন্তর্গত ‘মাকান্দিকাবদন’। ‘মূল্যপ্রাপ্তি’ (২৬

আশ্বিন, ১৩০৬) কথাবস্তু গৃহীত হয়েছে অবদানশতকের ‘পদ্মঃ’ থেকে। ‘নগরলক্ষ্মী’ (২৭ আশ্বিন, ১৩০৬)র উৎস অবদানশতকের কল্পদ্রুমাবদানের “সুপ্রিয়া” আখ্যান। ‘মস্তকবিক্রয়’ (২১ কার্তিক, ১৩০৪) এর কথার উৎস ‘অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্য’ আখ্যান “মহাবস্তু-অবদানের” অন্তর্গত।

কল্যাণীশংকর ঘটক মহাশয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- কোথায় কোথায় বুদ্ধকথা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং নাটকগুলি বুদ্ধ-কথা(জাতক, অবদানশতক) থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

(৯)

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ-প্রভাবিত হয়ে কী কী গ্রহণ করেছেন তা অনেকেই বলেছেন, আমরাও তাই বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সম্পাদনার কথা বলতে গেলে তাঁর বর্জনের দিকগুলিও উল্লেখ করতে হয়। আমাদের মতে, তবেই রবীন্দ্রনাথের ‘নির্মাণ’ কে সম্পূর্ণত বোঝা সম্ভব হবে। উপরের গৃহীত গল্পগুলি ছাড়াও, জাতক-অবদানে এমন অনেক গল্প আছে যেখানে বুদ্ধের অলৌকিকতার পরিচয় আছে; শিষ্যদের দ্বারা বুদ্ধকে দামী উপহার দান এবং তা নির্দিধায় গ্রহণের কথা আছে, ধনীদেবকে বুদ্ধের দামী দ্রব্য প্রদানের কথা আছে, আছে বুদ্ধের গল্প দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা যে তিনি দেবতা ইন্দের (বৌদ্ধধর্মে বা বুদ্ধের কালে দেবতা হিসেবে ইন্দ্র, বরুণের নাম পাওয়া যায়) বিশেষ স্নেহধন্য। অনেক ভক্তের হিতসাধন করার বর্ণনা আছে ইন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের মাধ্যমে। সঙ্গে অবশ্যই আছে যাদুবিদ্যার প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত গল্পগুলিই পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই প্রসঙ্গগুলি বাদ দিয়েছেন বা বদলে দিয়েছেন। *The Sanskrit Buddhist Literature* বইয়ের ‘অবদানশতক’ অধ্যায়ে ২০ নম্বর গল্পে আছে- মোদগল্যাণন একজন ধনী কোষাধক্ষ্যকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন, সেই ব্যক্তি একশত সুস্বাদু খাবার সহযোগে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান এবং বোধিলাভের প্রার্থনা জানান। বুদ্ধ খুব খুশি হন, তার দাঁত থেকে অলৌকিক রশ্মি নির্গত হয় এবং বলেন ‘এই কোষাধক্ষ্য মহান বুদ্ধ হবেন, এর নাম হবে, দিব্যানন্দ’। এরকম আরোও অনেক গল্প এই বইয়ে সংকলিত। আরো কিছু গল্পে আছে যেখানে বুদ্ধকে অর্পিত ফুল, গালিচায় বদলে যাচ্ছে, বড় হয়ে গিয়ে তাঁর মাথায় ছত্রে পরিণত হচ্ছে ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের

বুদ্ধ কোথাও এরকম প্রাচুর্য্য দ্বারা পূজিত এবং প্রীত নয়; এই সমস্ত গল্পকে তিনি বাদ দিয়েছেন অনায়াসে। অবদানশতকের যেসব গল্প সরাসরি তাঁর কবিতা এবং নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ, যেমন- কোন জাতক থেকে নেওয়া, ঠিক কোথায় কোথায় রবীন্দ্রনাথের হাতে তা আলাদা রূপ নিয়েছে সেসব আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু এতেই শেষ নয়।

আমরা একটু আগেই বলেছি, যে গ্রহণ অপেক্ষাও যা যা বর্জিত হয়েছে তার বিবরণও আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রকল্পকে বুঝতে সাহায্য করবে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা, আমাদের চোখে পড়েনি। যেমন বুদ্ধের জীবনকালে তাঁর প্রধান শত্রু ছিলেন দেবদত্ত এবং রাজা অজাতশত্রু। বৌদ্ধজাতকের যেসব গল্প আছে, সেখানে দেখা যায় দেবদত্ত, বুদ্ধের চরিত্রহনন এবং প্রাণহননের ক্রমাগত চেষ্টা করেছে, শুধু তাই নয় বুদ্ধপত্নী যশোধরার প্রাণনাশের চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধ সব ক্ষেত্রেই তার প্রেরিত নারী, পুরুষ, হাতি (পশু) ইত্যাদি সকলকেই হিংসার বদলে প্রেম এবং অহিংসার মন্ত্রে বশ করেছেন। কিন্তু এও দেখা যায় বুদ্ধ বিভিন্ন গল্পের উদাহরণ দিয়ে জাতিস্মর হিসেবে ‘ভালো’ লোকেদের নিজের এবং শিষ্যদের পূর্বজন্ম বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, আর ‘খারাপ, মন্দ এবং ক্ষতিকর’ চরিত্র গুলিকে দেবদত্ত বা ‘কোনো বিশেষ বুদ্ধবিরোধী, বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং প্রচার করছেন। এও একপ্রকার চরিত্রহনন নয় কি? আমরা বলতে পারি এতে কোনো দোষ নেই, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এটুকু ‘প্রতিবাদ’ প্রয়োজনীয়। এবং সেটিও যথেষ্ট অহিংসামূলক। রবীন্দ্রনাথও হয়ত তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গও তিনি বর্জন করেছেন। কোথাও বুদ্ধ বা তাঁর শিষ্যদের চরিত্র চিত্রণে এই দ্বিতীয় চিহ্নগুলি নেই। শুধু ‘নটীর পূজা’য় দেবদত্ত এবং রাজা অজাতশত্রুর নাম প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু চরিত্র হিসেবে নাটকে তারা সরাসরি উপস্থিত নেই। বিম্বিসার পত্নী, লোকেশ্বরী, দেবদত্তকে ‘বুদ্ধের ধর্মবৈরী, ত্রুর সর্প, নরকের কীট’ বলেছে। বিম্বিসারকে হত্যার দায়, দেবদত্ত ও তার শিষ্যদের ওপর চাপিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকে রাজা অজাতশত্রু পিতা এবং শ্রীমতি কাওকেই স্বহস্তে হত্যা করেনি, পুজারিণী কবিতাতেও তাই; অথচ জাতক অবদানের গল্পে হত্যাকারী অজাতশত্রুকেই আমরা পাবো। নাটকে এই ঘটনাসূত্রেই, অজাতশত্রুর

পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের থেকে বুদ্ধের দিকে ঝুঁকিয়ে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। বুদ্ধের শরণ নিয়েছে, বুদ্ধপূজা বুদ্ধের আদেশ ফিরিয়ে নিয়েছে, নিজে পূজা করতে ইচ্ছুক হয়েছে। কিন্তু নটীর হত্যার পর, অজাতশত্রু বুদ্ধের পূজা দিতে এসেও ‘সংবাদ শুনে ভয়ে কম্পিত হয়ে’ ফিরে যায়। রাণী রত্নাবলী আদেশে শ্রীমতির হত্যার পর, রত্নাবলী অনুশোচনায় বুদ্ধের শরণ নিয়েছে। খেয়াল করে দেখবো, এই নাটকে তা সত্ত্বেও, ‘বুদ্ধ-বিদ্বেষী’রা প্রধান হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধপ্রেম, ঈর্ষামুক্তি, রাজ্যলোভ মুক্তি; ক্ষমা করুণার বিস্তারই প্রধান বিষয়।^{৪৭}

এই প্রসঙ্গেই, আমরা সংক্ষেপে বলবো, রবীন্দ্রনাথের নাটকে কবিতায় তাঁর মৌলিক চিন্তার আরেকটি প্রকল্প- ‘রাজা-ভাবনা’র কথা। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের ‘বেনেভোলেন্ট রাজা’, প্রতীকী রাজা, বাস্তবের রাজা, রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়! কিন্তু আমাদের মনে হয় এই রাজার ভাবনাও আসলে জাতকের গল্পের ব্রহ্মদত্ত, শিবি ইত্যাদি রাজার ছবি(ইমেজ) দ্বারা প্রভাবিত। তিনি ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন-

জাতকের বাংলা অনুবাদ ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একটি আশ্চর্য কীর্তি। বৃহৎ এই গ্রন্থখানির মধ্যে কোথাও শৈথিল্য নাই, সর্বত্রই লেখকের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পরিচয় আছে। এরূপ বহুশ্রমসাধ্য ও চিন্তাসাধ্য অধ্যবসায় বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। এই অসামান্য উদ্যোগে লেখক বাংলা পাঠকের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন, এই গ্রন্থখানির অনুশীলন করিয়া অনেক উপকার পাইতেছি; সেই জন্যও অনুবাদকের নিকট ব্যক্তিগতভাবে আমি কৃতজ্ঞ।^{৪৮}

এই উপকার হয়ত, শুধু গল্পগ্রহণে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর রাজা ভাবনাকেও নির্মাণ করেছে। এরকম ‘বেনেভোলেন্ট রাজা’ জাতকের অনেক গল্পে পাই। *মখাদেব-জাতক* এর রাজা, মাথায় পাকাচুল দেখামাত্র, রাজ্যভোগ বাসনা ত্যাগ করে। সুখবিহারি-জাতক এর রাজা, বুদ্ধের পারিষদ হয়ে, রাজ্যসুখ ত্যাগ করে, ভিক্ষু হয়ে কী সুখ তা ব্যাখ্যা করে(বুদ্ধও নিজে তাই করেন-গল্প নয় সত্য)। মহাশীলবজ্জাতক এর রাজা প্রজাপালনে বিশ্বাসী ছিলেন, শাস্তিদান বা রাজ্যবিস্তারে নয়। তার রাজ্যে কোনো সৈন্যও ছিল না(গুপী গাইনে শুন্দির রাজা মনে পড়ে, সত্যজিতের হীরক রাজার পরিণতি; সত্যজিৎও রবীন্দ্র প্রভাবিত ছিলেন, হয়ত জাতক প্রভাবিতও)। চোরকে অর্থদান করে, চৌর্যবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেন। এই রাজা আক্রান্ত

হয়েও শীল, চরিত্র, বুদ্ধিবলে বিনারক্তপাতে রাজ্য উদ্ধার করে। দুর্মেধ, রাজাববাদ, কুরুধর্ম-জাতকে। - দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন, রাজার এই দশগুণের কথা পাই। আরও অন্য জাতকেও এমন রাজাদের বর্ণনা পাবো। অবশ্যই ‘মন্দ’ রাজা চরিত্রও জাতকের গল্পে ভরপুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ‘বেনেভোলেন্ট’ রাজার টুকরো, ইমেজ আমরা এই গল্পগুলিতে পাই। রাজা নাটকটি যে, কুশজাতক থেকে প্রভাবিত তা আমরা জানি। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ জাতক থেকে কিছু গ্রহণ করে বাকিটা নির্মাণ করেছেন, নিজ প্রকল্প-অনুযায়ী। কিন্তু প্রভাবের কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সরাসরি ছায়ায় নির্মিত হয়েছে, সত্যেন সেনের উপন্যাসের, কৈবর্ত রাজা দিবোদক। পরবর্তী অধ্যায় থেকে আমরা সরাসরি উপন্যাসের আলোচনায় চলে যাবো।

তথ্যসূত্র

- ১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, গ্রন্থপরিচয়, (সম্পাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য) ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ ৭৫০
- ২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রক্তকরবী*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ ৫
- ৩। *The English Writings of Rabindranath Tagore*. Volume II, Ed. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi, 2012, Page No. 495-505
- ৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *চোখের বালি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ ১
- ৫। *The English Writings of Rabindranath Tagore*. Volume II, Ed. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi, 2012, Page No. 673
- ৬। রবীন্দ্র-রচনাবলী, (সম্পাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য), একাদশ খণ্ড, একাদশ খণ্ড, পৃ ২৭০
- ৭। আশীষ লাহিড়ী, *রবীন্দ্রনাথঃ মানুষের ধর্ম, মানুষের বিজ্ঞান*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ ৩৩
- ৮। আশীষ লাহিড়ী, *রবীন্দ্রনাথঃ মানুষের ধর্ম, মানুষের বিজ্ঞান*, অবভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা ৭৭
- ৯। *The English Writings of Rabindranath Tagore*. Volume II, Ed. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi, 2012, Page No. 278

- ১০। The English Writings of Rabindranath Tagore. Volume II, Ed. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi, 2012, Page No. 520
- ১১। D.T. Suzuki, Outlines of Mahayana Buddhism, Luzac, London, first publication 1907, Schocken edition, 1963, page No. 432
- ১২। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, প্রবন্ধ, সম্পাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা। ১৯৮৯, পৃ ২৯৭-২৯৮
- ১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ ১৩২
- ১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সম্পাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ১৯৮৯, পৃ ২৬৬-৬৭
- ১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ ৯
- ১৬। সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাঃ), রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, ধর্মচিন্তা, রবীন্দ্ররচনা-সংকলন, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পৃ ২৭৪-৭৫
- ১৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১১০০, পৃ ৭০৭
- ১৮। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয়, সম্পাঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০১, পৃ ৯৭৬-৯৭৭
- ১৯। Sabyasachi Bhattacharya(Compiled and edited), *The Mahatma and The Poet, Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915-1941*, National Book Trust, India, 2015
- ২০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, সম্পাঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ ৯৯৩-৯৯৪
- ২১। সরলা দেবী চৌধুরানী, জীবনের ঝরাপাতা, প্রথম রূপা সংস্করণ, ডি মেহরা রূপা এন্ড কোম্পানী, ১৯৫০, পৃ ৩৪, ৩৫-৪৮
- ২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, বঙ্কিম রচনাবলী, কৃষ্ণচরিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ১১০০ পৃ ৫১২-৬১৫
- ২৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, আধুনিক সাহিত্য, সম্পাঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ ২৪৬- ২৫৭
- ২৪। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, সম্পাঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ ১৭০-৭১
- ২৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, চারিত্রপূজা, সম্পাঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ ২৫৫-২৫৬
- ২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, সম্পাঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ ৫৩৮-৫৩৯
- ২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালাত্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৬, পৃ ১৪৯-১৫২
- ২৮। কর্তব্যনীতি(অধ্যাপক হুজুরুল মত), রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১২, বিশ্বভারতী, ১৩৪৯, পৃ ১৩০০
- ২৯। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃ ৫২২-২৩

- ৩০। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃ ৪০২-৪০৩
- ৩১। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯২, পৃ ১০৩৬
- ৩২। রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ ১০১১-৭৪
- ৩৩। রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
- ৩৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ ৩৭৫
- ৩৫। সম্পাঃ সুজিতকুমার বসু এবং অন্যান্য, *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ ১৫৯-১৭১
- ৩৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের পথে*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭ পৃ ২২
- ৩৭। শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য, *পালিপ্রকাশ, পালিভাষার সুগম ব্যাকরণ, পাঠ্যাবলী ও শব্দকোষ*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ১৩-১৫
- ৩৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (অনূদিত), *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৭, কলকাতা, পৃ ৯-১০
- ৩৯। ভবতোষ দত্ত, *প্রবোধচন্দ্র সেন*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ ২৯-৩০
- ৪০। প্রবোধচন্দ্র সেন, *ধম্মপদ-পরিচয়*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৪
- ৪১। রত্না সিন্হা, *প্রবোধচন্দ্র বাগচী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ ১১
- ৪২। সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, *রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩২৫, পৃ ২০২
- ৪৩। আশা দাশ, *বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ ২
- ৪৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, সম্পাঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১
- ৪৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, সম্পাঃ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১, পৃ ৪৩১
- ৪৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সভ্যতার সংকট*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫১
- ৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নটীর পূজা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১১
- ৪৮। ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক সমগ্র*, ১-৬ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৯-১৪২৪
- ৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাঃ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, কবিতা, ১-৩ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০১ (কবিতাগুলির পাঠ এখান থেকে গ্রহীত)
- ৫০। কল্যাণীশংকর ঘটক, *অবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ*, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫
- ৫১। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা*, বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২
- ৫২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *শিল্পচিন্তা*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬
- ৫৩। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩
- ৫৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *দর্শনচিন্তা*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১
- ৫৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ৩য় সং, ১৩৬৬
- ৫৬। পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, জিগুসা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২

- ৫৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাঃ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, গ্রন্থপরিচয়, ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০১, পৃ ১৮১-৮২
- ৫৮। Rajendralal Mitra, *Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Asiatic Society of Bengal, 1982

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিকের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’: ‘আত্মপরিচয়’ নির্মাণের অভিপ্রায়

বুঝি না- এ হেন রূপটি স্রষ্টা নয়ন মেলিয়া কেমনে গড়ে;

নয়নে পড়িলে, মুগ্ধ বিধাতা ছাড়িত কি তারে ক্ষণেক তরে?

নির্মীলিত-চোখে এ রূপ-সৃষ্টি সম্ভব নহে; বুঝেছি তাই-

বুদ্ধের এই কথাটি সত্য- জগতের কোনো স্রষ্টা নাই!

-ধর্মকীর্তি^১

এই কবিতা কি আধুনিক?

উপন্যাস বা আধুনিক আখ্যানের যেকোনো সংরূপ তৈরির বহু আগের এই কবিতার স্রষ্টা বৌদ্ধ-দার্শনিক ধর্মকীর্তি। তাঁর সময়কাল, সপ্তম শতাব্দী। রবীন্দ্রনাথের *বৈষ্ণব কবিতা* এরও প্রকাশের পূর্বের এই কবিতা। আমাদের মতে এইখানেই আছে আধুনিকের বীজ।

শুধু কালিকমাত্রায় আধুনিকতার উপকরণ থাকে না। উনিশ শতক এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকের আখ্যানগুলির একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল ধর্মীয় অবস্থান প্রকট করা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দুটি উপন্যাস, *কাঞ্চনমালা* এবং *বেণের মেয়ে*; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শশাঙ্ক*, *ধর্মপাল* এবং *করণা*, দীনেশচন্দ্র সেনের *শ্যামল ও কজ্জল*—এ প্রসঙ্গে, আমাদের আলোচনায় প্রাথমিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অপ্রকাশিত এম ফিল গবেষণা সন্দর্ভে^২ এই উপন্যাসগুলি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছি। এখানে উপন্যাসগুলি বিষয়ে জরুরি কথা বলে, পরবর্তী উপন্যাসে চলে যাবো।

দ্রোণাচার্য প্রশ্ন করছেন- কী দেখাচ্ছে? সেখানে, সব দেখার থেকে শুধুমাত্র পাখির চোখ দেখা প্রশংসিত হচ্ছে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তার অংশগুলি গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক সিদ্ধান্ত হল, অবশ্যই নির্দিষ্ট করে দেখা, অংশকে দেখা, গুরুত্ব দেওয়া এবং বিশ্লেষণ করা একটি পদ্ধতি। কিন্তু সমগ্রের ধারণাকে বাতিল করে, আংশিক দেখা, আসলে সীমাবদ্ধতা। ‘সমগ্র’ কে বাতিল করে শুধু অংশকে বিচার করা যাবে না।

সমালোচকদের মতে উপন্যাস হল- ইমেজ সমৃদ্ধ দার্শনিক সন্দর্ভ; ইতিহাস, সমকাল এবং দর্শন এই তিনদিককে ধারণ করে থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত করবো সংবেদনশীলতা; স্রষ্টা বা লেখক একাধারে পর্যবেক্ষক এবং সমালোচকও। ফলে কাহিনির জটিলতা, বাঁকবদল, চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রবণতা বা প্রবণতার বিবর্তন ইত্যাদি সিদ্ধান্তের প্রশ্নে চলে আসে স্রষ্টার অবস্থান, প্রেক্ষিতগত এবং ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ। উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও আমরা এই ধারণাটিকে মাথায় রাখবো। প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, পরাধীন ভারতে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে জাতীয়তাবোধকে উন্নত করতে চাওয়া হচ্ছে, তখন সেক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে স্রষ্টার এবং সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার ধর্মীয় অবস্থান। বিশেষত হিন্দুধর্মকে মহিমাম্বিত করা হচ্ছে। কিন্তু উপন্যাসে যখন বাস্তববাদী প্রবণতা এসে হাজির হল, আধুনিকতা যখন ধর্ম ঈশ্বর সত্য সুন্দরকে সংশয় করতে শুরু করল তখন সেই ধারাবাহিকতায় অবশ্যম্ভাবী হল বাঁকবদল। পরাধীন ভারতের জাতীয়তাবাদ, স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনীতিতেও ব্রাত্য হয়ে গেল না; বরং ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ নির্মাণে জাতীয়তাবাদসহ নানা উপাদানের সন্নিবেশ শুরু হল। তাতে প্রাধান্য পেল, কেন্দ্রপ্রধান এবং কেন্দ্র নির্ভর সংস্কৃতি, হিন্দুধর্মের মান্যতা সেখানেও প্রতিষ্ঠিত হল।

আমাদের সিদ্ধান্ত, পরাধীন ভারতের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধর্মীয় বাইনারি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল, ব্রিটিশ পোষিত, তাদের বিভেদনীতির সহযোগী। ফলে তা ততখানি ব্রিটিশ-বিরোধি ছিলনা। ছিল ভারতবাসীর একে অপরের ধর্মীয় পরিচয়ের বিরুদ্ধে, যা ইংরেজ চলে যাওয়ার পরেও উত্তর-উপনিবেশ পর্বে, স্থায়ী জায়গা করে নিল। তখনও তা ছিল শাসকের স্বার্থে, স্বাধীন ভারতেও তা হল কেন্দ্রের, রাষ্ট্রের হেজিমনির স্বার্থে।

আধুনিকতা এবং বাস্তবতার সঙ্গে উপন্যাসে বুদ্ধ, বৌদ্ধযুগ, বৌদ্ধ-উপাদান কেমন করে ব্যবহৃত হচ্ছে? মধ্যযুগের স্বপ্নে পাওয়া অলৌকিক- সাহিত্য আর লেখা যাবে না। যা বলা হবে তার দায়িত্ব নিতে হবে। অবস্থানকে স্পষ্ট করতে হবে। প্রায় প্রতিটি লেখক, এই পর্যায়ে ‘কৈফিয়ৎ’ বা ‘ভূমিকায়’ বা ‘পরিশিষ্টে’ বা উপন্যাসের মাঝেই হঠাৎ হাজির হয়ে নিজেদের অভিপ্রায়, মতাদর্শকে স্পষ্ট করতে চান। পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চান। আখ্যানের সঙ্গে জরুরি হয়ে ওঠে তাদের সামগ্রিক

পরিচয়। স্রষ্টার, টেক্সটের, পাঠকের এবং টেক্সটের নির্মাণ-বিনির্মাণের গোটা সময়কাল, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অভিপ্রায়, অবস্থান, মতাদর্শকে পাঠ করাই- আধুনিক পাঠ হিসেবে গ্রাহ্য।

বাস্তববাদ নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনার জায়গা এখানে নেই। শুধু উপন্যাসের বিবর্তনের প্রবণতাকে বুঝে নিতে আমরা কতকগুলি কথা প্রাথমিকভাবে বলে নেব।

জর্জ লেভিনের মতে,- বাস্তববাদ, সাহিত্যে যেগুলির ওপর জোর দিয়েছে সেগুলি হল, শৈলী এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে- ডিমিস্টিফাই করা, রহস্যপূর্ণতা এড়ানো; স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দেওয়া। এছাড়াও তিনি বলছেন, বাস্তববাদ- বিষয়, মাধ্যম, শৈলী, বয়ান, প্লট, ঘটনার সজ্জাক্রম, অ্যাক্ট্যান্ট, পরিবেশ, প্রতিবেশ- বিবিধ ক্ষেত্রে জটিলতার (ইতিবাচক অর্থে, ইচ্ছাকৃতভাবে) ওপর জোর দেয়। যদি বলা হয়, বাস্তববাদ ‘রিয়াল/সত্য/বাস্তবের’ ওপর শুধুমাত্র জোর দেয়, আর তাকেই বলে বাস্তববাদ; তাহলে সবটা ঠিক বলা হয় না। বাস্তববাদের গুরুত্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে একে অতিক্রম করে। কারণ দার্শনিকভাবে একমাত্রিক ‘রিয়েল/সত্য/বাস্তব’কে উপস্থাপন সম্ভবপর নয়। একটা নিশ্চিত সত্য, কমিটমেন্ট/ প্রতিশ্রুতি/ অঙ্গীকার বলে আদতে কিছু নেই। কারণ ‘জ্ঞান’, ‘জানা’ এবং ‘দৃষ্টিকোণ’, আপেক্ষিক, চিরপরিবর্তনশীল এবং তা অনন্ত সম্ভাবনাময়। ঐতিহাসিক পরিবর্তনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক বোধগম্যতা তার নমনীয়তা এবং চলমানতা এক্ষেত্রে প্রধান বাধাস্বরূপ।^৭ এই ভাবনা থেকেও বুদ্ধের ‘প্রতিত্যসমুৎপাদ’ তত্ত্ব আধুনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কার্যকারণসম্পর্ক এবং পরিবর্তনশীলতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।^৮

বাস্তববাদের ন্যায়সঙ্গত (কার্যকারণ-সম্পর্কসূত্রে) এবং বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার দায় আছে, ইতিহাসের কাছে এবং সামাজিক ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্যের কাছে। একই সঙ্গে অ্যাকট্যান্ট-নির্ভর আখ্যানে সম্পূর্ণ গল্প জানানোর দায়, স্রষ্টার থাকে না। কারণ ‘সম্পূর্ণ সত্য’/‘দ্য হোল সিচুয়েশন’ বোঝা এবং বুঝিয়ে দেওয়া বাস্তবে স্বাভাবিক নয়। শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ, সীমিত দৃষ্টিভঙ্গিই সাহিত্য জানাতে পারে। যদিও তার মধ্যেও পরিবর্তনের বীজ থাকে। তাই এই সাহিত্যগুলি দৃষ্টিকোণের সীমিত পর্যবেক্ষণকেই প্রকাশ করার দায় নেয়। ফলে গল্প জানানোর তুলনায় প্রেক্ষিত অনুযায়ী জীবন-যাপন বিষয়ে বিভিন্ন অ্যাকট্যান্টের অবস্থান অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ এবং দৃষ্টিকোণই বর্ণিত হয়। যার মধ্যে দিয়ে স্রষ্টা এবং পাঠক

পারস্পরিক বোধগম্যতার সাঁকো তৈরি করেন, প্রস্তাবের আদানপ্রদান করেন। ফলে পাঠকও পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে, পাঠকে সম্পূর্ণ করে। স্রষ্টা এই ‘কমন স্পেস’টি তৈরি করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য, যথাযথ ইতিহাস এবং সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সিচুয়েশন/প্রেক্ষিত/প্রতিবেশ তৈরি করেন এবং চরিত্রগুলি সেই অনুযায়ী ব্যবহার করে।

আধুনিক বাস্তব সাহিত্যে যে প্রবণতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল- জীবিকা নির্বাহ, বৃত্তি, পেশার প্রশ্ন। আরেকটু স্পষ্ট করে বললে পয়সা উপার্জনের প্রশ্ন। কারণ চরিত্র গুলির শ্রেণিগত অবস্থান সেখানে কনটেক্সট হিসেবে জরুরি। আর পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পয়সা উপার্জনের প্রশ্নটি, শ্রেণির মাপকাঠি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। জীবনসঙ্গী নির্বাচন, একমাত্রিক প্রেমজনিত সমস্যার থেকেও এটি জরুরি প্রশ্ন। কারণ আখ্যানের নির্ধারিত এবং উদ্দিষ্ট মধ্যবিত্ত পাঠক এই প্রশ্নের দ্বারাই জর্জরিত। তারা সাহিত্যে এই প্রশ্নের সঙ্গেই একাত্মবোধ করে। কিন্তু উপন্যাসে, ছদ্ম বাস্তবতা দেখিয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়। ‘ইতিহাসের কাল্পনিক স্মৃতি’ নির্মাণের জন্যও, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আখ্যান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন স্রষ্টারা।

আধুনিক বাস্তববাদী আখ্যানের পরিণতি মিলনান্তক হলে, চরিত্রেরা নৈতিকতার জন্য পুরস্কৃত হয়। এক্ষেত্রে মধ্যযুগের ভক্তির তুলনায় নৈতিকতার গুরুত্ব বেশি। এও এক ধরনের ‘ইচ্ছাপূরণের’ ছক। আর বিয়োগান্তক হলে নৈতিকতার জন্য পুরস্কৃত হয় না, অর্থ, স্ট্যাটাস, পছন্দসই সঙ্গী লাভ হয় না, আত্মসমীক্ষায় হতাশা বাড়ে! উপন্যাসগুলিতে এই নৈতিকতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আবারও নৈতিকতা ব্যাপারটিও আপেক্ষিক; ফলে আখ্যানভেদে দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে নৈতিকতার রকমফের এবং পরিবর্তনশীলতা নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। বিষয়টি জটিল এবং বহুমাত্রিক।

আরও স্পষ্ট করে বললে, আধুনিক বাস্তববাদী উপন্যাস সেকুলার, না-ধর্মীয় বিষয়কেই উপন্যাসে তুলে ধরে। আমরা আগেই বলেছি তার মধ্যে প্রধান হল- জীবিকা নির্বাহের প্রশ্ন। কীভাবে বাঁচবো? এবং প্রিয়জনদের বাঁচিয়ে রাখা যায়? এই প্রশ্ন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে হাজির থাকে, সেই অনুযায়ী ঘটনাক্রম সজ্জিত হয় তার বাঁকবদল ঘটে। চরিত্রেরা অবস্থা, প্রেক্ষিত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং

নৈতিকতার বশবর্তী হয়ে। পাঠক সেই দৃষ্টিভঙ্গি, সিদ্ধান্তকে পাঠ করে, সমালোচনা করে, মতামত দেয় নিজেদের প্রেক্ষিত এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী। সাধারণের দৈনন্দিনতায়, তাদের দৈনিক যাপন থেকেই নাটকীয় উপাদানের চাহিদা এবং যোগান সাহিত্য (সাহিত্য-পণ্য) কে তৈরি করে।

জর্জ বলছেন,-

Here the question of secularity looms large, for realism is the mode that reads character into the conditions of ordinary life, the life of Vanity Fair, and makes drama of their apparent everydayness, of their problems in making a living, of their relations with their neighbours, of the things that they have and want, of their domesticity. Every character in realist novel must be read in relation to the circumstances of his or her life. (Page No. 201-202)

কিন্তু একই সঙ্গে একে চালিত করে হেজমনি এবং বাজার। চূড়ান্তভাবে সাহিত্য যখন শুধুমাত্র লাভবান পণ্য হয়ে উঠতে চায় তখন, শুরু হয় বাস্তবতার ভ্রম উৎপাদন। ‘বাস্তব’ এর মোড়কে, ধর্ম, শাসকের প্রতি প্রশ্নহীন ভক্তি, চিরাচরিত-নৈতিকতা, কেন্দ্রমুখী সংস্কৃতিকেই পেশ করা হয়। এই কারণেও বৌদ্ধযুগকে ব্যবহারের প্রবণতা, অনেক লেখককেই প্রভাবিত করেছে। কল্পকাহিনি আর ইতিহাস সংস্কৃতির প্রতি তাঁরা দায়বদ্ধ থাকেননা। সাহিত্যকে, ক্ষমতার মন অনুযায়ী সাধারণকে, ‘ম্যানুপুলেট’ করার যন্ত্র বানিয়ে তোলে। যেহেতু সত্য বহুমাত্রিক, পরিবর্তনশীল, এবং আপেক্ষিক তাই যে, সত্য ‘তৈরি’ করে, তাকেই চিরকালীন, অবশ্যসম্ভাবী বলে দাবী করে।

আমরা একটু আগেই নৈতিকতার কথা বলেছি, এবার একটু পরিষ্কার করে বলি, ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় এই ধর্মীয় বা বৈশিষ্ট্যগত বা সমাজ নির্ধারিত নৈতিকতার প্রয়োজন, কৌশলগতভাবে, শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের ক্ষেত্রে। কারণ আধুনিক এবং বাস্তবাদী সাহিত্যের মূল বিষয়াধার এই দুটি শ্রেণিই। আর এইখানেই এই নৈতিকতা এবং তার পুরস্কার পাওয়া না পাওয়া অনেকাংশে নির্ধারিত হয়, ক্ষমতার মনোমত পদ্ধতি অনুযায়ী, তাকেই ‘জনপ্রিয় চাহিদা’ অনুযায়ী প্রকাশ করতে এবং নির্মাণ করতে থাকে সাহিত্য-বাজার। শুধু নৈতিকতা ও তার পুরস্কারের ক্ষেত্রেই নয় এই বিপর্যাস (বিয়োগান্তকের ক্ষেত্রে) চলতে থাকে মেধা (পরিশ্রম) এবং সাফল্য, আইনক্রম এবং ন্যায়বিচার, বৃত্তি এবং অর্থাগম ও

তার সঙ্গে এক্সপ্লয়টেশন বা শোষণ এবং ম্যানিউপুলেশনের ক্ষেত্রে। চরিত্রগুলিও বিশেষ প্রতিবেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং শ্রেণির প্রেক্ষিত এবং পরিস্থিতি জাত।

এরসঙ্গে বলে রাখি, এই ধরনের সাহিত্য পাঠককেও অংশগ্রহণে, মতামতজ্ঞাপনে, সমালোচনায় ব্যাপ্ত করে, তা, ঠিক। কিন্তু পাঠকের দৃষ্টিকোণকে ম্যানিউপুলেট করা এই নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

(১)

ঔদার্য, ক্ষমাশীলতা, সহিষ্ণুতা, রাজপ্রাসাদ থেকে, ভোগ বিলাসের জীবন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে আসার ত্যাগ, বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা, তাদের ঐক্যবদ্ধ করা, গণতান্ত্রিক পথ দেখানো; আধুনিকের কাছে বুদ্ধকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। বুদ্ধের জীবন, জাতক-অবদানের গল্পে, বৌদ্ধকালের বিভিন্ন ঘটনা সাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে অনায়াসে। এর সঙ্গে আছে বুদ্ধের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, ‘চিরাচরিত ঐতিহ্য’কে প্রশ্ন করা, সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখা; নতুন নির্মাণের স্পর্ধা। পরিবর্তনশীলতা এবং বিবর্তনকে শাস্ত্র বলে, জ্ঞানের, অভিজ্ঞতার এবং জানার ভিত্তি বলে, স্বীকৃতি দেওয়া- এই প্রবণতা গুলির সঙ্গে আধুনিকের মিল আছে, ফলে তারা প্রভাবিত হচ্ছেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নৈতিকভাবে জীবনাপনের প্রসঙ্গটি জড়িয়ে আছে। যদিও বেশিরভাগ ধর্মই আসলে কতকগুলি ভালো-মন্দ নৈতিক কোডকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে এই নৈতিকতা ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সংযম, মধ্যপন্থা, অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এসবের ভিত্তিই নৈতিকতা। ফলে আধুনিক ঔপন্যাসিকরা নৈতিকতার প্রশ্নেও বুদ্ধকাল, বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষিতকে বিনির্মাণ করতে চেয়েছেন। আত্মসমীক্ষার, আত্ম এবং বাইরের জগৎকে বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা আধুনিক উপন্যাসের অন্যতম ব্যবহৃত বিষয়। সেখানে যুক্ত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নটি। এই সমালোচনা এবং পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গি, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দুই ক্ষেত্রেই, রাজনৈতিক। চৈতন্য বা দেহের অস্তিত্ব বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক কাল এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বাস্তববাদ আসলে গুরুত্ব দেয় ‘লব্ধ অভিজ্ঞতা’র ওপর। এই লব্ধ অভিজ্ঞতা স্রষ্টা এবং সাধারণ-পাঠকের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ; পাঠের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের জন্য। এই লব্ধ অভিজ্ঞতার গুরুত্ব এদের ইনটুইশনে, কল্পনায় এবং চেতনায়। এই

অভিজ্ঞতার দুটি স্তর- এক বাহ্যিক সমাজে আদান-প্রদান, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় লব্ধ অভিজ্ঞতা; এবং আত্মসমীক্ষার বা আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা। এখান থেকেই জর্জ, মনে করেছেন আত্মজ্ঞানবাদ বা সলিপসিজম এর সঙ্গে এর যোগ। বাস্তববাদের আধুনিকতার সঙ্গেই উপন্যাসে আত্মসমীক্ষা প্রধান হয়ে ওঠে। অ্যাকট্যান্টের মধ্যে দিয়ে স্রষ্টা এবং পাঠক এই আত্মসমীক্ষার পাঠের আদান-প্রদানই ঘটায়। জর্জ বলছেন-

Realism, in this connection (still however, allied to empiricist philosophy, though not systematically) is the commitment to register the external real and then (or at the same time) the interiority that perceives it and distorts or penetrates it. (তদেব, Page No. 189)

বুদ্ধের নতুন ধর্মের-দর্শনের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করা, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, রাজনৈতিক। সেইকালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ বুদ্ধকে নতুন ধর্ম-দর্শন প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করে। বহু ধরনের ধর্ম-দর্শন প্রস্থান, সেকালে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধের কাছে তা অসার বলে মনে হয়। কারণ তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, মানুষের জীবনাযাপন সম্পর্কে- যে প্রশ্নগুলি বুদ্ধের মনে জাগিয়েছিল, তার উত্তর প্রচলিত ধর্ম-দর্শনের খোপে মেলেনি। এর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করেছেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। আমাদের মনে হয়, এই রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, আধুনিক উপন্যাসে সমকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের চিহ্ন হিসেবে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে আছে বিভিন্ন ধরণ-বিভাগ, সেগুলি উপন্যাসের প্রেক্ষিতে আমরা আলোচনা করবো। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, বুদ্ধের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সেখান থেকে রাজনৈতিক সমাধানের উপায় হিসেবেই, তাঁর ধর্ম দর্শনের প্রস্তাবনা। বলছেন-

Whether original Buddhism was a form of religion in our sense and whether the Buddha had any real taste for philosophy and metaphysics may still be questions open to controversy. ... The Buddha, for all that we know of him from Pali Tripitaka, was taking at least a precariously near-secular- if not fully secular- sociological interest,

judged at least in the context of his time. Further, he was about the only thinker in ancient India with conscious commitment to the dialectical outlook. Because of this, he also came rather near to the understanding of some "palliative remedy" required by the people in class-divided society. This he formulated in his own way; though, on retrospective analysis. He seems to have anticipated the essential function of religion as understood by Marx.^৫

এখানে দেবীপ্রসাদ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অসাম্যের সঙ্গে বুদ্ধের ধর্মকে 'উপশমকারী সমাধান' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর এই না-ধর্মীয়, উপাদানের জন্যই, জর্জ কথিত বাস্তববাদীরা এক বিষয় হিসেবেও ব্যবহার করতে চেয়েছেন, আধুনিক উপন্যাসে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের যে ক্ষতিকারক অসাম্য তাকে অনুধাবন করেই বুদ্ধ সমাধান খুঁজতে চেয়েছিলেন। একথা প্রমাণের জন্য তিনি বুদ্ধের কালের রাজনৈতিক অস্থিরতা, হিংসা, লোভের বশবর্তী হয়ে সাম্রাজ্যবিস্তার প্রভৃতিকে প্রেক্ষিত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। বুদ্ধের প্রশ্ন, যা তাঁর ধর্ম-দর্শনেরও মূলে আছে, তা হল- জগৎ এবং তার মানুষেরা দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত কেন?

দেবীপ্রসাদের মতে, এই প্রশ্নের উৎস, বুদ্ধের সমকালে রাজনৈতিক অশান্তি, মাৎস্যন্যায়-

It was the age in which North-East India was first witnessing the rise of the ruthless state powers- specially those of Magadha and Kosala- on the ruins of the tribal societies. As was characteristic of such an age 'base greed, brutal sensuality, sordid avarice, selfish plunder of common possessions', taxation, usury, extortion and such things were creating new and unheard of miseries in the lives of the people in whose memory the liberty, equality and fraternity of the tribal life was still somewhat fresh and whose neighbours like Mallas, Vajjis and Sakyas were still in the state of Tribal simplicity.(তদেব)

এপ্রসঙ্গে বুদ্ধের বজ্জিদের গণতন্ত্র বিষয়ে মত উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ নিজেও, শাক্য ট্রাইবের জাতক, এবং তাঁর ট্রাইবাল উৎস সম্পর্কে গর্বিত। উপজাতিদের ইতিবাচক দিকগুলিকে সমকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গে, রাষ্ট্রের প্রশ্নে আমৃত্যু স্মরণ করেছেন। কিন্তু বুদ্ধের সময় এই ট্রাইবগুলিই অস্তিত্বসংকটের মুখে পড়ছিল। সাম্রাজ্যবিস্তার-আকাজক্ষা ট্রাইবগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল। দেবীপ্রসাদ যোগ করেছেন-

But the equality and freedom of the tribes were already threatened because the rising states could not tolerate the continued existence of such examples of democracy, primitive though these might have been. Besides, lik, deforestation, the expansion of the states required detribalisation of vast areas. Extermination and subjugation of

the tribes thus formed the policy-objective of the early states. Vidudabha, the prince of Kosala, presumably during the life of Buddha, unleashed the most brutal massacre on Sakyas, the Buddha's own people, and even the children and women of the tribe were not spared. Alatsatru, the king of Magadha and one eulogised as a great philosopher in the Upanisads, declared, 'I will root out the Vajjians, I will destroy the Vajjians, I will bring these Vajjians to utter ruin'. (তদেব)

বজ্জীদের এই প্রসঙ্গ কোসাস্থীও ব্যাখ্যা করেছেন-

অজাতশত্রুর অমাত্য বস্‌সকার বুদ্ধের কাছে, বজ্জীদের পরাজিত করবার জন্য পরামর্শ এবং আশীর্বাদ নিতে আসে। বুদ্ধ তখন বজ্জীদের পালনীয় সাতটি গুণের কথা বলে এবং জানায় এভাবেই 'একত্র' থাকলে তাদের পরাজিত করা অসম্ভব। সেই সাতটি গুণ হল- ১। বজ্জিরা বারবার নিজেরা একত্রিত হয়ে সভা করে। ২। সকলেই সেই সভায় উপস্থিত থাকে। ৩। তাদের আইন নিজেদের তৈরি, নিজেরা তার পালন করে, লঙ্ঘন করে না। ৪। বজ্জিরা তাদের রাজনীতিবিদদের সম্মান করে। ৫। তারা মেয়েদের সম্মান করে, কোনো অত্যাচার তাদের ওপর হয় না। ৬। মন্দিরের যত্ন নেয়। ৭। অর্হৎ দেব সেবা করে। এই নিয়মগুলির অর্থ কোসাস্থী ব্যাখ্যা করেছেন।^৬

বুদ্ধ বলেন, তিনিই বজ্জীদের এই নিয়মগুলি পালন করার পরামর্শ দেন। তাই তারা অপরাজেয়। এরপর অজাতশত্রু বজ্জি গণরাজাদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে অনৈক্য তৈরি করে তাদের পরাজিত করে। উপন্যাসেও গণতন্ত্রের প্রসঙ্গে বারবার বজ্জিদের কাহিনিকে স্মরণ করা হয়েছে, আমরা একটু পরেই তা আলোচনা করবো। বুদ্ধ তাঁর সঙ্ঘতেও এই নিয়মগুলি প্রবর্তন করেন। কোসাস্থী বলেছেন-

বৌদ্ধ সংঘ একত্র মিলিত হইয়া সংঘ কার্য করিবে, এই যে নিয়ম বিনয়পিটকে দেওয়া আছে, তাহা হইতে, বজ্জী প্রভৃতি গণরাজারা কিভাবে একত্র মিলিত হইয়া সভার কাজকর্ম করিত, তাহা অনুমান করা যায়। (ভগবান বুদ্ধ, পৃ ২২১)

দেবীপ্রসাদ বলছেন, এই একত্র হয়ে থাকা, এই শিক্ষা, জনজাতির শিক্ষা। যা বুদ্ধ, জনজাতির মধ্যে বেড়ে ওঠার সূত্রে পেয়েছিলেন, সমীহ করেছিলেন, শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, প্রয়োগ করেছিলেন। জনজাতির অস্তিত্বসংকটের জন্য দায়ী মাৎস্যন্যায়, সাম্রাজ্যবিস্তারের লোভ, নিষ্ঠুরতা তাকে ব্যথিত

করেছিল। তারই প্রতিকার চেষ্টা তার নৈতিক দায়িত্ব সম্পন্ন, মানবিক ধর্ম-প্রস্থান, বৌদ্ধধর্ম। আমরা উদ্ধৃত করবো-

He could also see how this greed of kings recoiled back on themselves and made their power and riches unstable. Two of his early patrons were King Bimbisara of Magadha and King Prasenjit of Kosala. The former was starved to death by his own son Ajatsatru and the latter most treachrously betrayed by his Vidudabha. "The princes who rule kingdoms", said the Buddha, "rich in treasures and wealth, turn their greed against one another, pandering insatiably to their desires. If these act thus restlessly, swimming in the stream of impermanences, carried along by greed and carnal desire, who then can walk on earth in peace? To these were also to be added the hitherto unheard of miseries created in the lives of the people by the new institutions of taxation, salvery, extortion, torture, mortgage, interest, usury: the voluminous Jatakas are full of these.

The Buddha himself saw all these. (রিলিজিয়ন অ্যান্ড সোসাইটি, Page No. 160-61)

ফলে কী করণীয়? এই ভাবনায় তিনি দেখেন, ঈশ্বর, মোক্ষ, সৃষ্টিকর্তা, পূজা-পার্বণ, আড়ম্বর-আয়োজন, বলি-উৎসর্গ ইত্যাদি যা সমকালের ধর্ম-প্রস্থানগুলির আলোচ্য, সেগুলি এই পরিস্থিতির সমাধানে অচল, অসার!

বুদ্ধের সমকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং বুদ্ধের সফল অসফল সমাধান প্রচেষ্টা; বহু আধুনিক উপন্যাসের বিষয়। তারা সমকালের রাজনৈতিক লোভ, নিষ্ঠুরতাকে হাজির করতে সাহায্য নিচ্ছেন বুদ্ধের সময়পর্বের, বা সেই অনুষ্ণ-যুক্ত, বুদ্ধ পরবর্তী সময়পর্বের।

উপজাতিদের আদর্শে বুদ্ধ কতখানি প্রভাবিত ছিলেন সে প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ বলছেন-

... he looked backward to the tribal collectives and wanted to revive what Marx called 'the imaginary substance of the tribe.' Apparently, he was pleading for a moral reform of the world. In the fourth noble truth, he spoke of right faith, right resolve, etc.,- values, ...Modelled consciously on the tribal collectives- without private property and with full equality and democracy among the brethren- these alone could offer the real scope to practise the 'the simple moral grandeur of the ancient gentile society', for which the Buddha was really pleading. Thus the samgha-s, as classless societies within the bosom of the class society, could become the heart of a heartless world, the spirit of a spiritless situation. (তদেব, Page No. 163)

দেবীপ্রসাদের মতে, ব্যক্তিগত সম্পদ, লাগামছাড়া লোভ-চাহিদাই আসলে এই সামাজিক অস্থিরতা, অরাজকতার উৎস, তা বুদ্ধ উপলব্ধি করেছিলেন। মার্ক্সের তত্ত্বেরও যা অন্যতম অভিমুখ। দেবীপ্রসাদ, Fyodor Shcherbatskoy or Stcherbatsky (চেরবাটস্কি)-এঁর (বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক) গবেষণা এবং মতামত দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় একাধিকবার তাঁর উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে Stcherbatsky এঁর উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলছেন-

Where there is personality, there is property belonging to it. Where there is I, there is also my. And where there is personal property, there necessarily emerges a love for it in one form or other. These attachment to personal property is the root of all evil, the root of every personal action as well as of social injustice. Thus, by negating the existence of the soul, Buddhism gives us a very profound philosophical basis for the negation of the right of personal property.

What personal property can be possible where even the personality itself is not there? Therefore, a real Buddhist is only he who has renounced personal property- and not merely property but also family, home, etc.- once for all. (তদেব, Page no. 163-64)

এই মন্তব্যের সঙ্গে দেবীপ্রসাদ যুক্ত করেছেন, তাঁর নিজের বক্তব্য-

What was historically possible for him was to workout some palliative remedy for suffering, which he saw everywhere and everything. All that he could suggest was to change subjective attitude to the World- to subdue the 'mental intoxicants' and thereby to attain 'a quietude of the heart'. Private property is to be renounced because, as the Buddha feels, it creates these mental intoxicants-longing, clinging, attachment, and so on. The view of the unreality of personality, he thinks, helps one to realise the foolishness of pursuing personal property and is thus an incentive to renounce private property.

But private property, as the Buddha understands it, is to be avoided within the samgha-s or communities of the monks.

...

The Buddha's demand for its abolition of private property is a demand for its abolition within the isolated pockets of society and it is not- what would have been historically premature- the demand for the abolition of private property from society as such. As the Buddha himself advises the brotherhood of Monks.

...

দেবীপ্রসাদ বলছেন, আরও অনেক কারণেই, মার্ক্সীয় অর্থে ‘বিপ্লবী’ অর্থে বুদ্ধকে চিহ্নিত করা অতিরঞ্জন এবং ভুল পাঠ হয়ে যাবে। কিন্তু তারমধ্যে বিপ্লবের উপাদান এবং প্রবণতাগুলিকে অস্বীকার করা তার থেকেও বড় ভুল হয়ে যাবে-

So it will be an error to make of the Buddha a revolutionary in our sense of the term. At the same time, it will be another error not to see what actually revolutionary about his sociology-particular in so far as it follows from his dialectical outlook- his view of everything being involved in perpetual flux. (Religion and Society,

Page No. 164-65)

এইভাবে তিনি আলোচনার ধারায় এসে পড়েন, বুদ্ধ কথিত, পরিবর্তনশীলতাই একমাত্র সত্য, এবং যা মার্ক্সের তত্ত্বেরও ভিত্তি-

Equipped with no tool For socio-historical analysis in our sense- or, more strictly, possessing the only tool in the form of his intuitive vision of the dialectical outlook- the Buddha is trying never the less to understand and explain a momentous historical question, the question of the origin of wealth which, as he understands, creates wickedness, aggressiveness and war. And what is revolutionary about his understanding is not merely and total absence of any supernatural cant about the phenomenon- and therefore that total absence of any tendency to invest them with any supernatural sanction as in the purusasukta and Rgveda, the Brahmana-s, Upanisad-s and above all the Dhramasastra-s- but the view that like everything else in the universe, wealth and the consequent aggressiveness and war, are subject to the relentless law of pratitya-samutpada: all these come into being subject to the collocation of a number of definite conditions and hence these are also destined to pass away.

From this point of view, Stcherbatsky's suggestion that the Buddha's rejection of private property is only a corollary of his rejection of soul and personal property, perhaps needs amendment. Still, in the Buddha's thoughts the rejection of the two is unconnected. The soul is unreal, because there is nothing but perpetual flux- the coming into being and passing away. But so also is the power of wealth and private property. Like the soul and personality, private property too is subject to the relentless law of pratitya-samutpada, which is the theoretical ground of the view of universal flux. (Religion and Society, Page No. 166)

দেবীপ্রসাদ তাঁর আলোচনায় স্বীকার করছেন, যে, আধুনিক সময়ে, আমরা যেভাবে ক্ষমতার স্তর, রাষ্ট্র-সম্পত্তির ধারণা, শ্রেণি-বর্ণ বিভাজনকে যে তত্ত্ব দ্বারা বুঝি, তা বুদ্ধের কালে অসম্ভব ছিল। তাকে সেভাবে বিচার করাও ইতিহাসগতভাবে ভুল হবে। যে ভুলটি বাণী বসু তাঁর উপন্যাসের ভূমিকায় করেছেন। আমরা পরে সে আলোচনা বিশদে করেছি। কিন্তু তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ধ্যান-ধারণায় ভেবেছিলেন, তাকে প্রয়োগ করেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। আমাদের এখনকার তত্ত্বের প্রাথমিক রূপ হিসেবে তা অবশ্য-পাঠ্য। এবং সেই উপাদানগুলিকে জোর করে সংযুক্ত এবং সম্পর্কিত করতে হচ্ছেনা। বুদ্ধের মতবাদেই তার যথেষ্ট সম্ভাবনার বীজ প্রোথিত।

It is no use speculating whether, given modern terminologies, the Buddha would have formulated his verdict on property-oriented society in the same way. The fact is that modern terminologies are not there for him-and the importance of which can in no way be overlooked-- is the dialectical view, the relentless law of pratitya-samutpada. This leads him to express, in his own way, the view that mere property career cannot be the final destiny of mankind: it comes into being subject to definite conditions and it is foredoomed to wither away. (তদেব)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মে এই ‘বৈপ্লবিক’ ধারণা গুলিকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিশেষত মহাযান বৌদ্ধধর্মে। বুদ্ধ রাজত্বকেও দেখেছিলেন, পরিবর্তনশীলতা নিরীখে। রাজাদের রাজত্ব স্থায়ী নয়, তাই অহঙ্কার অনুচিত। অন্যদিকে পরবর্তীকালে, পেট্রিনেজকে অব্যাহত রাখতে, রাজত্বের সঙ্গে ঈশ্বরত্ব যোগ করা হচ্ছে। বুদ্ধ সহ, ছোট বড় সমস্তরকম দেবদেবীর পূজা, আয়োজন, আড়ম্বরের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দেবীপ্রসাদ এবং Stcherbatsky দেখাচ্ছেন, বৌদ্ধধর্ম আর ‘সো-কল্ড হিন্দুধর্মের’ ফারাক ক্রমশ মুছে যাচ্ছে।

আমাদের আলোচিত উপন্যাসেও, বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি থেকে চোখ সরিয়ে দিতে, তাকে অতিমানব, অবতার না হলেও, ‘একক অসাধারণ’ করে তোলা হচ্ছে। বাস্তব প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা থেকে সরিয়ে, আধ্যাত্মিকতায়, বিচ্ছিন্নতার উদযাপনে জোর দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মতে, তার কারণ অবশ্যই সচেতন রাজনৈতিক অভিপ্রায়। ধনতান্ত্রিক বাজার কখনই, বাজারে সেই সাহিত্য-পণ্য ‘বেচবে না বা বিজ্ঞাপিত করবে না’ যা তারই বিরুদ্ধে যায়।

এই বিষয়টি আমাদের আলোচ্য বেশীরভাগ উপন্যাস সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বুদ্ধ বুদ্ধকাল ব্যবহারের প্রবণতা জটিল রাজনৈতিক অভিপ্রায়-সজ্জাত, বহুমাত্রিক।

আমরা একটু আগেই আলোচনা করেছি, ডিট্রাইবালাইজেশনের বিরোধিতা, লোকাযত স্থানীয় সংস্কৃতি, এবং সাধারণের মুখের ভাষার প্রতি মর্যাদা ইত্যাদি বুদ্ধের ভাবনার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেছিল। হয়ত সেই জন্যেই পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম টিকে ছিল, প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে। যে সমস্ত দেশগুলি মূলত উপজাতি নির্ভর সেখানেও দেখবো বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য-- নেপাল, ভুটান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ইত্যাদি। সাহিত্যে, উপন্যাসেও আমরা এই প্রবণতা ব্যবহৃত হতে দেখছি। আবার মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শাখা যেভাবে ক্ষমতা, রাজতন্ত্র, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে আপোষ করেছে, তার ফলেও ক্ষমতা এবং শাসক একে ব্যবহার করেছে নিজের পক্ষে। সেই উদাহরণও অনেক। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে রাজার অনুরোধে যাচ্ছেন, উপজাতিদের নিজের ধর্মের প্রাধান্যকে সীমিত করার উদ্দেশ্যে, রাজার মনোমত বৌদ্ধধর্মকে প্রচার করার জন্য। হয়ত কুমারজীবের চীনে যাওয়ার কারণও তাই। দেখেছি, রবীন্দ্রনাথ জাপানের সেনারা যখন যুদ্ধের আগে বুদ্ধের আশীর্বাদ নিতে যাচ্ছে, তাকে সমালোচনা করছেন। এই প্রবণতাকে পর্যবেক্ষণ করেই দেবীপ্রসাদ বলছেন-

ভারতবর্ষে যখন বৌদ্ধধর্ম আর রাজ-আনুকূল্য, বা রাজধর্মের মর্যাদা পাচ্ছে না, তখন আস্তে আস্তে তার জন্মভূমি থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু,

In some of the neighbouring countries-- specially Tibet and Mongolia-- the rising monarchical power found in the new Buddhism a very suitable ideology, not only providing with the most suitable palliative for suffering masses but also to keep them cowed with awe, wonder and fear. Thus the Tibetan historians of Tibet—who themselves profess to be devout Mahayanists-- tell us with tremendous enthusiasm about the zeal of the Tibetan monarchs to suppress the older religion of Tibet-- called Bon (pronounced as Pan)-- and establish Mahayana Buddhism as the state religion of the country. ... The Tibetan monarchs would not certainly have been so

enthusiastic about the religious reform of Tibet, if they did not sense in it a distinct political function. (Religion and Society, Page No 181-182

আমাদের আলোচনার মূল বক্তব্য তাই, যে ধর্ম আসলে একটি রাজনৈতিক উপকরণ। এবং তাকে ব্যবহার করা হয়, নিতান্তই রাজনৈতিক সাধনী (টুল) হিসেবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হেজিমনি এই প্রবণতাগুলিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আশ্বেদকর এবং রাহুল সাংকৃত্যায়নের প্রথম দিকে বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হন, জাতবর্ণের বিভেদহীনতার জন্য। কিন্তু এই অসাম্যের উত্তর ধর্ম নয়; কারণ বৌদ্ধধর্ম ততদিনে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে, রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিশ্বাসী হন কম্যুনিজমের আদর্শে। বুদ্ধের ভাবনায় সজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি, তিনি সংগঠক, এই পরিচয়টিকে গ্রহণ করছেন মার্কসবাদীরা। দেবীপ্রসাদের পাশাপাশি ধর্মানন্দ কোসাম্বী, নলিনাক্ষ দত্ত, রামশরন শর্মা, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এই দিকগুলি আলোচনা করেছেন। এই রাজনৈতিক দিকগুলিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যই, যখন পীতাতঙ্কের(৫ম অধ্যায়ে আলোচ্য) প্রচার প্রসার সত্ত্বেও বুদ্ধের প্রভাবকে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। সেখানে তাকে ‘ইচ্ছেপূরণের’ গল্পের নায়ক বানিয়ে তুলে, সাধারণের থেকে দূরে সরিয়ে ‘অবতার বা মহামানব’ বানিয়ে তোলা হয়েছে। এও এক রাজনৈতিক অভিসন্ধি। ফলে সাধারণ মানুষ তাকে অনুকরণীয় অনুসরণীয় না ভেবে, নিজেদের ভাবনায় আত্মীকৃত না করে, ভয়যুক্ত সমীহ করতে শেখে। বুদ্ধকে, বুদ্ধের ধর্মকে এই ভাবে পাঠ করাকে দেবীপ্রসাদ ভুল পাঠ বলেছেন। কিন্তু বাজার, ইতিহাসকে রূপকথা, মানুষকে দেবতা বানাতেই আগ্রহী!

(২)

মার্ক্সিজমের সঙ্গে বুদ্ধিজমকে মিলিয়ে পড়ার এই দর্শন বা ধারণা প্রস্থান, পীতাতঙ্ককে বিরোধী হিসেবে আরও স্থায়ী করে তুলল। ‘বিপ্লবের ভয়’, ব্যক্তিগত মালিকানার বিরুদ্ধতা, জনজাতির বিকাশ, ডিট্রাইবালাইজেশন বিরোধী রাজনৈতিক-প্রতিবাদ, স্থানভিত্তিক সংস্কৃতি, মাতৃভাষার প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন, উদ্ভূত বিরোধিতা সবই পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে ‘নিষিদ্ধ বুলি’।

ফলে কখনও পীতাতঙ্কের মধ্যে দিয়ে, কখনও ‘ছদ্ম লিবারেল’ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বৌদ্ধ দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা এই গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণের বিপরীতে চলতে থাকল, বাড়তে থাকল। বাজার তাকে জনপ্রিয় করে তুলল। চেরবাটস্কি, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, দেবীপ্রসাদ, কোসাম্বী, নলিনাক্ষ দত্ত, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, আশ্বেদকর, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের(সকলে এঁরা সববিষয়ে একমত নন) গবেষণাভিত্তিক আলোচনা, রাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে, শোষিতের পক্ষ হিসেবে এই মতকে হাজির করা, জনপ্রিয় হল না। আবার কেউ কেউ এই দিকগুলি আছে বলেই এই প্রেক্ষিতকে উপন্যাসে উপস্থিত করতে চাইলেন।

আমাদের চিহ্নিত প্রবণতা গুলি সম্পর্কে, জিতেন্দ্র নাথ মহান্তি, তাঁর আত্ম এবং অপর বইয়ে মন্তব্য করেছেন-

কয়েক বছর আগেও আমরা বেশ প্রত্যয় নিয়ে বলতে পারতাম যে, পৃথিবীর দর্দশা ঘুচত যদি একটি বিশ্বব্যাপী সরকার থাকতো,...একটি বিশ্বভাষা, একটি বিশ্বসংস্কৃতি, ...কোনো বিশ্বধর্ম এবং একটি বিশ্বমানবতার বোধ। ...

বহুসংস্কৃতিবাদ কিন্তু বিশ্বজাগতিক এক সংস্কৃতির সমর্থন নয়। আদতে এটি এমন এক প্রতিজ্ঞার প্রকাশ যা বিশ্বজনীনতার নামে বৈচিত্র্যকে ‘আত্মসাৎ করার’ বিরোধী। কার্যত বেশি শক্তিশ্বর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এটি স্থানীয় সংস্কৃতিগুলির প্রতিবাদের ভাষা, যেকোনো রকম বিশ্বায়নের বিরোধী।

এইজন্যই এখন অর্থনীতি এবং প্রযুক্তির বিশ্বায়নের পথে চলবার প্রবণতার সঙ্গে সংস্কৃতিগুলির নিজস্ব পরিচয় ঘোষণার একটি সংঘর্ষ চলছে। ...মানুষের চিন্তন ঠিক দাবা খেলার মতো নয়। এটি বরং নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাছাকাছি একটি ব্যাপার। প্রথমটি হলো পরিপ্রেক্ষিতহীন একটি আকারগত প্রক্রিয়া, দ্বিতীয়টি ইতিহাস এবং সংস্কৃতির একটি পটভূমিকে শর্ত হিসেবে রাখে। দ্বিতীয়ত, চিন্তন হলো প্রতিবর্তক্রিয়া। ... এর বাইরেও, জ্ঞাতা মানুষের একটি অন্তর্নিহিত প্রেক্ষিত আছে, বস্তুকে দেখার একটি অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ‘আমি মনে করি যে ...’ বলার মধ্যেই থাকে না, এটির মধ্য দিয়েই জীবন বয়ে চলে, একটি ‘মুদ্রিত রূপের’ মাধ্যমে এটি বুঝিয়ে দেওয়া যায় না, একজনের জীবনের পথ ধরেই এটি ‘প্রকাশিত’ হয়। ...

বিষয়িতা শুধু চিন্তন সম্পর্কীয় আন্তর-দৃষ্টিভঙ্গিটিই নয়, এটি কালগত এবং ঐতিহাসিক। ... আমার পরিবার এবং সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই আমার নৈতিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা, আমার কাছে সমস্যা এবং আমার নিজস্ব পূর্বতন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা, আমার কাছে সমস্যা এবং আমার নিজস্ব পূর্বতন সিদ্ধান্ত এখন আমিই স্মরণ করি।^৭

মহান্তি, ব্যক্তি বিষয়ক আলোচনায় বলছেন-

চেতনার কেন্দ্ররূপে ব্যক্তি জানে, প্রতিরূপ তৈরি করে, চিন্তা করে। কিন্তু ব্যক্তিরূপে, এই সবকিছু তো বটেই, সে আরও কাজ করে, বিচার করে, দাবি করে, অধিকার ও মূল্যবোধের ধারক হয়, অপর ব্যক্তিদের ক্রিয়া, বিচার মূল্যায়ণ, অধিকার ও মূল্যবোধের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ব্যক্তির যাপন

পরিসর কতিপয় বিষয়ের ক্ষেত্র নয়, বরং এক বাস্তব, মূল্যজড়িত পরিস্থিতি-ক্ষেত্র যা ক্রমাগত তাকে ছাড়িয়ে যায়, এবং সেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এর মধ্যে দিয়ে তার সত্তার নতুন নতুন সম্ভাবনাকে সে উদ্ভাবন ও অভিক্ষেপণ করে।

(তদেব, পৃ ১০৩)

এই দর্শনকেই আত্মসমীক্ষামূলক উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন ঔপন্যাসিক। বুদ্ধ থেকে বোধি থেকে চেতনা। এই চেতনার প্রশ্নে দার্শনিকভাবে বুদ্ধ ব্যবহৃত হচ্ছেন।

সাহিত্য সহানুভূতি বা একানুভূতি তৈরি করে তা আমরা জানি। তেমনি আধুনিকতা আরেকটি প্রশ্ন করতেও শেখায়। সাহিত্য একই সঙ্গে কার সঙ্গে ‘সহানুভূতিশীল, বা একানুভূতিশীল হওয়া যাবে না, তাকেও নির্মাণ করে সচেতন ভাবে। সাহিত্য ‘অপর’কেও নির্মাণ করে, তাঁকে বজায় রাখতে, একপেশে করে দিতে সাহায্য করে। ধারাবাহিকভাবে প্রাধান্য-প্রভাবিত ‘অপর’ পাঠকদের মনে স্থায়ী জায়গা করে নেয়। বিচারবুদ্ধি লোপ করে, স্থায়ী ‘সন্দেহ’ বীজ বুনে দেয়। আস্তে আস্তে, ‘জাতি-ধর্ম-বর্ণগত অপর’-কে ‘ক্রিমিনালাইজ’ করতে থাকেন লেখকেরা জনপ্রিয়তার লোভে। শুধু এটুকুই নয়, রাষ্ট্র নির্ধারিত ‘অপর’রা সাহিত্যেও ‘অপর’ হওয়ায় দেশবাসীকে ‘ম্যানিউপুলেট’ করার ভূমিকা নেয়। তা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পরিস্থিতি রচনা করতে সাহায্য করে। দেশবাসীর কর যুদ্ধে খরচের কস্টেন্ট পাওয়া যায়। আমরা শেষ দুটি অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবো।

লিঙ্গ, বর্ণ সংস্কৃতির মান্য বিভাজনের রাজনীতিকে সচেতনে অবচেতনে চারিয়ে দেয়, গল্প- উপন্যাস। গ্রামশির হেজমনি- এর ধারণা রাজনৈতিক মতাদর্শকে তৈরি করতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। তা প্রভাবিত করে সাহিত্যকে। সাহিত্যিকরা কখনও হেজমনির পক্ষে মত সাজিয়েছেন কখনও এর বিরুদ্ধে। নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী। বাজার যে জনপ্রিয় সাহিত্য-পণ্য নির্মাণ করে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আধিপত্যের ভাবনার বিস্তারই ঘটায়। বুদ্ধিজীবীদের যে দুটি ভাগ গ্রামশি করেন,- জৈব এবং প্রথাগত, তাঁর মতে এই দুই ধরণই কোনো শুদ্ধ স্বতন্ত্র স্বাধীন শ্রেণি নয়, তাদের শ্রেণিপরিচয় তথা শ্রেণি আনুগত্য কোথাও প্রকাশিত কোথাও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মাত্র।^৮

দেশভাগ ছাড়াও যেকোনরকম বাস্তবচ্যুতি, গ্রাম থেকে শহরে যাত্রা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় বিবর্তন, নগরকেন্দ্রিক-যাপন, পারিবারিক বন্ধন থেকে একাকী মেস বা কর্মজীবন, অন্যরকম লড়াইয়ের সূত্রপাত ঘটাচ্ছে, সেই আপোষ-লড়াই বাইরের সঙ্গে তো বটেই কখনও কখনও ভেতরে নিজের সঙ্গে। গভীরভাবে ভেবে দেখলে এই বিচ্যুতির মূলে আবারও আছে অর্থনৈতিক পরিবর্তন। ‘ব্যক্তি’ হয়ে ওঠা ‘আত্ম-অন্বেষণ’ এর জন্য বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের কাঠামো আসলে এই ‘বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব’ উদযাপন করতে শেখায়। ফলে মানুষ প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্যও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষমতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। বিচ্ছিন্নতার এই স্তরগুলি লক্ষ্যণীয়। আমাদের আলোচিত উপন্যাস গুলিতে এই স্তরের মাত্রাগত পার্থক্য, স্রষ্টাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী করতে পারি। মার্ক্সের পণ্যরতির ভাবনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত কী না ভেবে দেখতে পারি। আখ্যান যখন ‘পণ্যের’ চরিত্র ধারণ করে। তখন পাঠকও ‘ছদ্ম-ইচ্ছেপূরণের এবং বিচ্ছিন্নতা-উদযাপনের’ গল্পগুলি পড়ে ‘শান্তি বা উপশম’ পাওয়ার চেষ্টা করে। পথিক বসু এই অবস্থা সম্পর্কে বলছেন-

পণ্যরতি পর্যায়ে মানুষ নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে একেজো হয়ে যায়। তারপর পণ্য মারফৎ আত্মপ্রকাশে সন্তুষ্ট হয়। শোষণ যতদিন থাকবে পণ্যরতিময় পরিস্থিতি ততদিন কায়ম থাকবে। পরিস্থিতিটা যেন সিস্টেমের অনিবার্য পরিণাম হয়ে দাঁড়াবে। মার্কস এই অবস্থাকে inhuman activity for alienation মনে করতেন। পরিস্থিতিটা শোষকের সচেতন শোষণবৃত্তির বৃত্তে শোষিত মানুষকে ঘিরে ধরবে।^৯

যত পাঠক এইসব ইচ্ছেপূরণের উপাদান পাবে, ততই সে, নিজের শ্রেণীগত অবস্থান, রাষ্ট্রের কাছ থেকে না-পাওয়া মৌলিক দাবীদাওয়া গুলি ভুলে থাকবে। আবার ‘একাকিত্বের উদযাপনে’ তাকে বারবার মনে করানো হয়, সে বিচ্ছিন্ন, তার সমস্যা বিচ্ছিন্ন-ব্যক্তিগত, তার সমাধান সম্ভব- এক, হয় যদি সে ‘অতিমানব, নায়ক’ হয়ে তার সমাধান করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে। নয়তো, দুই, তাকে সহ্য করে যেতে হবে, কারণ তার সমস্যা তার ‘একার, ব্যক্তিগত, বিচ্ছিন্ন’। সমস্যাগুলির মূল সমাজের শোষণ-বৃত্তে খুঁজতে সে ভুলে যাবে, ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

ফলে জনপ্রিয় সাহিত্যপণ্য, ক্ষমতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। আমাদের পাঠ্য উপন্যাসে, একদল যেমন 'রাজনৈতিক স্বার্থে' ঘোষিত ভাবে বুদ্ধকে ব্যবহার করছেন; আরেকদল তাকে ঘোষিতভাবে 'অরাজনৈতিক' বলতে চাইছেন। বলাবাহুল্য, দুই পদ্ধতিই রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে অস্তর্গত।

(৩)

প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার রেশ ধরে আমরা বলতে পারি, উনিশ-বিশ শতকের লিберাল এপ্রোচ আরও বেশি করে হিন্দু বৌদ্ধ ইসলামকে ডিফাইন করে দিল। ধর্মের পারস্পরিক দার্শনিক মেলামেশা গুলো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। দর্শনের সঙ্গে আচার-সংস্কার-রীতি মিশে জল-অচল পার্থক্য গড়ে উঠল। উপন্যাসগুলিতে ধর্মকে গল্পের মাধ্যমে লড়িয়ে দেওয়া হল, নায়কের ধর্ম এবং ভিলেনের ধর্ম এভাবে বাইনারি নির্মাণ করা হল। উনিশ শতক যুক্তিবাদের যুগ, বুদ্ধিজীবীদের নব নব আবিষ্কার, চর্চার যুগ তো বটেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সংকীর্ণতার নির্মাণও মূলত উনিশ-বিশ শতকে। সেকথা অস্বীকার করা যাবে কি? ধর্মকে ভিত্তি করতে গিয়ে ভারতীয় রাজনীতির বড় বাজি হয়ে দাঁড়াল ধর্ম, আভ্যন্তরীণ নীতি রক্ষায় তো বটেই, বিদেশ নীতিতেও, ঔপনিবেশিকতা আরও জেঁকে বসল। রাষ্ট্র-যন্ত্রের শাসক শাসিত পার্থক্যকে আরও চেপে বসানোর প্রক্রিয়া সাহিত্যের মধ্যে দিয়েও শুরু হল। চলল, পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ নির্মাণের ছক, হেজমনির স্বার্থে। দেশের এবং দেশের বাইরের প্রতিবেশীরা পরিচিত হল মুসলমান, বৌদ্ধ ইত্যাদি 'ধর্মীয় অপর'। দেশের ভেতরের এবং বাইরের প্রতিবেশীদের খাদ্যাভ্যাস, দৈহিক গঠন, বর্ণ, জাতি, সংস্কৃতি, ভাষা সব কিছুকে 'অপর' করতে করতে প্রতিপক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হল। তাদের শিল্প-কলা-স্থাপত্য-বাণিজ্য-সাহিত্য সব কিছু 'ধর্ম ছাকনিতে' 'অপর' হয়ে গেল।

উপন্যাসের আলোচনায় প্রাথমিকভাবে উল্লেখ্য- তিনজন ইতিহাসবিদ, গবেষক এবং ঔপন্যাসিক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দীনেশচন্দ্র সেন। এঁরা বুদ্ধকাল সম্পর্কে ইতিহাসচর্চা এবং গবেষণা করেছিলেন, পাশাপাশি এই বিষয়ক উপন্যাস লেখেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত ধর্মাচারণ দ্বারা কম নিয়ন্ত্রিত; ইতিহাসনিষ্ঠ গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখেছেন- *কাঞ্চনমালা* (১২৮৯ বঙ্গাব্দে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে আষাঢ় থেকে মাঘ সংখ্যায়

প্রকাশিত। ১৩২২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।) এবং তার বহুবছর পরে *বেণের মেয়ে* একদিকে এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর গবেষণা অন্যদিকে বঙ্কিমের সঙ্গে তার বন্ধুত্বে তিনি ইতিহাসনিষ্ঠতাকেই বেছে নেন। তৈরি হয় বঙ্কিমের সঙ্গে মতানৈক্য এবং দূরত্ব।

প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতকের যেসব প্রবণতা আমরা আলোচনা করেছি, এই উপন্যাস গুলিতে সেই প্রবণতা দোলাচলতা, দ্বন্দ্ব আমরা খেয়াল করব। হরপ্রসাদ বৌদ্ধধর্মকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েই দেখেছেন। তাঁর উপন্যাসের বিষয় মূলত, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিরোধ। *কাঞ্চনমালা*’র প্রেক্ষিত, অশোকের কাল; খ্রিষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। সেখানে শ্লাঘাপূর্ণ, অভিজাত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পরাজিত হয়ে, ক্ষমাসুন্দর মানবিক বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর প্লট নির্মাণে *কুণাল অবদান* এবং *শিবিজাতক*, *মহাপদ্মজাতকের* প্রভাব আছে।

হরপ্রসাদ নিজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন; কল্পকাহিনির মাঝে সরাসরি মন্তব্য করেন-

দাঁড়াইয়ো না, যে মহৎ কর্মের উদ্দেশ্যে তোমরা আজি উদ্যোগী, বিধর্মী ব্রাহ্মণের যদি আশীর্বাদ গ্রাহ্য হয়, আশীর্বাদ করি, কৃতার্থ হইয়া জগৎকে কৃতকৃতার্থ করো।^{১০}

উপন্যাস শেষ হচ্ছে-

এই দিবস যে কার্য হইল। তাহার বলে এক হাজার বৎসর ভারতে বৌদ্ধ ছিল। সমস্ত এশীয়া এই দিনের কার্যবলে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে। (পৃ ১৮৭)

আর ‘বেণের মেয়ে’ চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত নারায়ণ-এ ১৩২৫ এর কার্তিক থেকে ১৩২৩ এর অগ্রহায়ণ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। প্রেক্ষিত সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের কাল। যখন বৌদ্ধধর্ম তন্ত্র-মন্ত্র দেহবাদী, দেবদেবী নির্ভর বিভিন্ন লোকাযত ধারার সঙ্গে মিলে গিয়ে, রাজা এবং অভিজাতদের আনুকূল্য না পেয়ে প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে কোনোরকমে টিকে থাকছে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মুসলমান আক্রমণের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

মঙ্গলকাব্যে যেমন আমরা দেখি প্রতিপত্তিশালী বণিকদের মধ্যে দিয়ে লোকাযত দেব-দেবীদের প্রধান করে তোলার চেষ্টা চলছে। এখানেও সেই ইতিহাস। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ উভয়েই প্রাধান্য লাভের জন্য রাজার থেকেও বেশি বণিকদের দলে টানতে চেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্র বিহারী

দত্ত এবং সাধু বেণে; গল্পে উভয়ের সম্পত্তির অধিকারিণী কন্যা এবং পুত্রবধূ মায়া। ফলে মায়াকে দলে টানার লড়াই কেন্দ্রীয় লড়াই, এই দুই ধর্মীয় প্রতিপক্ষের। শেষে রূপা রাজার বৌদ্ধরাজ্য নাশ হয়ে হরিবর্মার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপন্যাসে, বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাওয়া, দেহবাদী সহজিয়াদের প্রতি অভিজাতদের ঘৃণা, সজ্জে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বংশবিস্তারের ফলে স্থান ও সুস্থ পরিবেশের অভাব, তন্ত্র-মন্ত্রের প্রাধান্য, সাধনসঙ্গিনী লাভের লোভ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাস এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের প্রভাবে সাহিত্যরস কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় বটে। কিন্তু হরপ্রসাদের এই সত্যনিষ্ঠা পরবর্তী আর কোনো ঔপন্যাসিকের মধ্যে আর সেভাবে দেখা যায়নি। প্রবল হিন্দু-জাতীয়তাবাদের যুগে হরপ্রসাদের এই প্রবণতা আমাদের বিস্মিত করে! তিনি ইতিহাস নিষ্ঠা, গবেষণালব্ধ প্রমাণকে গল্পের মধ্যেও বুনে দিয়েছিলেন।

এর সঙ্গে আরেকটি মন্তব্য যুক্ত করা খুব প্রয়োজনীয়, আগেও বলেছি, আবার পুনরাবৃত্তি করছি। এই যে, ধর্মীয় রাজনীতির প্রসঙ্গ এর সঙ্গে জাতীয়তাবাদ নির্মাণ প্রচেষ্টা এবং বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রসঙ্গে, বুদ্ধ-বৌদ্ধকাল-বৌদ্ধসাহিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষত ‘বাঙালি’ এই আবেগ থেকে এঁরা অনেক বেশি এই কালের চর্চা করেছেন, তাকে নিজদের মতাদর্শের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

বাঙালি জাতির স্বরূপ নির্ধারণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তথ্য প্রমাণ সহযোগে বলছেন-

বাঙালি মূলত বর্ণসংকর। ব্রাহ্মণ্য উপাদান, ইসলামি উপাদান, বৌদ্ধ উপাদান ইত্যাদি মিলেই বাঙালি জাতি। স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই এই সামগ্রিক পরিচয়কেই বহন করে।

তিনি ফারসি, উর্দু ও মুসলমানি বাংলায় লেখা গ্রন্থকেও ‘বঙ্গীয় সাহিত্য’ হিসাবে স্থান দেওয়ার পক্ষে এই যুক্তি দেন।^{১১}

এই উদারতা পরবর্তী আর কোনো ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি, দু একজন ব্যতিক্রমী ছাড়া। তাঁর উপন্যাসেও এই দৃষ্টিভঙ্গির চিহ্ন আছে। *কাঞ্চনমালা* শেষ হয়, অশোকের কালে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সত্যে, ব্রাহ্মণ কুঞ্জরকর্ণ তার নিষ্ঠুর কর্মফলের শাস্তি পায়। কুঞ্জরকর্ণের শাস্তি হিন্দুত্ববাদীদের মনঃপুত হয়নি তা আমরা জানি। *বেণের মেয়ে* হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠায় শেষ হয়না। শেষ হয় সর্ব ধর্ম সমন্বিত,

উদার মহৎ সংস্কৃতিবান বাংলার স্বপ্ন নিয়ে। হরিবর্মার রাজ্যে, মস্করী, সর্বধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে কবিসভার আয়োজন করে। এই উপলক্ষে তার সারাভারত ভ্রমণের বর্ণনা আছে। গল্পে বৌদ্ধধর্মের পতনের পরও, ওদন্তপুরী, নালন্দার সমৃদ্ধ বৌদ্ধধর্মের বর্ণনা আছে। বুদ্ধরক্ষিত, ‘লোকেশ্বর শতক’ রচয়িতা বজ্রদত্ত, প্রজ্ঞাকরমতি প্রভৃতি বৌদ্ধভিক্ষুদের বর্ণনা আছে। মাহমুদের আক্রমণের আশঙ্কা এবং পাশাপাশি সভায় রত্নাকর শান্তি, শ্রীহর্ষ, ক্ষেমীশ্বর, বজ্রদত্ত প্রভৃতিদের গুণ-বর্ণনায় উপন্যাস শেষ হয়েছে। ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ উপন্যাসে বুদ্ধ-উপাদানে সমৃদ্ধ, ইতিহাসনিষ্ঠ।

এখান থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মতান্তরের কারণ। বঙ্কিমের, পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে হিন্দুধর্ম এবং কৃষ্ণচরিত্র প্রচারের বিরোধিতা করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বঙ্কিমও ইতিহাসনিষ্ঠভাবে বৌদ্ধধর্মের চর্চাকে ভালো ভাবে দেখেননি। হরপ্রসাদ লিখেছেন-

...সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটা জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কালিদাস কোথাও ধর্মপ্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতো হিন্দুধর্মের প্রচারকও বিরল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে overrule করিলেন।^{১২}

বেণের মেয়ে লেখার বহুদিন পরে তা প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমের মৃত্যুর পর। বঙ্কিমের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও কাঞ্চনমালা সম্পর্কে কোনো প্রকাশ্য মন্তব্য তিনি করেননি। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গবেষণা, তা নিয়ে চর্চা, বৌদ্ধধর্মের পক্ষ নিয়ে উপন্যাস লেখা বঙ্কিমের বিশেষ পছন্দ ছিল না।

আমার সঙ্গে তাঁহার দুই-তিনবার ঘোরতর মতভেদ হইয়াছিল, এমন-কি, তাহার জন্য আমাকে কিছুদিন বাংলা লেখা ছাড়িতেও হইয়াছিল।

(তদেব, পৃ ৩৯, ২য় খণ্ড)

অবাক লাগে, বঙ্কিমের মৃত্যুর পর হরপ্রসাদ তাকে বুদ্ধের সঙ্গেই তুলনা করেছেন! আমরা কল্পনা করতে পারি না, বঙ্কিমের জীবদ্দশায় হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হত!

লোকোত্তরবাদীরা বলিতেন, তিনি যদি মানুষ হইতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সবই ফুরাইয়া যাইত; কিন্তু বুদ্ধ মরিলেও তো তাঁহার সব ফুরায় নাই, তাঁহার সঙ্ঘ বর্তমান আছে, তাঁহার শাসন বর্তমান আছে, তাঁহার বিনয় বর্তমান আছে, তাঁহার ধর্ম বর্তমান আছে, তবে তিনি আর মরিলেন কি? ... আমাদেরও বঙ্কিমবাবু সেইরূপ।

লোকোত্তরবাদী মাহাযানীরা বুদ্ধকে- বুদ্ধ-প্রতিবিক্ষকে, বুদ্ধ-মূর্তিকে উপায় বলিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, বোধি প্রজ্ঞা নির্বাণ। বুদ্ধ আর কিছুই নহেন, সেই বোধি, সেই প্রজ্ঞা ও সেই নির্বাণ পাইবার উপায়। তিনি যেক্ষেপে পাইয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপে পাইব। ...তিনি জীবনে আমার

Friend Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনো তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।

(তদেবপৃ ৪৪-৪৬)

এরপর বঙ্কিমের আরেক গুণমুগ্ধ শিষ্যের কথা বলবো, যাঁর সঙ্গে তাঁর কোনো মতবিরোধ ছিলনা। যিনি বিনা প্রশ্নে বঙ্কিমের হিন্দুজাতীয়তাবাদকে মেনে নিয়েছেন। তাকে জরুরি মনে করে তাঁর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন, নিজের ইতিহাসচর্চা, গবেষণা এবং উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। তাঁর উপন্যাসগুলিতে ধর্মীয় ‘অপর’ তৈরি করতেই বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ। এই শুরু। এরপর এই প্রবণতা চলতে থাকবে। আমরা বলছি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। তাঁর উপন্যাস *শশাঙ্ক* (১৯১৫); *ধর্মপাল* এবং *করুণা*।

শশাঙ্ক চরিত্রটিকে আমরা , বৌদ্ধধর্ম বিনাশকারী হিসেবে ইতিহাসে পাই। রাখালদাসের উদ্দেশ্য তার কলঙ্কমোচন। তিনি যশোধবল নামে একটি কাল্পনিক চরিত্রকে দায়ী করেন বৌদ্ধবিহার ধ্বংস, বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচারের জন্য। শশাঙ্ক এখানে তাঁর সহকারী মাত্র। এখানে প্রতিপক্ষ, পণ্ডিত, দূরদর্শী ভবিষ্যৎবক্তা- বৌদ্ধ বজ্রাচার্য চরিত্রটি। উল্লেখ করবো এইরকম চরিত্রদের শরদিন্দুও ব্যবহার করেছেন। উদ্দেশ্য প্রায় একই। কিন্তু রাখালদাসের অভিপ্রায়ের মত, এত প্রকট-প্রকাশ্য নয়। আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। আপাতত এই উপন্যাসে দেখবো এই চরিত্রটি ছাড়া বাকি ভিক্ষুরা, বিপথগামী, ধর্ম-বুদ্ধ-সঙ্গে আস্তাহীন, দুর্বল, ব্যভিচারী, লঘু পরিহাসপ্রিয়, বুদ্ধিহীন ভাঁড়ের মত (ভিক্ষু দেশানন্দ চরিত্রটি), গুপ্তচর, রাজদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ‘মহানুভব নায়কের নির্মাণ’ এবং প্রতিপক্ষকে সর্বতোভাবে হীন করা- এই বৈশিষ্ট্যগুলি রাখালদাস খুব সফলভাবে করে দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। সাধারণভাবে অহিংস, পণ্ডিত, করুণামূর্তি- ভিক্ষুদের ইমেজকে রাখালদাস অত্যন্ত সচেতনভাবেই ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন। বলা ভালো, যেখানেই ‘অপর’ হিসেবে বৌদ্ধরা এসেছে, তাদের বর্ণনা এমন- রামায়ণে, নাস্তিক এবং চোর; চৈতন্যচরিতামৃত- তে ব্যভিচারি ইত্যাদি। আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। উপন্যাসে, বুদ্ধঘোষ চরিত্রটি সজ্জ টিকিয়ে রাখতে সবরকম অন্যায় করতে প্রস্তুত; হত্যা, নিষ্ঠুরতা, যুদ্ধ-প্রবৃত্তি, রণকুশলতা এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। রাখালদাস বিভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তাদের এই স্বরূপকে নির্মাণ করে

চলেন, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। এই উপন্যাসে বৌদ্ধরা এতটাই দুর্বিনীত হয়ে ওঠে যে, ইতিহাস অস্বীকার করে শশাঙ্ক হয়ে ওঠে অপরাধীর শাস্তিবিধানকর্তা। শশাঙ্কের নিষ্ঠুরতা যে ভিক্ষু-ইতিহাসবিদদের মিথ্যাকুৎসা একথা রাখালদাস মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। উপন্যাসিকের কৌশলে বিধর্মী রাজার বৌদ্ধধর্মের প্রতি অত্যাচার নয়, অপরাধীর শাস্তিবিধানই প্রধান উদ্দেশ্যরূপে দেখা দিয়েছে। শশাঙ্ক বীর্যবান, দয়ালু, অন্যায়ের শাস্তিবিধানকারী, হিন্দুধর্মনিষ্ঠ রাজা; ঐতিহাসিক উপন্যাসের 'আদর্শ নায়ক'। শশাঙ্ক চরিত্রটি রাখালদাসের খুব প্রিয়; কারণ তিনি মনে করতেন- বাঙলা ও বাঙালির প্রথম স্বাভাবিক ঘোষণা করেন শশাঙ্ক। তার চারিত্র্য জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রথম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।^{১৩}

আমরা আগেই বলেছি 'বাঙালির আত্মপরিচয়' নির্মাণে স্রষ্টাদের নিজস্ব মতামতের কথা। রাখালদাসের বৌদ্ধবিদ্বেষ(বিধর্মবিদ্বেষ) তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠাকে অতিক্রম করে গেছে।

ধর্মপাল (১৯১৫) উপন্যাসের ভূমিকাতেই বলেছেন কেন শশাঙ্কের পর ধর্মপাল লিখেছেন।

শশাঙ্ককে লইয়া গোড় দেশে স্বতন্ত্র ইতিহাসের সূচনা হইয়াছে এবং ধর্মপাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়; এইজন্য 'শশাঙ্ক' এর পরে 'ধর্মপাল' লিখিত হইয়াছে। (তদেব, পৃ ২৬৭)

এই উপন্যাসেও 'খাদ্যসংস্কার' থেকে মন্তব্য-

বৌদ্ধদের কথা আর বলিও না ভাই, স্বয়ং বুদ্ধদেব বুড়া বয়সে শূকর-মাংস খাইয়া মরিয়াছিলেন। (তদেব, পৃ ৩০৯)

এই প্রসঙ্গটি বারবার বাঙালি লেখকেরা কুসংস্কারচ্ছন্নতায় তুলে এনেছেন, মেনে নিতে পারেন নি। এখানে যেমন ব্যঙ্গ করা হয়েছে অন্যরা তেমনি, যুক্তি দিয়ে খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন! এটিতে যেন, বুদ্ধের অসংযম আবিষ্কার করা গেছে! শূকরমাংস খাওয়ার প্রথা মুনিকজাতক, শালুকজাতক, তুত্তিলজাতক-এও পাবো। আমরা এর পরের অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

এছাড়াও আছে, মহাযানী এবং বজ্রযানীদের পরস্পর বিরোধ প্রসঙ্গ; বুদ্ধভদ্র বুদ্ধমিত্র জীনদাস প্রভৃতি বৌদ্ধ চরিত্ররা এই উপন্যাসে ধর্মপালের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্রকারী, বিশ্বাসঘাতক। কেন? তার কোনো যুক্তিযুক্ত উত্তর উপন্যাসে নেই। রাখালদাস গৌরবময় যুগের কৃতিত্ব, বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের প্রভাবকে দিতে

চাননি, দিয়েছেন, ব্যক্তিরাজাদের নেতৃত্বকে। এবং সেই গৌরবকে ‘হিন্দু বাঙালির আত্মপরিচয়ের’ সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন।

করুণা (১৩২৪) উপন্যাসের সময়কাল পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিক থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী। ধারাবাহিকভাবে উপাসনা পত্রিকায় বেরিয়েছিল। করুণা উপন্যাসটি সুখপাঠ্য নয়; চরিত্রটির বিকাশও তেমন ঘটেনি, নামকরণেও তেমন যুক্তি নেই। প্লট,- কুমারগুপ্তের পর অনন্তাদেবীর পুত্রকে রাজা করার ষড়যন্ত্র। যে ষড়যন্ত্র এবং রাজদ্রোহিতার মূলে আছে বৌদ্ধরা। বুদ্ধরক্ষিত নাগার্জুন এই উপন্যাসে “জ্ঞানী ভবিষ্যৎবক্তা” হিসেবেই সীমিত। আগেও বলেছি শরদিন্দুর চরিত্রগুলিও এমনি ‘জ্ঞানী, ভবিষ্যৎবক্তা’। করুণা-য় প্রতিপক্ষ ভিলেন, ভিক্ষু হরিবল- ষড়যন্ত্রী, লোভী, ব্যাভিচারী, অহঙ্কারী, রাজদ্রোহী, অধর্মী, বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত; রাখালদাসের অভিপ্রায় অনুযায়ীই নির্মিত।

এই উপন্যাসের ভূমিকায় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় লেখেন-

বৌদ্ধ ভিক্ষু, তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর অভিচারক্রিয়া এবং নানা অলৌকিক ব্যাপার উপন্যাসের পটভূমিকায় অনাবশ্যক গুরুত্ব লাভ করেছে, ফলে উপন্যাসের মূল কাহিনী কিছু বাধাগ্রস্ত হয়েছে।^{১৪}

আমাদের মত, কাহিনি রাখালদাসের উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মীদের ‘অপর’ হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়া। রাখালদাস সচেতনভাবেই তাঁর উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি সফল। পাঠকের সহানুভূতিকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিপক্ষে চালনা করেছেন। তাঁর ইতিহাসচর্চা, হিস্টরিওগ্রাফি (Historiography) এই রাজনৈতিক মতাদর্শ, অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত। এখানে তাঁর প্রবন্ধ এবং ইতিহাসের বইগুলির বিস্তৃত আলোচনার পরিসর নেই।

বাংলা উপন্যাসে এইভাবে বৌদ্ধদের চিত্রিত করার, পুরোধা হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সমকালের পীতাতঙ্ক প্রভাবিত যে উপন্যাসগুলি আমরা আলোচনা করবো, সেই প্রবণতার দেশীয় পথপ্রদর্শক হলেন রাখালদাস। তাঁর পদ্ধতি এতটাই জনপ্রিয় হয় যে তারপর তা পীতাতঙ্কের প্রবণতার সঙ্গে মিশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইতিহাস নিষ্ঠা, সর্বধর্ম সমন্বয়, বাঙালির আত্মপরিচয়ে নির্মাণে বৌদ্ধ-উপাদানের

ভূমিকা ইত্যাদি গবেষণা ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আর জনপ্রিয় কল্পকাহিনিতে প্রাধান্য পায় 'অপর' নির্মাণের প্রবণতা।

রাখালদাসের সমসাময়িক, এবং তাঁর 'জাতীয়তাবাদী, হিন্দুপ্রধান, বৌদ্ধবিদ্বেষী' ধরণকে আরও জনপ্রিয় করে তুললেন আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিক। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের *বীরবরণ* (১৮৮৩) নিঃসন্দেহে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রভাবিত করেছিল। উপন্যাসটির কাল, পালযুগের শেষের দিক। এখানে পাল রাজত্ব এবং বৌদ্ধধর্মকে 'বহিরাগত, বিধর্মী' প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বীরেন্দ্র, এবং মলয়ার প্রেমকাহিনী ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিবৃত হয়েছে; আর এখানে 'অপর, বিধর্ম' হিসেবে বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি। রাজা বীরসেনের উদ্দেশ্য-

বঙ্গেশ্বর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, “তখন, আমি জানিয়াছি, আমার কল্পনা-- এই মহাব্রত- এই জাতীয় মহাকার্য্য সাধিত হইবেই হইবে। গুরুদেব, আমার প্রতিজ্ঞা-প্রতিহিংসা-প্রতিহিংসা-প্রতিহিংসা। বৌদ্ধ গৌড়েশ্বর যতই বলীয়ান হউক না কেন, যতই ক্ষমতাশালী হউক না কেন, সেই বিধর্মীর করালকবলহইতে জননীকে উদ্ধার করিবই করিব।”^{১৫}

জাতীয়তাবাদকে কীভাবে বিধর্মী নিধনের আখ্যানে পরিণত করে তোলা হয়, তার উদাহরণস্বরূপ আরেকটি উদ্ধৃতি দেবো-

ভারতের কি নাই?- সকলই আছে। ...সময়ভেদে নাই একতা, নাই উদ্দীপনা, নাই নেতা। ...নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি- সনাতন আর্য্যধর্মের অবমাননা- আত্মনিগ্রহ-অনেকতা-স্বজাতিবিদ্বেষ ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ...এক্ষণে কেবল পিতৃধর্মের সম্মান- শৈবধর্মের বাহুল্য প্রচার, জাতীয় একতা এবং জাতীয় উদ্দীপনার প্রয়োজন। ...প্রত্যেক হিন্দু যখন বুঝিবে যে, বিধর্মী পালবংশ অন্যায়রূপে জাতীয় স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে, আমাদিগকে ক্রীতদাসপদে পরিণত করিয়াছে, তখন তাহাদিগের চৈতন্য হইবে। (তদেব, পৃ ২৭,২৮,২৯)

এই সংকল্পই শেষ অঙ্গি চরিতার্থ হয়, বৌদ্ধরাজের ছিন্নমাথা নিয়ে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায়; এবং স্বাভাবিকভাবেই তাকে গ্লোরিফাই করা হয়।

এই জাতীয় উপন্যাস হিসেবে হরিদাস পালিতের 'চান্দেলী' (১৩২২) খুবই জনপ্রিয় হয়। উপন্যাসটি খানিকটা রপকথাধর্মী, ইচ্ছেপূরণের আখ্যান। এর নামপত্রটি খুব উল্লেখযোগ্য। গৃহস্থ গ্রন্থাবলী- ১১, অর্থাৎ বেশিরভাগই পাঠিকা; এবং বলা হয়েছে, 'ঐতিহাসিক কাহিনী', কিন্তু কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম ব্যবহার ছাড়া, ইতিহাসের তেমন কোনো উপাদান আমরা উপন্যাসে দেখি না। কেন্দ্রীয় চরিত্র,

চান্দেলী 'ব্যভিচারী বৌদ্ধধর্মমতাবলম্বী' এবং 'ভিলেন'। আখ্যানকাল, লক্ষ্মণ এবং বল্লাল সেনের রাজত্বকাল। অন্যান্য লেখকদের মতই, 'প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ভালো কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বাকি পথ গুলি ভালো নয়' এ ভাবনাই প্রকাশিত।

এর নিবেদন অংশে হরিদাস পালিতের মন্তব্যগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ-

বার বৎসর পূর্বে "চান্দেলী" লিখিত হইয়াছিল। ...কুলপঞ্জিকা অবলম্বনে ও ইতিহাসের আবরণেই ইহা রচিত হইয়াছে। ...সমাজ যাহা অবগত আছে এবং যে আদর্শে বঙ্গীয় সমাজ পরিচালিত হইতেছে- তাহারই মর্মকথা লইয়া এই গ্রন্থের কলেবর পরিপুষ্ট। ...উপন্যাস মধ্যে যে সকল কথা অতি প্রয়োজনীয় সেইরূপে কথারই আলোচনা করা হইয়াছে।

আশা করি গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ মধুপের ন্যায় গুণভাগই গ্রহণ করিবেন-- রাষ্ট্রবিপ্লবের, আত্মকলহের, ধর্মবিদ্বেষের অশুভ ফলের বিষয় একটু চিন্তা করিয়া, দেশের ও দেশের মুখ চাহিয়া যাহা করা কর্তব্য তাহা করিবেন। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।^{১৬}

এই বক্তব্য, আমাদের মনে হয় এই ধরনের উপন্যাসের সকল লেখক সম্পর্কেই প্রযোজ্য। একই সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহী না হওয়া এবং সমাজচলতি নৈতিকতার পাঠ দেওয়া এই উপন্যাসগুলির গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করেছি।

পরিশিষ্টে দেখা যায়, রাজা বল্লাল সেন চান্দেলীকে মঠে নির্বাসিত করলে, সে বাকিদের 'রূপমুগ্ধ' করে তার অনুগত করে, এবং প্রতিবাদীদের হত্যা করে।

চান্দেলির চক্রান্তে ও কৌশলে গৌড়মণ্ডলের সমগ্র বৌদ্ধসমাজ তাঁহার পদানত হইয়া পড়ে। ...বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়মণ্ডলবাসী বৌদ্ধগণের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করেন। সমগ্র বৌদ্ধসমাজ ভীষণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। দেশের মধ্যে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে। ...এই ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধগণের ঘাত-প্রতিঘাতে রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র বিচলিত হইয়া পড়ে। ...ছদ্মবেশিনী চান্দেলী গৌড়েশ্বরী হইবেন এই ইচ্ছায় গুপ্ত ষড়চক্রের সৃষ্টি করেন। ...ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের দ্বন্দ্বের ফলে গৌড়মণ্ডলে মোসলেম পতাকা উড্ডীন হয়। শ্রীমতী চান্দেলী এই ঘটনার মূল স্থানের অধিকারিণী ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডে চান্দেলী চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ও দেশের পূর্ণ পতনের চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে।

(তদেব, পৃ ২১৭-২১৮)

দ্বিতীয় খণ্ডেও এই অভিপ্রায়গুলিই ব্যক্ত হয়েছে।

রাখালদাস এবং অন্যান্যরা অভিজাত মনস্কতা থেকে, প্রান্তিকের, লোকায়ত ধর্ম-চর্চাকে 'অপর' করতে চেয়েছেন। এঁদের হিন্দুধর্মও, উচ্চবিত্ত অভিজাতদের পালনীয় ধর্ম। তাঁর সমকালের পাঠকরাও ছিল নব্যশিক্ষিত, উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি। নিম্নবর্ণের ধর্মাচারণ প্রায়ই হয়ে উঠেছে 'অবক্ষিওর', অজানা-অস্পষ্ট তাই ঘৃণ্য, 'অপর'। ধর্মীয় রাজনীতির এই হেজমনিকেই তাঁরা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যা মধ্যবিত্ত পাঠকও জনপ্রিয় করে তুলেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই তন্ত্র মন্ত্র দেহ সাধনা প্রাকৃতজনের ধর্মীয় আচার, যা তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক এলিট সমাজের দর্শনের, পরিপন্থী। এঁরা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একে ভালোচোখে দেখে না, স্বীকৃতি দিতে চায়না, ঘৃণা করে, সেই ঘৃণাকে ছড়িয়ে দিতে চায়; নেতিবাচক, হীন 'অপর' হিসেবে দাগিয়ে দিতে চায়। ইতিহাস, কল্পনার সহযোগে বর্ণনা করা এই উপন্যাসগুলির উদ্দেশ্য নয়। কাল্পনিক ইতিহাস নির্মাণ করা এঁদের উদ্দেশ্য। এগুলি 'বিশেষ মতাদর্শে পাঠকদের ম্যানিউপুলেশনের আখ্যান'। যা আছে তা নয়, এঁরা যা হওয়া উচিত বলে মনে করেন, ধীরে ধীরে প্রচারই তার উদ্দেশ্য।

এই ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি এবং এই মানসিকতা সম্পর্কে শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলছেন-

Which rose mostly outside the circle of the upper-class people and were characterised by a general tendency of protest against current orthodox religious systems. These religious movements were sponsored by people who had no aristocracy of blood or advantage of culture and education; they rose mostly from among the ranks and preached their doctrines among the masses in their own tongue. ...But this religious zeal of the masses has been responsible for the copious growth of the vernacular literature in spite of the derision and opposition of the higher communities, who sometimes threatened these revolutionaries with curses of hell.^{১৭}

নীডহাম চীনের তাওবাদ সম্পর্কেও একই মানসিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে আমরা শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। পীতাতঙ্কের প্রভাবের সঙ্গে মিলিয়ে। সেখানে দেখা যাবে, শুধু নরকের ভয় দেখানো, উপহাস নয়; 'অপর', 'হীন' করতে করতে স্রষ্টারা ক্রমে কল্পনায় তাদের 'অপরাদ্ধী'র তকমা দিচ্ছে। রাষ্ট্র, 'জনপ্রিয় মান্যতা, নৈতিকতা, প্রাধান্য' অনুযায়ী তাদের শাস্তিবিধান করছে। মধ্যবিত্ত পাঠক

সবসময়েই তাদের দিকে দেখে ‘সন্দেহের’ দৃষ্টিতে। এই সন্দেহকেই নির্মাণ করতে চাওয়া হয় সচেতনভাবে। ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এঁদের মতে ‘অভিজাত, মান্য সংস্কৃতি’; সেখানে প্রান্তিকেরা ব্রাত্য। শ্রেণিবিভাজনের বৈষম্যকে এভাবেই আস্তে আস্তে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলেছি, বৈষ্ণব ধর্মের পরিণতিও প্রায় একই রকম, অবশ্যই তা বৌদ্ধ ধর্মের মত এত বৃহৎ না হলেও! বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মও বঙ্গদেশে বর্তমান। কিন্তু বাঙালি লেখকেরা বৌদ্ধধর্মকে যত আক্রমণ করেছেন, নাথ বা বৈষ্ণবদের তত করেননি।

শশীভূষণ দাশগুপ্তও বলছেন- একই ধরণ থেকেই শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব তন্ত্রের উন্মেষ একইরকমভাবেই।

(তদেব, পৃ ৪)

আলোচ্য পরবর্তী উপন্যাস, দীনেশচন্দ্র সেনের *শ্যামল ও কজ্জল* (১৯৩৮)। আখ্যানে উপস্থাপিত কাল, চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা। জনপ্রিয় *নীল ময়ূরের যৌবন* এবং *কাহ্ন* এর অনেক আগেই মাতৃভাষার সম্মানের প্রশ্নে, রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে, মাতৃভাষার স্বীকৃতির প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে।

মানুষের ভাষায়, মানুষ রিলেট করতে পারে এমন গল্প বলা; বিপুল সংখ্যক মানুষের সঙ্গে তাদের ভাষায় যোগাযোগ করা। শুধু তাই নয়- তাদের মনে, বক্তার নিজ-শৈলী অনুযায়ী, ফিলোজফিকালি ছাপ রেখে যাওয়া; ‘দার্শনিক ছাপকে’ একই সঙ্গে নির্মাণ করা- সার্থে একে মাতৃভাষার সাবলীলতার, যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন। মাতৃভাষায় যোগাযোগ একটি বৌদ্ধিক দার্শনিক যোগকেও নির্মাণ করে। এই বৌদ্ধিক দার্শনিক, স্বতন্ত্র যোগ আসলে বক্তার রাজনৈতিক অভিপ্রায় এবং মতাদর্শ জাত। যা শুধুমাত্র যোগাযোগ, শুধুমাত্র সাবলীলতাকে অতিক্রম করে একটি নতুন মাত্রার নির্মাণ করে। মাতৃভাষায়, সাধারণের ভাষায় সাহিত্যচর্চারও গুরুত্বপূর্ণ দিক এটি।^{১৮}

বুদ্ধ পালিভাষায় নিজের দর্শন প্রচার করেন, তার সময়ে প্রাধান্যের ভাষাকে অস্বীকার করেন। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক। বৌদ্ধসাহিত্যের একটি বিরাট অংশ লিপিবদ্ধও করা হয়, পালিভাষায়।

বুদ্ধ প্রভাবিত অশোকের শিলালিপি গুলিতেও সাধারণের ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তাই দেখবো ভাষাপ্রশ্নে বারবার রবীন্দ্রনাথসহ অন্যান্য আধুনিক স্রষ্টারা বুদ্ধের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন।

বাংলা ভাষা বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণা, ভাবনা-চিন্তার প্রকাশের কথা তাঁর দুই খণ্ডের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’^{১৯} প্রকল্পের মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারি; তারসঙ্গে লিখেছেন, ‘বৃহৎ বঙ্গ’^{২০}। বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণে ‘বাংলা-ভাষার’ গুরুত্বকে, এবং বুদ্ধকাল ও বৌদ্ধযুগের ভাষা বিপ্লবের দিককে এতখানি স্বীকৃতি দেওয়া দীনেশচন্দ্র সেনের অন্যতম অবদান। তাঁর মধ্যেও যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য হিসেবে দ্বন্দ্বিকতা, সীমাবদ্ধতা ছিল। তিনি ‘বৃহৎ বঙ্গ’ তে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির জন্য, অন্যদের মতই, সজ্জে ভিক্ষুগীদের প্রবেশ, দেহসাধনা, ব্যাভিচারকেই দায়ী করেছেন। বুদ্ধের প্রতি তার পক্ষপাত, অন্যান্য ভাগগুলিকে তিনিও ‘অভিজাত’ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন।

শ্যামল ও কজ্জলের বিষয়ও, বৌদ্ধধর্মের বিলোপের কালে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের অন্তর্বিরোধ। ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্রের ভাষাগত হেজমনি বিস্তারের বিরুদ্ধে, উপজাতিদের মাতৃভাষার সম্মানের জন্য সংঘাত। আমরা আগেও বলেছি, ‘ডিট্রোইবাইজেশন’ এর বিরোধিতা করেছেন বুদ্ধ নিজের দর্শনের দ্বারা। ফলে আধুনিকেরাও, উপজাতিদের, নিম্নবর্গের প্রতিবাদকে বিষয় করতে গিয়ে, বুদ্ধকালকে রাজনৈতিকভাবেই স্মরণ করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে এই প্রবণতা একমাত্র দীনেশচন্দ্র সেনের উপন্যাসে স্পষ্ট। এখানে আছে দুটি জাতির কথা- চণ্ডাল এবং কৈবর্ত। পূর্বোক্ত ‘ডিট্রোইবাইজেশনের’ বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে এই উপন্যাসে বৌদ্ধ-উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি উপন্যাসের ভূমিকায় উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছেন-

আমার প্রধান লক্ষ্য কোন ঐতিহাসিক প্রশ্নের সমাধান নহে। কিন্তু কেন যে পূর্ব বঙ্গের এক বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সামাজিক কারণ নির্ধারণ করা। হিন্দু শাসনের শেষ সময়ে সমাজ-গুরুগণের নির্দেশে এই সমাজে অনেক বর্ণ পূর্ব গৌরব-বিচ্যুত হইয়া হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন।^{২১}

প্রথম কারণটি পরে ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’ এর অন্যতম বিষয়-প্রবণতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যরা ইসলামী আক্রমণের জন্য শুধুমাত্র বৌদ্ধদের দায়ী করতে চেয়েছে, তাদের ষড়যন্ত্রী প্রমাণ করতে চেয়েছে,

তাদের হিন্দুরাজার-বিদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করতে চেয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন প্রথম এখানে দায়ী করেছেন- হিন্দুদের আভিজাত্য-অহমিকা, আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য, অন্য ধর্মের প্রতি, সাধারণ প্রজার প্রতি অসংবেদনশীলতা, রাজতন্ত্রের অরাজকতা, অত্যাচারকে, নগর-রাজধানীকেন্দ্রিক উন্নয়নকে। তাকেই প্রজা অসন্তোষের কারণ দেখিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যকে ব্যবহার করে খুব কম উপন্যাস লেখা হয়েছে, পরবর্তীকালে। তা হল- এখনকার যারা অপমানিত, নিম্নবর্ণের উপজাতি তারা বঙ্গদেশে চিরকাল এমন অসম্মানিত ছিল না। সমস্ত জাতির প্রতিনিধি রাজা। রাজাদের গৌরবে তাদেরও অবদান ছিল, আর পরিবর্তে ছিল, রাজার তাদের অবদানের প্রতি সম্মান এবং স্বীকৃতি। রাজসভায় সাধারণের, উপজাতির অংশীদারী ছিল। সেই সম্মান ধীরে ধীরে অপमानে পরিণত হল, নগর থেকে রাজসভা থেকে আভিজাত্যের, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অহমিকায়, ‘ডিট্রাইবালাইজেশন’, সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য ‘ডিফরেন্সেশনে’ তাদের ঠেলে ফেলা হল, যতখানি সম্ভব প্রান্তে। টিকে থাকার শর্ত হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হল, কেন্দ্রের স্বার্থে পছন্দ-অপছন্দ, হেজমনিকে। তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে ক্রমে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলল। এই দিকটি আর কেউ উপন্যাসে প্রায় ব্যবহার করলেননা তেমনভাবে। বরং রাষ্ট্রের হেজমনিকেই চাপিয়ে দিয়ে সাহিত্যেও তাদের ‘অপর’ করে তোলা হল।

এই উপন্যাসের ‘বীর নায়ক’ চণ্ডাল জাতীয় বৌদ্ধ, শ্যামল। সেইসময়- সৈন্যদলে, তাদের বীরত্ব এবং পদের মর্যাদা ছিল। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চক্রান্তে কীভাবে রাজসভা থেকে এই উপজাতিদের দূর করে দেওয়া হচ্ছে, সেই বর্ণনা আছে। শ্যামল পাণ্ডিত্যে উপযুক্ত হলেও জাতিগত কারণে তাকে সংস্কৃত শেখানোর ভার দেওয়া হয় না। বাংলা ভাষার গান, কাব্য-সাহিত্য চর্চা সংস্কৃত প্রাধান্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে- এগুলিই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের প্লটকে নির্মাণ করেছে।

এখানেও বৌদ্ধদের ভেদাভেদকে তুলে ধরতে দুটি ভিক্ষু চরিত্রকে ব্যবহার করা হচ্ছে- একজন ফা-হাউচ, যে নিষ্ঠুর বৌদ্ধ তন্ত্রসাধক। অপরজন মাহাযানী পণ্ডিত, তন্ত্রসাধনা-বিরোধী শান্তাচার্য্য। ফা-হাউচের

তন্ত্রসাধনার জন্য শ্যামলকে হত্যা করে, কজ্জলিকা সহমৃতা হয়(সহমরণকে গ্লোরিফাই করা বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করেছি)। উপন্যাসটির, রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে, আমাদের আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একই প্রসঙ্গে আরেকজন গবেষকের লেখা উপন্যাসের কথা আমরা বলব; জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর, ‘দেবীকোট’। দেবীকোট বিহারকে কেন্দ্র করে এর আখ্যান; আখ্যানকাল খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিক। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী চর্যাগান নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁর এই বিষয়ক বই- *চর্যাগীতির ভূমিকা*। এই বইয়ের নিবেদন অংশে, ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ নির্মাণে তিনি ভাষার গুরুত্বের সঙ্গেও স্বীকৃতি দিচ্ছেন, সহজযানকে; কারণ তারা জাতিভেদ বর্ণভেদ মানত না, নিম্নবর্ণের প্রতি গীতিকারদের সংবেদনশীলতাকে তিনি শিক্ষণীয় বলে মনে করেছেন। এই দিক থেকে উপন্যাসটি অভিনব। আর কেউ ‘সহজযানকে’ এমন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসে ব্যবহার করেননি। নিবেদন অংশে বলেছেন-

চর্যাগানগুলি গৌড়বঙ্গের নিজস্ব সম্পদ। গানগুলির ভাষা, স্থানিক পট, নিসর্গ-প্রকৃতি, আভ্যন্তর সাধন-প্রণালী ও পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ইহাদের উত্তরাধিকার-এই দেশেরই মর্মমূলকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছে। ... শুধু ধর্মসঙ্গীত বা তত্ত্ববাহিত সাহিত্য বলিয়া নহে, সংস্কারমুক্ত পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের ভিত্তি গঠনে ‘শূন্যতা-করুণাভিঙ্গ’ বোধিচিত্তের আদর্শ আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, জ্ঞানমিশ্রা করুণাই পরহিতব্রতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ- সেখানে জাতিভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই, স্ব-পরভেদ নাই। সমগ্র চর্যার অন্তরালে মুক্তমনের জীবন নিষ্ঠা ও পরোপচিকীর্ষার কথা যেন গানের ধ্রুবপদের মত নানা রূপকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।^{২২}

এই মুগ্ধতা থেকেই একই পটভূমিকায় আধুনিক উপন্যাস নির্মাণ করেছেন। সহজযানী গুরুদের নয়; তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন, চর্যাগানের ‘মেখলা’ টীকার রচয়িতা অদ্বয়বজ্রকে। অদ্বয়বজ্র সম্পর্কে মুগ্ধতাও ফুটে উঠেছে পূর্বোক্ত বইয়ে। তাঁর নিবেদন অংশ শেষ করেছেন, অদ্বয়বজ্রের শ্লোক দিয়ে-

স্বার্থং বাপি পরার্থং বা সাধিতং মে শুভং যতঃ।

তেন পুণ্যেন লোকোহস্ত জ্ঞানভূমিঃ স্বয়ম্ভবঃ।। (তদেব, পৃ ২)

উপন্যাসে পণ্ডিত, সহজযানী, অদ্বয়বজ্র চর্যাগানের টীকা রচনা করছেন; তাঁর সহজ-সঙ্গিনী, বিহারবাসিনী মেখলা। প্রেমিকার নাম অনুযায়ী টীকার নাম রাখেন- মেখলা টীকা। এছাড়া কাহিনি মূলত একইরকম,

বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন মতপার্থক্য; সেই সহজভাষার, মাতৃভাষার সম্মানের কথা, সেই প্রসঙ্গে, বুদ্ধের পালির ওপর গুরুত্ব এবং অশোকের সাধারণের ভাষায় শিলালিপির কথা, ব্যবহৃত^{২৩} সেই সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের বিরোধ, ব্রাহ্মণ্যধর্মের আভিজাত্য, আধিপত্য বিস্তারে নিষ্ঠুরতা, নিম্নশ্রেণির সঙ্গে দূরত্ব; সেন রাজাদের অপদার্থতা; নিম্নশ্রেণির অসন্তোষ, তাদের অবস্থার বিবরণে চর্যাগানের ব্যবহার (তদেব, পৃ ১৬-২৫); মুসলমান আক্রমণের আশঙ্কা(তদেব, পৃ ৫, ১০০), তাদের বিহারগুলির ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণ; নেপালে পুথি বাঁচাতে চলে যাওয়ার দোলাচলতা ইত্যাদি। শেষে দেবীকোট বিহারে, হিন্দু মাণ্ডলিক এবং অন্যান্য অমাত্যরা আগুন লাগিয়ে দেয়। মেখলা এবং মিত্রার মৃত্যু হয়।

এরপর আছে *নীল ময়ূরের যৌবন* এবং *কাহ্ন*। *নীল ময়ূরের যৌবন* পরের অধ্যায়ে আলোচনা করবো। আপাতত সংক্ষেপে *কাহ্ন* উপন্যাসে কথা বলবো, গবেষণার নির্ধারিত সময়কালের, খানিক পরে লেখা। শিবশিস মুখোপাধ্যায়ের *কাহ্ন* (২০১০) উপন্যাসে, - *দেবীকোট, নীল ময়ূরের যৌবন* এর মতই চর্যাগানের ইমাজারি জুড়ে জুড়ে এর প্লটকে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানেও ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং বৌদ্ধ সহজিয়াদের বিরোধকে কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এখানে *কাহ্ন*, ভুসুকু, ঢেঁচন পা, এঁরা সহজিয়া ধর্মগুরু; যাদের সঙ্গে নিম্নবর্গের সহজ যোগাযোগ। তাদের মধ্যে থেকে উঠে আসা চরিত্র নয়। যেমন উপন্যাসের চরিত্র বলাই বলে-

আমাদের গেরস্ত ঘরের মেয়ে-মরদগুলোকে তবে সহজিয়া গুরুগুলো ফুসলে নিতে আসেই বা কেন?^{২৪}

এই উপন্যাসের ‘পুষ্পিকা’য় ঔপন্যাসিক বলেছেন- *কাহ্ন* পাদ এর অলৌকিক জীবন-কে সেই সময়ের বাস্তবে স্থাপন করার একটা চেষ্টা করেছেন। কল্পনা অনুযায়ী, একাধিক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে, *কাহ্ন* চরিত্রটির প্রেমিক স্বরূপটি বেশি প্রকট। তার কবিসত্তার উদ্দীপক; আত্মদ্বন্দ্বের উপকরণ ব্যক্তিজীবনের ওপর নির্ভরশীল।

চর্যাগানের আলোচনায় আধুনিক পাঠক বারবার বিস্মিত হয়েছেন, প্রাচীন সাহিত্যে ধর্মের পাশাপাশি, সমকালের নিম্নবর্গের বাস্তব সমাজ পরিবেশের ইমেজমালার উপস্থিতিতে। কবিতায়, নাটকে, ছোটগল্পে উপন্যাসে বারবার সেগুলি বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। লেখক এই ধরণটির কারণ অনুসন্ধান করেছেন

এখানে। ধর্ম-গুরুর পরিচয়ের অতিরিক্ত কবিসত্তার প্রকাশ, সৃষ্টির আনন্দকে প্রকাশ করা হয়ত তাদের মনে বেশি করে ছিল, একথা ঔপন্যাসিক কল্পনায় উপস্থাপন করেছেন। আসলে কবিত্বের প্রশংসা আধুনিক। কবি কে? কবিতার এবং কবির উদ্দেশ্য কী? ধর্ম ইতিহাস, দর্শনের চেয়েও এই দিকটিই ‘কাহ্ন’ উপন্যাসে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।

ভুসুকু তার কবিতা সম্পর্কে বলেছে-

ইচ্ছে হয় আমি ফুলের সুগন্ধের কথা বলি আমার পদে। বলি মানুষের জীবনের কোন ঘটনার কথা। কিংবা কোন মধুর আখ্যানকে বেঁধে ফেলি আমার হৃদে। আমরা তো কবি কাহ্ন ...প্রকাশ করতেই তো তার আনন্দ। (তদেব, পৃ ৩৯)

বাঙালির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, কবি এবং কাব্যের প্রশ্নে, লেখক প্রাচীন বাঙালি কবিদের ঐতিহ্য পরম্পরাকে আধুনিকের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। শিবশিস মুখোপাধ্যায় নিজেও কবি।

(৫)

পীতাতঙ্কের প্রভাব, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর অনুসারীদের মত ‘হীনভাবে অপর’ করার দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও; রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই, স্বয়ং বুদ্ধ বা তার পারিষদবর্গ, এবং পরবর্তীকালের বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং দার্শনিক চরিত্রগুলিতে কোনোরকম কালিমালেপন চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে দেখিনা। আগের অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। বরং রবীন্দ্রনাথের নির্মিত ইমেজ অনুসারেই তাঁরা- ক্ষমাশীল, উদার, জ্ঞানী পণ্ডিত, পরিমিত-স্বভাব সম্পন্ন। কিন্তু ‘ভবিষ্যৎ-বক্তা’ বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত করে তাদের, আবার ‘অলৌকিক’-স্বভাব যুক্ত করে, একরকমভাবে ‘অতিমানব’ করে তুলেছেন কেউ কেউ, সাধারণের থেকে দূরবর্তী। জাদুশক্তি আছে যেন! আর তা হলেই পাণ্ডিত্য খানিক লাঘব হয়ে যায়। রাখালদাস প্রথম এঁদের ‘জ্যোতিষী-গোত্রীয় করেছেন। তাঁদের জ্ঞান-দর্শন-গ্রন্থরচনা ইত্যাদি দিকগুলি অনুল্লেখ করে করে মুছে ফেলেছেন। এরমধ্যে সর্বাপেক্ষা দক্ষ হলেন- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা এখন আলোচনা করবো শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি উপন্যাস- *কালের মন্দির* (১৯৫১), *গৌড়মল্লার* (১৯৫৪), *তুমি সন্ধ্যার মেঘ* (১৯৫৮)। শরদিন্দুর উপন্যাসগুলি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাবিত। একথা তিনি নিজেও বহুবার বলেছেন। এছাড়া বুদ্ধ-বুদ্ধকাল বিষয়ে তাঁর

ছোটোগল্পগুলিও ভীষণ জনপ্রিয়- অমিতাভ, মৃৎপ্রদীপ, চন্দনমূর্তি, মরু ও সজ্জা আগে আলোচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ইতিহাসনিষ্ঠ গবেষকও ছিলেন। শরদিন্দু কল্পকাহিনির সফল স্রষ্টা, ইতিহাস-পাঠক। ইতিহাসের চরিত্রদের দক্ষতার সঙ্গে ইতিহাস থেকে চ্যুত করে কল্পকাহিনিতে তাদের অবস্থান বদলে ফেলায় তিনি সুদক্ষ। তাঁর নিজের কথায়-

ইতিহাস থেকে চরিত্রগুলো কেবল নিয়েছি; কিন্তু গল্প আমার নিজের। সর্বদা লক্ষ রেখেছি কি করে সেই যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়। যে সময়ের গল্প তখনকার রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার, অস্ত্র, আহার, বাড়িঘর ইত্যাদি খুঁটিনাটি সব না জানলে যুগকে ফুটিয়ে তোলা যায়না। এরপর আছে ভাষা। ঐতিহাসিক গল্পের ভাষাও হবে যুগোপযোগী।^{২৫}

শরদিন্দুর এই পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতা তাঁকে সফল ঐতিহাসিক গল্পকার রূপে জনপ্রিয়তা দিয়েছে।

শরদিন্দুর এই তিনটি উপন্যাস নিয়ে আমাদের স্বতন্ত্র বক্তব্য বিশেষ কিছুই নেই। অধ্যাপক আব্দুল কাফি সযত্নে দক্ষতার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় শরদিন্দুর নির্মাণকে, উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করেছেন;^{২৬} আমরা তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত। এর সঙ্গে শুধু যুক্ত করতে চাই, পীতাতঙ্কের প্রভাবের কথা। যা শরদিন্দুকে প্রভাবিত করেছিল বলেই আমাদের অভিমত। শেষ অধ্যায়ে আমরা ‘ব্যোমকেশ’ প্রসঙ্গে সেকথা আলোচনা করেছি। শরদিন্দু, তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে, মুঙ্গিয়ানার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে ‘অপর’ এবং ইসলামধর্মাবলম্বীদের প্রতি ‘সন্দেহ’ তৈরি করে তাঁর আখ্যানকে জনপ্রিয় হিন্দুপ্রধান করে তুলেছেন। এই ‘ইসলামোফোবিয়া’ নির্মাণ কতখানি সফল তা আমরা দেখি, ক্ষেত্রগুপ্তের মন্তব্যে-

এই অগ্নিকন্দুক আধুনিক বোমার পূর্বরূপ। ... মহাশক্তি অতীশকে এই নতুন রাজনৈতিক চরিত্রদান করার পিছনে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের নিয়ত হুমকির সামনে লেখকের একধরনের সচেতন মনৈসিকতার প্রকাশ। পুরনো সময়ের কাহিনীতে এক নব তাৎপর্য আবিষ্কার। উপন্যাসে মুসলিম অশ্বব্যবসায়ীদের সঙ্গে চেদীর সেনানীদের সংঘর্ষের বিবরণও ঐ একই উদ্দেশ্য সাধন করেছে।^{২৭}

এই প্রবণতার কথাই আমরা বলেছি, যে রাষ্ট্র, যুদ্ধের জন্য কীভাবে দেশবাসীকে ‘ম্যানিউপুলেট’ করে। আমরা জানি না, এই তথ্যের সূত্র ক্ষেত্র গুপ্ত কীভাবে পেলেন! এই কার্যকারণসম্পর্কগুলি কীভাবে রাষ্ট্রের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তা আশা করা যায়, স্পষ্ট হয়েছে। অতীশ দীপঙ্করের তিব্বতযাত্রার উদ্দেশ্য অগ্নিকন্দুক নির্মাণ শেখার জন্য- এই কাল্পনিক গাথা নির্মাণের উদ্দেশ্যও এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আব্দুল কাফি ব্যাখ্যা করেছেন, শরদিন্দু কীভাবে তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’কে (ধর্মীয়) নির্মাণ করতে চেয়েছেন। আমরা উদ্ধৃত করবো সেই অংশটি-

তা হলে পদ্ধতিটি হল, জ্ঞান থেকে স্মৃতি(কল্পনা সহযোগে) এবং পরের ধাপে সেই স্মৃতিকেই জ্ঞান আকারে পাঠকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। সেই জ্ঞান পাঠক স্মৃতি আকারে, সংস্কার আকারে সঞ্চিত রাখে। তার মারফত, সেই স্মৃতি মারফত অর্জিত হয় তার আত্মতা। গড়ে উঠতে থাকে তার পরিচয়-- ব্যক্তিগত এবং সামূহিক। এই পরিচিতি কালক্রমে পারস্পরিক স্বীকৃতি পেতে থাকে কালে কালে। (তদেব, পৃ ২৪)

এই নির্মাণ পদ্ধতি শুধু শরদিন্দুর উপন্যাস প্রকল্প সম্পর্কেই প্রযোজ্য তা নয়। এই নির্মাণ আমাদের গবেষণায় আলোচ্য প্রায় প্রতিটি উপন্যাস সম্পর্কেই প্রযোজ্য। এই ‘আত্মপরিচয়, স্মৃতি, সংস্কার’ নির্মাণ করতেই তাঁরা বুদ্ধ, বৌদ্ধযুগ-কালকে ব্যবহার করেছেন। ‘বাঙালি’র ভাষা, ধর্ম, খাদ্যাভাস, ‘অপর’ ধর্মের প্রতি ব্যবহার, অভিজাত্য, ইত্যাদিকে কেন্দ্রের স্বার্থ এবং পছন্দ অনুযায়ী একমাত্রিক, নির্দিষ্ট করে ফেলা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই।

আরেকটি উদ্ধৃতি দেবো, শরদিন্দু, গৌড়মল্লার লেখার বিষয় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ডায়রিতে লিখছেন-

নীহাররঞ্জনের বইখানি পড়িয়া যে অপূর্ব উপাদান পাইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যে শতাব্দীব্যাপী মাৎস্যন্যায় আরম্ভ হইয়াছিল তাহারই সূচনা আমার গল্পে আছে। বাঙালীর জীবনে ইহা এক ক্রান্তিকাল আধুনিক বাঙালীর জন্ম এই সময়।^{২৮}

কেন্দ্রীয় চরিত্র বজ্র রাজত্ব নয়, সাধারণের জীবনকেই বেছে নেয়। বাঙালির গৌরবময় কালকে, বৌদ্ধযুগকে শরদিন্দু বাঙালির ইতিহাস এবং আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করছেন কিন্তু হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মগুলিকে ‘অপর’ করে। বৌদ্ধযুগের গৌরবকে স্মরণ করিয়ে তাকে ‘শুধুমাত্র হিন্দু বাঙালির’ জাতি গৌরবের সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে। রাখালদাসের অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিল পাচ্ছি আমরা।

(৬)

তুমি সন্ধ্যার মেঘ-এর সমকালে, কল্লোল-লেখক অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) করুণাঘন বসুধারা পত্রিকায় ১৩৬৪ সালে (বৈশাখ থেকে ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। আখ্যানের বিষয়, বুদ্ধের জীবনী; উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ। তা সত্ত্বেও আমরা এর উল্লেখ প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। কল্লোল যুগ এর লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কল্লোল গোষ্ঠীর এক গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর লেখা উপন্যাস কবিতার মধ্যে

কল্লোলের বৈশিষ্ট্য ভরপুর। কল্লোলের বৈশিষ্ট্য বলতে কী বোঝায়? অল্পকথায় উল্লেখ করতে জীবেন্দ্র সিংহ রায় কে অনুসরণ করছি-

এরা নতুন মানুষ। এদেরও সমস্যা আইডেন্টিটি ও আইডেন্টিফিকেশনের সমস্যা-- কিন্তু তার জটিলতা অনেক বেশী চেহারা ভিন্নতর। আয়োজন আরেক ঢঙের। ...এদের নতুন প্রণবমন্ত্র-- প্রবৃত্তি, শক্তি ও সাহস। ...এই পটভূমিকায় এবং জীবনবৃত্তের পরিবর্তন হলো প্রথম মহাযুদ্ধের উত্তরকালে।^{২৯}

এছাড়াও সমকালে রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলী- দেশে অসহযোগ আন্দোলনসহ পরপর গান্ধীপ্রভাবে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন, স্বাধীনতা এবং দেশভাগ, প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ‘সভ্য’ তকমা দাবী করা দেশগুলির লোভ-হিংসা, সাম্রাজ্যবিস্তারকামী নিষ্ঠুর রূপ প্রত্যক্ষ করল গোটা পৃথিবী। ফলে, যুদ্ধ পরবর্তী হতাশা, নৈরাশ্য, শূণ্যতাবোধ, বিষাদচেতনা মানুষের সঙ্গী হল। মানুষ, দর্শনে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর মূল খোঁজার চেষ্টা করতে থাকল; শোপেনহাওয়ার, নীৎশে অন্যান্য দার্শনিক; ফ্রয়েড, ইয়ুং, এডলার, লাকা, ইত্যাদির মতবাদ আত্মস্থ করার চেষ্টা করতে লাগল, তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে। রাজনৈতিকভাবে তখন পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিবিরোধিতা, কম্যুনিজম খুবই চর্চার বিষয়। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র, মার্ক্সসহ অন্যান্যদের মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলল।

মৌলিক ভাষায়, ইংরাজি অনুবাদে এই যুবকরা পরিচিত হতে থাকলেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের সাহিত্যের সঙ্গে। অনুবাদ, অনুবাদের সমালোচনা, তত্ত্বকে আত্মীকৃত করে নতুন নতুন সংরূপ, আঙ্গিক রীতি-শৈলীতে তাকে প্রকাশ করলেন। বিশেষত কলকাতা-কেন্দ্রিক সাময়িকপত্র গুলি এগুলি প্রকাশের জায়গা করে দিল।

এই সময়পর্বেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তাঁর মতাদর্শকে তৈরি করেন, ভাঙা গড়া করেন। একথা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও বলা যায়। বাস্তববাদ আধুনিকতাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বাঁকবদল ঘটাতে তাঁরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই অভিঘাতের গভীরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই সমস্ত রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছেন সচেতনভাবে।

সেই লেখক যখন রামকৃষ্ণ, সারদা, বিবেকানন্দ, চৈতন্যকে নিয়ে প্রৌঢ় বয়সে জীবনীগ্রন্থ লেখেন আমরা পাঠক হিসেবে খানিক অবাকই হই। এই ভক্তি এবং যৌবনের জয়গান এর মধ্যে কী আপাত বিরোধ আছে? *করুণাঘন* প্রকাশিত হচ্ছে, *পরমপুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ* (১৯৫২-১৯৫৭) এবং *বীরেশ্বর বিবেকানন্দ* (১৯৫৮-৬৯)- জীবনী-বইয়ের পাশাপাশি। তাহলে কী জনপ্রিয় মত অনুযায়ী, যেমন উদ্ধত যুবকেরা শেষ জীবনে ভক্তির আশ্রয় নেয়; তেমনভাবেই আমরা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘বদল’কে ব্যাখ্যা করতে পারি?

আমাদের মনে হয় এই ব্যাখ্যাই তিনি *করুণাঘন* এর মধ্যে দিয়ে রেখে যেতে চেয়েছেন। বুদ্ধের জীবনের দুটি পর্ব-- ভোগবিলাসী-সংসারী, রাজপুত্র থেকে ভিক্ষু-- বহুর জন্য আত্মোৎসর্গ। আধুনিক লেখকরা, পরিস্থিতির সঙ্গে, মানসিক দোলাচলতা, সেই দোলাচলতাকে বুঝতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার থেকে বারবার বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে তুলনায়, ব্যক্তি-জীবনকে হাজির করেছেন। বুদ্ধের জীবনীর আয়নায় নিজেদের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছেন। যে হতাশা, নৈরাশ্য, নাস্তির কুয়াশা সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বুদ্ধ তার সমকালে তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন, প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে। ফ্রয়েড যার উত্তর খুঁজতে ‘থ্যানাটস-প্রবৃত্তি’র ওপর গবেষণা করছিলেন। সেরকমই হিংসা লোভের প্রতিকার খুঁজতেই উপন্যাসের কাহিনি বুনেছেন লেখক। মূলত বুদ্ধের জীবন, জাতক এবং অবদানের, পুরাণের কাহিনি, থেকে এর ঘটনাক্রম গৃহীত হয়েছে। এর সঙ্গে আছে বৌদ্ধ দার্শনিকদের প্রভাব। পাশ্চাত্য দর্শনের পাশাপাশি লেখক দেশীয় দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। একাধিকবার নাগার্জুনের প্রসঙ্গ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। উপন্যাসে শুরুর দিকেই আছে-

নির্বাণ নঙর্থক নয়, সদর্থক। ...নাস্তিত্ব নয়, অস্তিত্ব।

কী নিবে গেলে হৃদয়ের সকল জ্বালা নিবে যায়? কী উচ্ছিন্ন হলে সমস্ত পথ নিষ্কণ্টক হয়ে ওঠে?

নিবৃত্তি! ৩০

অগ্রহায়ণে প্রকাশিত ৭ নং কিস্তির, ‘চৌদ্দ’ নম্বর পরিচ্ছেদে আছে-

কাম দুই রকম, বস্তুকাম ও ক্লেশকাম। ভোগের দ্রব্য পাবার যা ইচ্ছা তাই বস্তুকাম। আর ভোগের দ্রব্য পেয়েও যে অতৃপ্তি তাই ক্লেশকাম। ...তৃষ্ণার
পূরণ নেই, পূরণের নিবৃত্তি নেই। সুতরাং সংযত হোন প্রশান্ত হোন, তৃষ্ণার আগুনে পড়ে অপায়ে প্রবেশ করবেন না (প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড,
২য় সংখ্যা, পৃ ১৩৪-১৩৬)

এই অংশে আমরা প্রত্যক্ষভাবে মার্ক্সের ‘কমোডিটি ফেটিসিজম’ তত্ত্বের প্রভাব দেখতে পাই।
বৌদ্ধদর্শনের, এই রাজনৈতিক দিকগুলি এই অধ্যায়ের প্রথমেই আলোচনা করেছি।

অতএব এই জীবনী লেখার পর্যায়ে, তার আগের জীবনের প্রভাবকে মুছে ফেলছে বা লেখকের জীবনদর্শন
পালটে গিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারকারী উদ্ধত যুবক হঠাৎ ‘ভক্ত’ পরিণত হয়েছিলেন- এমন
সরলীকরণ করা হয়ত উচিত হবেনা। এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা, হয়ত ধারাবাহিকভাবে সংবেদনশীল হয়ে
অচিন্ত্যকুমারের সমস্ত রচনা পড়েই পেতে পারি। কল্লোলের কালেও যে ‘আইডেন্টিটির’র খোঁজ, প্রবৃত্তির
মূল তাঁরা খুঁজছিলেন। বুদ্ধের জীবনীতে হয়ত সেই যাপনেরই সাদৃশ্য তিনি দেখেছিলেন। তবে একথা
সত্য, মার্ক্সের বস্তুবাদের প্রভাব উপন্যাসের দর্শনের ক্ষেত্রে নেই। আছে ভাববাদী দর্শনের প্রভাব,
আধ্যাত্মিকতার প্রভাব যা তাকে রামকৃষ্ণের দর্শনের কাছে নিয়ে গেছিল।

এই উপন্যাসটির আঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ-বিশ শতকে নীতিকথা-প্রচারে ছাত্রপাঠ্য, বুদ্ধজীবনীর চর্চা
শুরু হয়েছিল-এটি সে গোত্রের নয়। কবি অচিন্ত্যকুমারের ছাপ, এর গদ্য রচনায় ভরপুর রয়েছে।
লিরিকাল, সাবজেক্টিভ গদ্যের ধাঁচে বুদ্ধজীবনী বিবৃত। এখানে আখ্যানের সময় ব্যবহারে মৌলিকতার
ছাপ আছে। বুদ্ধজীবনীর ঘটনা-পরম্পরাকে এখানে বিপর্যস্ত করা হয়েছে। লেখক বয়ানের একটি
নতুন ক্রমকে তৈরি করেছেন। যেমন সাত থেকে নয় নম্বর অধ্যায়ে- বন্ধুলের বত্রিশ পুত্রের
মৃত্যুশোক, এবং শুদ্ধোদনের সিদ্ধার্থকে বিদায় দেওয়ার শোক একই সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। সেরকমই
পনেরো ষোলো অধ্যায়ে- রাহুলকে ত্যাগ করা, এবং ফিরে এসে প্রব্রজ্যা দেওয়া একই সঙ্গে বর্ণিত হচ্ছে।
এই বাস্তব-সময়ক্রম বিপর্যাসের মধ্যে দিয়ে কাহিনির ‘খীম’ অনুযায়ী ক্রম নির্মাণে, লেখকের গদ্য এবং
প্লট নির্মাণের মুসীমানা দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশিত।

হঠাৎ শেষ করলেন না কেন এর উত্তর আমাদের কাছে নেই। তবে, *করুণাঘন*, এর বয়ানেও দেখবো, নিজের হিন্দুত্বকে অতিক্রম করতে পারেননি। রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, সারদা, বিবেকানন্দের কাছে যে আধ্যাত্মিক আশ্রয় তিনি খুঁজছিলেন তা কী বুদ্ধের কাছে পান নি? এই প্রশ্নই রাখি আমরা শেষ পর্যন্ত। কারণ বুদ্ধ আধ্যাত্মিক আশ্রয় দেন না; ঈশ্বর, পরলোক, মোক্ষের প্রসঙ্গ তাঁর কাছে অবান্তর। দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম আসলে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত নয়, ততদিনে গবেষণায় তা প্রমাণিত সত্য।

আত্মানুসন্ধানের প্রসঙ্গে, আলোচ্য পরবর্তী উপন্যাস। বিপ্রদাস বড়ুয়ার *শ্রামণ গৌতম* (১৯৯৬)। এর আখ্যান- ব্রজদাসের, আত্মসমীক্ষা। গৃহী, ভোগ-বিলাসের জীবনযাপন ছেড়ে বুদ্ধ শ্রামণ হয়েছিলেন আত্মসংযমের মধ্যে দিয়ে। আর ব্রজদাস ধর্মীয় দায়ে, বাল্যকালে শ্রামণ গৌতম হয়ে, শ্রামণ জীবন পালন, ভিক্ষু হওয়া, বিহারে জীবনযাপন থেকে গৃহী জীবনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যবসায়ী হয়, প্রেমের অসফল পরিণতিতে আবার যাযাবর জীবন বেছে নেয়- এই যাপনের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধিই এর প্লট। সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব, দোলাচলতাই এর বিষয়। বারবার আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে কথক বুদ্ধের জীবন দর্শন ইতিহাসকে তুলনায় হাজির করেছেন।

উপজাতির মানুষদের নিজস্ব বক্তব্য প্রকাশে বারবার বুদ্ধকাল রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তা গোড়াতেই বিশদে উল্লেখ করেছি। এই উপন্যাসেও পার্বত্য চট্টগ্রাম, চাকমা, মারমা, বড়ুয়া, নিম্নবিত্ত হিন্দু মুসলমান মানুষের কথা এসেছে প্রেক্ষিত হিসেবে। প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতা-দেশভাগ, ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গও এসেছে কথকের জবানিতে। বুদ্ধের দর্শন এখানে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ব্রজদাসের আত্মকথন-

আমার শ্রামণ-জীবন শুরু হয়েছিল আমার অজান্তে। ...তখন আমার বোধ ছিল না। শ্রামণ্য-ধর্ম পালন করতে করতে আমি বড় হতে লাগলাম। আমার শরীরে যৌবন এলো। যৌবনে আমি দেখেছি আমি একা, আমার পড়াশনার সঙ্গে আমার একাকিত্ব হেঁটে চলেছে। তারপর একসময় আমি ভিক্ষু হলাম। ... গভীর অনুভব দিয়ে আমি আমার চারপাশের পৃথিবীকে দেখতে চেষ্টা করলাম। সেভাবে আমি সমাজের অত্যাচার দেখেছি, স্বাধীনতা দেশ-বিভাগ দেখেছি, বড়ুয়াদের ওপর অত্যাচার নেমে আসছে দেখেছি, সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ করতে দেখেছি। ...

আমি মানুষ। মানুষের মধ্যে আমি ভালোবাসা খুঁজে বেড়াব। ব্যক্তি-সত্তা ও বস্তু-সত্তাকে ভালবাসব। সকল জীবের মধ্যে আমি ভালোবাসা খুঁজে বেড়াব। সকল জীবের সঙ্গে আমি দুঃখ ভাগ করে নেব, সুখ খুঁজে যাব। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ আমার কাছে এক। কালের ভাগ করা আমি ছেড়ে দিয়েছি।^{৩১}

এই নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে সমকালের পর্যবেক্ষণ, আধুনিক উপন্যাসের একটি ধরণ। সেকথা আমরা আগেও বলেছি। উপন্যাসে বৌদ্ধদর্শন এবং উপজাতিদের ব্যবহৃত বিভিন্ন 'টার্ম', টীকা সহযোগে বর্ণিত; প্রতিবেশকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য। একদিকে বিহারে ব্রজদাসের পালিশিক্ষা চলছে, অন্যদিকে চলছে ভাষা-আন্দোলন।(তদেব, পৃ ১১০) বাংলাভাষা রক্ষার জন্য কথকের আর্তি। আবার শেষে আছে, বাঙালিদের দ্বারাই তার নিজস্ব উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্যে আঘাত... প্রসঙ্গগুলি রাজনৈতিক সমাপতনে ব্যবহৃত। ভাষা-প্রসঙ্গে এখানেও বুদ্ধের ভাষা-বিপ্লবের রাজনৈতিক ব্যবহার ঘটেছে।

শেষের দিকে কথক বড়ুয়া, চাকমা উপজাতির উৎস অনুসন্ধানে বজ্জিদের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন আখ্যানে। কাল্পনিক গল্পে, বড়ুয়াদের যুক্ত করতে চাওয়া হয়েছে, বুদ্ধের কালের বজ্জি-জাতিগরিমায়। উপজাতিদের সামাজিক অবস্থানের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রায় গোটা উপন্যাস জুড়েই আছে। উদ্ধৃত করবো সেই অংশটি-

আমার মনে হয় বড়ুয়ারা আলাদা জাতি। তারা এসেছে নেপালের বজ্জি জাতি থেকে। গৌতম বুদ্ধের সময় বজ্জিরা প্রতাপশালী রাজা ছিল। তারা ক্ষত্রিয়। ...চাকমারা ছিল জাতি। এখন চাকমারা বাঙালিদের কাছে উপজাতি বা জনগোষ্ঠী। (তদেব, পৃ ২৬১)

এই অংশেই আছে চরিত্রেরা আলোচনা করছে, তাদের উপজাতিগুলি পরপর উৎখাত হতে হতে প্রান্তে আরো প্রান্তে সরে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে তাদের সমস্যার সমাধান কী?

আমরা শ্যামল ও কজ্জল, প্রদোষে প্রাকৃতজন, নীল ময়ূরের যৌবন এর আলোচনার ধারাবাহিকতায় একথাই বলতে পারি, যে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে কেন্দ্র যেভাবে, নিম্নবর্ণের, উপজাতিদের,- ভাষা, বাসস্থান, সংস্কৃতির ওপর থাকা বসায়, সেই ইতিহাস এবং সমকালই উঠে আসছে এই আখ্যানগুলিতে। দেবীপ্রসাদ চিহ্নিত, সেই ডিট্রাইবালাইজেশনের প্রশ্ন। বারবার উঠে আসছে আধুনিক বাস্তববাদী রাজনৈতিক আখ্যানগুলিতে। বাংলা ভাষা মর্যাদা পাচ্ছে, বাঙালি জাতি মর্যাদা পাচ্ছে; তারাই আবার

উপজাতি জনজাতির ওপর শোষণ নামিয়ে আনছে। যে ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’কে রাখালদাস, শরদিন্দু প্রমুখরা, ‘কেন্দ্রমুখী, অভিজাত, একমাত্রিক, একজাত, একধর্ম’- হিসেবে ‘দেগে’ দিতে চাইছেন, খেয়াল করবো সেইগুলির উল্টোপিঠে তৈরি হচ্ছে, এই আখ্যানগুলির প্রেক্ষাপট। অডুত দুপক্ষই বুদ্ধকে দলে টানছেন! দুই রকমফেরই আছে বাংলা উপন্যাসে।

কেন্দ্রের হেজমনি এবং প্রান্তের নিরন্তর লড়াই, সমকালের সঙ্গে বুদ্ধকালের কোন পার্থক্য থাকছে না! বুদ্ধের উপলব্ধি স্থান কাল ব্যক্তি ব্যতিরেকে বহমান। দুঃখের কারণ কী? ব্যক্তিগত নয়; তার উত্তর আছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অসাম্যে। যে প্রশ্ন দিয়ে, চেরবাটস্কি, নীডহ্যাম, দেবীপ্রসাদ, কোসাম্বী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ তাঁদের পর্যবেক্ষণকে প্রকাশ করেছেন।

(৭)

সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) *কুমারজীব* এবং *বিদ্রোহী কৈবর্ত* আমাদের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৈবর্ত-বিদ্রোহ নিয়ে অনুরূপা দেবীও উপন্যাস লিখেছেন তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো। কিন্তু দুটি উপন্যাসের বীজ, অভিপ্রায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ একেবারেই ভিন্ন। সত্যেন সেন, ঘোষিতভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। প্রগতি লেখক শিল্পী সংগঠন ‘উদীচি’র কর্মকর্তা। এছাড়াও কৃষক সংগঠন গড়ে তোলা, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের পাশে থাকা এবং সাহিত্য রচনা সমস্ত কিছুই করেছেন একইসঙ্গে, বলাবাহুল্য কোনোটার সঙ্গেই কোনো ভাবনার বিরোধ নেই।

বিদ্রোহী কৈবর্ত উপন্যাসটি, ২য় মহীপালের সময় ঐতিহাসিক উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লিখিত। একই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে ভাঙনও বর্ণিত। দিব্বোক- কেন্দ্রীয় চরিত্র। যদিও এই স্বাধীন রাজত্ব শেষ হয়, পালেদের নির্মম ভাবে ভীম তথা তার সহকারীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার মধ্যে দিয়ে। এই শেষ অংশটি উপন্যাসে নেই। শোষিতের প্রতিনিধি, দিব্বোকের ‘আদর্শ নিম্নবর্ণের ক্ষমতায়ন’ এর বাস্তবতা এবং তার মৃত্যুতে উপন্যাস শেষ হয়েছে।

ভূমিকায় সম্পাদক বদিউর রহমান উপন্যাসটি বিষয়ে বলেছেন-

তিনি নিম্নবর্ণভুক্ত কৈবর্ত সমাজের অন্তরগর্ভে সন্ধান করেছেন তাদের জীবনসংগ্রামের উৎস। যে শ্রেণীসংগ্রামের এক অসাধারণ আখ্যান। উপন্যাসে তিনি অতীত ইতিহাসকে তুলে এনেছেন সমসাময়িক শ্রেণীসংগ্রাম ও চেতনার উজ্জ্বল আলোকে।^{৩২}

দিব্বোক ক্ষমতায় বসে জোর দেয় সাধারণের স্বার্থে; সুষম-করপ্রদান, সকলের শিক্ষা, শোষণ মুক্ত সমাজে রূপ প্রতিষ্ঠায়। উল্লেখ্য সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে সত্যেন সেন যান, চোখের চিকিৎসার জন্য। উপন্যাসে, অভিজাতরা মেনে নিতে পারে না নিম্নবর্ণের এই উত্থান। ‘বর্বর’, ‘কালো কুচ্ছিত’দের ‘রাজত্বের অযোগ্য’ বলে মনে করে! মানবতা, বীরত্বগাথা, দেশপ্রেম, সমাজ-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি। রবীন্দ্রনাথের ভাবনার উজ্জ্বল উত্তরাধিকারী সত্যেন সেন। আমরা কুমারজীব আলোচনার সময়েও তা ব্যাখ্যা করব। এখানে ওলান ঠাকুরের কাছে নরবলি নিষেধ করলে, প্রজারা অসন্তুষ্ট হলে তিনি চলে যান, পরে রাজাকে মনোকষ্ট না দিতে সাধারণ মানুষ নিজেরাই বলি বন্ধ করে দেয়; এখানে স্পষ্ট বিসর্জন নাটক এবং রাজা গোবিন্দ্যমাণিক্য চরিত্রটির প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের রাজা-ভাবনা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

এই অরাজক পরিস্থিতিতে, বৌদ্ধধর্মের অবস্থাও সমান্তরালে বর্ণিত-

হীনযান, মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান-- আমাদের এই সমস্ত সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে রেশারেশি এমন পর্যায়ে আর কখনো ওঠেনি, সবাই যে যার নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করতে ব্যস্ত, এই কঠিন বিপদের দিনেও সাধারণ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে পারস্পরিক ভেদবুদ্ধিটাকে ভুলে যেতে পারছে না (তদেব, পৃ ১৭৮)

তারা দায়ী করছে, হিন্দুমন্ত্রীর আনুকূল্যে, পাল-রাজাদের অকর্মণ্যতাকে। নিম্নশ্রেণির মধ্যে ধর্মপ্রচার-রাজনীতিও উঠে এসেছে বস্তুবাদী ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে-

বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত ও কোচদের মধ্যে আমরাই প্রথম ধর্মপ্রচার শুরু করি। আমরা প্রথমে ওদের মিথ্যা দেবতা ভ্রান্ত সংসারগুলোকে অপসারিত করার চেষ্টা করতে লাগলাম চাইলাম ওদের মনকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে...হিন্দুপ্রচারকেরা... আমাদের পথ দিয়ে গেল না... ক্রমে ক্রমে তাদের ওপর হিন্দুয়ানীর রঙ লাগিয়ে নিঃশব্দে আত্মস্যাৎ করে নিল...এক সম্প্রদায় ভগবান বুদ্ধকে তাদের আরাধ্য বিষুণ্ডর অবতার বলে প্রচার করছে। ... তা হলেই দেখতে পাচ্ছ কৈবর্ত আর কোচদের মতই বৌদ্ধদেরও ফেঁদে ফেলবার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এক নতুন জাল পাতা হয়েছে (তদেব, পৃ ১৮৭)

বৌদ্ধরাও রাজানুকূল্য পাওয়ার জন্য রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। এই হিন্দু-বৌদ্ধ ষড়যন্ত্রের মধ্যেই, বিদ্রোহী, সাধারণ প্রজা দিব্বোকের নেতৃত্বে রাজধানী দখল করে। ধর্ম, দেশের রাজনীতিকে চালনা

করেনা। বৌদ্ধরাজা দেবরক্ষিত তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। জনগণের, প্রতিনিধি দিব্বোকই তাদের ধর্মীয় উন্মাদনার থেকে শিক্ষার পথে, মানবতার পথে উদ্ধুদ্ধ করে।

সত্যেন সেন একই বছরে লেখেন, কুমারজীব উপন্যাসটি। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ধর্মীয়-রাজনীতির ইতিহাসনিষ্ঠ দার্শনিক-বীক্ষা, এই দুই উপন্যাসে সংবেদনশীলতার সঙ্গে সুষমভাবে বর্ণিত। প্রাচ্যের দেশগুলির নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যবিস্তার, মাৎস্যন্যায়ের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে- একে অপরের প্রতি সৌহার্দ্র, বাণিজ্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান-পর্যটন-শিল্পচর্চা, পারস্পরিক আদান-প্রদান, পর্যটকদের পর্যবেক্ষণে ইতিহাস নির্মাণ- নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এমন রাজনৈতিক উপন্যাস-ভাবনা খুব বেশি প্রশ্রয় এবং জনপ্রিয়তা পায়নি। এত এত এত পরিমাণে, হিংসা, প্রতিবেশী সম্পর্কে হীন মনোভাব, ইত্যাদিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, বাজার, পাঠকের নজর এই উপন্যাসগুলি থেকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। ভূমিকায় লেখক লিখেছেন-

মধ্য এশিয়ার যেই ব্যাপক অঞ্চল এই উপন্যাসের রঙ্গভূমি, এক কালে তা সভ্যতার আলোকে প্রদীপ্ত ও সমুজ্জ্বল ছিল। ভারতবর্ষ থেকে চীন যাবার দুটি পথ এই অঞ্চলের উপর দিয়ে চলে গেছে। ... ভারতবর্ষ থেকে বাইরে হলেও এরা ভারতীয়দের সঙ্গে আত্মিক বন্ধন অনুভব করত। এই সমস্ত রাজ্যের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বিহার পরিচালিত হত। সেই সকল বিহারে হাজার হাজার বৌদ্ধভিক্ষু শাস্ত্র চর্চা করতেন। ... চীন ও ভারতবর্ষের বৌদ্ধভিক্ষু ও পর্যটকেরা ধর্মীয় শিক্ষালাভের জন্য বা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই পথ দিয়ে আসা যাওয়া করতেন।

এই উপন্যাসটিকে আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেই দাবী করতে চাই। এর ঐতিহাসিক কাঠামোটা... দীর্ঘকাল ধরে লোকচক্ষুরে আড়ালে মাটির তলায় চাপা পড়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা তাকে সেই বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই ব্যাপক অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে শুধু যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল তাই নয়, পারস্যের মিত্রপূজা, জরথুষ্ট্রের ধর্ম, মনু প্রবর্তিত ধর্ম এবং চীনের প্রাচীন ধর্ম এই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করবে এবং নানা ধর্মের সংমিশ্রণ ও সংঘাত ঘটবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এই অঞ্চলে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে বহু প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করেছেন।

... কুমারজীব যে একজন বৌদ্ধশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ নাই। তিনি তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ কার্যে অতিবাহিত করেন। চীন দেশের সাহিত্য কুমারজীবের স্মৃতি বহন করে আছে। এই কাহিনীর আনুমানিক ঘটনাকাল খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী।^{৩৩}

রবীন্দ্রনাথ, প্রাচ্যের মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে যে, ‘সভ্যতার সূর্য’ ওঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বুদ্ধকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে; ঠিক সেভাবেই এই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক উপন্যাসটির নির্মাণ সুখপাঠ্য

হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে তিনি যে অঞ্চলকে বেছে নিয়েছেন, ভারতবর্ষের পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্কে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ‘অপর এবং হীন’ করার প্রচেষ্টা ছাড়াই। মার্ক্স ধর্মকে আফিম বলেও, সমাজ ও অর্থনীতির বিচারে যেভাবে সংবেদনশীলতার সঙ্গে ধর্মকে ‘পাঠ’ করার কথা বলেছেন দেবীপ্রসাদ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখেরা সেভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। ফিক্সনে এর সফল ব্যবহার সত্যেন সেনের এই উপন্যাসগুলি।

কুমারজীব এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও, তার বাবা কুমারায়ণ চরিত্রটিও এই উপন্যাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার স্ত্রী ও দুই পুত্রকে রেখে ভিক্ষু হওয়ার যাত্রা বর্ণনায়, সরাসরি বুদ্ধের গৃহত্যাগের ইমেজমালাকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের গঠন প্রসঙ্গেও এই উপন্যাস গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে, ‘একমুখী, বীর, নায়ক, গুণবান’ বানিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। বরং বিভিন্ন পরিস্থিতির দ্বন্দ্ব কুমারজীবের ইচ্ছাশক্তি, এবং জীবনের সিদ্ধান্ত-নির্বাচন গুলি আস্তে আস্তে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে তার পরিণামকে সুনিশ্চিত করেছে।

উপন্যাসে দেখা গেছে, মহাযানী এবং পণ্ডিত কুমারজীব, কুচী ফিরে আসে, জ্ঞানের আন্ফালন এবং অহঙ্কার নিয়ে। কুচীতে বৌদ্ধ বিভিন্ন ধর্মমতের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কুমারজীবের ত্রুর প্ররোচনায়, প্রজা-অসন্তোষ, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় হিংসাকে বাড়িয়ে তোলে। তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মহাযানবাদের প্রসার-

মঙ্গলকোটের অধিবাসীরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের মধ্যে অধিকাংশ সর্বাঙ্গবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ...কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, সবাই শান্তিপূর্ণ ভাবে যে যার আপন আপন পন্থা অনুসরণ করে চলেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ধর্মমতের যে তীব্র সংঘর্ষ চলে আসছে, তার কোন তরঙ্গ এখানকার জীবনকে আন্দোলিত করে তুলতে পারে নি। ... বুদ্ধের সেই পরম ও নিগূঢ় ধর্ম অসার, লঘুচিত্ত ও উন্মার্গগামী স্থবিরদের হাতে পড়ে কেমন করে বিকৃতি লাভ করতে লাগল, কুমারজীব এবার সেই ইতিহাস পর্যায়ক্রমে বিবৃত করে চললেন। ...যুক্তি-তর্কের শাবিত অস্ত্রের সাহায্যে হীনযানপন্থীদের উপর তিনি আঘাতের পর আঘাত হেনে চললেন।

এই তরুণ আচার্য জ্ঞানের পাহাড়, তাঁর সব কথার মর্ম বুঝে ওঠা প্রাকৃতজনের পক্ষে সম্ভব নয়। ...সমস্ত নগরময় এই নিয়ে প্রবল আন্দোলন দেখা দিল। ...তারপর এই নিয়ে মন কষাকষি, কথা কাটাকাটি, অবশেষে দুটি চারটি হাতাহতিও হয়ে গেল। ...এখন শান্তির স্থলে অশান্তি আর সম্প্রীতির স্থলে বিদ্বেষ মাথা তুলে দেখা দিল। কুমারজীব উল্লসিত হয়ে বললেন, এতদিনে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। এই আমার যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। (তদেব, পৃ ৯৯-১০০)

উপন্যাসের চলনে আস্তে আস্তে তার পথ মতের, চারিত্রের বদল ঘটেছে। বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন ‘যান’ এর মধ্যে বিরোধকেও চরিত্র, সংলাপের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জটিল কুমারজীব চরিত্রের বিবর্তন, এই উপন্যাসের অন্যত্ব দক্ষ নির্মাণ।

এরপরের কাহিনি চীনের পটভূমিতে, তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রভৃতির উল্লেখ করেও, পাশাপাশি তাদের গভীর জ্ঞান-পিপাসা এবং তার চর্চার শ্রদ্ধামিশ্রিত বর্ণনা আছে। ভিক্ষুদের ক্লাস্তিহীন শেখার চেষ্ঠা, দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞান-আহরণের চেষ্ঠার শ্রদ্ধা মিশ্রিত বর্ণনা আছে। কুমারজীব শেষ পর্যন্ত জ্ঞানপিপাসাকে চরিতার্থ করে এবং একটি গভীর রাজনৈতিক প্রয়োজনে শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে, চীনদেশকেই আমৃত্যু তার কর্মভূমি করে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। চৈনিক-সৈনিকরা যখন কুচী আক্রমণের জন্য বুদ্ধের আশীর্বাদ নিতে যায়, চারুব্রতর ধিক্বারে, আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়া দেখি; রবীন্দ্রনাথ যা জাপানের সৈনিকদের নিয়ে বলেছেন, সেই প্রতিধ্বনি শোনা যায় সত্যেন সেনের বর্ণনায়। বারবার রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই আমরা তুলেছি-

সেদিন অসময়ে মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বেজে চলল। ব্যাপার কি খোঁজ করতে গিয়ে শুনলেন সৈন্যদের বিজয়কামনা করে মন্দিরে প্রভু বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানানো হচ্ছে। এ তারই ঘণ্টা। শুনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল তার মন। বুদ্ধের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা! হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত, নরহত্যা, ধ্বংসের কাজ-- এর জন্যেও কি পরম প্রেমময় বুদ্ধের আশীর্বাদ পাওয়া যায়? (তদেব, পৃ ১৭৫)

সত্যেন সেনের কালে এই সময়টি ছিল, ভারত-চীন যুদ্ধের রাজনৈতিক সমকাল। এই যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রায় ১৯৫০ থেকে শুরু হয়, পরে ১৯৬২ তে দু পক্ষের সরাসরি যুদ্ধ। সেই আবহে রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে পীতাতঙ্ক প্রভাবিত উপন্যাসের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। সেখানে সম্পূর্ণ অন্য রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে এই উপন্যাসের অবতারণা। প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক সহাবস্থান এবং জ্ঞান বিজ্ঞান, পর্যটন বাণিজ্য চর্চার মধ্যে দিয়ে প্রাচ্যের উন্নয়নের একটি প্রস্তাব, এই কাল্পনিক আখ্যানের মধ্যে দিয়ে লেখক রাখতে চাইছেন।

এর সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানকেও স্পষ্ট করার চেষ্ঠা নেই কী? কুমারজীব চীনে থেকে যেতে চাইলে, সেই প্রসঙ্গে তার মা জীবা তাকে যেসব প্রশ্ন করেছে- জন্মভূমির স্বার্থ না দেখে, চীনে থেকে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেন? কোনও উৎকোচ, অর্থ বা আর কোনো লোভে নিশ্চয় কুমারজীবের এই সিদ্ধান্ত! চীনের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কারণ কী? তা সমকালেও খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধের প্রতিপক্ষ, ‘ঘোষিত শত্রু’কে উপন্যাসে ব্যবহার করে তার সঙ্গে কূটনৈতিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রসঙ্গ এবং প্রস্তাব নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ছিল, আছে।

কুমারজীবের উত্তর ছিল, তিনি চীনের রাজাকে আক্রান্ত না হয়ে আক্রমণ না করার শর্ত দিয়েছেন, বুদ্ধের দোহাই দিয়ে; আর চীন-রাজার শর্ত, কুমারজীব জ্ঞানচর্চার জন্য আজীবন চীনে থাকবেন স্বাধীনভাবে; তাঁর জ্ঞানের আলোকে চীন উদ্ভাসিত হবে। দেখা যাচ্ছে কুমারজীব একেবারেই সাধারণ জীবন-যাপন করেন সেখানে, এই দীন-স্বভাবও যেন, চীনে থেকেও নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমরা উদ্ধৃত করবো-

আমার কোন দেশ নাই। আমি কোন দেশের বন্ধন অনুভব করিনা। ...প্রভু বলেছিলেন, হে আমার অনুবর্তীগণ, তোমরা আমার বাণী নিয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়। আমি তাঁর সেই বাণী শুনে বেরিয়ে পড়েছি। আমি চীনা, কুচি, ভারতীয়, শোক, কুশান কাউকে আলাদা করে দেখতে পারি না। আমার চোখে এরা সবাই সমান। ...পৃথিবী সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমি একাত্মতা অনুভব করি। ...ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি। বিরাট দেশ বিপুল তার জনসম্পদ তার চেয়েও বেশী। এই ধর্ম তার বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে যদি চীনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, ...সেদিন ভারতবর্ষ আর চীন এই দুই সূর্যের আলায় সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। ...আমি ভারতবর্ষ কুচী উভয়ের সন্তান ...সমস্ত পৃথিবী আমার জন্মভূমি, সমস্ত মানুষ আমার ভাইবোন। (তদেব, পৃ ১৮৪-৮৫)

আমাদের মনে পড়বে অতীশ দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা এবং সেখানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে শরদিন্দু কল্লনায় কীভাবে লঘু করেছিলেন! তার পরবর্তী সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্ত তাতে আরেক প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধকে ধর্মের ভিত্তিতে বাড়িয়ে তুলেছেন। সেখানে সত্যেন সেনের নির্মাণের পার্থক্য, পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন।

ইতিহাস, রাজনৈতিক মতাদর্শ, কল্লনা, সাহিত্যগুণ সবকিছুর সুষম মিশেলে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য, সুচিন্তিত উপাদান-পূর্ণ।

আমরা আগে একবার প্রসঙ্গক্রমে, শওকত আলির (১৯৩৬-২০১৮) প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪) এর উল্লেখ করেছি। ধর্মীয় 'অপর' নির্মাণ ব্যতিরেকে ইতিহাসনিষ্ঠ আধুনিক উপন্যাস নির্মাণের চমৎকার

উদাহরণ এই উপন্যাসটি। আধুনিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে যে, ইতিহাস-সমকাল-দর্শন অভিমুখের কথা বলা হয়, আমাদের মতে এই উপন্যাস তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর সঙ্গে আছে আখ্যান-নির্মাণে সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। '৮৩ সালে বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। উপন্যাসটি লেখার কারণ হিসেবে তিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন-

উপন্যাসটি লেখার চিন্তাটা এ কারণেই এসেছিল যে দক্ষিণ এশিয়ার এই প্রান্তে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কারণ কী? এটা ছিল আমার একটা প্রশ্ন। মুসলমান যারা দিগ্বিজয় করতে এসেছে তারা তো ওইদিক দিয়ে এসেছে। তারপর মোগল-পাঠানরাও ওইদিক দিয়ে এসেছে। এটা কিন্তু অবাস্তব কৌতূহলের কিছু নয়। একসময় মুসলমানরা এখানে আধিপত্য করছে, তারা শাসন করেছে ৪০০ বছর। তারা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও ওইসব অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যা বাড়েনি। এখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। এ সম্পর্কে আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, বইপত্র পড়েছি।... একসময় শেখ শুভদয়া নামে একটি সংস্কৃত বই হাতে আসে। কেউ বলেছে সেন রাজত্বের পরপরই ওটা লেখা হয়েছিল। শেখের শুভ উদয়_এই অর্থে। শেখ মানে মুসলমান। ওই বইয়ের মধ্যে কিছু কিছু গল্পের মতো পেয়েছি। যেমন একটা দৃশ্য ওখানে পেয়েছি যে অশ্ব বিক্রেতারা নৌকায় চড়ে অশ্ব বিক্রি করতে এসেছে। অশ্ব বিক্রি হয়ে গেছে। সন্ধ্যা সমাগত। তখন ছয়-সাতজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনি উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে মানে সূর্য অস্তের দিকে তাকিয়ে কানে হাত দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাকে যেন ডাকছেন। তারপর এক জায়গায় গোল হয়ে বসে প্রভু-ভূত্য সবাই আহার গ্রহণ করছেন এক পাত্র থেকে। আহার শেষে একজন সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করছেন, তারপর উবু হয়ে থাকছেন, অবশেষে প্রণাম করছেন, তিনি যা যা করছেন পেছনের সবাই তাঁকে অনুসরণ করছে। সামনে যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু প্রভু নন; ভূত্য। তবু সবাই তাঁকে অনুসরণ করছে। আমি এই দৃশ্যটা আমার প্রদোষে প্রাকৃতজন'র মধ্যে ইচ্ছে করেই দিয়েছি। এ ঘটনাগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছিল এ উপাদানগুলো নিয়ে একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়। এ রকম একটা দৃশ্য যদি দেখে সাধারণ মানুষ, যে মন্দিরের ছায়ায় অচ্ছুত নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের পা যেন না পড়ে সে জন্য সকালে মন্দিরের পশ্চিম পাশের এবং বিকালে মন্দিরের পূর্ব দিকের

রাস্তা দিয়ে নিম্নবর্গীয় মানুষের চলাচল বন্ধ, তাহলে তাদের মনে প্রতিক্রিয়া কী হবে? এ রকম একটা অবস্থা সেখানে ছিল। এরপর যখন যবনরা এল, তারা একসঙ্গে বসে, একসঙ্গে ওঠে, একসঙ্গে খায়, প্রভুর উপাসনা করে। আমার নিজের মনের থেকে ধারণা হলো এ অঞ্চলে নিম্নবর্গের মানুষ সবচেয়ে বেশি ছিল এবং এখানে সবাই যবন ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এর কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আমি দিতে পারব না। এটা আমার অনুমান। এই ভিত্তিতে আমি উপন্যাসে এই উপাদানগুলো ব্যবহার করেছি।^{১৪}

সমকালীন রাজনীতি সচেতন শওকত আলি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অবদানের জন্য জেলে বন্দী হন। এই উপন্যাসের কথা বলতে গিয়ে বারবার আসে, সত্যেন সেনের উপন্যাসদুটি এবং শ্যামল ও কজ্জলের প্রসঙ্গ^{১৫}। সেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামল; এখানে শ্যামাঙ্গ এবং বসন্তদাস। অরাজক, অশান্ত সেন যুগের রাজত্বের শেষের দিকে তুর্কি আক্রমণের সম্ভাবনায় আশঙ্কিত বাংলাদেশ-এর পটভূমি। বেশিরভাগ অংশজুড়েই প্রাধান্য পেয়েছে, সাধারণ মানুষের অবস্থা তাদের দৈন্য, দোলাচলতা। রাষ্ট্রের শাসকের পালাবদলের সঙ্গে তাদের অবস্থান, রাজনৈতিক মতাদর্শ কীভাবে বদলেছে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে সাধারণের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক, ব্যক্তিগত এবং সামূহিক জীবনাযাপনকে প্রভাবিত করেছে, এই উপন্যাস তারই আখ্যান। এখানে অন্যান্য উপন্যাসের মতই, ইতিহাস, যুগধর্ম অনুযায়ী রাজানুকূল্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং অন্ত্যজ প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যে, ধ্বংসপ্রায় বিহার গুলির মধ্যে কোনোরকমে টিকে থাকা, বৌদ্ধধর্মের সংঘাত বর্ণিত হয়েছে। আর আছে, তৃতীয়, ইসলামধর্মের আগমনে, সাধারণের জীবনে আসা আরেক পালাবদলের ইঙ্গিত। উপন্যাসের বিষয় হিসেবে, সাধারণের মর্যাদা আরও বেশি করে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে, ১৯৮৪ র এই উপন্যাসের বয়ানে। কোনো, সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র দ্বারা শোষিত; তবু তারা প্রতিবাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তত কঠিন হয় রাষ্ট্রের পালটা অত্যাচার; ততোধিক পাল্টা প্রতিবাদে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যায়। এই নিরন্তর লড়াই, যুগ-রাজনীতি, শাসকের পালাবদলের সঙ্গে সমান্তরালে চলতেই থাকে। অস্তিত্ব-টিকিয়ে রাখার অদম্য স্পৃহা আর মরে না! তাদের মৃত্যু হলেও মৃত্যুকে ছাপিয়ে যায়, তাদের শিল্প, তাদের প্রতিবাদী সত্তা।

যেমন শ্যামাঙ্গের মৃত্যু প্রসঙ্গ। 'পিপ্পলি হাটের' ঘটনা এখানে রাজনৈতিক পালাবদলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জটিল বাঁকবদলের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেখানে ভিক্ষু চৈতন্যনন্দকে রাজার সৈন্য আঘাত করলে, সাধারণ জেমনী মেয়েরা সৈন্যদের মেরে ফেলে। এরফলে আরও প্রকট হয় রাষ্ট্রের অত্যাচার; আস্তে আস্তে তারা আস্থা হারিয়ে, ইসলামধর্মাবলম্বী শাসকদের সঙ্গে যোগ দেবার দোলাচলতায় দুলতে থাকে। এই সংশয় বসন্তদাসের মধ্য দিয়ে প্রায় গোটা উপন্যাসেই আছে। সাধারণ মানুষেরা আশ্রয় খুঁজছে বৌদ্ধধর্মে, হিন্দুধর্মে, ইসলাম ধর্মে, চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মে... কিন্তু তাদের অবস্থা প্রায় একরকম থেকে যাচ্ছে। তাহলে এর সমাধান কী ধর্মে? ধর্ম তাদের স্বস্তি দিতে পারছে না, এই কথাই, উপন্যাসে উচ্চারিত। সমাধান বলা নয়, সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা।

লেখক, কখনও চরিত্রদের মুখে, কখনও নিজে আখ্যানে উপস্থিত হয়ে (উপন্যাসের শেষাংশ লেখকের বক্তব্য, সরাসরি পাঠকের প্রতি) এই প্রশ্নগুলিকেই জাগিয়ে দিয়েছেন-

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, লীলাবতী, বসন্তদাস, ছায়াবতী, মিত্রানন্দ, নিরঞ্জন প্রমুখ চরিত্রগুলির শেষ পর্যন্ত কী হলো? কেন তাদের পরিণতি লিপিবদ্ধ হলো না?

এ প্রশ্নের উত্তর সবিনয়ে নিবেদন এই যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাই লেখককে অধিক বিস্তারে যেতে সসাহসী করেনি। উপরন্তু ঐসব চরিত্রের পরিণতি ইতিহাসে মোটামুটি স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ।^{৩৬}

উপন্যাসের একটি চরিত্র বলে-

দেখো এই কি মানুষের জীবন? সুখ নেই, স্বস্তি নেই, গৃহ নেই, কেবলি প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে হচ্ছে- এর শেষ কোথায়? এ জীবন কি যাপন করা যায়? বলো কতদিন এভাবে চলবে? (তদেব, প্রচ্ছদ সংলগ্ন পাতা)

বুদ্ধের, দুঃখের কারণ কী? প্রশ্নও এর সমধর্মী। ২০২১ এ আমরা কী উত্তর দিই? ডিফরেন্সেশন, ডিট্রাইবালাইজেশন, রোহিঙ্গাদের নৌকো, আলান কুর্দি, এন আর সি, এন পি আর... বলো কতদিন এভাবে চলবে?

(৮)

ঠিক পীতাতঙ্ক প্রভাবিত না হলেও। বাজার নির্মিত জনপ্রিয় ছকে এই প্রেক্ষাপটে উপন্যাস লিখেছেন- সমরেশ মজুমদার, নারায়ণ সান্যাল। ১৯৮৬ সালে সমরেশ মজুমদার ‘শরণাগত’ নামে একটি উপন্যাস লেখেন। কুণালজাতক প্রভাবিত এর কাহিনী। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসের গল্পই এর প্লট। কিন্তু অভিপ্রায় *চান্দেলী* গোত্রীয়। এখানে বাসনাতাড়িত তিস্যা চরিত্রটির কামনা-নিষ্ঠুরতা প্রাধান্য পেয়েছে। *কাঞ্চনমালা* এর কাল্পনিক চরিত্র- কুঞ্জরকর্ণ এখানে খল্লাতক। কিন্তু মানের দিক থেকে তা নয়। এখানেও বুদ্ধ-বৌদ্ধধর্মে ভ্রান্ত ‘নারীবিদ্বেষের’ ধারণাটি চিরাচরিত পদ্ধতিতে, ব্যবহৃত। এই প্রসঙ্গটি আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এছাড়া এখানে ‘মেয়ে রাজনীতিবিদ’ আসলে কতখানি অক্ষম তার বর্ণনা আছে- তিস্যা একমাসের জন্য ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলে, তার ব্যক্তিগত ঈর্ষা হিংসা ক্রোধ রাজ্য এবং কুণালের জীবন নষ্ট করার মধ্যে। তিস্যার ‘বক্তৃতা’ স্ত্রী-পুরুষে বিরোধ তৈরি করেছে লেখকের কল্পনায়। শেষে তিস্যার মৃত্যুদণ্ড প্রসঙ্গে, জনগণের স্বরকে, তুলে ধরে, কথক বলেছেন-

সম্রাট যদি দুর্বল হতেন, যদি ক্ষমা পেত ওই কামুকী তাহলে অবধারিতভাবে তার প্রভাব পড়ত নাগরিকদের গ্রহণে গৃহে। তখন নারীদের অব্যাহতা বর্ধিত হতো, তাদের সংঘর্ষে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু এই পাপের শাস্তি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকায় আর কেউ সাহসী হবে না এমন আচরণে।^{৩৭}

উপন্যাসে তিস্যার ফাঁসি হয়। কিন্তু সমরেশ মজুমদার তার মৃত্যুদৃশ্যকে আরও নিষ্ঠুর মর্মান্তিক করে তোলেন,- ফাঁসি দেওয়া সত্ত্বেও তিস্যার মৃত্যু হয় না। ঘাড় ভেঙে সে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে। এই অংশটি সম্পূর্ণ লেখকের কল্পিত। মূলত, বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে লেখা এই গল্পের, কোনো ‘ধরণ বা ভাঙ্গনেই’ তিস্যার এরূপ শাস্তিবিধান নেই। কুণাল অবদানে, অশোক মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইলেও, কুণাল তাকে ক্ষমা করে দেয়, সেখানে মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করে ‘উপযুক্ত শাস্তি’র উল্লেখ আছে মাত্র।^{৩৮} হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাসেও আছে, কাঞ্চনমালা এবং কুণালের অনুরোধে রাজা তাকে ক্ষমা করে; উন্মাদিনী তিস্যারক্ষার উপশম করে; তিস্যা পরে, কাঞ্চন প্রদত্ত ঋদ্ধিমতি, নাম সার্থক করে।^{৩৯}

আমাদের প্রশ্ন এই অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই ‘ভিলেন’ নারী চরিত্রটিকে উপন্যাসে হত্যা করার উদ্দেশ্য কী? তার সমকালের ‘পাঠিকা’দের সংঘর্ষে যাতে রাখা যায়, তারা যাতে অবাধ্য না হয়; সেরকম শিক্ষা দেওয়া? উদ্ধৃত জনগণের স্বরের মধ্যে দিয়ে হয়ত লেখকের অভিপ্রায় প্রকাশিত।

সত্যেন সেনের আগে কুমারজীবকে নিয়ে ১৯৫৮ সালে *আনন্দ-স্বরূপিনী* লেখেন; নারায়ণ সান্যাল। কিন্তু তিনি নিজেই সংশয়ান্বিত, যে তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে কুমারজীবের বোন অক্ষুমতী। এই উপন্যাসের বুনন বেশ প্রক্ষিপ্ত ধরণের। মাঝে পর্যটক ফা-হিয়েন, চীনের কবি পর্যটক, তাও-চিং এর সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভিক্ষু এবং প্রাচীন কবি কালিদাসের কাল্পনিক কাব্যালোচনা প্রধান হয়ে উঠেছে। কীভাবে বিভিন্ন ধ্রুপদী সাহিত্যে চীন এবং ভারতবর্ষের মিল আছে, কে কার দ্বারা প্রভাবিত বোঝা যায় না- এই আলোচনার মূল বিষয়। শেষে, কুমারজীব তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি, অক্ষুমতীকে দান করে, যেমন বুদ্ধ আনন্দকে করেছিল; তাই এই উপন্যাসের নাম- *আনন্দ স্বরূপিনী*।

উপন্যাসের আঙ্গিক উল্লেখযোগ্য। লেখক মাঝেমাঝেই আখ্যানে উপস্থিত হয়ে, ইতিহাস কতটুকু আর কল্পনা কতটা তা নির্দিষ্ট করে দেন। উপন্যাসে দুই দেশের যাতায়াত, জ্ঞানচর্চার পরিচয় সবই ইতিহাস অনুসৃত। কিন্তু যেখানে আখ্যানের মূল কেন্দ্র, সেই ঘটনাক্রমগুলিতে চৈনিকদের অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতার বর্ণনা কল্পিত। এক্ষেত্রে পীতাতঙ্কের প্রভাব পড়েছে বলেই আমাদের মনে হয়।

ইতিহাস কথিত ‘নিদারুণ নিগ্রহ’ কে তিনি যেভাবে ‘এঁকেছেন’ এবং ‘কল্পিত চিত্রে’ ব্যাখ্যা করেছেন- তাতে দেখা যায়- চীন সেনাপতি কুচীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, কুমারজীবকে দৈহিক নির্যাতন করে। তার বোন, রাজকন্যা এবং ভিক্ষু অক্ষুমতীকে ধর্ষণ করে, ‘রক্ষিতা’য় পরিণত করে। এই মূল ঘটনাক্রমকে ভিত্তি করে প্লট পরিণতির দিকে এগোয়।^{৪০}

আমরা সমসাময়িক রাজনীতির পরিচয় কুমারজীব আলোচনার সময় দিয়েছি। ফলে তার কিছুটা আগেই প্রকাশিত উপন্যাসে, চৈনিকদের অতিরিক্ত নিষ্ঠুরতার কাল্পনিক আখ্যান নির্মাণে, লেখকের অভিপ্রায় সম্পর্কে আমাদের প্রশ্ন জাগে। যুদ্ধের আবহে এই বিষয়ে উপন্যাস নির্মাণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অভিপ্রায়সঞ্চারিত।

নারায়ণ সান্যালের ‘আম্রপালী’(১৯৯১-৯২), রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস। ইংরেজ থ্রিলার লেখক ফ্রেডেরিক ফোরসাইথের ‘মানি উইথ মিনাসেস’ গল্পটিকে তিনি ‘আম্রপালী’তে গ্রহণ করেছেন, একথা লেখক প্রথমেই জানিয়েছেন। কথক একে ‘অল্লীল’ গল্প বলেছেন। এই গল্পে দেখা যায়, কথক কেমিস্ট্রির অধ্যাপক, তালুকদার এবং সলিল মিত্র ছদ্মনামের সাহিত্যিক। তিনি ‘প্লটের’ খোঁজে এক ‘রূপোপজীবিনীর’ কাছে যান। এবং পরবর্তীকালে তাদের শারীরিক মিলনের ছবি তুলে মেয়েটির সঙ্গীরা তাকে ব্ল্যাকমেইল করে। অপহরণ, হত্যা, ধর্ষণ, ব্ল্যাকমেইল, রাজনৈতিক দলের গুণ্ডাদের অত্যাচার, আইনের ফাঁক ইত্যাদির বর্ণনায় সমকালের অরাজক পরিস্থিতিতে তুলে ধরা হয়েছে। শেষে বৃদ্ধ তালুকদার বিশেষ অনুসন্ধানে রহস্যের সমাধান করে, খানিকটা গোয়েন্দাও হয়ে ওঠে এবং দুষ্কৃতিদের হত্যা করে। মেয়েটি যেহেতু তার পুত্র ‘জীবন’কে রক্ষা করতেই দুষ্কৃতিদের সাহায্য করতে বাধ্য হত, তাই এখানে তাকে ‘জীবক মাতা, আম্রপালীর’ সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আমরা বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে গোড়ার দিকে বলেছি, কেন ‘আইন হাতে তুলে নেওয়ার’-আখ্যানগুলি জনপ্রিয় হয়।

তেমন কোনো সার্থকতা নেই আম্রপালী বা বুদ্ধকে ব্যবহার করার। ‘পাল্ল ফিক্সন’ প্রভাবিত উপন্যাস। ‘রাজনীতি নয় তিনি নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী’- এই কথনের যে কোনো মানে নেই তা আমরা জানি। পক্ষ নিতেই হয়। তাতে রাজনৈতিক দলের শীলমোহর থাকতে পারে বা নাও পারে। খেয়াল করে দেখবো, রাজনীতি ছাড়া ‘আম্রপালীর’ প্লট সম্ভবই ছিল না! আখ্যানকাল আর লেখকের সময়কাল একই। উপন্যাসে, আছে সফদর হাশমি- ঐর হত্যার প্রসঙ্গ(১৯৮৯)। কংগ্রেসের গুণ্ডারা কীভাবে তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে তার বর্ণনা। আবার কথকের এই সহমর্মিতার পাশাপাশিই আছে, নিজের হিন্দু বংশগৌরবের বড়াই এবং ইন্টেলেকচুয়ালদের প্রতি সম্মান থাকলেও, মধ্যবিত্ত ‘অপর’ ধর্মের প্রতি অসম্মান; ইসলামোফোবিয়া। ট্যাক্সিতে কথকের পূর্বতন যাত্রীর প্রতি, কোনো কারণ ছাড়াই-

ট্যাক্সিতে একজন মাত্র যাত্রী। নিঃসন্দেহে মুসলমান। দাড়ি, কাজ-করা সফেদ টুপি আর রসুনের গন্ধেই তা আন্দাজ করা যায়।^{৪১}

এই প্রবণতা চৌথুপীর চর্যাপদেও আমরা পাবো। আমাদের গবেষণায়, রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসে কীভাবে “ধর্মীয় বর্ণগত জাতিগত- ‘অপর’”-কে ‘ক্রিমিনালাইজ’ করা হয় তা উঠে এসেছে এবং আসবে।

উপন্যাসের প্রথমে লেখকের ‘কৈফিয়ৎ’ আছে, যেখানে তিনি কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ নিতে রাজি নন। ‘কৈফিয়ৎ’ টি পুরোটাই পাঠ্য। খানিকটা উদ্ধৃত করছি-

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভোটদাতাদের পোলারাইজেশন দিন-দিন জোরদার হয়ে উঠছে। সর্বত্র।

... রাজনৈতিক দাদাগিরির তোয়াক্কা না রেখে ‘ভালকে ভাল’ আর ‘মন্দকে মন্দ’ বলার হিম্মতই যদি না রইল তবে কিসের এই সাহিত্যসেবার ভড়ৎ? কথাসাহিত্যিক শুধুমাত্র সত্য শিব সুন্দরের পক্ষাবলম্বন করতে পারবে না? বিশেষ সেই অস্ত্রবাসী কথাসাহিত্যিকের যদি পাঠক পাঠিকার ভালোবাসা ব্যতিরেকে আর কোনও পার্থিব কামনা বাসনা না থাকে? (তদেব)

আমাদের বক্তব্য, এভাবে ‘একজন হিরো’র রাজনীতি ব্যতিরেকে (যদি তা সম্ভব হয় কোনোভাবে!), রাজনৈতিক দল ছাড়া ‘অপরাদ্ধীমুক্ত’ সমাজ গড়ে তোলা কীভাবে সম্ভব? ‘সুপারম্যান-আখ্যানগুলি’ মনে পড়বে। বরং, তার উত্তর আছে ‘প্রিভেন্সন’ এবং ‘সেন্সিটাইজেশন’, লিঙ্গসাম্যের লড়াইয়ে, সকলের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের দাবী পূর্তিতে। সেই দাবী একক ‘হিরোর’ দ্বারা সম্ভব নয়। একাকিত্বের-উদযাপন, আত্মসমীক্ষার বাইরে সামাজিক দায়বদ্ধতায় সবসময়েই সীমাবদ্ধ। দেবীপ্রসাদ দেখিয়েছেন, বুদ্ধ কীভাবে দর্শনের জিজ্ঞাসা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে, রাজতন্ত্রের মন্ত্রণাদাতা হিসেবে সংঘের সাহায্যে তার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। সত্যেন সেন দেখিয়েছেন কুমারজীবকে। কিন্তু তারা কেউ ‘অন্য ব্যতিরেকে একক হয়ে ওঠেননি’ তাদের ইতিহাস, পক্ষ নেওয়ারই ইতিহাস।

নারায়ণ সান্যালের উত্তরাধিকার দেখি সন্মাত্রানন্দের উপন্যাসে। তিনিও শাওন, অমিতাযুধ, চাগ্ লোচাবা, অতীশ দীপঙ্কর কে ‘একক, বিচ্ছিন্ন হিরো’ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। শাওনের পরিচয়ে লেখা আছে-

আমি আপনি কিংবা একা অন্য কেউ...

নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা আমাদের আলোচিত কালপর্বে আসবে না, তাও সূত্রানুযায়ী উল্লেখযোগ্য। শাওনের মধ্যে আমরা নারায়ণ সান্যালের প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো-

শাওন যখন এখানে এল, তার কয়েকদিনের মধ্যেই ভোটের বাজনা বেজে উঠল। তিনি দশকেরও বেশি যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন ছিল, বছর পাঁচেক আগে তাদের সরিয়ে এসেছে আর-একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী। ... ভোটের প্রাক্কলনের বেশ কিছুদিন আগে ঘুষ কেলেঙ্কারি সামনে আনল গণমাধ্যম। সত্য, মিথ্যা কে জানে! আবার এই বর্তমান ক্ষমতাসীন দলটির বিরোধিতা করবার জন্য এতদিন ধরে মানুষ যাদের সাপে

নেউলে সম্বন্ধে বিবদমান দেখেছে, বিরোধী সেই দুটি দল জোট করে বসল সমস্ত বৈপরীত্য ভুলে, সমস্ত আদর্শ ভুলে। আদর্শ কিছু নয়, টাকাই সব।...” ইত্যাদি

এভাবে কেন্দ্রে ‘পৌরাণিক হিন্দুধর্মেরও অবক্ষয়িত একটা রূপ’ এর ধ্বজাধারী পার্টি, গোহত্যাকারীকে পিটিয়ে মেরে ফেলার বাস্তব প্রসঙ্গ; তার বিরুদ্ধতা করে গোমাংস খাওয়া এবং সরকারি খেতাব ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতীকি প্রতিবাদ কে ব্যঙ্গ করা হয় বর্ণনায়। তারপর আসে, পার্লামেন্টে আক্রমণের প্রসঙ্গ, ফাঁসির প্রসঙ্গ, কানাহইয়া কুমারের শ্লোগান-বিতর্ক, বে-আইনী কারাবাস, কানাহইয়ার পার্টি নির্বাচন ইত্যাদি সমকালের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। এবার কেন্দ্রীয় চরিত্র আবার ‘নিরপেক্ষ হিরো’ খোঁজে। *শাওন কোনো সাইড নিতে পারছে না। সে কনফিউজড। এ কোন্ সময়? কী হবে এরপর? সব কর্পোরেট হাউসের কাছে বিকিয়ে গেছে? আর এই পটভূমিকায় তার উপন্যাসের আর কোন নায়কের প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন আছে চর্চার এমন এক ইতিহাসবিস্মৃত পণ্ডিতের জীবনকথার, যিনি শিক্ষার জন্যে, সভ্যতার জন্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন? (তদেব, পৃ ১৪৩-১৪৪)*

এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে ‘বিচ্ছিন্নতার-উদযাপনের’ নেতিবাচক দিক নিয়ে পথিক বসুর মন্তব্য, ব্যাখ্যা করেছি। মার্ক্স কথিত এই ‘বিচ্ছিন্নতা’ নিয়ে আরেকটি উদ্ধৃতি দেবো-

The Alienation of humankind, in the fundamental sense of the term, means the loss of control: its embodiment in an alien force which confronts the individuals as a hostile and potentially destructive power. When Marx analysed alienation in his Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, he indicated four principal aspects of it the alienation of human beings from: 1. Nature; 2. their own productive creativity, 3. their ‘species being’, as members of the human species; and 4. each other.

...In other words, not the deed of an all powerful outside agency, natural or metaphysical, but the outcome of a determinate type of historical development which can be positively altered by conscious intervention in the historical process, in order to ‘transcend labour’s self alienation’.^{৪৩}

এই অধ্যায়ে আর আমরা উপন্যাসের সংখ্যা বাড়াবো না। সময়পর্ব এবং সীমিত শব্দসংখ্যার ঘেরাটোপই তার প্রধান কারণ। পরবর্তীকালে, শাহজাদ ফিরদৌসের, *তথাগত*, *অঙ্গুলিমাল্য*, সন্মাত্রানন্দের, *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা* এবং *তোমাকে আমি ছুঁতে পারিনি*- উপন্যাসগুলি বিস্তৃত আলোচনার দাবী রাখে। মূলত অস্তিত্ববাদী দর্শন, সময়ের বিভিন্ন ডাইমেনশন, কালিক-মাত্রা, আত্মবিশ্লেষণের উপখ্যান এগুলি। যেগুলি

বুদ্ধ, অতীশ দীপঙ্কর, অঞ্জলিমাল প্রমুখদের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং বুদ্ধের কালকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করে লেখা হয়েছে। যদিও এর প্রবণতা গুলি, আখ্যানের নির্মাণের মৌলিকতা সত্ত্বেও আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকতায় স্পষ্ট।

‘নৈতিকতা’ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আরেকটি উপন্যাসের কথা বলব, পরবর্তী অধ্যায়ের প্রস্তুতি হিসেবে। প্রমথনাথ তর্কভূষণের, *মণিভদ্র* ঘোষিতভাবে নৈতিক উপন্যাস। বৌদ্ধধর্মের, বুদ্ধের জীবনীর সঙ্গে নৈতিকতা যোগ গভীর। আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য, নন-ফিক্সন হিসেবে এই বিষয়গুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল; নিয়মিত প্রকাশিত হত। জাতক-অবদান কাহিনি গুলিরও মূল উদ্দেশ্য, নীতিশিক্ষা দান। উপন্যাসের কাল, বুদ্ধের সমসাময়িক সময়; বুদ্ধভক্ত, মণিভদ্র এবং রত্নমালার প্রণয় আখ্যান। তারা নিজেদের দাম্পত্যজীবন, রক্ত-মাংসের মানুষের প্রেম-সংসারের থেকেও নৈতিকভাবে ‘সংযমী শ্রমণের’ জীবনযাত্রাকে বরণ করে নিচ্ছে; এই হচ্ছে এর কাহিনি। জাতক এবং অবদানের থেকে প্লট অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধযুগের, বুদ্ধ এবং প্রাথমিক বৌদ্ধধর্মের ‘মহিমাম্বিত বর্ণনা’ এর প্রতিবেশ রচনা করেছে।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন-

প্রায় দুই বৎসর হইল, এই ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র উপন্যাসটি ‘শিল্প ও সাহিত্য’ নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। গত বৎসর হইতে *জগজ্জ্যাতিঃ* নামক মাসিকপত্রে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

...আরও একটি বক্তব্য এই যে,— যে আদর্শ অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত, তাহা অবদান ও জাতক নামে প্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে ঈষৎ আকার পরিবর্তন করিয়াই গৃহীত হইয়াছে। ...কয়েক বৎসর হইতে আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এবং সাধারণতঃ উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিমাট্রই—আমাদের বালক বালিকাগণের মধ্যে নৈতিকশিক্ষা দান দ্বারা চরিত্রোৎকর্ষ-সাধন— একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উজ্জ্বল ও একান্ত মনোহর উৎকৃষ্ট আদর্শ অঙ্কিত করিয়া সাহিত্যের সাহায্যে জন সাধারণের মধ্যে চরিত্রোৎকর্ষ সাধন করিবার আবশ্যকতা—প্রাচীন ভারতে কোন যুগেই উপেক্ষিত হয় নাই, ইহার প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। ঐসকল সাহিত্যের মধ্যে জাতক ও অবদান নামে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থগুলি সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিলেও বোধকরি অত্যুক্তি হইবে না। ঐ সকল জাতক ও অবদান গ্রন্থগুলিতে যে সকল মহনীয় চরিত্রোৎকর্ষের আদর্শগুলি অতি সুন্দর ও নির্দোষভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই আদর্শগুলি আমাদের ভাষায় পুনর্ব্বার সময়োপযোগিভাবে চিত্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে, উহা আমাদের তরুণবয়স্ক ছাত্রবৃন্দের পক্ষে বিশেষ হিতকর হইতে পারে, এই আশায় কয়েকটি জাতক ও অবদান গ্রন্থের আদর্শ অবলম্বনে আমি এই উপন্যাসখানি সংকলন করিয়াছি। (ভূমিকা)⁸⁸

সমাজ নির্ধারিত ‘নৈতিকতা’ প্রসঙ্গেই পরবর্তী অধ্যায়ের অবতারণা। দুইরকমের নৈতিকতা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য, ‘চিরাচরিত-নৈতিকতা’ এবং মানবতাপন্থী-নৈতিকতা। উপন্যাসে চিরাচরিত নৈতিকতার বহুল ব্যবহৃত। আর পালটা প্রস্তাব হিসেবে আছে, দর্শন, রাজনীতির চর্চায় ডিফাইন করা, মানবতাপন্থী নৈতিকতা। দ্বিতীয়টিকে দেবীপ্রসাদ, কোসাম্বী, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল প্রমুখ বৌদ্ধধর্মের সংযম, মধ্যপন্থা এবং নৈতিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এই অধ্যায়ে মেয়েদের লেখা কোনো উপন্যাস আমরা আলোচনা করিনি। তাদের আলাদা পরিসরে আলোচনা করবো বলেই। আমাদের প্রাথমিকভাবে মনে হয়, ‘চিরাচরিত-নৈতিকতার’ দায় সমাজে মেয়েদের ওপর বেশি ন্যাস্ত হয়, ফলে তাদের রচনাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিস্তৃত আলোচনা পরের অধ্যায়ে।

তথ্যসূত্র

- ১। অবন্তী সান্যাল (সম্পাদ), *হাজার বছরের প্রেমের কবিতা*, খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী, নূতন সাহিত্য ভবন, কলকাতা, ১৩৬৬, পৃ ৫৩
- ২। বীথিকা সাহানা, *উনিশ-বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধযুগঃ ইতিহাস, রাজনীতি, মতাদর্শ*, তত্ত্বাবধায়ক আব্দুল কাফি, এম ফিল গবেষণা সন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)
- ৩। George Levine, *Realism, Ethics and Secularism, Essays on Victorian Literature and Science*, Cambridge University press, New York, 2008
- ৪। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *ভারতবিদ্যা ও মার্কসবাদ*, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও দামোদর কোসাম্বী, উথক প্রকাশনী, কলকাতা। ২০১৪
- ৫। Debiprasad Chattopadhyaya, *Religion and Society*, Aakar, Bangalore, 1987, 2003, Page NO. 158-59
- ৬। ধর্মানন্দ কোসাম্বী, *ভগবান বুদ্ধ*, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ ২১৭-২২১
- ৭। জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তি, *আত্ম এবং অপর*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়াদিল্লি, ২০১৮, পৃ ২৫-২৬
- ৮। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন ভট্টাচার্য, *আনতোনিও গ্রামসি বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ১৭
- ৯। পথিক বসু, *বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ ৭১
- ১০। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *কাঞ্চনমালা*, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩২২ কাঞ্চনমালা পৃ১০
- ১১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *সত্যজিৎ চৌধুরী* (সম্পাদ), *রচনাসংগ্রহ*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০১২ পৃ ৩১০
- ১২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *সত্যজিৎ চৌধুরী* (সম্পাদ), *রচনাসংগ্রহ*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ২০১২

- ১৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *শশাঙ্ক*, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ১৪
- ১৪। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ৪
- ১৫। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *বীরবরণ*, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮৮৩, পৃ ২৬
- ১৬। হরিন্দাস পালিত, *চান্দেলী*, ঐতিহাসিক কাহিনী, প্রথম খণ্ড, গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩২২, পৃ নিবেদন
- ১৭। Sashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cult*, Firma KLM Private Limited, 1995, Page No. 3
- ১৮। Sartre, Jea-Paul, *What is Literature*, Routledge, 2nd edition, 2001
- ১৯। দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম এবং ২য় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০২
- ২০। দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ১ম এবং ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬,
- ২১। দীনেশচন্দ্র সেন, *শ্যামল ও কঙ্কাল*, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৪৫, পৃ ২০
- ২২। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *চর্যাগীতির ভূমিকা*, কলকাতা ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ ১, নিবেদন অংশ
- ২৩। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *দেবীকোট*, প্রকাশক শ্রী জয়াদ্রিনাথ সান্যাল, গঙ্গোত্রী পরিষদ, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ ২
- ২৪। শিবশিস মুখোপাধ্যায়, *কাহ্ন*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩, পৃ ২৩
- ২৫। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ৮২১
- ২৬। আব্দুল কাফি, প্রবন্ধ- *স্মৃতি, পরিচিতি আর সময়ের স্বাদ*, দেশ পত্রিকা, ২ জুন, ২০১৮
- ২৭। ক্ষেত্র গুপ্ত, *উপন্যাসের ইতিহাস*, ৪ র্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃ ৩১৫
- ২৮। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ ৮২৮
- ২৯। জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *কল্লোলের কাল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ ১১০-১১৯
- ৩০। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *করুণাঘন*, বৈশাখ, ১৩৬৪, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বসুধারা
- ৩১। বিপ্রদাস বড়ুয়া, *শ্রামণ গৌতম*, পুস্তকবিপনী, কলকাতা, ২০০২, পৃ ২৮৬
- ৩২। সত্যেন সেন, বদিউর রহমান (সম্পাদিত), সত্যেন সেন রচনাবলি, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ ২১-২২
- ৩৩। সত্যেন সেন, বদিউর রহমান (সম্পাদিত), সত্যেন সেন রচনাবলি, ৪ র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ ৫২৩-২৪
- ৩৪। <http://www.amarboi.com/2015/06/prodoshe-prakreetojon-showkat-ali.html>

- ৩৫। সুমিতা চক্রবর্তী, *আমার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণে বর্জনে*, কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১০, পৃ ৩৭
- ৩৬। শওকত আলি, *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৬ পৃ ১৯৬-৯৭
- ৩৭। সমরেশ মজুমদার, *শরণাগত*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ১২৪
- ৩৮। রায় শ্রী শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, *বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০০, পৃ ৫৪৩
- ৩৯। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *কাঞ্চনমালা*, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩২২, পৃ ২৬০
- ৪০। নারায়ণ সান্যাল, *দশটি উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ ৪৮
- ৪১। নারায়ণ সান্যাল, *আম্রপালী*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ ১১
- ৪২। সন্মাত্রানন্দ, *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা*, অতীশ দীপঙ্করের পৃথিবী, ধানসিড়ি, কলকাতা, ২০১৭, পৃ ৪০
- ৪৩। Meszaros Istavan, *Marx's theory of Alienation*, Aakar, 2013. Page No. 8
- ৪৪। প্রমথভূষণ তর্কভূষণ, *মণিভদ্র*, বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস, শ্রী গোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩২১

চতুর্থ অধ্যায়

থেরীগাথা থেকে মেয়েদের লেখা উপন্যাস: আধুনিকতার মাত্রা

এই অধ্যায়ে, আলোচ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে শেষ উপন্যাসটি, চর্যাগীতির রচনাকালের প্রতিবেশ এবং প্রেক্ষাপটে লিখিত, বাকিগুলি বুদ্ধকালে বা পরবর্তী বৌদ্ধকালে(যখন রাজার ধর্ম বা সাধারণের প্রধান অনন্তপূণ্য (১৯৮৭), বাণী বসুর *মৈত্রেয় জাতক* (১৯৯৬), সেলিনা হোসেনের *নীল ময়ূরের যৌবন* (১৯৮২)। প্রকাশকাল অনুযায়ী *নীল ময়ূরের যৌবন* তৃতীয় স্থানে থাকার কথা কিন্তু, এই উপন্যাসটি একবারে শেষে ব্যাখ্যা করবো।

উপন্যাসগুলিতে ব্যবহৃত কাহিনিকাল প্রাগাধুনিক, একথা ঠিক; কিন্তু উপন্যাস সংরূপটি আধুনিক, লেখকরাও এই সময়ের। আমাদের নির্বাচনের উদ্দেশ্য, এই উপন্যাসগুলির লেখকদের বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ, এবং অবস্থানকে চিহ্নিত করে তার প্রবণতাগুলিকে বুঝতে চেষ্টা করা।

এই চিহ্নগুলির সঙ্গে যোগ আছে লিঙ্গ-রাজনীতির। অন্য উপন্যাসে যে, একথা নেই তা আমরা একেবারেই বলতে চাইছি না। আগের অধ্যায়ে আলোচিত বেশিরভাগ উপন্যাসেই, এই অধ্যায়ে চিহ্নিত প্রবণতাগুলির ছাপ আছে। বাংলা উপন্যাস লেখার ধারায়, পুরুষের আধিপত্য; নারী সংখ্যায় অনেক কম, তৃতীয় লিঙ্গ নেই! এর কারণ অবশ্যই রাজনৈতিক লিঙ্গগত বৈষম্য।

নারী অথবা পুরুষ উভয়ের লেখাতেই তাদের বিষয়-ভাবনা, ভাষা, চরিত্র, অভিপ্রায় নির্মাণে ‘আধিপত্যের’(হেজিমনি) প্রবণতাকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, ভাবনার প্রচার এবং প্রসার লিঙ্গের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা বারবার প্রমাণিত। একথা ঠিকই নারীবাদের আলোচনায় সমাজ এবং শ্রেণির তথ্য নির্ভর পরিসংখ্যান অর্থনৈতিক ডেটা বিচার অনেক বেশী জরুরি। মেয়েদের লড়াইয়ের ইতিহাসের বিভিন্ন সত্য ও তথ্যের নথি (নন-ফিক্সনাল) এই

লড়াইকে বুঝতে অনেক বেশি সাহায্য করে। শুধুমাত্র সাহিত্যের, বিশেষত ফিল্মের আলোচনায় এই ধারাকে বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু সাহিত্যও এই বিচারের এবং চর্চার একটি স্বীকৃত মানদণ্ড। বাস্তব সত্য এবং তথ্যের পাশাপাশি, ফিল্মের আলোচনা এই ধারায় একটি আলাদা মাত্রা যোগ করে। কিন্তু ফিল্মকে বিচার করতে গিয়েও, বাস্তবের, সমকালের সামাজিক-অর্থনৈতিক-মেডিকাল তথ্য, নথি, দিনলিপিকে তুলনামূলক ভাবে পড়া, হাজির করা একই সঙ্গে ভীষণভাবে প্রয়োজন। তাহলেই আমরা ‘মেয়েদের’ সামাজিক-অবস্থানের একটি সামগ্রিক ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারবো।

বাস্তবের প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটে এ তো পুরনো আংশিক-সত্য কথা। কিন্তু সাহিত্য কি বাস্তবকে চালিত বা প্রভাবিত করার চেষ্টা করে না? বাস্তবের থেকে দূরবর্তী ‘ইচ্ছেপূরণের-জগৎ’ সৃষ্টি করে ভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা, বাস্তবের ওপর পর্দা ফেলার চেষ্টা, ক্ষমতার হেজিমনি অনুযায়ী আমাদের দিকভ্রান্ত করে, আমাদের ‘চাহিদা’, ‘ফোকাস’ কে নির্মাণের চেষ্টাও একই সঙ্গে কার্যকর। পাঠকগোষ্ঠী, বাজার মেয়ে-লেখকদের কাছে আলাদা কিছু ‘নৈতিক-মাত্রা’ দাবী করে। মেয়ে-লেখক এবং পুরুষ লেখক এই লিঙ্গগত বিভাজনের রাজনীতির আলাদা আলোচনার প্রয়োজন কতখানি? মেয়ে-লেখকদের, বিষয় নির্বাচন, মন্তব্য প্রকাশে বেশি সচেতন হওয়ার দরকার পড়ে?

আমরা গোটা গবেষণা জুড়ে এই প্রশ্নগুলির উত্তরই খোঁজার চেষ্টা করছি। তার সঙ্গে আছে, বৌদ্ধধর্ম এবং ইতিহাসের ধারায়, এই লিঙ্গ রাজনীতির প্রসঙ্গটি কালে কালে কীভাবে সংযুক্ত হয়েছে, এবং বদলেছে সেসব কথা।

জাতকে, বিশেষত, উদধ্বনি, বন্ধনমোক্ষ, রাধজাতক, চুল্লপদ্ম, উচ্ছিষ্টভক্ত, কুণালজাতক, সমুদগ্জাতকে; এবং অন্যান্য বৌদ্ধ ‘টেক্সট’(বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা ইত্যাদি), মেয়েরা,- অরক্ষণীয়া, সাধারণভোগ্যা, অকৃতজ্ঞা, মোক্ষলাভের অন্তরায়স্বরূপ এরকম বহু কটুক্তিপূর্ণ। কিন্তু খেয়াল করে দেখবো, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমস্ত ধর্মীয়-বইয়েই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের এরকম বর্ণনা আছে।^১

বুদ্ধ, প্রথমে, মেয়েদের সংঘে নিতে আপত্তি করেছিলেন বলে, অনেকেই মনে করেন বুদ্ধ মেয়েদের সম্পর্কে হীন মনোভাব পোষণ করতেন। এই ভ্রান্ত ধারণাটি ঈশানচন্দ্র ঘোষ, বেশি জনপ্রিয় করে তোলেন, তাঁর মহৎ গবেষণার পাশাপাশি।(তদেব)

সংঘের মধ্যে পুরুষ ভিক্ষুর প্রাধান্য এবং মর্যাদা বেশি ছিল তা সত্য। কিন্তু জ্ঞান আহরণে, তর্কবিদ্যা আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় নি। বেশ কয়েকজন বিদূষী ভিক্ষুণীকে (ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা)বুদ্ধ নিজে প্রধানের পদমর্যাদা দিয়েছিলেন সেই প্রমাণও পাওয়া যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে জাতকের গল্পগুলি বেশিরভাগই মৌখিক, জনশ্রুতি গল্পের রূপ, যা বুদ্ধের দ্বারা ব্যবহৃত। আমরা আর প্রমাণ করতে পারিনা কোন গল্প গুলি তাঁর মুখ নিঃসৃত কোনগুলি প্রক্ষেপ। চপলা বর্মা তাঁর প্রবন্ধ “*The Wildering Gloom*”: *Women’s Place in Buddhist History*তে এই বিষয়টি বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁর প্রবন্ধটি একটু পুনরাবৃত্তিমূলক। মূলত প্রবন্ধে দুটি যুক্তি আছে- এক, জাতকের গল্প এবং বুদ্ধের বাণী, বহু যুগ পরে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে, ফলে প্রচুর প্রক্ষেপ আছে, আমরা আর নিশ্চিত করে বলতে পারি না- কোনগুলি বুদ্ধের নিজস্ব মত কোনটি নয়। বুদ্ধের সমস্ত কথাতে নারীবিদ্বেষের প্রমাণ পাওয়া যায় না, শ্রদ্ধা এবং সম্মানের বোধও প্রকাশিত। দুই, শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধকথা নয়, যেকোন ধর্মের যেকোন কথা এবং গাথায় এরকম ‘নারীবিদ্বেষী’ ভাবনার প্রচলন আছে, শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মকে কোনঠাসা করা ঠিক নয়। এর যুক্তি তেমন দেননি। এছাড়াও তিনি বলেন-

...those responsible for this recasting of the original prescriptions for the conduct and organization of Buddhist society were men, the rules that came to dominate Buddhist life were framed from the male perspective. It is not surprising, then, that the place of men has been elevated in Buddhist society while that of women has been debased. These texts are therefore unreliable guides to understanding both how the Buddha himself thought of women and what the place of women really was in early Buddhist society.^২

আমাদের এই প্রবন্ধের বক্তব্যের সঙ্গে বেশ কিছু সংযোজন আছে। সবক্ষেত্রে আমরা চপলা বর্মার সঙ্গে একমত নই।

খেয়াল করবো, বুদ্ধকথায়, জাতক ইত্যাদিতে কোন মেয়েদের ‘হীন’ চরিত্রের করে দেখানো হয়েছে? যারা ‘বিধর্মী’; বৌদ্ধধর্মের আওতায় তখনও আসেনি, বা বৌদ্ধধর্ম তথা বুদ্ধকে কোনোভাবে কলঙ্কিত করতে চেয়েছে। সমস্ত ধর্মের ক্ষেত্রেই এই ন্যারেটিভ বা কথন এক। এই ধরণটি যেকোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপ্রচারের সমস্যাযুক্ত অঙ্গ। অন্যান্য ধর্মের মতই বাইনারি তৈরি করা হয়েছে নারী-চারিত্রের ক্ষেত্রে। বৌদ্ধধর্মের আওতায় যারা আছে,- তারা দৃঢ় চারিত্র্যযুক্ত, শালীন, উচ্চবর্গীয়, শিষ্টাচারযুক্ত, ‘ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-মান-মর্যাদার-জ্ঞানের’ ধারক ও বাহক। আর দ্বিতীয় ধরণটি ঠিক বিপরীত বৈশিষ্ট্যবলীর সমাহার। যত বেশি করে ‘অপর’দের হীন প্রমাণ করা যাবে, তত বেশি করেই তো ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হবে! অবশ্যই সেক্ষেত্রে মেয়েরা সহজ নিশানা। একদিকে থাকবে ‘কুরুচিকর হীন অপর’; অন্যদিকে ‘ধর্মে’র আওতায় আসা মেয়েরা ‘শীলপূর্ণ’। ধারাবাহিক ধর্মের ইতিহাসে এটাই সরলতম কথন। এখানে কোনো ধর্মকেই ‘রক্ষা’ করতে যাওয়া, বা কোনোধর্মের হয়েই ‘চৌকিদারি’ করতে যাওয়া, যুক্তির ধোপে ঢিকবে না। আমরা আরেকবার মনে করে নেব, আমাদের এই গবেষণার উদ্দেশ্য, ধর্মীয় রাজনীতির ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করা, সেক্ষেত্রে আমরা বেছে নিয়েছি মাত্র বৌদ্ধধর্মকে।

আবার এই কথন বদলে গেছে যখন অন্য ধর্ম জায়গা করতে চেয়েছে। ‘বেণের মেয়ে’, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের উপন্যাসের বিবরণের আমরা পাবো, ভিক্ষুণিরা ‘হীন, ব্যভিচারি, অসতী, কুলনারীদের সতীত্ব নাশে মন্ত্রণাদাত্রী’ হিসেবে। এরা অন্তরমহলে যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে ‘জাতিধর্ম নাশের’ চেষ্টা করে। মনে রাখতে হবে, তাদের আখ্যানের উদ্দেশ্য ছিল- হিন্দুধর্মের উত্থানের কথন। আবার ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ে আছে বৈষ্ণবপীঠস্থান থেকে ‘অনাচারী নেড়া-নেড়িদের’ বিতাড়নের কাহিনী। পরে বৈষ্ণবীরা ‘হীন, ব্যভিচারি, কুলবধূদের জাতি-ধর্ম নাশের মন্ত্রণাদাত্রী’ হয়েছে ভিক্ষুণিদের মতই।

বিষবৃক্ষ মনে পড়বে এবং দেবেন্দ্রর ‘ছদ্মবেশ’। এছাড়াও অনেক আখ্যানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেখানে ভিক্ষুণি এবং বৈষ্ণবীদের এমন বর্ণনা পাবো। দীনেশচন্দ্র সেন ইতিহাস লিখতে গিয়ে একই যুক্তিতে বৌদ্ধধর্মকে কোন্ঠাসা করছেন, আর বৈষ্ণব ধর্মকে কলঙ্কমুক্ত করতে চাইছেন, সেকথাও আমরা আগের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনায় দেখিয়েছি।

আমরা উপন্যাসের আলোচনায় যাব। তার আগে নারীবাদী সমালোচনার ক্ষেত্রে, বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা উল্লেখ করবো। তাত্ত্বিকরা নারীবাদের সঙ্গে যুক্ত, প্রাথমিক কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন,-

The concern with ‘conditioning’ and ‘socialisation’ underpins a crucial set of distinctions- that between the terms ‘feminist’, ‘female’, and ‘feminine’. As Toril Moi explains, the first is ‘a political position’, the second ‘a matter of Biology’, and the third ‘a set of culturally defined characteristics’.

...The representation of women in literature, was felt to be one of the most important form of ‘socialisation’, since it provided the role models which indicated to women, and men, what constituted acceptable versions of the ‘feminine’ and legitimate feminine goals and aspirations. Feminists pointed out, for example, that in nineteenth-century fiction very few women work for a living, unless they are driven to it by dire necessity. Instead the focus of interest is on the heroine’s choice of marriage partner, which will decide her ultimate social position and exclusively determine her happiness and fulfilment in life, or her lack of these.^৩

আমাদের আলোচনা মূলত তৃতীয় শব্দ, ‘ফেমিনিন’কে মাথায় রেখেই। বাংলা সাহিত্যেও এই একই প্রবণতা আমরা খেয়াল করি। বেশিরভাগ, মূলধারার জনপ্রিয় সাহিত্যে(উপন্যাসে), মেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন এমনই। জোর পড়ে, বিশেষত ‘সঙ্গিনী, মাতা, কন্যা’ সত্ত্বার ওপরেই। ‘জীবনসঙ্গী’ নির্বাচনের জটিলতা, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জটিলতা, একে অপরের বিরুদ্ধে মেয়েদের লড়িয়ে দিয়ে, ‘সঙ্গী’ বাছাইয়ের প্রতিযোগিতা, এবং সেই সিদ্ধান্তকে ঘিরেই তার ‘সামাজিক-পারিবারিক মান-মর্যাদার উত্থান-পতনের’ ঘটনাক্রম- এসবই ঘুরে ফিরে কাহিনি নির্মাণের ‘একঘেঁয়ে ফর্মুলা’ ব্যবহৃত, ব্যবহৃত...

অন্যদিকে, যা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একেবারেই চর্চা নেই বললেই চলে তাহল, মেয়েদের ওপর অনবরত ঘটে চলা, ঘরে বাইরে ‘হিংসাত্মক’ ঘটনার ছবি বা তার সঠিক কারণ নিয়ে চর্চার পরিসর। ‘ব্যক্তি’ হিসেবে তার চারিত্রিক বিকাশ, আত্মসমীক্ষা, স্বতন্ত্র কর্মজগৎ বা অন্য কোন জগৎ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয় হয়ে ওঠেনি। কোথাও সেই হিংসা নিয়ে কথা বলা হলেও, তাতে আছে পক্ষপাত, ‘পুরুষতান্ত্রিক এবং যৌনগন্ধী ছাঁকনির প্রলেপ’! গার্হস্থ্য হিংসা, সম্মতি ব্যতিরেকে বৈবাহিক সংগম, ধর্ষণ, অ্যাসিড-অ্যাটাকের মত পৈশাচিক হিংসা ইত্যাদির কোন, প্রভাব জনপ্রিয় মূলধারার উপন্যাসে নেই। অথচ সরকারি-বেসরকারি ডেটায়, খবরের কাগজে তা প্রতিদিন বর্তমান, বর্ধমান। নন-ফিক্সন থেকে পাঠক যখনই ফিক্সনে মুখ ঘোরান, তখনই ‘ফেমিনি-চারিত্র্য’ নির্মাণের ‘ভ্রান্ত-আখ্যান’ আবার তাকে গ্রাস করে। যেন মূল সমস্যা গুলি সচেতনভাবে ভুলিয়ে দিতেই এত আয়োজন!

এই ‘বয়ানে’, সবরকমভাবে মেয়েদের ওপরেই ভার চাপিয়ে দেওয়া হয় ‘চিরাচরিত-নৈতিকতা, শালীনতা, ঐতিহ্য, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মাচরণ, নিয়মানুবর্তিতা, সীমাবদ্ধ আধুনিকতা, একগামিতা...’ বজায় রাখার। তার প্রচারক, ধারক বাহক মেয়ে এবং পুরুষ উভয় ফিক্সন-স্রষ্টাই। এই উপাদানগুলি লিঙ্গ-সাম্যের বিচারে ধার্য নয়; মাপকাঠি, মেয়ে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা।

নারীবাদের আরেকদিকে আছে, মেয়েদের ভিন্ন ভিন্ন লড়াইয়ে একে অপরের পাশে থাকার, একে অপরের ‘উন্নয়নে-উৎসাহদানের’ ইতিহাস এবং অঙ্গীকার। কিন্তু বেশিরভাগ ফিক্সনে তাদের চিত্রায়ণ প্রতিযোগিতামূলক(ক্যাট-ফাইটের মত মুখরোচক, বিনোদন পূর্ণ, অশ্লীল নামকরণও আছে তার)- শাশুড়ি-বৌমা, দুই বন্ধু, দুই বোন, ননদ-বৌদি, দুই-জা, একই পুরুষের জন্য (বেআইনি) ‘সতীন’-মাফিক সম্পর্ক ইত্যাদি। তার সঙ্গে যুক্ত আরও বাইনারি উপাদানঃ ঘরোয়া-আধুনিকতা; ধর্মাচারী-নাস্তিক; পড়ুয়া, চাকুরীজীবী- গার্হস্থ্যকর্মনিপুণা। অবশ্যই আখ্যানের ঘটনাক্রমে প্রথম উপাদান গুলি ‘মর্যাদাপূর্ণ’ এবং কাম্য; পরের গুলি ন্যাকারজনক। এরসঙ্গে সমাজ-সাহিত্য অর্থনীতি রাজনীতি, প্রযুক্তি -বিজ্ঞান যত ‘আধুনিক’ হয়েছে, মেয়েদের ‘আধুনিক’তার সম্পর্ক তার সঙ্গে ব্যাস্তানুপাতিক হয়েছে। মেয়ে এবং

পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাইনারি তো আছেই, যেমন- অর্থোপার্জন- গার্হস্থ্যকাজ, বীরত্ব- বীরের সঙ্গিনী, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা- সিদ্ধান্ত পালন, যুক্তি- আবেগ, প্রযুক্তিনির্ভরতা- অজ্ঞতা, আবেগশূন্যতা- আবেগনির্ভরতা, মাথা- মন, সমাজের মূল অংশ- অপর, প্রথম লিঙ্গ- দ্বিতীয় লিঙ্গ। অবশ্যই প্রথমগুলি পৌরুষের সঙ্গে যুক্ত। আর ‘চিরাচরিত-নারীকল্পের’ সঙ্গে দ্বিতীয় গুলি। তার সঙ্গে আছে সম্পর্ক-পরিবার- একগামিতা রক্ষার, সন্তান-পালনের সামগ্রিক দায়ভার এবং জবাবদিহি।

সমতার বদলে মেয়েদের ‘লিঙ্গভিত্তিক নির্দিষ্ট কাজ এবং ভূমিকাকে’ বারবার ‘মহিমাস্থিত’ করার চেষ্টা চলেছে, উপন্যাসে। আধুনিকতার নাম দিয়ে তার ‘সৌন্দর্যের’ নতুন নতুন মাপকাঠি এবং মাত্রা যোগ করা হয়েছে। সেখানেও আছে দু ধরনের মাপকাঠি- ‘ঐতিহ্যপূর্ণ এবং আধুনিক সাজ-পোশাক’! (ইণ্ডিয়ান-ওয়েস্টার্ন)! এর হুঁদুর-দৌড়ে আছে গাত্রবর্ণ, শারীরিক গঠন (স্লিম, পিয়ার শেপড, আওয়ার-গ্লাস...), চুল, পোশাক-গয়না ইত্যাদি, সেগুলিকে শানিয়ে তোলার জন্য স্পা-পার্লারের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাজার। এবং এই সমগ্র ব্যবস্থাপনা অন্যান্য বাজারের মতই, নিত্য পরিবর্তনশীল, চাহিদা-যোগান-পণ্যের নতুন নতুন নির্মাণ এবং প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। এখানেও ‘মেয়ে উপভোক্তারা’ একে অপরের প্রতিযোগী! একই পত্রিকায়, এইসব উপাদানকে ব্যবহার করে থাকে গল্প। পরের পাতায় এইসব উপাদানের দ্রব্য-বিজ্ঞাপণ। বাজার এভাবেই ভাবনাটিকে নির্মাণ করে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে, বেশিরভাগ সাহিত্যে, লিঙ্গ ভাবনা, মেয়েদের অবস্থান, মতাদর্শকে যেভাবে প্রচার করা হচ্ছে, বাস্তব সমাজের পরিসংখ্যানের তথ্য একেবারেই বিপরীত কথা বলছে। মধ্যবিত্তের লিখিত, মধ্যবিত্ত উপভোক্তার জন্য তৈরি সাহিত্যে, লিঙ্গ ভাবনাকে বাজারের প্রয়োজনে চালিত করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য তার সঙ্গে সামাজিক প্রগতি, আধুনিকতা, লিঙ্গ-সমতা, বাজারের পণ্যের চাহিদা এবং বিক্রির ভাবনা ইত্যাদি মাপকাঠিগুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আমরা মেয়ে-লেখকদের আলাদা করেছি, রাজনৈতিক পরিচয় এবং অবস্থানের জন্যই। তাদের ‘দ্বিতীয় লিঙ্গ’ হিসেবে চিহ্নিত করা স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ সংকীর্ণ রাজনৈতিক ইতিহাসের ফলাফল।

এখানে উল্লিখিত লেখকরা প্রত্যেকে, এই সমাজে লেখক হয়ে ওঠার জন্য লড়াই করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় অপমানিত হয়েছেন, মেয়ে এই পরিচয়টির জন্য লড়াই কর্তিন হয়েছে, একথাও স্বীকার করেছেন বিভিন্ন আলোচনার সূত্রে, ব্যক্তিগত জীবনভিত্তিক ইন্টারভিউ এবং লেখালেখিতে। যেমন অন্যান্য প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে, খুঁজলে মেয়ে এবং পুরুষের একই কাজের জন্য প্রতিদান (বেতন এবং সম্মান) অসম। তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, বাংলা-সাহিত্য জগতে, বলা ভালো লেখাপড়ার জগতে, মেয়েদের, নিজের অবস্থান নির্দিষ্ট করার জন্য, বৃহৎ লড়াইয়ের ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। আমাদের আলোচ্য, এই নির্দিষ্ট পরিসরে, মেয়ে লেখকরা তাদের ‘নির্দিষ্ট বক্তব্য, সিদ্ধান্ত, অবস্থান’ কে ‘মেয়ে’ হিসেবে, দেখতে বা বুঝতে চেয়েছেন, তাঁদের ‘রাজনৈতিক’ প্রশ্নগুলিকে তাঁদের উপন্যাসের বিষয়, প্রেক্ষাপট, চরিত্র মতাদর্শ নির্মাণের মধ্য দিয়ে কীভাবে হাজির করছেন। স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে মেয়েদের অবস্থানের প্রশ্নগুলি এদের লেখায় সচেতনভাবেই হাজির হয়েছে, কিন্তু তাদের রাজনৈতিক অবস্থান কোনদিকে, তারা যে সমস্যা ও সমাধানের(যদি সমাধান খোঁজেন) কথা বলছেন সেগুলি কেমন?

প্রাগাধুনিক কালের সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য (প্রেরণা) হিসেবে, ঈশ্বরের(প্রত্যক্ষ বা ছদ্মবেশে, স্বপ্নাদেশ) আদেশ বা রাজার আদেশ বলে খানিক ‘দায় এড়ানোর’ রীতি প্রচলিত ছিলো বা সমালোচকেরা তাকে সেভাবে ব্যাখ্যা করতেন। একালে তা হাস্যকর। শাসকের ‘আদেশের’ অনুসরণকে, লেখকের ব্যক্তিগত তাঁবেদারির ইচ্ছাই বলা হবে। কিন্তু গুণগোল আরেক জায়গায়, ভাতের সংস্থানের ক্ষেত্রে। আগে রাজা এবং তার অমাত্যদের খুশি করলেই সাহিত্য রচনার কাজ আর ভাত কাপড়ের সংস্থান সবই চলত। কিন্তু এখন রাজসভা নয়, সাহিত্যের দরকার জনসভার এবং বাজারের অনুমোদন, লেখককে মাথায় রাখতে হয় তাদের পছন্দ-অপছন্দের কথা কারণ তার ওপরেই পণ্যের বিক্রি নির্ভর করছে।^৪ ব্যতিক্রম সবকালেই ছিল একথা বলাবাহুল্য। যেমন সেকালে ‘চর্যাগীতি’ শাসকের রক্তচক্ষুর আড়ালে লিখিত এবং

রক্ষিত। আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসগুলির রচয়িতাদের বিষয় ও ভাবনার নির্বাচন থেকেই আমরা আমাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবো।

বুদ্ধকথা, বৌদ্ধধর্ম-দর্শন, ইতিহাসকে, উপন্যাসের বিষয় হিসেবে, ‘গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের’ খোঁজে ব্যবহার করেছেন বহু সাহিত্যিক। আগের অধ্যায়ে তা নিয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে এরকম দুটি উপন্যাসকে আমরা নির্বাচন করেছি- *রামগড়* এবং *দ্রিবেনি*; লেখক অনুরূপা দেবী (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২- ১৯ এপ্রিল, ১৯৫৮)।

অনুরূপা দেবী সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি পণপ্রথা, বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাধুরীলতার সঙ্গে, মুজফ্ফরপুরে ‘চ্যাপম্যান গার্লস স্কুল’ স্থাপন এবং পরিচালনা করতেন। যুক্ত ছিলেন কলকাতা ও কাশীর কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গেও। মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। মেয়েদের কল্যাণের জন্য একাধিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০-এ মহিলা সমবায়ও তৈরি করেন। পরের বছর উত্তর বিহার সাহিত্য সম্মেলনে কথাসাহিত্য শাখার সভানেত্রী হন। ১৯৪৬-এর হিন্দু কোড বিল আন্দোলনে, যুক্ত ছিলেন। শ্রীভারতধর্ম মহামণ্ডল থেকে ‘ধর্মচন্দ্রিকা’ (১৯১৯) উপাধি; শ্রী শ্রী বিশ্বমানব মহামণ্ডল থেকে ‘ভারতী’(১৯২৩) উপাধি, পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৩৫) জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, (১৯৪১) এ ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক পান। ১৯৪৪-এ ‘লীলা লেকচারার’ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।^৫

সব দিক মিলিয়েই তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান, নারী-ভাবনার নির্মাণ। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়েছে তাঁর উপন্যাসের ভাবনাতেও। আমরা বৌদ্ধকালের প্রেক্ষাপটে লেখা, তাঁর দুটি উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি।

(২)

এই চারটি উপন্যাসের অভিপ্রায় এক নয়। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অবস্থান এবং মাপকাঠির নিরিখে আমরা এই লেখকদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি, এঁরা ‘হিন্দু অথচ উদার’(সেলিনা হোসেনের উপন্যাসটিতে, লেখকের ধর্ম পরিচয় ছায়া ফেলেনি), ‘চিরাচরিত-নৈতিকতা’ এবং ‘ইটারনাল ফেমিনিন’ এর ধারণায় বিশ্বাসী। সেলিনা হোসেন ছাড়া অন্য তিনজনের উপন্যাসের মূল চরিত্ররা অভিজাত, উচ্চবংশীয়; তাদেরকে কেন্দ্র করেই গল্পের বিস্তার।

‘হিন্দু অথচ উদার’ এর অর্থ, প্রথম অধ্যায়ের আলচনাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উনিশ শতক থেকেই একটি ‘বৃহৎ হিন্দুধর্মের’ উদার-ধারণা তৈরি করে ইসলাম ও খৃষ্টান বাদের বাকি ছোটো ও অপ্রধান ধর্মকে নিজের আওতায় (ধর্মীয় হেজিমনি) নিয়ে এসে ‘অপর এবং গৌণ’ করা হয়েছে, তা আমরা বলেছি। এই লেখকরা তিনজনেই ব্যক্তিগত জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাস উপন্যাসে নিয়ন্ত্রিত হয়নি, উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে স্বাভাবিক বৌদ্ধধর্মের দর্শন-ইতিহাস থেকে সরে এসেছেন, তাদের ফিক্সন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। সেখানে বৌদ্ধদর্শনের কালক্রমিক চর্চার গভীরতা একেবারেই নেই।

লেখক নিরপেক্ষ নন তাঁর পক্ষপাত থাকেই; আর তাঁর স্বরকে প্রশ্ন করা, বুঝতে চাওয়াও তাঁর টেক্সটকে পড়ার একটি জরুরি ধরণ। তাঁদের পক্ষপাতগুলিকেও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা, একটু মনে করবো। অনুরূপা দেবী, তাঁর সমসাময়িক আর বাকিরা সকলেই তাঁর পরবর্তী। ফলে তাঁর প্রভাব সকলের মধ্যেই থাকাটা অবশ্যম্ভাবী। সকলেই রবীন্দ্রনাথকে কম বেশি স্মরণ করেছেন, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে। কিন্তু এঁরা সম্পূর্ণভাবে ‘কবির ধর্ম’-কে গ্রহণ করেননি। বরং প্রথম অধ্যায়ে আমরা যেসব হিন্দুপ্রধান প্রবণতাগুলির উল্লেখ করেছিলাম এঁরা তার উত্তরাধিকার বহন করেছেন। সংকীর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখেছি,

হিন্দুধর্মপ্রাধান্য কীভাবে ‘বাঙালির আত্মপরিচয়’ সীমাবদ্ধ একরৈখিক করতে চেয়েছে। এই উপন্যাসগুলিতেও তার ছায়া পাবো।

দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর উপন্যাস লেখার উপাদান যেখান থেকে সংগ্রহ করেছেন, তার তালিকা দিয়েছেন-

কাহিনীর সূচনা রাজগীরে। বুদ্ধের পদাউসরণ করতে করতে কাহিনীটি ধীরে ধীরে রূপ পায়। যে সব গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে প্রধান হোল রিস ডেভিডস ও রকহিলের রচনাবলী; অমূল্য চন্দ্র সেনের বুদ্ধকথা এবং রাজগৃহ ও নালন্দা; রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধদেব; অবনীন্দ্রনাথের নালক; সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের বুদ্ধজীবনী, সুকুমার দত্তের অনূদিত মহাপরিনির্বাণ সুত্ত; রামপ্রসাদ সেনের ধম্মপদ; ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতকমঞ্জরী; ভিক্ষু শীলভদ্রের দীঘানিকায়; বিজয়চন্দ্র মজুমদারের থেরী গাথা; বিমলাচরণ লাহার বৌদ্ধযুগের ভূগোল ও ডঃ আশা দাসের বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ। (সূচনা)^৬

এই তালিকার বই এবং লেখকদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। ফলে দীপ্তি ত্রিপাঠীর অবস্থান বেশ স্পষ্ট। উল্লেখ্য, থেরীগাথার উল্লেখ থাকলেও, তিনি থেরীগাথার স্পৃহাকে, সেভাবে গ্রহণ করেননি, আমরা বিস্তৃত আলোচনায় যাবো।

মৈত্রেয় জাতকের নিবেদন অংশে বাণী বসু বলেছেন-

অশ্বঘোষ, ললিতবিস্তর, অবদানশতক এবং সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রনাথ সবার চোখেই বুদ্ধ করুণার অবতার। সবার আগে অবশ্যই তিনি অধ্যাত্মপুরুষ। কিন্তু আধ্যাত্মিক কৃতির মূল্যায়ণ তো অনাধ্যাত্মিক মানুষের ক্ষমতার বাইরে! ... (নিবেদন)^৭

ফলে মন্তব্যটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথ নন, লেখকের ওপর উনিশ-বিশ শতকের ‘অবতারকল্পের’ ভাবনার চর্চা যাঁরা করছেন, তাঁদের প্রভাব পড়ছে। ‘কবির ধর্মে’ এভাবনা নেই।

রামগড় (১৯০৩), দীর্ঘকাল পরে ১৯১৮ সালে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত বইয়ের ভূমিকায় লেখকের কথা আমরা খানিকটা উদ্ধৃত করছি-

রামগড় ১৩১০ সালে প্রথম লিখিত হয়। সে সময় বৌদ্ধজগতের ইতিহাস এরূপ সুপ্রচারিত হয় নাই।- হইলেও সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নিতান্তই অল্প ছিল। কেবলমাত্র শাক্য বিবাহ প্রথার অনুসরণে এবং গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী ‘রামগড়’ হ্রদ সম্বন্ধীয় একটি কিম্বদন্তী অবলম্বনে এই উপন্যাসখানি রচিত হয়।...

উক্ত ইতিহাসের সহিত বহুস্থলে একতা সম্পন্ন হইলেও আমার কল্পনার সহিত বাস্তবের মূল ঘটনাটিতেই অনৈক্য ঘটিয়াছিল। অগত্যা ইহার মহিমা ত্যাগ করিতে হয়।

...আবার এত দিনের পর তাঁহাদেরই একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহের বলে ইহাকে বহুস্থলে পরিবর্তিত ও সংশোধিত করিয়া পুরাতনের নূতনে মিশ্রিত এই ‘রামগড়’কে সাধারণ্যে বাহির করিলাম। যতটুকু সম্ভব ইতিহাস সম্মত ঘটনা ইহাতে সন্নিবেশ চেষ্টা করিলেও উপাখ্যান ভাগের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থ সে চেষ্টা সর্বত্র ফলবতী হইতে পারে নাই। যাহা হউক ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের চক্ষে না দেখিলেই ইহার সমুদয় ঐতিহাসিক দ্রুটি মার্জ্জনীয় হইতে পারিবে ইহাই ভরসা। (লেখিকা, মজঃফরপুর, ২২ শে বৈশাখ, ১৩২৫)^৮

ঐতিহাসিক উপন্যাসে, ইতিহাস কল্পনা উভয় থাকে। উপন্যাসটি পড়লেই বঙ্কিমের স্পষ্ট প্রভাব চোখে পড়ে। এমন কী প্রতি অধ্যায়ের শুরুতে পাশ্চাত্যের কবি, উপন্যাসিকদের বিভিন্ন লাইন ব্যবহার করাও অনুকরণ করা হয়েছে।

লেখক এখানে বিষ্ণুর অবতারত্বকে মেনেছেন, এবং রামের রঘুবংশ ও বুদ্ধের শাক্যবংশ যে এক তার তুলনা গোটা উপন্যাস জুড়ে বারবার করেছেন। আমরা উদাহরণ দেব-

পরমারাধ্যা ভগবতী মায়াদেবী ও মহাপ্রজাবতী দেবীর ভ্রাতৃপুত্র, ভগবান শাক্যসিঙ্ঘের মাতুলবংশীয় শাক্যপুত্র যথার্থই কি এত হীন প্রবৃত্তিশালী হইতে পারে? ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশশোণিতে চণ্ডালের জন্ম হইল? (তদেব, পৃ ৩০৮)

খেয়াল করবো, উনিশ- বিশ শতকের বৌদ্ধধর্ম চর্চার সরাসরি প্রভাব পড়ছে। গল্পে ‘মহানায়িকা’(উপন্যাসে এভাবেই সম্বোধন করা হয়েছে) গুল্লার স্বামী অন্যতম প্রধান চরিত্র পুষ্পমিত্র, উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে বলে-

শাক্য বিবাহের জটিলতা আমার অজ্ঞাত ছিল না। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র মহারাজা কুশের সন্ততিবর্গ অত্যধিক জাত্যাভিমান বশে নিজ সমাজের বহির্ভাগে কুটুম্ব সম্বন্ধ স্থাপন করেন না, ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের সিংহাসনহীন আমাদের বংশীয়গণ বিশেষ করিয়াই অবমাননা বোধ করিয়া থাকেন।...(তদেব, পৃ ৩১০)

ইতিহাস পুরাণ কল্পনা, মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, সচেতন রাজনৈতিক অবস্থানও সঙ্গে সুস্পষ্ট হচ্ছে। রামের বংশই শাক্যবংশ, বুদ্ধ সেই বংশের জাতক; বুদ্ধ যেহেতু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তাই তার পূর্বপুরুষ হিসেবে রামকেও ঐতিহাসিক চরিত্র প্রতিপন্ন করার এক অলীক, আজগুবি কাল্পনিক বাস্তবকে নির্মাণ করার চেষ্টা আছে। ডিট্রাইবালাইজেশনের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে মুছে ফেলা হয়েছে। এই গবেষণার পাঠকেরা সকলেই একমত হবেন, রাম কাল্পনিক চরিত্র এবং বুদ্ধ ইতিহাসের চরিত্র। এখানে লেখক, রাম যে বাস্তব চরিত্র নয়, তা তার ‘বিশেষ ধর্মীয়’ উত্তরাধিকারে তিনি মানতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের

(কৃষকের ঐতিহাসিকতা, কৃষকচরিত্র) অনুসারী অন্যান্যদের মধ্যেও আমরা এই প্রবণতার কথা আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষের ‘ধর্মীয় রাজনীতির’ ধারা চর্চায় এই প্রবণতা এবং তার প্রচারের সচেতন ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে এই ধরনের উপন্যাস গুলি নির্মাণের রাজনীতিও খুব প্রভাব-বিস্তারি। মনে রাখতে হবে, মধ্যবিত্ত হিন্দুর ধর্মীয় ভাবাবেগ এর দ্বারাই বেশি প্রভাবিত। যার বিস্তার বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যমান।

বাণী বসু, মৈত্রেয় জাতকের ভূমিকায় বলেছেন-

‘মৈত্রেয় জাতক’ বুদ্ধের জীবন কথা নয়। ঐতিহাসিক রোমাঞ্চ তো নয়ই। এই জাতক একটি সময়কালের পুনর্নির্মাণ, যে কাল আজকের সংকটমূহূর্তে নিঃসন্দেহে ফিরে দেখার যোগ্য। অবশ্যই কল্পনাশ্রয়ী নির্মাণ, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যসমূহকে অবমাননা করে নয়। ইতিহাসের গর্ভে যেখানে যেখানে অনিশ্চয়তা, পরস্পরবিরোধ ও নীরবতা, যুক্তিসিদ্ধ কল্পনা সেই ফাঁকগুলোতেই স্বেচ্ছাচারী হয়েছে। ...ঘটনাবলীর পেছনের মোটিভ-নির্ণয়ও ছিল গবেষণার কেন্দ্র, যদি একে ন্যূনতম গবেষণা মান দেওয়া যায়। (মৈত্রেয় জাতক, নিবেদন অংশ, পৃ ৭)

আমাদের বিনীত বক্তব্য, এটি ইতিহাস নয়, রোমাঞ্চ নয়, গবেষণা তো নয়ই; এটি উপন্যাসের নিয়ম অনুযায়ী একটি উপন্যাস। এই ‘ফাঁক’ গুলি সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত, খুব গভীর, তাত্ত্বিক, দার্শনিক গবেষণার পরিসর গড়ে উঠেছে, সমান্তরাল একাডেমিক চর্চায়; যার প্রভাব মৈত্রেয় জাতকে পড়েনি।

চুল্লপদ্মজাতকে, ব্যাভিচারিণীর শাস্তিস্বরূপ, নাক-কান কেটে দেওয়ার উল্লেখ আছে। মৈত্রেয়-জাতক উপন্যাসে আমরা দেখাবো, রগুগার নাক-কান কেটে দেয়, নাগরিক-অভিজতরা। যদিও এরকম কোনো বৈশিষ্ট্য তার ছিল না। কিন্তু নাগরিকরা চিরকালই উপজাতি-আদিবাসী মেয়েদের যৌনতার আবেদনেই চিহ্নিত করতে পছন্দ করে। স্মেরিণী (নিজের ইচ্ছায় চলা) মেয়েরা, ‘চিরাচরিত-নৈতিকতায়’, বহুকাল ধরেই, কারণ ছাড়াই ‘ব্যাভিচারিণী’ বলে স্বীকৃত হয়ে গেছে। ডিট্রাইবালাইজেশন, ডিফরেন্সেশন ইত্যাদি রাজনৈতিক চিহ্নগুলি রগুগা-এর গল্পের মধ্যে দিয়ে ছুঁয়েছেন লেখক। কিন্তু শেষে চণকের স্ত্রী, এবং পুত্রের মা, রগুগা, সেই ‘চিরাচরিত নারীকল্প’ এবং ‘ইচ্ছেপূরনের’ ধাঁচে থাকবন্দীই থেকে গেছে।

আমাদের মনে পড়বে, রামায়ণ কাহিনির আদিরূপ জাতকে পাই, তাকে বাণ্মীকি রামায়ণের তুলনায় প্রাচীন বলেই ধরা হয়। রাম লক্ষ্মণ সেখানে সূৰ্পনখার নাক-কান কেটে দেয়, হয়ত তাদের কাছে অপরাধ ছিল- সূৰ্পনখা নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা ‘মেয়ে’ হয়ে সোচ্চারে জানিয়েছিল! দশরথ জাতক তো আছেই; রামায়ণের এই অনুষ্টিও আমরা প্রথম জাতকে পাচ্ছি, একথা এখানে প্রসঙ্গান্তর হলেও উল্লেখ করা থাকল।

(৩)

‘চিরাচরিত-নৈতিকতার’ সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের যোগ গভীর। বেশিরভাগ মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ক্ষমতার বলয়, ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের মধ্যে বিভিন্ন ডু’স এবং ডোন্টস (টোটাম ট্যাবুর ধারণা) এর আগলকে নির্মাণ করে। সঙ্গে থাকে বিধান, না মানলে শাস্তির ফিরিস্তি। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল তাঁর প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ককে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, আদতে কিছু নৈতিকতার বিধিকে প্রচলিত করতে চায়। কিন্তু বুদ্ধনির্দিষ্ট নৈতিকতার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। আমাদের গবেষণায় দেবীপ্রসাদ এবং আশীষ লাহিড়ী বক্তব্যে এই পার্থক্যকে স্পষ্ট করেছি। বিমলকৃষ্ণ মতিলালের সম্পূর্ণ প্রবন্ধের খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করব-

The Truth of the Way: There is, the Buddha asserted, the Way, which leads to the cessation of suffering. It is the Great Path characterized by the practice of eight virtues. This is called Eight Fold, Path, having right view, right will, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration, and wisdom or insight.

Ethical behaviour is the wilful abstention from various misdeeds. The ten cardinal ‘sins’ are: 1. killing, 2. stealing, 3. sexual misconduct, 4. lying, 6. harsh talk, 7. frivolity, 8. covetousness, 9. ill-will, 10. false views. Ethical behaviour is the essential first step for spiritual progress in the towards nirvana. This will falsify a claim that is often made by some ill-informed Orientalists today that religious practice in Buddhism (and in any other Indian religion) is decidedly ‘amoral’. The alleged amorality, if there is any in modern society, must be a disease of modernity, - a disease that is overtly or covertly widespread in most modern societies. What is unfortunate is that such an amoral stance, as well as alleged presence in the history of such religions as Buddhism, received support and

reinforcement from the misinterpretation of such intriguing phrases as 'beyond good and evil', describing the ultimate goal. (essay: What is Buddhism?)^৯

সমাজে 'চিরাচরিত-নৈতিকতার' ক্ষেত্রে দেখা যায়, কিছুসংখ্যক ক্ষমতাবান মানুষ নিজেদের লাভের জন্য বেশিরভাগ মানুষের ওপর 'খবরদারি' করতে চায়, তাকেই নৈতিকতা বলে দেগে দিতে চায়। হেজিমনি, এই ধরনের নৈতিকতাকে নিজের সুবিধামত ব্যবহার করে! তাতে বহুমতের পারস্পরিক 'স্পেস'-ধারণা, স্বাতন্ত্র্য, আত্মপরিচয়, বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। আগের অধ্যায়ে উদ্ধৃত মহান্তির, বক্তব্য স্মরণ করবো। বৌদ্ধধর্মকে ব্যবহার করে এইধরনের 'চিরাচরিত-নৈতিকতার' শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা বেশ কিছু উপন্যাসে করা হয়েছে। উপন্যাসের নির্মাণের মধ্যেই 'আধুনিক'কে কিছু নৈতিকতার পাঠ দেওয়ার চেষ্টা প্রকট ভাবেই চোখে পড়ে। আমাদের আলোচ্য বেশ কিছু উপন্যাসের মধ্যেও এই প্রবণতা বিলক্ষণ।

'মানবতাকেন্দ্রিক-নৈতিকতার' রাজনৈতিক-দার্শনিক, যুক্তিগ্রাহী, গবেষণা এবং অধ্যয়ন পরিসর ছাড়াও সমাজে এই 'চিরাচরিত-নৈতিকতা' বেশি প্রচলন। যার আধার, রক্ষণাবেক্ষণের ভার মেয়েদের ওপরেই 'বেশি' বিন্যস্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, মেয়েদের ওপরেই এই নৈতিকতার ভার চাপিয়েছে। আমাদের দেশেও মেয়েরা প্রথম লিখতে শুরু করছেন যখন, তখন দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, গার্হস্থ্য-সংসার-পরিবার প্রেম এগুলিই তাদের লেখাতে প্রধান বিষয় হয়ে উঠছে। অনেকেই লেখা শুরু করেছেন 'সুরক্ষিত' বিষয় দিয়ে।

উনিশ-শতকে মেয়েদের গীতিকবিতার বিষয়গুলি ভেবে দেখা যেতে পারে। শুধু উনিশ শতক নয়, বিশ শতক, তারপরেও মূলধারার লেখায় খুব বড় পরিবর্তন আসে নি। ব্যতিক্রম যে নেই, তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমাদের আলোচিত লেখকদের উপন্যাসে খুব বেশি পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারিনা। যদিও শৈলীতে, সময়ের সমকালের প্রগতির অন্যান্য ছাপ বর্তমান। আমরা এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর একটি মন্তব্য ব্যবহার করবো

শিশুসাহিত্যের বাজারে...বিচরণ করেছি দীর্ঘদিন ধরে। অতঃপর বড়দের হাতে সম্ভরণে প্রবেশ। ...কারণটা যদি এখন বলি তো শুনে সকলেই অট্টহাস্য করে উঠবেন। এ যাবৎ বলিওনি... তখন মনে হত - বড়দের লেখা মানেই তো প্রেমট্রেম অর্থাৎ নরনারী ঘটিত ব্যাপার? তার মানেই

তো আবেগ অস্থিরতা রোম্যান্টিক সিন-ফিন এসে যাওয়া? সেই বস্তু গুরুজনদের চোখে পড়বে, না বাবা, কাজ নেই... কিন্তু ওই চক্ষুজ্জাটা কাটতে চাইছে না। অবশেষে ভেবে চিন্তে বিশুদ্ধ গোছের প্লট নিয়ে নেমে পড়া।^{১০}

‘বিশুদ্ধ গোছের প্লট’ শব্দবন্ধটি খেয়াল করবো। রোম্যান্টিক সিন-ফিন না আসা, সঙ্গে নারীর ‘চিরন্তন পুরুষতন্ত্রসম্মত নারীত্ব, শুধুমাত্র মেয়েদের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতার ‘যুদ্ধ যুদ্ধ’ খেলা, তাতে ঐতিহ্যকে জিতিয়ে দেওয়ার রীতি; আর ঐতিহ্য স্বামী-সংসার-পরিবার ধর্মের পালনে, পোশাকে, মূল্যবোধে। এক বিশেষ সমাজ প্রচলিত নৈতিকতার (ভালো মন্দ) বোধ, রাজনীতি(পার্টিভিত্তিক) নিয়ে সীমাবদ্ধ বোধ বা একেবারেই কোনো কথা না বলা বা অবস্থান না নেওয়া, তাকে সমকালের দলিল হিসেবে লিপিবদ্ধ না করে এড়িয়ে যাওয়া; যদি কখন গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে মেয়েদের পেশার উল্লেখ করাও হয় (বেশিরভাগ সময়েই তা না করা) তাহলেও সীমাবদ্ধ পেশার প্রচার (শিক্ষকতা, লেখালেখি, টুকটাক সরকারি বা বেসরকারি অফিসে ‘টেবিলে বসে কাজ’ ইত্যাদি) এবং প্রসার... ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের ‘শ্রেষ্ঠভিক্ষা’কেও অশ্লীল বলা হয়েছে, মন্টো, সমরেশ বসু সহ আরো বহু বিখ্যাত লেখকদের আদালতে অন্দি টানা হয়েছে। একথা একই সঙ্গে উল্লেখ করবো- মেয়েরা কোন বিষয় নির্বাচন করবে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তারা পায় নি। নিজের ইচ্ছায় জীবন-যাপনই যেখানে সমাজের চাপে বাধাপ্রাপ্ত, সেখানে সাহিত্যচর্চার বিষয়-নির্বাচন অনেক দূরবর্তী। সেই সময়ে কোনো মহিলা বিষয়ে এই অভিযোগ উঠলে তাদের বেশিরভাগেরই লেখা বন্ধ হয়ে যেত। আমরা জানি, যে মেয়েদের লেখায় এই অভিযোগ উঠেছে তাদের ‘লেখক জীবন’ খুব নিরাপদ নয় (লেখার মান নিয়ে প্রশ্ন থাকবে)। এখানে বলে রাখা ভালো মেয়েদের লেখায়, ‘যৌনতার’ও একটি বাজারসৃষ্ট চাহিদার মাপকাঠি আছে। ফলে এঁরা সমাজ এবং বাজারের প্রয়োজনে যখনই সামাজিক বিষয় নিয়ে লিখেছেন তখনই আদর্শ এবং সমাজ চলতি নৈতিকতাকেই প্রচার করেছেন, প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি যে সচেতনভাবেই করেছেন, তা বলা অতিকথন নয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন- বেশিরভাগ লেখক তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে হয়ত মেয়েদের স্বাধীনতার জন্য কথা বলছে, লড়াই করছেন; কিন্তু অদৃষ্টভাবে তারাই যখন

‘ফিক্সন’ লিখছেন, কল্পিত কাহিনি লিখছেন তাদের লেখায় সেই ‘চিরন্তন নারী-স্বরূপ’ই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর কারণ অবশ্যই প্যাট্রনের(প্রকাশক, মিডিয়া হাউস, ডিস্ট্রিবিউটর)মনোভাবকে লেখকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা বলেই আমাদের মনে হয়। তবে এর বিপরীত স্বতন্ত্র স্বর যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। কিন্তু খেয়াল করলেই দেখবো বই-পণ্যের বাজারে তাদের জনপ্রিয়তা, প্রচার খুবই কম। একটি উদাহরণ দিই, সাহিত্যপ্রেমী সাধারণ পাঠক, আশালতা সিংহের গল্প সাহিত্যপিপাসা মেটানোর স্বার্থে কিনে পড়ছেন বা তাঁর নাম জানেন এমন সংখ্যা খুবই কম।

(8)

Women Writing in India নামক দুখণ্ডের সংকলনটিতে সম্পাদকেরা মেয়ে লেখকদের লেখাপত্র জোগাড় করা, ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধের কথা ভূমিকা অংশে বলেছেন। আমরা সেখান থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করে, এই সমস্যা গুলি নির্দেশ করার চেষ্টা করবো। তাহলে বোঝা যাবে মেয়েদের লেখক হয়ে ওঠা এবং লেখক হিসেবে টিকে থাকার লড়াইটি কত কঠিন। এই লড়াইকে মান্যতা না দিয়ে পরবর্তী আলোচনায় যাওয়া সমীচীন হবে না-

Small presses often didn't record a date of publication and on occasion even children could not tell us when their mothers had been born or their major works published. Sometimes the writers themselves were depressed or reduced penury and didn't have the space or inclination to keep copies of their own books.(Introduction)^{১১}

ফলে, ভারতীয় মেয়েদের লেখা, সেসময়ে জনপ্রিয় হলেও, পরে সেগুলির কপি সংরক্ষণ না থাকায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি পড়া এবং গবেষণার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে, আলোচনা করেছি প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে নিয়ে; একসময়ে বিপুল জনপ্রিয় লেখক, তাঁর বেশিরভাগ লেখাই এখন পাওয়া যায়না। আমরা জানি, ভারতবর্ষের আধুনিক মেয়ে লেখকদের বড় অংশ নাগরিক, উচ্চবর্ণ, উচ্চবিত্ত হিন্দু; দলিত, প্রান্তিক, ‘অন্য ধর্মের’ লেখক প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখার ক্ষেত্রে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। উপনিবেশের কালে এবং স্বাধীনতার পরেও ‘মেয়েদের লেখার

স্বাধীনতা' সীমিত। তাদের কাছে 'বিশেষ নৈতিকতা' প্রচারের দাবি এখনও বর্তমান। এই বইয়েই ক্রুপা সন্তিয়ানন্দন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সম্পাদকেরা বলছেন-

Colonial administrators cited her life as testifying that education or intellectual achievement did not destroy the modesty or sensitivity natural to women. The Indians who spoke at the meeting considered her novels important because they demonstrated that education had in no way alienated Krupa from her roots in Hindu society.(তদেব)

যেন বা মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে ঐতিহ্য-ধর্ম পালনের সম্পর্ক বিপরীতমুখী। এই কথাগুলি শুধু বিশেষ কালের নয়, বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি নিয়ে নয়। মেয়ে লেখকদের কাছে সমাজের এগুলোই প্রত্যাশা। 'চিরন্তন নারীকল্পের' ধারণার চর্চিত চর্চণ।

নবনীতা দেব সেন তাঁর একটি প্রবন্ধে বলছেন-

First, writing is a social gesture; it is a form self-expression allotted to men. In Bengali culture, most gestures are codified according to gender, and women's gestures are especially clearly codified by the duties and space allotted to them by society.

A close look at the Bengali words for "women" and "wife" clearly reveals the sociocultural roles imposed upon the Bengali women. Her actions are predominantly sexual, as the breeder; Her duties all household-related, as the nurturer; her character passive as servant; her space indoors to limit her powers. She is bound within the kitchen and the bedroom- which really means catering to the senses of men folk. The women's ultimate duty turns out to be catering to the senses, and we may stretch it a little further beyond the kitchen and the bedroom to the area of the arts.

... A writer deals with verbal signs. The act of writing is an act of intellection, and therefore it is regarded as male territory. In Bengali culture, as elsewhere, the area of the mind is allotted to men and the area of the senses to women. Hence, the women who dances, cooks or sings is well within her rights, but the women who writes? She is Not. (Eroticism and the Women Writer in Bengali Culture)^{১২}

এখানে আমরা সংযোজন করবো, মেয়েদের নাচ এবং গানের ক্ষেত্রেও 'সমাজ নির্দিষ্ট শালীনতা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-পরম্পরার' মাপকাঠি আছে। ধ্রুপদী, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভক্তি ইত্যাদি চলতে পারে, সঙ্গে 'নির্দিষ্ট

পোশাক’ নাচ এবং গান উভয়ক্ষেত্রেই, কিন্তু একটু নড়ন-চড়ন হলেই তা মেয়েদের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে ‘অশ্লীল এবং চারিত্রিক হীনতা’র পরিচায়ক! লেখার ক্ষেত্রেও তাই।

বাঙালি সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের ‘ফিক্সন’ সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। তারা তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভাষার সম্যক বোধ, রাজনীতি ইত্যাদি সমস্ত কিছু ব্যাতিরেকে ‘শুধু গল্প’ পড়তে চান! এবং পাশাপাশি এই বিষয়ক চর্চা সম্পর্কে, তাদের প্রায় কোনো ধারণাই গড়ে ওঠে না। ফলে পুঁজিবাদও খুব সন্তুর্পণে সহজেই এক অলীক ‘গল্পবিশ্ব’ তৈরি করে, এবং তাতে তাদের বুদ্ধ করে রাখে! যেমন বেশিরভাগ ‘ফেসবুক সাহিত্য’ বা তাদের ‘ভ্রান্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে গল্পের মধ্যে দিয়েই তাদের তত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভাষার সম্যক বোধ, রাজনীতি ইত্যাদি সব কিছু একই সঙ্গে পরিবেশন করা হচ্ছে। পাঠকরাও মনে করেন গল্পতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ভাষার সম্যক বোধ, রাজনীতি ইত্যাদি একজায়গাতেই তারা পাচ্ছেন। ফলে আলাদা করে সেই বিষয়ের বই পড়ার চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই।

সমাজ এবং পণ্যের(লেখা) বাজার এই বিশেষ নৈতিকতা, শ্লীলতাবোধ দাবী করে, এবং মেয়েলেখকরা বেশিরভাগই সচেতনভাবে এগুলির যোগান দেন। আমরা বলেছি মেয়েদের লেখক হয়ে ওঠার পথ একেবারেই সুগম ছিলো না। অত্যন্ত ‘নৈতিক’, ‘আস্তিক’, ‘শ্লীলতা’য় বিশ্বাসী লেখক, অনুরূপা দেবীর *ত্রিবেণী* উপন্যাসের বিরুদ্ধেও অসংখ্য অভিযোগ ওঠে (বহু নামী-বেনামী চিঠি, সাময়িকপত্রে ‘ত্রিবেণী কলঙ্ক’ ইত্যাদি বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হয়।)

অভিযোগ এবং কৈফিয়ৎগুলি পড়লে আমাদের আজকের দিনে এসে অবাক হতে হয়! মেয়ে-লেখকদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই লড়াইকে কুর্ণিশ জানাতেই হয়। তাই অবশ্যই মেয়ে-লেখকরা যখন বাজার-সমাজ-পুরুষতন্ত্র-নৈতিকতা দ্বারা চালিত হয়, তাকে আলাদা গুরুত্ব দিয়ে, পর্যবেক্ষণ করার দরকার আছে। পুরুষ লেখকদের সঙ্গে এই ধারার পার্থক্য আছে। সঙ্গে এই প্রশ্নও জরুরি যে, এই এত লড়াইয়ের পর, যে প্রতিষ্ঠা তারা পেলেন, যে স্বরকে স্বতন্ত্রভাবে সমাজকে শোনালেন, সেখানে কি তারা নিজেরা

এই লড়াইকে গুরুত্ব দিচ্ছেন? পরবর্তী মেয়ে-লেখকদের পথকে আরেকটু করে সুগম করে দিচ্ছেন? না কি তারা যে বাধার পাহাড় পেরিয়ে এসেছেন, সেই বাধাগুলি সম্পর্কে সচেতন না করে, সেগুলিকেই নতুন প্যাকেজিং এ হাজির করছেন? সময় যত আধুনিক হচ্ছে, মেয়েদের সমস্যাগুলি সমতার দিকে যাওয়ার বদলে আরও জটিল হয়ে, সে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কি? তারা কি তাদের ‘পুরুষতান্ত্রিক’ মনকে কাটিয়ে উঠতে পারছেন?

আমরা এই প্রশ্নগুলি তোলার চেষ্টা করেছি, আমাদের সীমিত পরিসরে, আমাদের গবেষণার বিষয়-শ্রেণীকৃত অনুযায়ী। এর বাইরেও আলোচনার অনেক বিচিত্র পরিসর এবং দিক আছে, আমরা এখানে সেই আলোচনায় যাচ্ছি না।

উপন্যাসে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে তেমন বক্তব্য নেই। পাল আমলের, কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে কাল্পনিক গল্প ও চরিত্র মিশিয়ে, এই উপন্যাস। এই ভূমিকাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি-

মাসিক বসুমতীতে প্রকাশকালে আমার এই উপন্যাসে দিব্যোক ভীম প্রভৃতিকে ‘জালিক’ কৈবর্ত করায় কয়েকজন মাহিষ্য পাঠক ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কেহ কেহ আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন, কেহ বা আমার লেখা প্রতাহার না করিলে ‘তীর প্রতিবাদ হইবে’ বলিয়া ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। তাহাদের যুক্তি এই, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের “আর্লি হিন্দী অব ইণ্ডিয়া” গ্রন্থে, শ্রী দুর্গাদাস লাহিড়ীর “পৃথিবীর ইতিহাসে”, ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদারের “ভারতবর্ষের ইতিহাসে” দিব্যোক-ভীমাদিকে চাষীকৈবর্ত বা মাহিষ্য জাতি বলা হইয়াছে। আমি না কি ইহার ব্যতিক্রম করিয়া উহাদের মনে নিদারুণ দুঃখ দিয়াছি! মাহিষ্য সমাজ পত্রিকায় “ত্রিবেণির পঙ্ক” শীর্ষক প্রবন্ধে আরও অনেক কথাই উহারা এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন।...কতকগুলি বিষয়ের উত্তর দিবার জন্য কয়েকটি ফুটনোট... ছাপাইতে বাধ্য হই... সমস্তগুলির প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও ভবিষ্যতের জন্য এ সম্বন্ধে একটুখানি সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয় বোধ করিলাম।^{১৩}

এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগগুলি ছিল, ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার যোগ্য ‘ইতিহাস জানা বা পড়া নেই, তাই স্পর্ধা না করে তাঁর শুধু সামাজিক উপন্যাসই লেখা উচিত; ‘ভয় এবং মৈত্রীপূর্ণ’ চিঠিতে অভিযোগ করা হয় ‘উজ্জ্বলার অপহরণ’ দেখানো মানেই নারী চরিত্রে ‘কলঙ্কার্পণ’ করা হয়েছে ইত্যাদি। আগের অধ্যায়েও দেখেছি, কল্পনার সঙ্গে ইতিহাসকেও বিকৃত করা হচ্ছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এমন চিঠি আসেনি। উপন্যাস লেখার জরুরি উপাদানও তা নয়, উপন্যাসে কল্পনা থাকবেই, ইতিহাস নাও থাকতে পারে। তিনি উত্তর দিয়েছেন, সীতা যাঙ্গসেনীর ‘সতীত্ব-খ্যাতির’ প্রমাণের সাহায্যে। এখানেও

একাধিকবার রামায়ণের প্রসঙ্গ এসেছে। কৈবর্ত জাতির মাহাত্ম্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি রামায়ণের গুহক চণ্ডালের প্রসঙ্গ এনে এর যথার্থতা ও ঐতিহাসিক সত্য প্রতিপন্ন করেছেন! পুরুষতান্ত্রিক পাঠ অনুযায়ী যেমন প্রচলিত আছে- নারীই সমস্ত যুদ্ধের মূল, রামায়ণ মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসি... এখানেও অনুরূপা দেবীর রামগড় এবং ত্রিবেণি দুটি উপন্যাসের বিষয়-ভাবনা নির্মাণের ক্ষেত্রে সেই যুক্তিই কাজ করেছে। কৈবর্ত বিদ্রোহে নিয়ে সত্যনে সেনের নির্মাণ তুলনায় পড়া যেতে পারে।

লেখক তার উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেন, ইতিহাসের সঙ্গে তার বিশেষ যোগ নেই-

আমি ইহাতে দেখাইতে চাইয়াছি, ধার্মিক ক্ষুদ্রের হাতে পাপী প্রবলতমের পরাজয়! আমি ইহাতে দেখাতে চাইয়াছি, মর্মান্তিক আঘাতে দুর্বলও সবল হইয়া উঠিয়া অসাধ্যসাধন করিতে পারে, আমি দেখাইতে চাইয়াছি, অত্যাচারী মহীপালের পাপের ফলে অত বড় পাল-সাম্রাজ্যের ধ্বংস কত সহজে তাহার নিজের মধ্য হইতেই সম্ভব হইয়াছিল। ...দিব্যোকাদিও রাজ-অত্যাচারে যে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, তাহা মনে করা যায় এবং মানুষকে সব চেয়ে বিচলিত করিতে এ অত্যাচারের মত অপর কোন অত্যাচারই যে জগতে নাই, শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি হইতে আধুনিকতম খড়্গবাহাদুর সিংহ প্রভৃতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ! হিন্দুর নিকট সতী নারীর অবমাননা মহাপাপ এবং অত্যাচারের চরম। এই পাপে রাবণ ও কুরুকুলের ধ্বংসপ্রাপ্তি হইয়াছিল। (তদেব)

আমরা এই প্রবণতাগুলিকেই ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি। এখানেও ‘বিধর্মী’ মহীপালের দ্বারা উজ্জ্বলার অপহরণ এবং ‘হিন্দু’ বীরদের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার। যদিও কাল্পনিক উজ্জ্বলা চরিত্রটি, ‘সতীত্ব’ রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করে। রামপাল আবার ক্ষমতা দখল করে, ‘কৈবর্ত বীরদের’ ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে এই ইতিহাস রক্ষায় উপন্যাস শেষ হয়।

(৫)

এই ধারাতেই সম্পৃক্ত, ‘নারী’ এই সামাজিক অবস্থানটির প্রসঙ্গ। আমাদের নির্বাচিত লেখকরা অন্তত প্রথম তিনজন ‘ইন্টারনাল ফেমিনিন’ এর ধারণায় বিশ্বাসী ফলে তাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিও তাই। একজন পুরুষ-লেখক সাধারণত যেভাবে মেয়েদের বর্ণনা করেন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে এঁদের লেখাতেও ঠিক তাই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী দ্বিতীয় লিঙ্গ, তার প্রধান ধর্ম পতিব্রত্যা; আদর্শ কন্যা, জায়া, মাতা সতীরূপে জীবনপাত করা। এরা সকলেই শ্রেষ্ঠ রূপ, একই সঙ্গে সর্বগুণের অধিকারি। ‘গুণ’ বুদ্ধিমত্তা বা স্বাতন্ত্র্যের বিকাশে নয়। গার্হস্থ্যজীবন পালনের জন্য যেসব গুণের দরকার ঠিক ঠিক

সেগুলিই(গৃহকর্ম, রান্না, পরিবার প্রতিপালন, গুরুজনের সেবা ইত্যাদিতে নিপুণা)। এই কারণেই এঁদের প্রত্যেকের লেখায়, জাতকের বিশাখা চরিত্রটি প্রশংসার সঙ্গে ব্যবহৃত। এরা সমাজের বীর, বুদ্ধিমান, বিপ্লবী, সমাজ-সেবী, উচ্চপদস্থ চাকুরে, এক্ষেত্রে রাজা বা উচ্চবংশজাত ইত্যাদি ‘আদর্শ পুরুষ’ের ‘আদর্শ সঙ্গিনী’; যদি ‘পুরুষ’ আদর্শ না ও হয়, তবুও। মেয়েদের দেখাতেও তারা ‘অপর’ ‘দ্বিতীয়’ ‘সঙ্গিনী’ সত্তাতেই জীবনের পরিপূর্ণতা খুঁজে পাচ্ছে। যদি কোনো মেয়ে চরিত্র থাকে, যে, স্বতন্ত্র, বুদ্ধিমান, বিধাতা বা ভাগ্যের ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিতে অস্বীকৃত; সেই চরিত্রগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মন্দ-কুটিল-খল চরিত্র। স্মেরিণী (খেয়াল করে দেখবো এই শব্দটির অর্থ যে নিজের ইচ্ছায় চলে; অর্থ রূপান্তরে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ‘নেতিবাচক’ ‘দায়িত্বজ্ঞানরহিত’ ‘হীন’ মেয়ে অর্থে।) ‘কুটিল-খল-মন্দ মেয়ে’। রূপের দিক থেকেও সেই ধ্রুপদী(আর্য এবং অনার্য উভয়ক্ষেত্রেই) বর্ণনা, গাত্রবর্ণ, চুল, স্তন, নিতম্বের বাটখারাতে মাপা ‘আদর্শ নারীদেহ’। বাদামী রঙের দেশ হওয়া সত্ত্বেও ‘মোর হোয়াইটের প্রতি’ আমাদের টান (ফেয়ারনেস ক্রিমের বাজার কে পড়া যেতে পারে) আমাদের বিস্মিত করে!

অনুরূপা দেবীর *রামগড়* উপন্যাসের শুক্লা অমিতা সুদক্ষিণা পুষ্পমিত্র বসন্তশ্রী ইত্যাদি ‘খুবই ফর্সা’, মেয়ে, পুরুষ অনুযায়ী ‘আদর্শ’ দেহসৌষ্ঠব যুক্ত। *ত্রিবেণীর* সন্ধ্যা, মহাদেবী, মহীপাল, রামপাল ইত্যাদি; *মৈত্রেয় জাতকের* সুমনা, বিশাখা, জিতসোমা; তিস্য, চণক বুদ্ধ পূর্ণবর্ধন; হে অনন্তপূণ্যর শুভা, নায়কী, মল্লিকা, বিশাখা, মণিমালিনী জীবক ইত্যাদিদের রূপবর্ণনা একই রকম। বুদ্ধ *মৈত্রেয় জাতকে* গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। লেখক তার চরিত্র বিশ্লেষণের পাশাপাশি, ‘আদর্শ রূপ’ এর অধিকারীও করেছেন। অথচ বুদ্ধ কেমন দেখতে ছিলেন সেই নিয়ে এখনও নানান গবেষণার অবকাশ আছে। এছাড়াও আরও নানান মত আছে। কিন্তু লেখক, বলছেন-

দেখা গেল সিদ্ধার্থ একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান (চতুরও বটে), অসামান্য দৈহিক রূপ ও ব্যক্তিমায়া সম্পন্ন(পুরুষদেরও মাথা ঘরিয়ে দেবার মতো), সময়ে সময়ে কৌতুকপ্রিয় (মোটাই সর্বদা ধ্যানগম্ভীর নন)... (মৈত্রেয় জাতক, পৃ ৭)

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের লেখকরা ‘আর্য অনার্য’ ভাবনার দ্বারা পরিচালিত। ‘স্বজাতি বলতে ‘আর্য’দের উত্তরাধিকারকে মান্যতা দিতে চেয়েছেন! ‘অনার্য’ দৈহিক আকার-প্রকার বর্ণের সঙ্গেই আমাদের মিল।

অনার্য চরিত্র, প্রধান চরিত্র হিসেবে এইধরনের উপন্যাসে আসে খুবই কম; আসলেও দাস-দাসী, সৈন্য, দয়ার পাত্র, ‘হীন’ ইত্যাদি পরিচয়ে। এখানে ত্রিবেণি উপন্যাসে, কৈবর্ত বিদ্রোহকে প্রেক্ষাপট হিসেবে হাজির করায়, দিব্যোক, রুদ্রোক, ভীম ইত্যাদি চরিত্রকে আনতে হয়েছে। এই ধরনের উপন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা আগেই বলেছি, অনার্য প্রধান চরিত্রদের ক্ষেত্রেও মাপকাঠি নির্দিষ্ট করা আছে। শুধু গাত্রবর্ণ ‘কৃষ্ণ’ কিন্তু মেয়েচরিত্রদের ক্ষেত্রে প্রভূত চেষ্টা করা হয় তাকে ‘সাদা বর্ণের’ প্রলেপ দিতে। আমরা উদাহরণ দেবো। তার আগে উদ্ধৃত করবো, অনুরূপা দেবী কৈবর্ত এবং বাগদীপাড়ার যে ছবি পাঠকদের কাছে হাজির করছেন-

রাজধানীর অপর এক প্রান্তে দিব্যোক ও রুদ্রোক কৈবর্তদিগের কুটীর গুলি দারিদ্র্যব্যঞ্জক তো নহেই বরং তাহা ইহাদিগের স্বচ্ছল অবস্থারই বিশেষ পরিচায়ক। মধ্যে বড় একখানি আটচালা, ইহার একধারে কয়েকখান সুন্দরভাবে মার্জিত সুসংবদ্ধ অবস্থিত গৃহ, এবং অপর পার্শ্বে সারি সারি গোলা মরানি, টেকিশালা ও গো গৃহ। ...মোটের উপর ইহাদের অবস্থা আগের চেয়ে অনেকখানিই খাটো হইয়া গেলেও এখনও যথেষ্ট স্বচ্ছল বলা চলে।

পল্লীবাসীদিগের অধিকাংশই কৈবর্ত; প্রায় পঁচিশ ত্রিশ ঘর হইবে। এই দিব্যোক এদিককার কৈবর্ত-সমাজের সমাজপতিদের মধ্যর একজন। ...এই কৈবর্ত পাড়ার পরই কিছুদূরে বাগদীপাড়া। বাগদী জাতীয় অধিকাংশ পুরুষই পাইক-পেয়াদার কার্যে ভর্তি থাকে। দৈহিক বল ও বিক্রমে ইহারা প্রায় ক্ষত্র শক্তির পার্শ্ববর্তী হইতে সমর্থ- আর তাহা হইয়াও ছিল। (পার্শ্ববর্তী বলেছেন, সমকক্ষ বলেন নি)। রাজা জমিদার, ধনী সম্প্রদায় সকলেরই অধীনে বহু দিন অবধি বাগদী তিরন্দাজ পাইক বা দৌবারিকও অপরিমিত পরিমাণে পোষিত হইত।

(ত্রিবেণি, পৃ ৩১-৩২)

ত্রিবেণি উপন্যাসে ইতিহাস বাদে যে কল্পিত কাহিনি আছে, তার কেন্দ্রে আছে কাল্পনিক চরিত্র ‘উজ্জ্বলা’, সে ঐতিহাসিক চরিত্র ভীম কৈবর্তের স্ত্রী। তাকে হঠাৎ দেখে মহীপাল মুগ্ধ হয়, এবং কৌশলে অপহরণ করে, ভীম এবং অন্যান্য কৈবর্তরা সংগঠিতভাবে তাকে উদ্ধার করতে গিয়েই কৈবর্ত বিদ্রোহের সূচনা। এই কাহিনিতে রামায়ণের প্রভাবের কথা স্বয়ং লেখকই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সে কথা আগে বলেছি। এখন আমরা বলছি- কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের রূপে ‘ফর্সা রঙ’ ব্যবহারের আকুলতার কথা! কিন্তু ঐতিহাসিক ‘মহারাজাধিরাজ’ মহীপালকে রূপে মুগ্ধ করবে ‘সাধারণ শ্যামলা ভারতীয় বাস্তবের কৈবর্ত’ মেয়ে? এ নিয়ে সংশয় ছিল স্বয়ং লেখকের মনেই। তাই তাকে আপ্রাণ ‘উচ্চবংশজাত, ফর্সা’ করে নির্মাণ করার চেষ্টা করে গেছেন। আমরা এই অবস্থানের কথাই বলতে চাইছি। যে সাহিত্যে

মেয়েদের চরিত্র নির্মাণে, ভ্রান্ত বাস্তবচিত্রহীন, অতিরঞ্জিত ‘চিরন্তন নারীত্বের’ ধারণার প্রয়োগ কীভাবে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এবং সেটি ‘মেয়ে-লেখকরাও’ কেমন ফলাও করে, বিশ্বাসের সঙ্গে নির্মাণ প্রশয় এবং প্রসার ঘটিয়ে গেছে। উজ্জ্বলার বর্ণনা-

মসী বিনিন্দিতা (খেয়াল করবো, নিজে ‘মসী বিনিন্দিতা’ তাই উজ্জ্বলাকে হিংসা) ভীম-জননী একটুখানি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন,- “ও, ওই ভদ্র নোকদের মতন কটা চামড়াখানার গুণে লো মা”! (ত্রিবেণি, পৃ ৩৫) (সে যে কালো নয়, আসলে ‘ফর্সা’ একথাটাই জানিয়ে দেওয়া হল; এটি নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা! কথকের ইচ্ছায় নিন্দা, লেখকের ইচ্ছায় প্রশংসা।)

কথকের ‘নায়িকা’ বর্ণনায়, লেখকের স্বরের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাবো-

উজ্জ্বলা সুন্দরী, চতুরা, হাস্যময়ী, কস্মিনীপুণা এবং হৃদয়বতী। দরিদ্র অশিক্ষিত গৃহে পালিতা হইলেও সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা ছিল, তাহাতে ভদ্র-সংস্পর্শ থাকায় অন্তরের পূর্ণ আকর্ষণ তাহার ভদ্র-সমাজেরই সহিত। (ত্রিবেণি, পৃ ৩৭)

উপরের উদ্ধৃতিতে খেয়াল করবো লেখকের পক্ষপাত কাদের প্রতি! তাঁর অবস্থান, ‘ভদ্র’, ‘উঁচুতলা থেকে করুণার দৃষ্টিতে’, ‘নিম্নবর্ণ’ ‘অশিক্ষিতের’ একটি ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের প্রতি।

উজ্জ্বলাকে আরও ‘উচ্চবংশজাত’ করে তোলার জন্য, যে কাহিনি নির্মিত হয়েছে-

প্রগল্ভা প্রৌঢ়া এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, “ঠিক কথাই বলেছেন বাবা, রাজবাড়ীতেও অমন রূপ নেই! তা হবে নাই বা কেন? ও ত আর ছোট ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মায়নি, ভাল ঘরেরই মেয়ে ছিল নি। রাজ্য করতে গিয়ে ওর বাপ তো আর ফিরলো না, মা’টাও মনের দুঃখে মরে গেল; তখন দস্যুতেই না কি ওকে বাঘতটী গাঁয়ের ঐ ভদ্র কৈবর্তের কাছে সাতটি দ্রম নিয়ে বিক্রী করে যায়। নইলে ওতো আর তার মেয়ে নয়। ভীমের কপাল ভাল, তাই সে ওকে বিয়ে ক’রে ঘরে এনেচে। (ত্রিবেণি পৃ ৪৩)

মৈত্রেয় জাতকে বিশাখা, সুমনা, জিতসোমা ইত্যাদির বর্ণনা ‘আর্য রমণীর রূপবর্ণনার’ কথা মাথায় রেখে; রগ্গার বর্ণনা ‘অনার্য ইটারনাল ফেমিনিন’ এর রূপবর্ণনাকে মাথায় রেখেই-

নাতিদীর্ঘ কিন্তু ভারি সুগঠিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মেয়েটি। তার বক্ষোদেশ অনাবৃত। এই বনের অজস্র কচি কাঁচা বিল্বফলের মতো বক্ষ দুটি তার। নিম্নাঙ্গে একটি পিটিয়ে নরম করা বকল। তার মাথার অজস্র ধুলোমাখা কালো চুল তার বুক এবং পিঠ প্রায় ঢেকে রেখেছে। (মৈত্রেয়

জাতক, পৃ ১৮)

বৌদ্ধসাহিত্যে নারীবিদ্বেষ আছে সেকথা আমরা আগেই বলেছি। ধর্মানন্দ কোসাম্বী, নলিনাক্ষ দত্ত প্রমুখ তাত্ত্বিকরা বুদ্ধ ‘নারীবিদ্বেষী’ এই মতটি মানেননি। কোসাম্বী তাঁর বই *ভগবান বুদ্ধ* এর- ‘নারী সাধুদের সংঘ’- নামক অংশে বলেছেন-

তপস্বী মুনিঋষিদের মধ্যে, অথবা বৈদিক ঋষিদের মধ্যে, স্ত্রীলোকের সমাবেশ হয় না। গার্গী বাচস্পরীর মতো নারী ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চায় অংশগ্রহণ করিত বটে। কিন্তু মেয়েদের কোনো পৃথক সংঘ ছিল না। স্ত্রীলোকের পৃথক সংঘ বুদ্ধের সময়ের পূর্বে দুই-একশত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। মনে হয় যে, জৈন সাধ্বীদের সংঘই ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এইসব জৈন সাধ্বী যে বাদ-বিবাদে বিশেষ পটু ছিল, তাহা ভদ্রা কুণ্ডলকেশা ইত্যাদির গল্প হইতে বুঝিয়া পারা যায়।

আগে মুনিঋষিরা অরণ্যে বাস করিত এবং কদাচিৎই গ্রামে কিংবা শহরে যাইত। এইজন্য তাহাদের পক্ষে স্ত্রী সংঘ স্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু শ্রমণরা লোকালয়ের আশেপাশেই থাকিত এবং তৎকালের সামাজিক অবস্থা স্ত্রী সংঘ স্থাপন করার পক্ষে অনুকূল ছিল বলিয়া, তাহারা ঐরূপ সংঘ স্থাপন করিতে পারিয়াছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্য পাঠ করিলে, বিশেষ একটি জিনিষ লক্ষিত হয় যে, তৎকালে ধর্মের ব্যাপারে পুরুষদের মতই মেয়েরাও বেশ অগ্রগামী ছিল। ইহার কারণ এই যে, গঠনমূলক অথবা গোষ্ঠীমূলক রাজ্যগুলিতে মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। ভগবান বুদ্ধ বজ্জীদিগকে উন্নতির যে সাতটি নিয়ম বলিয়াছিলেন, তাহাদের পঞ্চমটি এইরূপ ছিলঃ ‘স্ত্রীলোকের সম্মান রাখিতে হইবে; বিবাহিত হউক অথবা অবিবাহিত হউক, স্ত্রীলোকের উপর কোনোরকম অত্যাচার হইতে দিবে না।’ আর অন্ততঃ বুদ্ধের মৃত্যু পর্যন্ত বজ্জীরা এই নিয়ম মানিয়া চলিত। বজ্জীদের মত, মল্লদের রাজ্যেও স্ত্রীলোকের সম্মান রক্ষিত হইত, এইরূপ ধরিয়া লইলে আপত্তির কারণ নাই। অঙ্গ, কাশী, শাক্য, কোলিয় ইত্যাদি গোষ্ঠীমূলক রাজ্যগুলির স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বটে, তথাপি আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা দেশের লোকদের হাতেই ছিল বলিয়া ইহাদের রাজ্যে স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশেষ কিছু আঘাত পড়ে নাই।

মগধ ও কোশলে সার্বভৌম রাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, তথাপি সেখানকার একছত্র রাজারা প্রাচীন গোষ্ঠীমূলক রাজ্যশাসন পদ্ধতি সমূলে উৎপাটন করিতে সমর্থ হয় নাই। বিস্থিসার অথবা পসেনাদি কোনো নারীকেই জোর জবরদস্তি করিয়া নিজের অন্তঃপুরে আনিয়াছিলেন বলিয়া কোথাও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।^{১৪}

বিশেষত ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার সময় বুদ্ধের অনিচ্ছা, শর্তগুলিকেই বুদ্ধের ‘নারীবিদ্বেষের’ প্রমাণ বলে হাজির করা হয়। জনপ্রিয় আখ্যানটি চুল্লবগ্গে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে, নিম্নবৈষম্য মূলক ৮টি শর্ত বুদ্ধ আরোপ করেন, ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে- ১। সংঘে ভিক্ষুণী যত দীর্ঘকালই থাকুক না কেন, সে ছোটোবড় সকল ভিক্ষুকেই নমস্কার করবে। ২। যে যে গ্রামে ভিক্ষুরা নাই, সেখানে ভিক্ষুণীরা থাকবে না। ৩। প্রত্যেকে পক্ষে উপবাস ও ধর্মান্বেশ শোনার সময়কাল ভিক্ষুসংঘের কাছে জেনে নিতে হবে। ৪। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষু সংঘের ‘প্রবারণা’ করবে। ৫। ভিক্ষুণীর হাতে ‘সংঘাদিশেষ আপত্তি’ ঘটলে ১৫ দিনের ‘মানন্ত’ গ্রহণ করবে। ৬। দুবছর সাধনার পর ভিক্ষুণী উভয়সংঘই তাকে উপসম্পদা দেবে। ৭।

কোনো কারণেই ভিক্ষুণী ভিক্ষুকে গালাগালি করতে পারবে না। ৮। শুধুমাত্র ভিক্ষুই ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেবে, উল্টোটা হবে না।

কোসাসী এগুলিকে প্রক্ষেপ বলেছেন; এবং তার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। আমরা উদ্ধৃত করব-

... বিনয় ও অঙ্গুত্তরনিকায়ের মধ্যে এই ব্যাপারের বর্ণনায় সাম্য আছে বটে, তথাপি এই আটটি কঠোর ধর্ম(গুরুধর্ম) পরে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ বলিতে হইবে; কেননা, বিনয়ের নিয়ম বিধান করিবার সময় ভগবান যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সহিত বর্তমান নিয়মগুলির স্পষ্ট বিরোধ রহিয়াছে।

... সারিপুত্ত ভগবানকে অনুরোধ করিল যে, আচার-বিচার সম্বন্ধে ভিক্ষুদের জন্য নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হউক। ভগবান কহিলেন, 'হে সারিপুত্ত, তুমি একটু থামো। কখন নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া দরকার, তাহা তথাগতের জানা আছে। যতদিন পর্যন্ত সংঘে কোনোরকম পাপাচার প্রবেশ না করে ততদিন পর্যন্ত ঐরূপ পাপ নিবারণ করিবার জন্য তথাগত কোনো নিয়ম করেন না।

বুদ্ধের এই উক্তি অনুসারেই সংঘের সর্বনিয়ম রচিত হইয়াছিল। প্রথম কোনো ভিক্ষু কিছু একটা অপরাধ অথবা ভুল করিত, আর সেই কথা বুদ্ধের কানে আসিলে, তিনি ভিক্ষুসংঘের সভা করিয়া, দুই-একটি নিয়ম প্রবর্তন করিতেন। আর ভিক্ষুরা ঐ নিয়মের ঠিক ঠিক অর্থ করিতে পারে না, এইরূপ বুঝিতে পারিলে, তিনি পরে ঐ নিয়মের সংস্কার করিতেন।

কিন্তু (পূর্বোক্ত কাহিনীতে) মহাপ্রজাপতী গৌতমীর ব্যাপারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। ভিক্ষুণীসংঘে কোনো দোষ ঘটে নাই, আর তাহার আগেই ভিক্ষুণীদের উপর এই আটটি নিয়ম চাপানো হইল, ইহা বিলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর, ভিক্ষুসংঘ নিজের হাতে সকল ক্ষমতা রাখিয়া দেওয়ার জন্য এইসব নিয়ম করিয়া বিনয়ে এবং অঙ্গুত্তরনিকায়ে ঢুকাইয়াছিল।

বিনয়পিটক হইতে সুত্তপিটক বেশি প্রাচীন। তথাপি উহাতে কোনো কোনো নূতন সুত্ত পরে সমাবিষ্ট হইয়াছিল এবং উক্ত আটটি নিয়মও এইরূপই। খৃস্টপূর্ব প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে, যখন মহাযান সম্প্রদায়ের দ্রুত গতিতে প্রসার হইতেছিল, ঐ সময় এইগুলি লিখিত হইয়া থাকিবে। ইহাতে যে সঙ্কর্ম শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার অর্থ 'স্থিরবাদী পন্থ'। এই কাহিনীতে সুত্তের রচয়িতা যেন এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, ভিক্ষুণীসংঘের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে এই ধর্ম পাঁচশো বছর টিকিবে, আর তাহার পর, সর্বত্র মহাযান সম্প্রদায়ের প্রসার হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতেই প্রমাণিত হয় যে, উক্ত সুত্তটি ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পাঁচশো বছর পরে লিখিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের প্রথম ভিক্ষুণীসংঘ যদি বুদ্ধ দ্বারাই স্থাপিত হইত, তাহা হইলে হয়ত এই আটটি 'গুরুধর্ম'কে কিয়ৎপরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত। কিন্তু বাস্তবিক অবস্থা সেইরূপ নয়। জৈন এবং অন্যান্য সম্প্রদায় বৌদ্ধসম্প্রদায় হইতে দুই এক শতাব্দী পূর্বে আন্তিত লাভ করিয়াছিল। এবং ঐ সকল সম্প্রদায় ভিক্ষুণীদের বেশ বড় বড় সংঘ ছিল, এবং উহাদের কোনো কোনো ভিক্ষুণী বুদ্ধিমতী ও বিদূষী ছিলেন, এই কথার সাক্ষ্য পালি সাহিত্যের অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। আসলে এইসব সংঘের অনুকরণেই বুদ্ধের ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপন করা হইয়াছিল। গণমূলক রাজ্যগুলিতে এবং যেসব দেশে একছত্র রাজতন্ত্র সবেমাত্র দেখা দিয়াছিল, সেইসব দেশেও নারীদের সম্মান বেশ ভালোভাবেই রাখা হইত। সুতরাং ভিক্ষুণীসংঘের রক্ষণার্থ কতগুলি অদ্ভুত নিয়ম করার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। (ভগবান বুদ্ধ, পৃ ১১১-১১২)

(৬)

বুদ্ধকথায় শুধুমাত্র মেয়েদের ‘হীন’ ছবি আছে একথা একেবারেই সত্য নয়। তার সবথেকে বড় প্রমাণ-
থেরীগাথা^৫। থেরীগাথার গাথাগুলি পড়লে, আমরা সেই সমাজের একটি ভিন্ন বাস্তব ছবি পাবো।
বৌদ্ধধর্ম এই মেয়েদের কাছে ‘দুর্বিসহ ঐকিক গার্হস্থ্য শ্রম এবং সম্মানহীনতা’ থেকে মুক্তির উপায়।
স্বাভাবিকভাবেই তখনকার সমাজে ‘একক’ ‘স্বতন্ত্র; জীবনযাপনের একমাত্র পথ ছিল- ‘প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম’।
বৌদ্ধধর্ম ততদিনে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

থেরীগাথায়, মেয়েদের লেখাতে তাদের যন্ত্রণা বঞ্চনার কথাও উঠে এসেছে প্রত্যক্ষভাবে। যার কারণ
ব্যক্তিগত নয় বরং অনেক বেশি রাজনৈতিক। আমরা থেরীগাথা থেকে বেশ কিছু উদাহরণ তুলে আনবো।
তিম্মা নামী ভিক্ষুণী ‘উচ্চতম মানসিক উন্নতি’র অনুশীলনের জন্য সংঘে এসেছে।

মুক্তা(মুত্তা)র আনন্দের কারণ-

সতাই আমি মুক্ত। দ্বিবিধ বক্র পদার্থ হইতে

-উদ্বল, মৃষল ও কুজদেহ স্বামী হইতে

আমার মুক্তি গৌরবময়।...(তদেব, পৃ ৮)

চিরাচরিত-নৈতিকতায় সে অসতী বলেই বিবেচিত হবে কারণ, সমাজ, ব্রতকথা নীতিকথায়,- অসৎ
স্বামীকেও সেবা, কুষ্ঠরোগী স্বামীকে স্ত্রীর কোলে করে বারবণিতার কাছে দিয়ে আসার ‘মহৎ’ কাহিনিগুলি
মজুত আছে। যেকোন পরিস্থিতি সমস্ত কিছু সহ্য করে নিয়ে, নিজের ‘স্বতন্ত্র্য, সম্মান, ভালো থাকা’
ইত্যাদি সব কিছু মেনে নিয়ে, ‘কন্যা, জায়া, মাতা’ রূপে অন্যের সুখে নিজের সুখ খুঁজে নিয়ে, ‘গার্হস্থ্য’
জীবনে টিকে থাকা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। এটাই মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া। সমাজ নৈতিকতার
মাপকাঠি। কিন্তু থেরীগাথায়, আরও অনেক ভিক্ষুণিও সোপানসে প্রকাশ করেছেন- সংসার, গৃহ, স্বামী,
সন্তান ত্যাগ করে জ্ঞানের চর্চা করার সুযোগ পাওয়ার আনন্দের কথা।

সুমঙ্গলের মাতা(তার নাম অজ্ঞাত স্বতন্ত্র পরিচয় নেই তবুও)র গান-

সুমুজা নারী! পাকশালার দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্তি কি মধুর মুক্তি! পাকপাত্র সমূহের মধ্যে শ্রমরতা আমার মলিন ও নিষ্প্রভ দেহ আমার নিষ্ঠুর স্বামীর নিকট তাঁহার নির্মিত ছত্র দণ্ডের অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর ছিল। অতীতের রাগ দোষাদি বর্জন করিয়া আমি স্বচ্ছন্দে বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্ন হই, সুখী আমি সতি সুখী! (থেরীগাথা, পৃ ১৯)

চিত্রা (চিত্তা) এবং মেত্তিকার গানে পাই, দুঃখক্লিষ্টা, বলহীন, বিগতযৌবনা হওয়ায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের কোনো সম্মান এবং প্রয়োজন ছিলনা, কিন্তু ভিক্ষুণী হয়ে অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পেরে তারা আনন্দিত।(থেরীগাথা, পৃ ২১-২২)

বৌদ্ধধর্মে নারীদের সম্মান সম্পর্কিত প্রশ্নের ক্ষেত্রে সোমার গানটি খুব জরুরি। ধর্মানন্দ কোসাম্বী তাঁর ভগবান বুদ্ধ বইয়ে, এই একই উদ্দেশ্যে এই গাথাটি উদ্ধৃত করেছেন। (ভগবান বুদ্ধ, পৃ ১১৫-১১৬)

থেরীগাথা অনুযায়ী- মার, ভিক্ষুণী সোমাকে, পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা কত হীন এই বলে তার সাধনায় বাধা দিতে চায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাশ্রিতা সোমা তার বিরোধিতা করে। এখানে, ভাত করার সঙ্গে শুধুমাত্র মেয়েদের যুক্ত করে, তারা কতখানি নির্বুদ্ধিসম্পন্ন তার উপমা দেওয়া আছে। এটি অত্যন্ত সমাজ প্রচলিত একটি ধরণ এবং উপমা- যেহেতু প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, ‘মেয়েরাই’ গার্হস্থ্যকর্ম করে, তাই তারা জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, পরবর্তীকালে বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন ইত্যাদি জটিল শাস্ত্রচর্চার অনুপোযোগী। বা উলটো দিক থেকে, যেহেতু ‘জন্মগত ভাবেই, তারা ‘বুদ্ধিহীন’(তাই দ্বিতীয় লিঙ্গ, বা উল্টোটা) তাই ‘বর্হিবিশ্বে, জ্ঞান-রাজনীতি ইত্যাদি’ চর্চার অনুপযোগী, তা শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট, আর মেয়েদের জন্য পড়ে রইল- ‘বুদ্ধিহীন’ ‘পুনরাবৃত্তিমূলক’ ‘দৈনন্দিন’ ‘বিরামহীন’ গৃহকর্ম! উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

...মার আকাশপথে অদৃশ্যরূপে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিলঃ

যে স্থান ঋষিদিগের প্রাপ্তব্য উহা লাভ করা

সুকঠিন। নারীগণ তাহাদের দুই অঙ্গুলিপরিমিত

জ্ঞান দ্বারা উহা প্রাপ্ত হইতে পারে না! ৬০

যেহেতু নারী সপ্তম অষ্টম বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জীবন অন্ন পক্ষে অভ্যস্ত হইয়াও পাত্রস্থ চাউল কোন্ সময়ে সিদ্ধ হইল জানে না, উহা জানিবার জন্য তাহাকে দুই একটি চাউল হাতার সাহায্যে উঠাইয়া দু অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া দেখিতে হইবে। এই কারণে ‘দুই অঙ্গুলি পরিমিত জ্ঞান’ কথিত হইয়াছে। তৎপরে ভিক্ষুণী মারকে ভৎসনা করিয়া কহিলেনঃ

যাহাদের চিত্ত সুসমাহিত, মার্গে সুপ্রতিষ্ঠিত

হইয়া যাহাদের জ্ঞান ক্রমবর্ধমান, অন্তদৃষ্টি

দ্বারা যাহারা ধর্মের সম্যক অনুধাবনে সমর্থ

হইয়াছে, স্ত্রী-স্বভাব তাহাদের কি করিতে

পারে? ৬১

ভোগানুরিক্তি দমিত ও অজ্ঞানান্ধকার বিদীর্ণ

হইয়াছে। হে পাপী, ইহা জানিয়া রাখ।

এখানে তোমার স্থান নাই। ৬২ (থেরীগাথা, পৃ ৩৯-৪০)

মারের বক্তব্য ‘চলতি সমাজ নৈতিকতার’ মনোভাবকেই প্রকাশ করে। সোণার গানে পাই দশ সন্তান ধারণে ‘দুর্বল ও জীর্ণ’ হয়ে; স্বামীর অবর্তমানে ছেলেদের মধ্যে সম্পদ বিলিয়ে দেয়, পুত্র ও পুত্রবধূগণ সম্পদহীনা বৃদ্ধাকে অসম্মান করলে সোণা প্রব্রজ্যা নেয়। জ্ঞানের সাধনা করার সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দিত-

ক্লক্ক সমূহের এই মিলন মন্দিরে আমি দশ

পুত্রকন্যা ধারণ করিয়াছিলাম। দুর্বল ও

জীর্ণ হইয়া আমি এক ভিক্ষুণীর নিকট গমন করিলাম। ১০২ (থেরীগাথা, পৃ ৫৬-৫৭)

ভদ্রা কুণ্ডলকেশার গাথায় আছে- চোরকে কুণ্ডলকেশা যেভাবে শাস্তি দেয় তার উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা, তা দেখে, স্থানীয় দেবতা তাকে বলে-

সর্বক্ষেত্রে মানুষ নারীর অপেক্ষা শ্রেয় নয়; নারীও তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইলে পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারে। নারীও চতুর, সে চিন্তা করিতে মুহূর্তমাত্র

সময় লয়। (থেরীগাথা, পৃ ৫৯)

চন্দ্রার গাথা-

বিধবা, নিঃসন্তান, মিত্র ও জ্ঞাতিহীন, নিরন্ন ও

বস্ত্রহীন হইয়া আমি দুর্দশাগ্রস্ত ছিলাম। ১২২

দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা

করিতাম। রৌদ্রতপ্ত ও শীতাত্ত হইয়া সাত

বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলাম। ১২৩

তৎপরে এক ভিক্ষুণীর দর্শন পাইলাম। তিনি
আমাকে সাদরে গ্রহণপূর্বক পানভোজনে
তৃপ্ত করিইয়া অনাগারীত্ব আশ্রয় করিতে
কহিলেন। ১২৪ (থেরীগাথা, পৃ ৭২)

বাসিট্টীর গান-

পুত্রশোকাকর্ষা, উন্মাদিনীপ্রায়, বিবসনা ও
আলুলায়িতাকেশ হইয়া, আমি পথিপার্শ্বস্থ
জঞ্জাল তুপে, শ্মশানে ও শকটবর্ত্তে ক্ষুধাকর্ষা
ও তৃষণাকর্ষা হইয়া তিন বৎসর ভ্রমণ করিয়াছি। ১৩৩-৩৪
পরিশেষে মিথিলা নগরে সুগতের দর্শন
পাইলাম-সেই সুগত, যিনি অদান্তের দমন
কারক, অকুতোভয় বুদ্ধ। ১৩৫ (থেরীগাথা, পৃ ৭৭-৭৮)

তিন বছর ধরে, পরিবার এবং সমাজ তাকে স্থান দেয়নি; স্থান হয়েছে বৌদ্ধধর্মে।

একইরকম আরও বহু উদাহরণ আছে। তাছাড়াও আছে সৌন্দর্য গর্বিতা, এবং বারবণিতা বহু মেয়ের,
দৈহিক সৌন্দর্যের অসারতা, বুঝতে পেরে সজ্জে যোগ দেওয়ার গাথা।

কিসা গোটমী র গাথায়, মেয়েদের অবস্থা এবং অবস্থান নিয়ে বেশ কিছু কথা আছে-

‘জীজন্ম দুঃখ’ ইহা নরচিত্তদমনাকারী বুদ্ধের
বাক্য। সপত্নী সহবাস দুঃখ, সন্তান প্রসব
দুঃখ।
কেহ স্বকীয় কণ্ঠচ্ছেদন করে, কোন সুন্দরী
তরুণী বিষ পান করে। প্রাণনাশী ভ্রূণ মাতৃ-
কুক্ষিগত হইয়া উভয়েই বিনাশ প্রাপ্ত
হয়। ২১৭
প্রসবার্থে গৃহাভিমুখিনী হইয়াছিলাম, পথে

স্বামীকে হারাইলাম। প্রসব সময়ে গৃহে

উপনীত হইতে অসমর্থ হইলাম। ২১৮

হতভাগ্য নারী! দুই পুত্র হারাইলাম,

পথে স্বামীর মৃত্যু দেখিলাম; মাতা,

পিতা ও ভ্রাতাকে একচিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলাম'। ২১৯

ভাগ্যহীনা নারী তুমি অপরিমিত দুঃখ

ভোগ করিয়াছ, বহু সহস্র জন্ম অশ্রুমোচন

করিয়াছ। ২২০

শ্মশানে পরিত্যক্ত পুত্রের মৃতদেহ বন্যপশুর

খাদ্য হইল, তাহাও দেখিয়াছি। হতসর্বস্ব,

সর্বজন বর্জিত, পতিহীনা হইয়াছি। তথাপি

এক্ষণে আমি মৃত্যু অতীত! ২২১ (থেরীগাথা, পৃ ১০৪-১০৫)

‘স্ত্রীজীবন’-এর সঙ্গে বারবার গৃহকর্ম, পতি ও পরিবারের সেবা, সন্তানধারণ এবং পালন এবং এত কিছু করা সত্ত্বেও অসম্মান, বা কোন একটি থেকে চ্যুত হলে(তাও সেখানে মেয়েটির কোন দোষ নেই), পরিবার বা সমাজের কাছে তার গুরুত্ব কমে যাওয়া, পরিত্যক্ত হওয়া এইগুলি যুক্ত হয়ে আছে। এবং সেখান থেকে তাদের আশ্রয় দিচ্ছে সমাজ। সম্মানের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে, জ্ঞানার্জন করে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিচ্ছে।

পুল্লিকা ছিল, অনাথপিণ্ডদের ক্রীতদাসের কন্যা। প্রথা অনুযায়ী সেও পারিবারিক সূত্রে দাসী। পরে ‘প্রভুর’ অনুমতি নিয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করে, এবং এই গাথায় তার ক্রীতদাসীর জীবন থেকে মুক্তির জন্য আনন্দ প্রকাশ করেছে-

সর্বদা জলাহরণ আমার নির্দিষ্ট কর্ম ছিল,

আর্য্যাদিগের দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহাদের

ক্রুদ্ধ বাক্যে উৎপীড়িত হইয়া শীতেও আমাকে

জলে অবতরণ করিতে হইত। ... ২৩৬ (থেরীগাথা, পৃ ১১১-১১২)

ইসিদাসীর গাথার উদাহরণটিই আমাদের আলোচনায় থেরীগাথা থেকে শেষ উদাহরণ। শ্রেষ্ঠীকন্যা, ইসিদাসীর, বিয়ের পর, ‘সমস্ত নারীধর্ম-কর্ম, নিষ্ঠাভরে’ পালন করা সত্ত্বেও সে তিনবার স্বামী পরিত্যক্তা হয়, শেষপর্যন্ত সজ্জের আশ্রয় পেয়ে, ‘স্বতন্ত্র জ্ঞানসাধনার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হয়। তার গাথা-

পুরশ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনী নগরে আমার পিতার

বাসস্থান, তিনি ধর্মশীল শ্রেষ্ঠী; আমি

তাহার একমাত্র কন্যা, তাহার অতি প্রিয় আনন্দ

দায়িনী স্নেহের পুতলি। ৪০৫

সাকেত নগর হইতে আগত এক শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভূত

ধনবান শ্রেষ্ঠী তাহার পুত্রের সহিত আমার

বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমি তাহার পুত্রবধূ হইলাম। ৪০৬

আমার শিক্ষানুসারে সায়ংকালে ও প্রাতে শ্রুত

ও শৃঙ্গরকে প্রণাম করিতাম, নতমস্তকে

তাহাদের পদধূলি লইতাম। ৪০৭

স্বামীর ভগিনী, ভ্রাতা ও পরিজন বর্গকে

দেখিবামাত্র শশব্যস্তে আসন প্রদান

করিতাম।

গৃহে রক্ষিত অন্ন, পান, খাদ্যাদি পরিবেশন

কালে যাহার যেরূপ প্রাপ্য তাহাকে সেইরূপে

বিতরণ করিয়া তাহাদের প্রীতি উৎপাদন

করিতাম। ৪০৯

যথা সময়ে অযায়াত্যাগ পূর্বক গৃহদ্বার

ও হস্তপদ ধৌত করিয়া অঞ্জলিবিসর্গ হইয়া স্বামীর

নিকট গমন করিতাম। ৪১০

কঙ্কতিকা, মুখবিলেপন, অঞ্জন, দর্পণ ইত্যাদি

লইয়া পরিচারিকার ন্যায় স্বয়ং স্বামীকে

বিভূষিতা করিতাম।

আমি নিজহস্তে অন্নপাক করিতাম, নিজ হস্তে
পাত্রাদি ধৌত করিতাম। একমাত্র পুত্রের মাতার
ন্যায় স্বামীর পরিচর্যা করিতাম। ৪১২
আমার ন্যায় অতুলনীয় পরিচারিকা, নিরভিমানা,
নিরন্তর পতি-সেবাপরায়ণা, প্রত্যুষে
শয্যাভ্যাগশীল, অনলসা, ধর্ম্মানুরক্তা পত্নীর
প্রতি স্বামী বিমুখ হইলেন। ৪১৩

...

স্বামীর এই বচনে শ্বশুর এবং শ্বশুর আমাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি অপরাধ
করিয়াছ? নিঃসঙ্কোচে সত্য কহ।” ৪১৭
‘আমি কোন অপরাধ করি নাই, কোন অনিষ্ট
করি নাই, কোন দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করি
নাই। স্বামী এরূপ বিরূপ হইলে আমি কি
করি?’ ৪১৮

...

তৎপরে পিতা, পূর্ব্বের শ্রেষ্ঠী প্রদত্ত অর্থের
অর্দ্ধ পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার ধনাবানের
গৃহে আমার বিবাহ দিলেন। ৪২০
একমাস সেখানে বাস করিবার পর সেখানে
হইতেও বহিষ্কৃত হইলাম, যদিও সেখানে
নির্দোষ ও শীলসম্পন্ন হইয়া ক্রীতদাসীর ন্যায়
অপরের সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। ৪২১
আত্মসংযম নিরত, শান্তচিত্ত উদাসীনকে ভিক্ষায়
রত দেখিয়া পিতা তাঁহাকে কহিলেন, “তোমার
চির ও ভিক্ষাপাত্র দূরে নিঃক্ষেপ কর, এস,
আমার জামাতা হইবে,” ৪২২

ঐ স্বামীর সঙ্গে একপক্ষ বাস করিবার পর

তিনিও পিতাকে কহিলেন, “আমার চীর,

ভিক্ষাপাত্র ও পান পাত্রদাও, আমি পুনরায়

ভিক্ষাজীবী হইব।” ৪২৩

...

তিনি বিদায় লইলেন। আমি একাকিনী চিন্তা

করিতে লাগিলাম। পরে মাতাপিতার নিকট

দেহ কিম্বা গৃহত্যাগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। ৪২৬ (থেরীগাথা, পৃ ১৫২-১৫৬)

এই বর্ণনাগুলি থেকে খুব সহজ অথচ দৃঢ় ভঙ্গিতেই স্পষ্ট যে পুরুষের কামনার নিরসন, শুধুমাত্র গার্হস্থ্য শ্রমদান, সন্তানপালন, অবিরাম সন্তানের জন্মদান ইত্যাদি সম্মান, ভালোবাসা, মর্যাদাহীন দায়িত্ব পালনে বিরক্ত ক্লান্ত, অসম্মত। যতটা না বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাদের আসক্তি; তার থেকেও তাদের বেশি আসক্তি আত্মসম্মানের সঙ্গে একান্তে জ্ঞানের চর্চার সুযোগের প্রতি; আর এই সুযোগ পেয়ে তারা উচ্ছ্বসিত।

এক্ষেত্রে বিত্ত, বংশ অনুযায়ী কোনো ভেদ নেই। সাধারণ ভিখারিণী, গৃহবধূ, বারবণিতা, শ্রেষ্ঠী ও রাজকন্যা বা বধূ সকলেই সেই পরিসর পাচ্ছেন তাদের একই সঙ্ঘে সমানভাবে ঠাঁই হচ্ছে। ‘ভিক্ষুণী শ্রেষ্ঠ’ হবার মর্যাদাও পাচ্ছেন, উপযুক্ত জ্ঞানলাভের পর। মেয়েদের, ইচ্ছার মূল্য, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দিতে পারেনি, দিয়েছিলো সংঘ। অবশ্যই আমরা যে গাথাগুলি পাচ্ছি, তা সেইসময়ের মেয়েদের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম, কিন্তু তবু এই পরিসরে বাস্তব একটি ছবি পাবো।

একথা বলা, যেতেই পারে, যে মেয়েরা ‘স্বতন্ত্র জীবনযাপনের’ সুযোগের জন্য কেন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আশ্রয়ে যাবে? কেন সমাজ তাদের সেই পরিসর ‘ধর্মের’ ছাতার বাইরে রাখবে না? কিন্তু বুদ্ধের কালে সেই প্রশ্ন তুলে লাভ কী! তখন তো তাও ‘বৌদ্ধধর্ম’ তাদের এই পরিসর দিয়েছিল, জীবনযাপনের। মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া ‘চিরন্তন নারীধর্ম-কর্ম’ পালন ভালো লাগছে না, এই কথা গুলি বলার স্পষ্ট স্বর আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু এখন একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যদি আমরা আগের প্রশ্নগুলি তুলি, কতজন নারী জোর গলায়, স্পষ্টত বলতে পারে, যে, ‘এই চিরন্তন নারীধর্ম-কর্ম’ ভালো

লাগছে না; সামাজিক আশ্রয় তো দূরের কথা, মেয়েদের এই কথা বলার পরিসর আমরা দিতে পারিনি। অত যুগ আগে যে ‘স্বতন্ত্র স্বর’ আমরা শুনেছিলাম, তার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে, আমরা সভ্যতার অগ্রগতির না এগিয়ে, আরও বিস্তৃত আয়োজন করেছি, যেটুকু স্বর শোনা গেছিল, সেটুকুও যেন আর না শোনা যায়। তার জন্য বাজার ‘পরিপাটি ব্যবস্থায় মুখবন্ধ’ করে দিতে বেশি আগ্রহী।

আমাদের কাজ ছিল, পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে, যাতে এই স্বর গুলির জন্য ‘ধর্মছাতা’ ছাড়াও সমাজে স্বতন্ত্র্য পরিসর তৈরি করা যায়, কিন্তু স্পষ্টতই তা আমরা পারিনি, করিনি। আমাদের আলোচনার সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা মেয়েদের লেখা সাহিত্য থেকেই যে বক্তব্য গুলি তুলে ধরেছি, তাতে তা স্পষ্ট। ‘গার্হস্থ্য জীবনই মেয়েদের পক্ষে আদর্শ, এই মত প্রচারের আরও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন আমরা দেখেছি। সামাজিক বা বাস্তবের বিভিন্ন ক্ষেত্রের তথ্য, যদি মেয়েদের অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে দেওয়ার পরিসর থাকতো তাহলে দেখা যেত, তা আরও কতখানি ভয়ঙ্কর দিকে এগিয়েছে! পাঠকরা নিজেদের আগ্রহে সেই তথ্যগুলি এর পাশাপাশি পড়ে দেখতে পারেন। এইভাবেই আমাদের বক্তব্য সুপরিষ্কৃত হবে। আধুনিকতার প্রস্তাবে আমরা কাকে এগিয়ে রাখব? প্রাচীনকালের খেরীগাথা না বর্তমানের আধুনিক এই উপন্যাসগুলিকে?

খেরীগাথার প্রায় সমসাময়িক কালকে ব্যবহার করে ‘আধুনিক’ উপন্যাস লেখা হয়েছে- *মৈত্রেয় জাতক!* উপন্যাসে লেখক কয়েকটি দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করেছেন- আছে, বৌদ্ধদর্শন-ধর্ম রাজনীতি- ইতিহাসের কিছু প্রসঙ্গের উল্লেখ কিন্তু সেগুলিতে যথেষ্ট গবেষণার অভাব আছে। লেখকের মতামত বেশ অস্বচ্ছ, বিভ্রান্তিমূলক। আছে আন্তিক-নাস্তিক বিতর্ক; অস্তিত্ববাদের সঙ্গে এই উপন্যাসের ভাবকে মেলানোর চেষ্টা, শূন্যবাদ নিয়ে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য। নিবেদন অংশে একটু লেখকের মন্তব্য গুলো খেয়াল করবো-

আজকের ভাষায় তাকে শোধনবাদী বললে বোধহয় ভুল হবে না। ...তাঁর প্রধান সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা হল- অতিকৃষ্ণ ও অতিভোগ এই উভয়বিধ বদভ্যাসের মাঝামাঝি এক মধ্যপন্থার সুপারিশ। তাঁর কালের বিচারে এ পদক্ষেপ যদি বৈপ্লবিক না-ও হয় অন্তত তা বিশেষ কাণ্ডজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়। ...

বর্ণভেদ তিনি নিজে মানতেন না, তাঁর সজ্ঞও মানত না, কিন্তু সমাজশরীর থেকে বর্ণভেদ উঠিয়ে দেবার জন্য তো কই উঠে পড়ে লাগেননি!...
অপর দিকে আত্মা তিনি মানতেন না, ঈশ্বর সম্পর্কে ছিলেন নীরব। আবারও আত্মবিরোধ। কেননা আত্মা ও ঈশ্বর বিশ্বাসের মতো আশাপ্রদ ও
শুভসংস্কার আর কী-ই বা থাকতে পারে? তবে কি তিনি ধ্যানযোগে অনাদ্যন্ত শূন্যেরই মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবং সে কথা সোজাসুজি সামান্য
জনের কাছে প্রচার করা ভালো মনে করেননি? জীবনের বৃহত্তম দার্শনিক 'চালাকি'টি করলেন এই ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রশ্নে ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে অনর্থক
বাদানুবাদ সর্বাসুন্দর ইহ জীবনের পরিপন্থী মনে করেই কি তিনি তাঁর আবিস্কৃত শূন্যতত্ত্ব গোপন রাখলেন? তিনি কি পৃথিবীর প্রথম
এঞ্জিস্টেনশ্যালিস্ট?... (নিবেদন, মৈত্রেয় জাতক, পৃ ৭-৮)

শূন্যতত্ত্ব সম্পর্কে লেখকের ধারণা বিভ্রান্তিমূলক তা আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। এই সমস্ত
প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দেশী-বিদেশী তাত্ত্বিকেরা, দার্শনিক এবং গবেষকেরা দিয়েছেন-
নাগার্জুন, দিঙনাঙ, ধর্মকীর্তি, রবীন্দ্রনাথ, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, ধর্মানন্দ কোসাম্বী, নলিনাক্ষ দত্ত,
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রমুখরা। এমন কি রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও তা নিয়ে যে
টুকরো মন্তব্য আছে, তাও এই ভাবনার তুলনায় অনেক আলাদা। ফলে ফিক্সনের সত্যতা যথার্থতার
যুক্তিবিন্যাস, লেখকের রাজনৈতিক অবস্থান প্রশ্নহীন নয়।

কেননা আত্মা ও ঈশ্বর বিশ্বাসের মতো আশাপ্রদ ও শুভসংস্কার আর কী-ই বা থাকতে পারে?

আস্তিক, ঈশ্বরবিশ্বাসী অবস্থানকে, স্পষ্ট করে দেন, তিনি অস্তিত্ববাদের সংকট গোটা উপন্যাসে কীভাবে
বিবৃত করেছেন, তা প্রশ্নাতীত নয়। উপন্যাসের নিবেদন অংশ, উপন্যাসেরই অংশ।

গোটা নিবেদন অংশে আছে, একটি ব্যক্তির ওপর (বুদ্ধ) দেশ কাল সময় প্রেক্ষিত ভুলে সব দায়
চাপানোর চেষ্টা! এবং তার সমাধান, কোনো এক মৈত্রেয়ের আগমনে ঘটবে বলে। যদিও তিনি মৈত্রেয়কে,
'হয়তো একটি ভাবনা' বলতে চেয়েছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,

What is definite about all this is that the Buddha is not prophesying the coming of a leader to organise a
revolutionary party for the final overthrow of a society every fabric of which is permeated with evil-evil that
originally follows from the accumulation of wealth or private possession, or, as the Buddha puts, it, from 'goods
not being bestowed on the destitute'. যিনি কার্যকারণসম্পর্ক নির্ভর 'প্রতীত্বসমুৎপাদ'এর কথা বলেন, তিনি
কাল্পনিক 'মেসিহা'র আগমনে সব দুঃখ লাঘব ঘটবে তা বলতে পারেননা।^{১৬}

তিষ্য, চণক ইত্যাদির বিদ্যাশিক্ষায় দুর্মেধোজাতকে(৫০) এর প্রভাব আছে; বিরুড়কের গল্প ভদ্রশাল জাতক (৪৬৫); যে ব্রাহ্মণ দলিত স্পর্শ-রহিত ‘পবিত্র ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্মশান’ খুঁজে বেড়াতো , পরে বুদ্ধের উপদেশে ভুল বুঝতে পারে এ কাহিনি উপসাগ-জাতক(১৬৬); অজাতশত্রুর বিশ্বিসারকে হত্যার গল্প সঞ্জীবজাত(১৫০); প্রসেনজিতের মালাকার কন্যা মল্লিকাকে বিয়ের গল্প কুল্মার্ষ্যপঞ্চ(৪১৫); বিভিন্ন বিদ্যায় মেয়েদের পারদর্শী করে তোলার গল্প ‘চুল্লকলিঙ্গ’ (৩০১); এছাড়াও কালকর্ণী জাতক, রুরুর এবং অন্যান্য জাতক থেকে গৃহীত।^{১৭} লেখক এগুলিকে নতুন মাত্রা দিয়ে একটি অখণ্ড উপন্যাসের গল্প নির্মাণ করেছেন, চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে। এই কৃতিত্ব অবশ্যই লেখকের মুন্সিয়ানার পরিচয়।

অস্তিত্বসংকটের যে সংশয়ে এসে চণক পৌঁছায় তা তার জানার বা অভিজ্ঞতার অনুসন্ধিৎসার ফলে নয়। গল্পের ঘটনাক্রম অনুযায়ী স্মৃতি হারানোর ফলে। এই অস্তিত্বসংকট আর দর্শনের অস্তিত্বসংকটের সংশয়, দোলাচলতা, বীক্ষা এক নয় বলেই আমাদের মত।

কিন্তু বাণী বসু যে ধরনের নারীবাদের প্রতিধ্বনি এই উপন্যাসে করেছেন, তা যথেষ্ট বিভ্রান্তিমূলক। যে প্রশ্নগুলি তিনি তুলেছেন, সেই প্রশ্নগুলি তোলা, সংগ্রাম এবং সম্ভাব্য সমাধানের পথ নারীবাদের তত্ত্ব এবং পাশাপাশি প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথ আমাদের কাছে এই সময়ে দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট। নারীবাদের বিভিন্ন আন্দোলন আসলে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। লিঙ্গ রাজনীতির সঙ্গে আর সমস্ত রকম রাজনীতিরই যোগ আছে। এটি কোন বিচ্ছিন্ন আন্দোলন নয়। আমরা বাণী বসুর ভাবনা এই উপন্যাসে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা করব।

বাণী বসু ভূমিকায় বলেছেন-

হায় বুদ্ধযুগের নারীকুল। প্রায়শই উচ্চশিক্ষিত, ব্যক্তিগতময়ী, পূর্ণবিকশিত কিন্তু সামনে কোন পথ খোলা পাননি প্রব্রজ্যাই একমাত্র বিদ্রোহ যা তাঁরা করতে পেরেছেন। ব্যর্থ এবং আবারও ট্রাজিক। এঁদের সবাইকে নিয়েই প্রধানত ‘মৈত্রেয় জাতক’ -এর যাত্রা। (নিবেদন, পৃ ৯)

কিন্তু শুধু অভিজাত মেয়েদের কথা উনি বললেও এই বিদ্রোহীদের দলে প্রচুর সংখ্যায় সাধারণ মেয়েরাও ছিল। তাদের দূর্দশাকে তারা জীবন দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন, উচ্চশিক্ষা থাকুক বা না থাকুক।

জীবনকে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো শিক্ষা তাদের ছিল। এবং একমুখী সম্মানহীন গার্হস্থ্যজীবন থেকে ‘মুক্তি’ পেয়ে তারা ‘ব্যর্থ এবং ট্রাজিক’ বোধ করেননি। স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা, সজ্জ্ব বিভিন্ন পদাধিকার, জ্ঞান-বিদ্যা-তর্ক-সাহিত্য-দর্শন চর্চার সুযোগ তারা পেয়েছিলেন, তাতে তারা আনন্দই পেয়েছিলেন। থেরীগাথা ও অন্যান্য উদাহরণে আমরা তার আলোচনা করেছি।

বাইরের কাজ (উৎপাদন) বিশেষত যাতে প্রত্যক্ষ মুনাফা তৈরি হয় সেসব ক্ষেত্রে আমরা নারী পুরুষ সমানাধিকারের দাবী তুলি, উমেন এমপাওয়ারমেন্ট বলতেও বিশেষত এই ক্ষেত্রগুলিই চিহ্নিত। তা সত্ত্বেও আরেকধরনের শ্রম আছে যা প্রত্যক্ষ মুনাফা উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, যে উৎপাদন ও শ্রম থেকে প্রত্যক্ষ মুনাফা তৈরি হয়না, অথচ ব্যক্তি পরিবার সমাজ, উৎপাদন-ব্যবস্থাকে সচল রাখতে যার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তা, গার্হস্থ্য শ্রম।

কিন্তু সমাজ এর জন্য নির্দিষ্ট শ্রমিক হিসেবে ঠিক করে রেখেছে মেয়েদের। ৮ ঘণ্টার বিভাজন ছিল – ৮ ঘণ্টা শ্রম, ৮ ঘণ্টা ঘুম, ৮ ঘণ্টা অবসর, অর্থাৎ এমন কাজ করা যা ব্যক্তিকে আনন্দ দেবে। আমরা তৈরি করলাম জনপ্রিয় সিনেমা, সিরিয়াল, ফিক্সনে ‘আদর্শ বধূ’। যে ঘরের সমস্ত কাজ সামলে, পরিবারের পুরুষতান্ত্রিক হাইরার্কিকে ‘খুশি করে’ তারপর সময় বাঁচলে বাইরে শ্রম দেবে বা অবসরযাপন করবে। আমরা গার্হস্থ্য শ্রমে(রান্না, কাপড় কাচা, শৌচাগার-ঘরের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) সমতার ধারণা না আনতে পারলে পুরুষদেরও এই শ্রমসঙ্গী না করলে ‘৮ ঘণ্টার দাবী’ কখনও বাস্তব হবে না। আমাদের উপন্যাসের মেয়েচরিত্র গুলিও কমবেশি এই ‘আদর্শ বধূ’ ভাবনায় তৈরি। *মৈত্রেয় জাতক*, *হে অনন্তপুণ্য*, *রামগড়*, *ত্রিবেণী* – উপন্যাসের মূল চরিত্ররা, থেরীগাথার মুক্তা, সোণা, চিত্রা নয়। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিশাখা। কারণ বিশাখা ছিল ‘আদর্শ বধূ’।

প্রশ্ন তুলছে বটে, গার্হস্থ্য জীবনের বাইরে কোনো ‘স্বতন্ত্র পছন্দ বাছার সুযোগ’ সে পাচ্ছেনা, বা চেষ্টাও করছে না। যদিও থেরীগাথায় দেখছি, বুদ্ধ তাদের সেই সুযোগ দিচ্ছে! কিন্তু উপন্যাসে ব্যর্থতাকেই দাগিয়ে দেওয়া আছে! আমাদের মনে হয় বিশাখার গল্পটি এই ব্যর্থতারই উদ্‌যাপন। পাঠকদের মধ্যে

সহমর্মিতা জাগানোই এর উদ্দেশ্য। যে মেয়েদের শুধু একটু আধটু সুষ্ঠুভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের 'বুদ্ধিটুকু' থাকলেই হবে। ঘরের পরিসরে থেকেই সে 'সীমিত আধুনিক' হবে। কার্য্যকারণ সম্পর্ক ধরিয়ে দেওয়া বা কোনো সমাধানের দিকে যাওয়া, বা নারীবাদের সঙ্গে, শ্রমের রাজনীতির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করানো এর উদ্দেশ্য নয়। বিশাখার মাধ্যমে ১৯৮৭ সালে যে বার্তা দেওয়া হচ্ছে-

বাড়িতে যা হয় তা বাইরে বলবে না, বাইরের কথা সংসারে আলোচনা করবে না, শ্বশুর শাশুড়ীর সামনে বসবে না, তাদের আহার না হলে খাবে না, তারা না ঘুমোলে, শোবে না, তাদের অগ্নিবৎ পূজা করবে, দেবতাবৎ জ্ঞান করবে ইত্যাদি। একই গল্প একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, 'লেখিকা'দের দুরকম, দুসময়ে লেখা উপন্যাসে। ঘরে বাইরে 'আদর্শ গৃহবধূ' 'মিগারমাতা' হয়েই জীবন কাটাচ্ছে।(মৈত্রেয় জাতক পৃ ১৯২-১৯৫ ; হে অনন্তপূণ্য পৃ ৮৩-৮৬)

World bank, UNO, ILO, Oxfam এর ধারাবাহিক, নারীশ্রম সংক্রান্ত রিপোর্টগুলি এর পাশে রেখে পড়া যেতে পারে। বাস্তব কেমন আর 'বাজারি, জনপ্রিয়' সাহিত্য কেমন! সাহিত্য সমাজের আয়না নাকি 'অলীক মায়াবী স্বপ্নপুরী?

(৭)

'বীরাঙ্গনা কাব্যের' রচয়িতা মধুসূদন দত্তের বিভিন্ন রচনায়, বলিষ্ঠ নারী চরিত্র সৃষ্টির প্রশংসা আমরা চিরকাল করে আসছি। তাঁর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র প্রমীলা, রূপে গুণে বীরত্বে শ্রেষ্ঠত্বে মেঘনাদের সমান। ১৮২৯ সালে আইনত সতীদাহ প্রথা রদ করা হয়, তবু প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পতিব্রতা প্রমাণ করতে প্রমীলাকে মধুসূদন পর্যন্ত সহমরণে পাঠান ১৮৬১ তে লেখা কাব্যে। এর কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি উনিশ শতকের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নারীর স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নয় 'সঙ্গিনী' সত্তাকেই কৃতিত্ব বলে মনে করা হত। সমাজে যেমন কন্যা স্ত্রী মাতা ছাড়া আর নারীর কোনো পরিচয় নেই তেমনি কাল্পনিক প্রমীলা চরিত্রটি মেঘনাদের মৃত্যুর পর প্রয়োজনহীন স্রষ্টার কাছে তাই তাকে সহমরণে যেতে হয়! আর আলাদা কোনো ভূমিকা প্রমীলার জন্য তিনি তৈরি করতে পারেন না। তার একটি কারণ

অবশ্য রামায়ণে চরিত্রটিই নেই বলে, কাব্যে কল্পিত চরিত্রকে কাব্যেই সমাপ্ত করার ঔচিত্য। রামায়ণে কোনো সতীদাহের প্রসঙ্গ নেই। বরং আছে দুবার অগ্নিপরীক্ষা দেবার পর(সেখানেও কিন্তু সতীত্বের প্রমাণ দিতে অলৌকিকভাবে পুড়ে না যাওয়া, সহনশীলতা ইত্যাদি মানদণ্ড আছে) দুঃখিত সীতার ‘আত্মহত্যা’র কথা। আমাদের অভিযোগ- বেআইনী, একটি নিষ্ঠুর সামাজিক ‘হত্যা’কে, মধুসূদন গ্লোরিফাই করেছেন সতীত্বের, প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে! তার বহুকাল পরে, বিশ শতকে লেখা অনুরূপাদেবীর, রামগড় উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র শুক্লা এবং অমিতারও পরিণতিও এক! শুক্লা আত্মহত্যা করে, তারপর সে যেসব কথা মৃত্যুকালে ‘তিন পাতা জুড়ে’, বলে তা ‘অপর সত্তা’কেই গ্লোরিফাই করে-

শুক্লা সেই শান্ত মধুর হাসি (পোড়া দেহে, শারীরিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে, শান্ত, মধুর হাসি!) হাসিয়া বলিল- “নিজের প্রাণ দিয়াও স্বামীর ধর্মের সহায়তা করাই যে সহধর্মিণীর কর্তব্য। সেই বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিলাম। প্রভু! তোমার এ অকৃতজ্ঞা চিরদাসীকে ক্ষমা করিও... আমার জন্য দুঃখ কি নাথ? তোমার দাসীর অভাব হইবে না। আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা সেবিকা পাইবে। ...ছিঃ তুমি কাঁদিও না, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাজপুত্রের পক্ষে তো অসহায় রোদন শোভা পায় না। এখন শান্ত হইয়া একবার প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ কর, আমার স্বহস্তঘাতী আত্মা যেন শান্তিলাভ করে। আর কিছুই সে চাহে না, শুধু যেন জন্ম জন্ম তোমার দাসী হইবার অধিকারটুকু তার নষ্ট না হয়। সেই স্বর্গ, সেই মোক্ষ, সেই আমার পরিনির্বাণ। আমি স্বর্গ মোক্ষ কিছুই চাহি না নাথ! যেখানে গেলে তোমায় পাইব,- সেই মহাপীঠ স্থানই আমার একমাত্র কাম্য! দেবতা আমার! যেন অনন্তকাল আমি-তোমারই,-তোমারই দাসানুদাসী থাকি। (রামগড় পৃ ২৬৬-৬৭)

অমিতা চিতায় সহমৃত্যু হয়, প্রমীলা, অমিতা উভয় ক্ষেত্রেই (আরও বেশ কিছু উদাহরণ আছে), জীবিত হয়েও, জ্বলন্ত আগুনেও কে কত স্থির, শান্ত, সহনশীলা, এই মানদণ্ডে তাদের পতিপ্রেমকে গ্লোরিফাই করা আছে; এই বর্ণনা নিষ্ঠুর! বেআইনি। অমিতা চরিত্রটি প্রথম দেখা থেকে শেষ পর্যন্ত তার প্রণয়ী বসন্তশ্রীর ‘অহেতুক, অমূলক’ সন্দেহের শিকার এবং তার দ্বারা অত্যাচারিত, তবুও-

সেই অপূর্ব সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠময় ফুল শয্যার উপর অপূর্ব সুন্দর মূর্তি শায়িত হইলে পুষ্পবাসিত মন্দ মলয়ানিল সদৃশ হাস্যচ্ছটার অভিনব দু্যুতিতে আরক্ত ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ উদ্ভাসিত করিয়া আম্র পল্লব ধারণ পূর্বক বধুবেশিনী অমিতা চিতাপার্শ্বে আগমন করিল। অসীম ধৈর্য্যের প্রতিকৃতি এই শাক্যনন্দিনী জীবনের মহা দুঃখভারকে দূরে অপসৃত করিয়া দিয়া ভবিষ্যতের অবিচ্ছিন্ন সুখপ্রাপ্তির আশায় এমনই উল্লাসিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে তাঁহার আর তিলমাত্র বিলম্ব সহিতেছিল না। ...ভীষণ চিতাশিখা গগন স্পর্শ করিয়া আরক্তরাগে গজ্জিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং অনতিকাল মধ্যেই সে হৈম-প্রতিম প্রণয়ী-যুগল সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির দাহ মধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া গেল। (রামগড়, পৃ ৩২৩-৩২৪)

ওপরের এই বর্ণনাতে খেয়াল করে দেখবো কীভাবে সুললিত রোম্যান্টিক গদ্যে একটি নিষ্ঠুর হত্যাকে ন্যায়সঙ্গত, প্রেমের পরাকাষ্ঠা করে যুক্তি (কুযুক্তি) সাজানো হচ্ছে! ত্রিবেণীর ভূমিকা পড়ে এবং সাধারণ ভাবে মধ্যবিত্ত পাঠক-চরিত্র পাঠ থেকে আমরা জানি, এই ধরনের গল্পের চাহিদা কীভাবে তৈরি করা হয়, বাজার তৈরি করা হয়, এবং পণ্যকে ঠিক সেভাবেই সাজানো হয়। মূলসাহিত্য ধারার গল্প-উপন্যাস-চলচ্চিত্র-ধারাবাহিক আজকেও এমনই, শুধু মোড়োক (প্যাকেজিং) জমকালো! ‘সহমরণ বা অগ্নিপরীক্ষা’ সরাসরি দেখানো না হলেও, মেয়েদের একতরফা আত্মবিসর্জন, হত্যা, মৃত্যুকে একইরকমভাবে এখনো ‘পরিবেশন’ করা হয়। বারবার ধ্রুপদী ধরনের টেলিভিশন শো প্রচার করার মধ্যেও এই ভাবনাই প্রচারিত হতে থাকে বারবার। থেরীগাথার চরিত্ররা এঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। স্বতন্ত্র ‘বৌদ্ধিক-জীবনযাপন’ মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছুতেই প্রশংসনীয় হচ্ছেনা।

মেঘনাদ এবং বসন্তশ্রী পূর্বমৃত ছিল, কিন্তু প্রমীলা ও অমিতাকে লেখকদ্বয় নিষ্ঠুরভাবে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারলেন! প্রাচীন হয়েও রামমোহন এবং বেন্টিঙ্ক এঁদের তুলনায় অনেক বেশি নারীবাদী নন কি?

হে অনন্তপূণ্য উপন্যাসের কাল বুদ্ধের অজাতশত্রুর সমকাল, কেন্দ্রীয় চরিত্র চিকিৎসক জীবক। বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন; তখনকার দিনে বেদে অবিশ্বাসী অর্থে, ঈশ্বর বা মৃত্যুর পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে তিনি ছিলেন মৌন, এই মৌনতা যে ইতিবাচক নয় তা বহু দার্শনিক তাত্ত্বিক প্রমাণ করেছেন। কিন্তু দীপ্তি ত্রিপাঠী এই উপন্যাসের ভূমিকায় পূর্বলিখিত ‘বিশুদ্ধতা’কে গুরুত্ব দিয়েছেন-

মনে রাখতে হবে এ কাহিনী কাম ক্রোধ লোভ মোহের কাহিনী নয়। ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয় লোকে যাবার অভীক্ষা (হে অনন্তপূণ্য, নামপত্র)

বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ ‘আঁতের কথা’ কে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, ‘মায়ের ঈর্ষা’কে মনোবিশ্লেষণে গুরুত্ব দিয়েছেন, বিশ শতকে যে বাস্তবতার চর্চা হয়েছে তা রক্তমাংসের মানুষের কাম ক্রোধ লোভ মোহেরই স্বরূপ, এগুলিই মধ্যযুগীয় দেবনির্ভরতা থেকে মানুষকে, তার মানসিক দ্বন্দ্বকে সাহিত্যে জায়গা করে দিয়েছে। স্ত্রীর পত্রের মতো গল্প লেখা হয়েছে ১৯১৪ সালে, আছে আশাপূর্ণার

ট্রিলজি। নারী স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এবং শ্রমের উপযুক্ত সম্মানের বিষয়টি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত- এই রাজনৈতিক দাবিতে বারবার গোটা বিশ শতক জুড়ে আন্দোলন চলেছে। অথচ ১৯৮৭ সালে দীপ্তি ত্রিপাঠী ‘অতীন্দ্রিয় লোকের’ কাহিনি লিখেছেন! কাম ক্রোধ লোভ মোহ কে বাদ দিচ্ছেন!

উপন্যাসে, ইতিহাস এবং জাতকের গল্প এই নিয়েই কাহিনি উপকাহিনিগুলি সরলরৈখিক ভাবে নির্মিত। দেশচালনার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং অহিংসার বার্তা উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে। মেয়েদের অবস্থান নিয়ে কোনো ‘চিরন্তন নারীর কর্ম এবং রূপ’ ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো ভাবনা নেই। এর স্বরূপ আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি তারই আরেকধরনের ‘টাইপ’ উদাহরণ মাত্র। বুদ্ধ এবং জীবক চরিত্রটিও সরলরৈখিক।

জনপ্রিয় মেয়েদের ম্যাগাজিন ইত্যাদি খেয়াল করলেই দেখতে পাবো ‘আদর্শ রূপবতী নারীদেহ’ তৈরির জন্য নানারকম ঘরোয়া ও বাজারি টোটকা মেয়ে পাঠকদের টানার বিশেষ উপায় হিসেবে ব্যবহৃত, তারা সফল এ বিষয়েও কোন মতান্তর নেই। এখানে জীবক এইধরনের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেয়- রাজকন্যারা প্রসাধনকলা বিষয়ে শিখতে তার কাছে আসে। তাদের প্রশ্নগুলি- ‘কেশকে সুগন্ধি করবো কী করে?’, ‘কেশ কি করে কালো রাখা যায়?’ ‘গাত্র সুগন্ধির উপায় কি?’ ‘যৌবন ধরে’ রাখার উপায় কি? ইত্যাদি এবং জীবকের যথাযোগ্য উত্তর। ঠিক যেন এখনকার পত্রিকার ‘রূপচর্চা বিভাগ’ মেয়েদের সমকাল রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে না জানলেও হবে নিজেকে এবং ঘরকে সাজিয়ে তোলাই একমাত্র কাজ। প্রধান মেয়ে চরিত্রগুলিও এই উপন্যাসে স্বতন্ত্র নয় ‘অপর বা সঙ্গিনী সত্তা’।

বাণী বসু প্রশ্ন তুলেছেন- সমাজশরীর থেকে বর্ণভেদ উঠিয়ে দেবার জন্য তো কই উঠে পড়ে লাগেননি! (নিবেদন অংশ, মৈত্রেয় জাতক)

অথচ এই লেখকেরা কেউই তাদের অভিজাত, ‘হিন্দু’ অবস্থান থেকে বুদ্ধর শেষ আহার ছিল একজন ‘নিম্নজাতের’ মানুষের বানানো শূকরের মাংস একথা মানতে চান নি। উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই

তাকে ‘ছত্রাক’ বা ‘খাম আলু’ (উপন্যাসের মধ্যে বন্ধনী ব্যবহার করে ‘দেগে’ দেওয়া হয়েছে) প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন! তাঁরা নিজেদের খাদ্য(কু)সংস্কারকেই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি বলেই আমাদের মনে হয়েছে।

উপবাণ পিছনে পিছনে এসে বলল- ‘ঐ তো শূকরকন্দের (খাম আলু) ব্যঙ্গন আছে। তাই দাও’

নির্বোধ চন্দ্র কিছু না বুঝে তাই এনে প্রভুকে খেতে দিল। (হে অনন্তপূণ্য, পৃ ১৩৪)

কম্মার চন্দ্র বহু আয়োজন করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে শূকরমদ্রব নামে একপ্রকার ছত্রাকের ব্যঙ্গন। (মৈত্রেয় জাতক, পৃ ৪৩১)

যদিও আহারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তা শূকরের মাংস হওয়াই সমীচীন হয়। ধর্মানন্দ কোসাম্বী তাঁর ভগবান বুদ্ধ তে ‘মাংসাহার’ অধ্যায়ে এপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। হিন্দু শাস্ত্রেও শূকরের মাংস ‘অখাদ্য’ নয় তাও উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিশ শতকের শেষের দিকে এত বিতর্কের, বা মানতে না চেয়ে কুযুক্তি দেওয়াটাও প্রশ্নাতীত নয়। লেখকদের ‘প্রচলিত হিন্দু চলতি রীতি’ অনুযায়ী শূকরের মাংস খাওয়ায় আপত্তি থাকলে তা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। উপন্যাসের কাহিনির সঙ্গেও এই যুক্তির কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই! তথাপি বাড়তি জোর দেওয়ার অর্থ ব্যক্তিগত (কু)সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের ভাবনাও বড় অর্থে বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্মের অংশ বা বিষ্ণুর অবতার কল্পের ভাবনার থেকে খুব বেশী আলাদা কিছু নয়।

মেয়েদের লেখায় আরো সচেতনভাবে মেয়েদের কথা উঠে আসুক। প্রবন্ধে এই ধরণটি যতটুকুও আছে, ফিক্সনে তার প্রভাব খুবই কম, অথচ ফিক্সনই বহুপাঠ্য! ‘মেয়ে’ এই রাজনৈতিক পরিচয়টি (পুরুষ হওয়ার চেষ্টা নয়, পূর্ণ বিকশিত মানুষ হওয়া) আরও সুস্পষ্ট হোক, বাংলা সাহিত্যে; এবং তা হোক রাজনৈতিক স্বার্থেই। যে রাজনীতির উদ্দেশ্য লিঙ্গসাম্য। তারজন্য আরও দীর্ঘ ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পথ সুবিস্তৃত।

(৮)

এই অধ্যায়ে প্রস্তাবিত শেষ, জনপ্রিয় উপন্যাসটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব- সেলিনা হোসেনের(১৯৪৭-), *নীল ময়ূরের যৌবন*^৮। নবম-দশম শতাব্দীর সেন আমল, চর্যাগীতির রচনার সময়কাল এই উপন্যাসের কাহিনির প্রতিবেশ। তখন আর বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের সেই ‘গৌরবময় যুগ’ আর নেই, তা রাজধর্ম, নগর, উচ্চবিত্তের উচ্চবর্গের ধর্ম নয়। বরং প্রান্তিকের ধর্ম(খেরবাদের বহু পরিবর্তিত রূপ, বুদ্ধের প্রচলিত ধর্মের চেয়ে অনেক দূরবর্তী) হিসেবে কোনোভাবে টিকে থাকার কাল। চর্যাগানের ভাষা, প্রান্তিক মানুষের তৈরি করা ভাষা। তাকে আড়ালে প্রচার করতে হয়; ক্ষমতার রক্তচক্ষু থেকে আড়াল করতে হয়। যা এককালে রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা পেত, তা চর্যার কালে পায় রাজ-ঘৃণা।

সেলিনা হোসেন প্রতিবেশ তো বটেই, চরিত্রগুলিকেও চর্যাগীতির আংশিক ইমেজারি থেকে পূর্ণাঙ্গ চরিত্র্য দান করেছেন, তার আখ্যানে। ২৮, ৫০, ২, ১১, ৭, ১২, ২০, ৩৩, ৪৯ নম্বর গানগুলি^৯ থেকে কাহিনি এবং উপকাহিনির উপাদান সংগ্রহ করেছেন লেখক। এই উপন্যাসে ধর্মীয় অনুষ্ণকে বাদ দিয়ে প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আখ্যানকেই নির্মাণ করা হয়েছে।

উপন্যাসে মোট এগারোটি অংশ আছে। প্রতিটি অংশের নাম ‘অপনা মাংসে হরিণা বৈরী’। এই ‘প্রবাদটি’ প্রাগাধুনিক সাহিত্যে বহু-ব্যবহৃত, বিভিন্ন প্রসঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি। চর্যাগীতিতে তো আছেই-

কাহেরে ঘিণি মৌল আচ্ছ কীস।

বেটিল হাক পড়অ চৌদীস।।

অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।। (তদেব, পৃ ১২৬)

গূঢ় ধর্মীয় অর্থ যাই হোক, অর্থ- হরিণ নিজের সুস্বাদু মাংসের কারণেই সকলের শত্রু। এখানে ধর্মীয় বা সমাজ-চলতি কোন সূত্রে এর ব্যবহার লেখক করেছেন? আমাদের প্রশ্ন জাগে।

উপন্যাসের প্রত্যন্ত গ্রামের নিম্নশ্রেণির মানুষদের জীবন-স্বপ্ন-আশাকে আখ্যানে তুলে ধরা হয়েছে। ধর্মীয় অনুষ্ণ(লেখকের ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার ইত্যাদি) এই উপন্যাসের নেই। বরং আছে ধর্মকে ব্যবহার করে যে ক্ষমতাবান শাসক এবং শোষিতের সম্পর্ক তৈরি হয়, সেই অনুষ্ণ। ক্ষমতার রক্তচক্ষু, দমন আর সেই দমনের বিরুদ্ধে সাধারণের জাগরণ, নিরন্তর প্রতিবাদের স্পৃহাকে তুলে ধরা।

এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র চর্যাগীতির জনপ্রিয় গীতিকার কাহু পা এর অনুসরণে, কাহু। আগেই বলেছি ধর্মীয় অনুষ্ণকে প্রাধান্য দেননি লেখক। ধর্মের উল্লেখ যতটুকু আছে তা চর্যাকালের হেজিমনির স্পৃহাকে ব্যবহারের অনুষ্ণে এসেছে। কাহু বৌদ্ধরাজা বুদ্ধমিত্রের পাখাটানার কাজ করে। সে স্বপ্ন দেখে, তার মাতৃভাষায় লেখা গান একদিন রাজসভায় পাঠ হবে, কবিত্বের সম্মান সে লাভ করবে। কারণ রাজা, রাজসভা বেশিরভাগ সাধারণ প্রজার স্বার্থেই। অথচ সেইসময় রাজা বৌদ্ধ হলেও, ব্রাহ্মণ্যধর্মের উত্থানের কাল, রাজার থেকে মন্ত্রী, দেবল ভদ্র ক্ষমতাবান। রাজসভায় যে সাহিত্যের চর্চা হয় তার ভাষা সংস্কৃত (কতিপয় ক্ষমতাধর উচ্চবিত্তের সাহিত্যের ভাষা)। এই উপন্যাসের রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং চিহ্নগুলি খুব স্পষ্ট। সমকালের বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাহু মাতৃভাষার, কবিত্বের সম্মানের বদলে দেবল ভদ্রের কাছে চূড়ান্ত অপমানিত হয় এবং প্রতিবাদে সে রাজার চাকরিতে ইস্তফা দেয়। রাজদরবারে মাতৃভাষার এবং প্রান্তিক মানুষের স্বরের, চাহিদার সম্মানের দাবিতে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করে। কাহু এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেছে, যেখানে জনগণের স্বর তার সমস্যা ক্ষমতার কেন্দ্রে আলোচিত হবে। নইলে বারবার তারা সেই শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তাদের প্রতিহত করবে, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করবে, ক্ষমতাবানদের গদিচ্যুত করবে। এরপর নেমে আসে ক্ষমতার নির্ধূর দমন, কাহুর দুহাত কেটে দেওয়া হয় কবিতা লেখার অপরাধে; ডোম্বীর ফাঁসি হয়, দেবলভদ্রের অত্যাচারি ভাগ্নেকে হত্যা করার জন্য; তাদের গ্রাম রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। জীবিত যারা তারা এরপরেও দমে না, প্রতিবাদ স্পৃহাকে, পরাজয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও জীইয়ে রাখে; এই নিরন্তর লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতিতেই উপন্যাস শেষ হয়।

দীনেশচন্দ্র সেন, শ্যামল ও কজ্জলে প্রথমবার কণোজিয়া ব্রাহ্মণদের দাপটে নিম্নশ্রেণির মাতৃভাষার সাহিত্য রাজসভায় নিষিদ্ধ হওয়া এবং তারফলে সাধারণের ক্ষোভকে দেখিয়েছেন। সত্যেন সেনের বিদ্রোহী কৈবর্ত- তে ইতিহাস অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী হলেও, নিম্নবর্গের ক্ষমতায়নকে তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসে সেলিনা হোসেন সেই ক্ষোভকে, বিদ্রোহে পরিণত করেছেন। বুদ্ধকথা বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ণে ভাষা-আন্দোলনের প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে জড়িত। এবং এই প্রশ্নটি বুদ্ধ নিজেই একটি রাজনৈতিক অবস্থানের চিহ্ন হিসেবে তুলে ধরেন। একথা আগের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

চর্যাগীতির ভাবনাতেও ধর্মীয় গূঢ়তা ইত্যাদি অনুষ্ণের পাশাপাশি ভাষার প্রশ্নটি খুব গভীর ভাবে জড়িয়ে আছে। সন্ধ্যাভাষা ‘একটি নির্মিত ভাষা’ হওয়া সত্ত্বেও তারমধ্যেও প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষার প্রভাবের কথা, এবং সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার ইমেজারির কথা অনেক গবেষক-আলোচকই বলেছেন। চর্যাগীতি-র ভাবনা এবং স্পৃহা, ক্ষমতা-বিরোধী, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই প্রাগাধুনিক প্রতিবেশটি বারবার আধুনিক লেখকেরা বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে বিনির্মাণ করেছেন। সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসটি লিখেছেন ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, সেকথা বুঝতে পাঠকের অসুবিধে হয়না। উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার বদলে মাতৃভাষা বাংলার জন্য আন্দোলন, বিদ্রোহ এবং সেই সূত্রে আলাদা দেশের স্বাধীনতা এই ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রেক্ষপটই উপন্যাসটি গড়ে ওঠার ভিত্তি। আগের অধ্যায়ে উপন্যাসে ‘বাঙালি আত্মপরিচয়’ নির্মাণের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, এখানেও সেই রাজনৈতিক চিহ্নটি ব্যবহৃত। উপন্যাসের শেষে ধ্বনিত হয়েছে ভুসুখু পা এর বিখ্যাত গান-

বাজনাব পাড়ী পঁউআ খালোঁ বাহিউ।

অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ।।

আজি ভুসুখু বঙ্গালী ভইলী। (৪৯ নং চর্যাগান)

কিন্তু ভেবে দেখা প্রয়োজন যে বহু লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সফল আন্দোলনের বেশ কিছু বছর পরে সেলিনা হোসেন এই উপন্যাসটি লিখলেও তাতে কোনোরকম জয়লাভের ন্যারেটিভ তিনি উপন্যাসে

তৈরি করেন নি। তাই শুধু ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এ উপন্যাস এমন সরলীকরণ আমরা করে ফেলতে পারি না।

বাংলাদেশ গঠনের পরেও দেখা গেছে- তখন সেই ‘বাংলা ভাষাই’ আন্তে আন্তে হয়ে উঠেছে ক্ষমতাবানের ভাষা এবং তাকে হাতিয়ার করে চট্টগ্রামসহ অন্যান্য প্রান্তিক ভাষার ওপর নেমে এসেছে দমন পীড়ন। ক্ষমতা(হেজমনি), বাংলা ভাষা এবং অন্যান্য আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যগুলি মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছে, এখনও করছে। শুধু বাংলাদেশ না তা ভারতবর্ষ সহ গোটা পৃথিবীর ভাষার ধারাবাহিক ইতিহাসের নিরিখে জ্বলন্ত সত্য। সুতরাং শুধু বাংলাভাষা নয়, যেকোন ভাষাগোষ্ঠী যখনই মাতৃভাষার অধিকার নিয়ে লড়াই করেছে এবং করবে, সেই নিরন্তর লড়াইয়ের স্পৃহাই এই উপন্যাসের উপজীব্য। এই কৃতিত্ব অবশ্যই লেখকের। বুদ্ধর-ভাষা অবস্থানের উত্তরাধিকার সূত্রে এই উপন্যাসকে আমরা পড়ব।

এতক্ষণ ধরে, জাতীয়তাবাদ, বাঙালি, মেয়ে, পুরুষ ইত্যাদি আত্মপরিচয়কে নির্মাণের রাজনীতি আমরা খেয়াল করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, পাশ্চাত্য নির্মিত, ম্যানিউপুলেটিভ, পীতাতঙ্ক-প্রকল্প। উপনিবেশ-প্রীতি থেকে তা সরাসরি বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। গোটা পৃথিবীতে, পীতাতঙ্কের সঙ্গে বুদ্ধ-বৌদ্ধ এবং প্রাচ্যকে ‘হীন ও অপর-অপরাধপ্রবণ’ করে তোলার প্রকল্প, দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণ এবং জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনায় যাবো।

তথ্যসূত্র

- ১। ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতকে পুরাতত্ত্ব, *জাতক*, ২য় খণ্ড, পৃ ২৩-২৪,
- ২। Mandakranta Bose (ed.), *Faces of the Feminine in Ancient, medieval, and Modern India*, Oxford University Press, New York, 2000, Page No. 71
- ৩। Peter Barry, *Beginning Theory*, Viva Books, third edition, New Delhi, 2017, Page No. 117
- ৪। বিনয় ঘোষ, *জনসভার সাহিত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৬২

- ৫। মুনমুন দাশগুপ্ত, *নারীর অধিকার রক্ষায় অগ্রণী তিনি*
(<https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/anurupa-devi-was-the-pioneer-of-protecting-women-rights-1.1057551>)
- ৬। দীপ্তি ত্রিপাঠী, *হে অনন্তপুণ্য (জীবকের বুদ্ধ-স্মৃতি কাহিনী)*, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ ১
- ৭। বাণী বসু, *মৈত্রেয় জাতক*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২, পৃ ৭
- ৮। অনুরূপা দেবী, *রামগড়*, এমারেন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১৩২৫ পৃ ১-৪
- ৯। Bimal Krishna Matilal, Jonardon Ganeri (ed.), *Mind, Language and World*, Oxford University Press, New Delhi, 2002, Page No 284
- ১০। আশাপূর্ণা দেবী, *আর এক আশাপূর্ণা*, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ ২৫
- ১১। Susie Tharu and K. Lalitha, *Women Writing in India*, vol. I, Oxford University Press, New Delhi, 1995
- ১২। Mandakranta Bose (ed.), *Faces of the Feminine in Ancient, medieval, and Modern India*, Oxford University Press, New York, 2000, Page No. 297-298
- ১৩। অনুরূপা দেবী, *ত্রিবেণী*, এমারেন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা
- ১৪। ধর্মানন্দ কোসাম্বী, *ভগবান বুদ্ধ*, চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য (অনুবাদ), সাহিত্য আকাদেমি, ২০১২, পৃ ৪৮-৪৯
- ১৫। ভিক্ষু শীলভদ্র, *থেরীগাথা*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৭, পৃ ৬
- ১৬। Debiprasad Chattopadhyaya, *Religion and Society*, Aakar, Bangalore, 1987, 2003) Page No. 168
- ১৭। ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক-সমগ্র*, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩২৩-১৩৩৭
- ১৮। সেলিনা হোসেন, *নীল ময়ূরের যৌবন*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৯
- ১৯। নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭

পঞ্চম অধ্যায়

পীতাতঙ্ক : ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, আখ্যানের তথ্য-তত্ত্ব

উপনিবেশ এবং উত্তর-উপনিবেশ পর্বে (উপনিবেশের সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক আছে, সেকথা মনে রেখেই), জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যের একটি ধারার বেশিরভাগটাই ছিলো ইউরোপ প্রভাবিত। আমরা এই অধ্যায়ে, একটি ধারাকে বেছে নিয়েছি,- রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা ধর্মী বাংলা উপন্যাস; যার প্রতিবেশে আছে বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধ-উপাদান, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ, তাদের পরিচয়, বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত অঞ্চল, আমরা সেগুলির আলোচনা করবো।

সাম্প্রতিক কয়েকবছরে, বইমেলায় বা পূজাবার্ষিকীতে (বছরের অন্যান্য সময়েও) প্রকাশিত গোয়েন্দা উপন্যাসগুলি লক্ষ্য করলে দেখবো বেশিরভাগের কেন্দ্রে আছে, বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত কিছু উপকরণের (পুথি, মূর্তি) হারানো বা উদ্ধার বিষয়ক সমস্যা, বা সেই সংক্রান্ত কোনো রহস্যের (অপহরণ, চুরি, খুন ইত্যাদি) উন্মোচন বা উদ্ঘাটন। আর তার প্রেক্ষাপট দেশ-বিদেশের বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত অঞ্চল বা মঠ (দেশের পার্বত্য-উত্তরাঞ্চল, তিব্বত, চীন, মায়ানমার ইত্যাদি)। যেমন ১৪২৬ সালের আনন্দমেলায় সমরেশ বসুর একটি গল্প, *কাইরং মঠে গোগোলের কাণ্ড* ছবির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৪২০ পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলায় হিমাদ্রীকিশোর দাশগুপ্তর *বরফ দেশের ছায়ামানুষ* এছাড়াও আছে তার আগে, *হেরুক* (২০১০), *ঈশ্বর যখন বন্দী* (২০১৬); চৌথুপীর চর্যাপদ (২০১৭) ইত্যাদি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই ধরণটি ধারাবাহিকভাবে বহুল জনপ্রিয়।

কিন্তু এই ধারার সূত্রপাত এই কয়েকবছরে নয়। তার বহু আগেই। আমরা কতকগুলি প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো এই অধ্যায়ে, তাই প্রয়োজন অনুযায়ী কতকগুলি মাত্র উদাহরণ ব্যবহার করাই সম্ভব হবে। এছাড়াও অনেক বাংলা উপন্যাস গল্প লিখিত হয়েছে, হয়ে চলেছে।

বাংলা-সাহিত্যে এই ধারা আছে ঔপনিবেশিক কাল থেকেই এবং তার সূত্রপাত ইউরোপের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই হয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে, এর ধারণা, ইতিহাস ও রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করবো।

(১)

আমরা ইউরোপ ও উপনিবেশের প্রভাবের কথা বলছিলাম। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার আগেই, ভারতের নিজস্ব মর্যাদা আদায়ের জন্য, তার নিজস্ব পরিচিতিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতই, সার্বিকভাবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-ছবি-শিল্প-কৃষি-সাহিত্য-কলা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমুখীভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীন সত্তার বিকাশের কথা বলেছিলেন। অন্যান্যদেরও উৎসাহিত করেছিলেন এই স্বতন্ত্রধারাকে খুঁজতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই(যেগুলি উপনিবেশ ছিল) উত্তর উপনিবেশ পর্বে, ঔপনিবেশিককালেই শেখা চিন্তাপ্রণালীকে ব্যবহার করে, এবং নিজস্ব ধারাকে মিলিয়ে, ‘স্বাধীন সত্তা’ নির্মাণের চেষ্টা করেছে। স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা ইউরোপকেন্দ্রিক, ইউরোপের মুখাপেক্ষি, তাদের মহত্বেরই আরেকধরনের প্রশস্তি মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র-পরিচিতি ভুলে ‘স্বাধীন সত্তার’ ছায়ায় ইউরোপের ভাবনারই প্রসার ও বিকাশ ঘটানো হয়, সচেতন বা অবচেতনে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পদ্ধতিতে। আমরা বাংলা উপন্যাসের যে ধারাটি নিয়ে এখন কথা বলবো সেটি এই মতের দ্বারাই পুষ্ট।

উত্তর-ঔপনিবেশিক চর্চার ধারায় সাহিত্যে এর প্রভাবকে দুভাবে চিহ্নিত করতে চাওয়া হয়েছে। তাঁরা এক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন- adopt, adapt , adept।^১ প্রথমটির বাংলা করেছি ‘অবলম্বন বা গ্রহণ’; দ্বিতীয়টির বাংলা করেছি ‘অভিযোজন’ যাকে খাপ খাওয়ানো হয়েছে; তৃতীয়টি ‘দক্ষ’, যাকে মৌলিক(মানের তারতম্য আছে) বলেই প্রায় মান্যতা দিতে হয়, এই পর্যায়ে আলাদা করে তার ক্রমকে চেনা যায়না, অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর। আমরা সাম্প্রতিক কয়েকবছরের উপন্যাসগুলির নাম একটু আগেই বলেছি, তা তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত। রহস্য-রোমাঞ্চ বা গোয়েন্দা গল্পের মান্য ও জনপ্রিয় ধারার সূত্রপাত মূলত ইউরোপীয় প্রভাবেই। ফলে আদর্শ, বর্ণ, রূপ, লিঙ্গ, উপস্থাপনা,

আভিজাত্য, জাতীয়তাবাদ, নায়ক-নায়িকা, দুর্জন বা বিরোধী (ভিলেন) ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে ইউরোপীয় মাপকাঠি ‘গৃহীত’ হয়েছে, সেগুলিই মূল ভিত্তি তৈরি করেছে। পরে সেই ভাবনারই পরবর্তী স্তর হিসেবে ভারতীয় প্রেক্ষাপট বা পটভূমিতে তা অভিযোজিত হয়েছে। পরবর্তী লেখাগুলি পড়তে গেলে ক্রমানুযায়ী আর আমাদের অচেনা লাগেনা! এই ধারায় জনপ্রিয় সাহিত্যের পাঠক অভ্যস্ত। তা সত্ত্বেও বাজার বারবার তাকে নতুন প্রমাণ করতে চায়, চমক দিতে চায়। বাজারের নিয়মই তাই অন্তত মোড়ক নতুন হওয়া চাই বা নতুন বলে ভ্রম উৎপাদনকারী হওয়া চাই; ক্রেতাকে ‘নতুনের’ নেশা ধরানো না গেলে মোবাইল, ফ্যাশান দ্রব্য ইত্যাদির মতোই বই-পণ্যকেও বিক্রি করা মুশকিল!

গোয়েন্দা গল্পের উদ্ভব আধুনিক সময়ে এ নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়। গোয়েন্দা এই বিশেষ ‘পদে’র উদ্ভবই আধুনিক অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। পুঁজিবাদ এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা ছাড়া আধুনিক গোয়েন্দার উদ্ভব বা নির্মাণ অসম্ভব। যেসব গোয়েন্দা গল্প লিখিত হয়েছে, তাতে মূলত একজন সর্বগুণসম্পন্ন ‘নায়ক’(হ্যাঁ আধুনিক অন্যান্য সাহিত্য ধারায় ‘নায়ক-ভাবনা’ বিবর্তিত হচ্ছিল কিন্তু গোয়েন্দা গল্পের ‘কেন্দ্রীয় চরিত্র’ ‘নায়কোচিতই’) থাকে। তার সহচর বা সহচরী সাধারণত মূল গোয়েন্দার তুলনায় অল্প মেধার, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সহচর বা সহচরীই সেই ‘মহাত্ম্যব্যঞ্জক’ গল্পের কথক। ব্যতিক্রম আছে।

ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই গোয়েন্দার উদ্ভব; ফলত ব্যক্তিগত ভাবে উপযুক্ত অর্থমূল্যের বিনিময়ে তার কাছে পরিষেবা আদায় করা হয়, সব ক্ষেত্রেই সরকারী পরিষেবার সমান্তরালে তা চলে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী পরিষেবার অক্ষমতাকে বোঝানো হয় বা ব্যঙ্গ করা হয়। কখনও কখনও সরকারীভাবেও গোয়েন্দার পরিষেবা চাওয়া হয়ে থাকে, তার মাধ্যমেও আসলে সরকারের অক্ষমতাই প্রকট করা হয়। বেসরকারী গোয়েন্দার পাশাপাশি যেসব সরকারী কর্মচারীরা থাকেন তারা রূপে-গুণে সব ক্ষেত্রেই আখ্যানের মূল চরিত্রের চেয়ে হীনতর। দোষীরা মূলত প্রশাসনিকভাবে নির্দিষ্ট অপরাধ করে, তার শাস্তি পায়; বা নৈতিক অপরাধ করে যা প্রশাসনের চোখে

ঠিক অপরাধ নাও হতে পারে, তার শাস্তি হয় অনুশোচনায় বা স্বীকারোক্তিতে। উল্লিখিতগুলি ছাড়াও বহু দিক এবং ধরনের কথা আলোচনা করা যায়, অনেক বিশেষজ্ঞরা দেশ বিদেশে এনিয়ে বহু আলোচনাও করেছেন। আমরা গোয়েন্দা গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করবো না, আমাদের আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় অংশগুলি উল্লেখ করেছি। এবার সরাসরি বিষয়ে চলে যাবো।

গোটা পৃথিবীজুড়েই জাতি-বর্ণ-দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ‘ম্যানিউপুলেটেড বৈষম্যের’ ছাপ সাহিত্যে পড়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যেই বসবাস হওয়া সত্যেও আমরা নাগরিক মান্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এদের ‘অপর’ করে রেখেছি। এদের চলতি নাম ‘চিকি’ বা চাইনিজ বা ‘নেপালি’ (বর্তমানে নাম- ‘কোরোনা ভাইরাস’); যদিও এঁরা পুরোদস্তুর ভারতীয় নাগরিক। কোনো রকম মিডিয়াতে এদেরকে আমরা ভারতীয় চরিত্র হিসেবে দেখতে এবং দেখাতে অভ্যস্ত নই। আমাদের মান্য-জনপ্রিয় সিনেমা, সিরিয়াল কাহিনি গল্পে এরা নেই। অথচ আমাদের সহপাঠী, সহকর্মী, সহ-নাগরিক সব অর্থেই এরা আছে।

কিন্তু গোয়েন্দা গল্পেই এদের দেখা মেলে, বা যদি কখনও কোনো গল্পের প্রেক্ষাপট পূর্বদিকের দেশের এবং বিদেশের) ভূখণ্ডে দেখানো হয়, তাহলেই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এদের চরিত্রায়ণে ‘অপর’ করে দেখানোটাই অলিখিত নিয়ম। সাধারণ মানসে বৌদ্ধ বললেই যে মানুষগুলির ছবি ভেসে ওঠে তারা এরাই! যদিও বাস্তবে অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মানুষও বৌদ্ধ হতে পারেন। আগের অধ্যায়ে আলোচিত উপন্যাসে আমরা এই প্রবণতা পাই না। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও একটি ‘অপরতা’র দৃষ্টিভঙ্গি আছে তা আগেই আলোচিত। এই ‘অপরের’ ধারণা খুব যে নির্বিবাদি তা কিন্তু নয়। ‘অপর’ থেকে জাত একটি আশঙ্কাকে রাষ্ট্র জিইয়ে রাখে, তাকে ‘হীন এবং আশঙ্কায়ুক্ত’ বলে চিহ্নিত করে। স্বাভাবিক ভাবেই তা নাগরিক ঐক্যতার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর এবং ডিভাইড অ্যান্ড রুল(বিভাজন এবং শোষণের) নীতির পক্ষে সহায়ক। যদি বলি সাধারণ মানসের এই গোটা ধারণাটি ইউরোপ অনুসারী বা প্রভাবিত তাহলে খুব একটা ভুল বলা হবেনা, কারণ এর সূত্রপাত উপনিবেশ-কালেই।

(২)

বৌদ্ধধর্মকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেও জাতীয়তাবাদী উপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখা হয়েছে এবং তার ধরণ-বিবর্তন নিয়ে আমরা আগের অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এই ধরণের উপন্যাসগুলি দেশ, জাতি, ভাষা-সম্পর্কিত আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে কীভাবে ব্যবহৃত হয় সেকথাও বলা হয়েছে। গোয়েন্দা গল্পগুলিও আধুনিক সময়ে দেশের এবং জাতির গৌরবের জন্যই ব্যবহার করা হয়। যদিও একই সঙ্গে এতে দেখানো হয় সেই দেশে কতধরণের ‘ক্রাইম বা অপরাধ’ আছে, যেমন- সাংগঠনিক, ব্যক্তিগত, নৈতিক বা মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত, ভ্রষ্টাচার বা কোরাপশন জনিত, দুর্ঘটনা বা নানা ধরণের বিপর্যয় জনিত ইত্যাদি। কিন্তু এর মাধ্যমে একইসঙ্গে সুরক্ষা বিষয়ক আশঙ্কা, যেমন পাঠক বা দর্শক সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়, তেমনি, তাদের আশ্বস্তও করা হয় যে, এর নির্মূল করা সম্ভব, সরকারী প্রশাসন বা বেসরকারী ‘নায়কোচিত’ গোয়েন্দাদের মাধ্যমে। আশ্বস্ত করার ভাবই শেষ পর্যন্ত প্রতিপাদ্য। উদ্দেশ্য সম্পর্কে জেমসন বলছেন-

যেন বা কিছু সমস্যা আছে বটে কিন্তু তবুও আমরা মহান দেশে বসবাস করছি। শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যাওয়া, দোষীর শাস্তি পাওয়া, বিপর্যয় বাস্তবকে পুনরুৎপাদিত (রিস্টোর) করে।^২

রাষ্ট্রের স্থিতিবস্থার বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে শেষপর্যন্ত ‘দুষ্টির দমন শিষ্টের পালন’ই হয়, প্রকারান্তরে তা রাষ্ট্রের বা প্রশাসনের গুণকীর্তনই। একক, বেসরকারী গোয়েন্দা তার ‘বীরত্বের’ দ্বারা অপরাধ ও অপরাধীদের দমন করলেও অপরাধীর, শাস্তি, রাষ্ট্রের আইনী পদ্ধতিতেই হয় (নইলে অপরাধী আত্মহত্যা করে, সেটিও শাস্তিই বা অপরাধ/অপরাধী মুক্তিই। আত্মহত্যাকেও ব্যাখ্যা করা যায়। আপাতত করছি না।) গোয়েন্দা গল্প বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রদর্শনেরই (হেজিমনি) বর্ণনা ও বিস্তার করে, যেন বা সমস্ত কিছুর ওপরেই রাষ্ট্রের নজর আছে, এবং দেশের বা জাতির ওপর যেকোনো ধরণের থ্রেট বা আশঙ্কাকে শক্ত হাতে দমন করা হয়, বা প্রশাসন দমন করতে সক্ষম, সরকারি বা বেসরকারি যে পদ্ধতিতেই হোক!

দেশ বা জাতির অস্তিত্ব যে প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কাজনক এটি অত্যন্ত সচেতনভাবে, অনবরত জিইয়ে রাখে রাষ্ট্র, দেশবাসীর মনে, মস্তিষ্কে; যেন রাষ্ট্রের ওপর যেনতেনপ্রকারে জনগণের আস্থা বজায় থাকে। তার ফলে প্রশাসনের হাতে, সুরক্ষাখাতে একটি বড় মাপের বাজেট এবং ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখা যায়, জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হলেও প্রশাসনিক ব্যয় ও ক্ষমতার দোহাই দিয়ে পার পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের নজরদারিকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা যায়; জনগণকে বোঝানো যায়, তাদের ব্যক্তিগত পরিচয়, স্বাধীনসত্তা, আঙুলের ছাপ, রেটিনার ছাপ, নানান পরিচয়পত্র আসলে জনগণের রক্ষার্থেই রাষ্ট্রের সম্পত্তি, বা রাষ্ট্রের কাছে জামিন রাখতে হবে!

যদিও বাস্তবে এই পদ্ধতি জনগণের স্বাধীন সত্তা, আত্মসম্মান বিরোধী। রাষ্ট্র, জনগণের ভ্রমের সুযোগ নিয়ে, নিজের সুবিধে অনুযায়ী শত্রু এবং মিত্রের নির্বাচন করে; এবং রাষ্ট্রের মতের পক্ষে, বেশিরভাগ জনসাধারণের সহানুভূতি বা একানুভূতিকে ‘ম্যানুফ্যাকচার’(বানিয়ে তোলা) করে। যার প্রভাব পড়ে সরাসরি নির্বাচনী (ভোট) প্রক্রিয়ায়। এই পদ্ধতি কোনোভাবেই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। মিশেল ফুকোর একটি মন্তব্যকে আমরা উল্লেখ করবো-

We deprive it of a crucial means of disciplining all of us. This suggestion is fraught with danger vigilantism is one possible outcome- but it might also offer a glance into.^৩

আমাদের এতক্ষণের আলোচনার যোগ আমাদের বিষয়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হবে।

আখ্যানের সঙ্গে সহানুভূতি এবং একানুভূতির যোগ সুগভীর। আখ্যানের কথনের মূল উদ্দেশ্যই হল একানুভূতি তৈরি করা। যদি সেই আখ্যানে দুটি পক্ষ থাকে- তাহলে প্রায় একই গল্প নিয়ে বাল্মীকি, কৃত্তিবাসের কথনপ্রক্রিয়া একানুভূতি এবং সহানুভূতিকে রামের পক্ষে এবং রাবণের বিপক্ষে চালিত করে; আর মধুসূদন, রাবণ, মেঘনাদের পক্ষে চালিত করে। ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তাই ঘটে। আমাদের আলোচ্য গোয়েন্দা গল্পেও তাই। আগে আলোচ্য উপন্যাসেও তাই। তার রীতি, মাত্রা, ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হয় মাত্র। সহানুভূতি, একানুভূতি এবং আখ্যানের সম্পর্ক নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বে অনেক

আলোচনা হয়েছে। আমরা সেই আলোচনার পুনর্বিবরণ দিচ্ছি। তবে আখ্যানে সহানুভূতি এবং একানুভূতি দুইই থাকে - বিষয় পক্ষ, জাতি, বর্ণ, চরিত্র অনুযায়ী চালিত হয় বিশেষ বিশেষ প্রেক্ষিত এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী।

সহানুভূতি এবং একানুভূতি কার পক্ষে বা বিপক্ষে যাবে তার সঙ্গে যোগ আছে ক্ষমতার রাজনীতির, রাষ্ট্রের। আমাদের মধ্যে যুগ যুগ ধরে লালিত যে ‘মান্য’ বিভাজন, সচেতন ও অবচেতনে আমরা বহন করি- বৃত্তি, শ্রেণি, জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাই এর সহায়ক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। জনপ্রিয় সাহিত্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে প্রশ্ন বা সংশয় করতে, আমাদের ভাবিয়ে তুলতে সাহায্য করে না। সেগুলিকেই মান্যতা দিয়ে আমাদের ‘অগভীর’ভাবে ‘ইচ্ছেপূরণ’ ঘটায়। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেনা। কারণ ঐক্যবদ্ধ দেশবাসী রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে প্রশ্ন করে। ব্যতিক্রম আছে কিন্তু তা সাধারণত দেখা যায় না।

মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত পাঠক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাহিত্যে বা শিল্পকলায় বিলাস এবং বিনোদনের আকাঙ্ক্ষা করে, ভাবনার খোরাক সে খুব বেশি চায় না। ফলে সাহিত্যের, বিশেষত গল্প উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা মেটানো হয়, শুধু তাই নয়, চাহিদা কে নির্মাণ করা হয় (বাজার এখন শুধু চাহিদা-যোগানের হিসেবে বিক্রি করে না, সে চাহিদাকেও তৈরি করে, যোগানকে প্রভাবিত করে, তা এখন আর সম্পূর্ণত উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল নয়); পাঠক দর্শককে ম্যানুপুলেট (নিজের মতানুযায়ী প্রভাবিত করা/ ভাবিয়ে তোলা) করা হয়। সাধারণ পাঠক, কঠিন ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি, সত্য-তথ্য নির্ভর ‘নীরস’ লেখা পড়তে চায় না, গল্পের মধ্যে দিয়ে তার তথ্যের, ভাবনার, ইতিহাসের চাহিদা মেটাতে চায়। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গল্পকে তার কল্পনা থেকে চ্যুত করে, সত্য হিসেবে মানতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বর্তমান সময়ে বইয়ের পাতার থেকেও এই গোটা প্রক্রিয়াকে আরও সুচারু ও সুষ্ঠু করেছে টেলিভিশন বা অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যম। মিডিয়াও তাদের তথ্য না দিয়ে ‘গল্প

দেয়'। গোটা মাধ্যম-পদ্ধতিকে, রাষ্ট্র, বা ক্ষমতার যন্ত্র, দক্ষতার সঙ্গে নিজের মতের সপক্ষে ব্যবহার করে।

অন্যান্য আখ্যানের মতই গোয়ান্দা গল্পেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় চরিত্র পুরুষ। আগে নায়কের 'নায়কত্ব' প্রকাশিত হত বীররসের কাব্যে, যুদ্ধকাব্যে। তার রূপ-গুণের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য, অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে তুলনায়, অস্ত্রের দক্ষতায়, প্রতিষ্ঠিত হত। ভিলেন(দুর্জন) সবদিক থেকে হীন প্রমাণিত হত। গোয়েন্দা গল্পেও তাই। শুধু যুদ্ধটা মাথার সঙ্গে মাথার। অন্যান্য আধুনিক অস্ত্র(বন্দুক ইত্যাদি) থাকলেও মূলত মগজাস্ত্র(শব্দটি নিঃসন্দেহে চেনা)। নায়ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হতেন রাজা, রাজা জয়ী হলে মাহাত্ম্য তার রাজ্যের, তার জাতির, তার ধর্মের, তার লিঙ্গের... আর গোয়েন্দার মাহাত্ম্যতেও জয় তার দেশের, জাতির, বর্ণের, লিঙ্গের...

আমরা কীধরণের গোয়েন্দাগল্পগুলিকে বেছে নিয়েছি তা আগেই বলেছি। আমাদের আলোচনায় যে গোয়েন্দারা আসবে, যেমন - গোয়েন্দা ব্লেক, খোদ ব্রিটিশ, কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ নয়, বাঙালি অনুবাদে সরাসরি একে হাজির করেছেন দীনেন্দ্রকুমার রায়; তাঁর একাধিক উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করবো। এছাড়াও উপন্যাসগুলি- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মরণের ডঙ্কা বাজে*; প্রেমেন্দ্র মিত্রের *মামাবাবু সিরিজের- কুহকের দেশে*; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *কাকাবাবু সিরিজের- কাকাবাবু ও বজ্রলামা*; হেমেন্দ্রকুমার রায়ের *পদ্মরাগ বুদ্ধ*; *ড্রাগন সিরিজ*; সমরেশ বসুর *কাইরং মঠে গোগোলের কাণ্ড*; সত্যজিত রায়ের *ফেলুদা সিরিজের গ্যাঙটকে গভোগোল* ও অন্যান্য উপন্যাস, হিমাদ্রীকিশোর দাশগুপ্তের *বরফদেশের ছায়ামানুষ* ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন উদাহরণ প্রেক্ষিত অনুযায়ী ব্যবহার করবো।

এছাড়াও আমাদের আলোচনায় আছে কিছু মেয়ে-গোয়েন্দা চরিত্রও, তা আগেই বলেছি। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণা সিরিজের কৃষ্ণা, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন মাসী, দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের *ঈশ্বর যখন বন্দী* উপন্যাসে রুদ্র, প্রীতম বসুর *চৌথুপীর চর্যাপদের* যোজনগন্ধা(গোয়েন্দা নয়, কেন্দ্রীয় চরিত্র)।

খেয়াল করে দেখবো প্রত্যেক গোয়ান্দা (সাধারণত) পুরুষ, বীর, দৈহিক ও মানসিক বলে অপরাজেয়, লম্বা, চওড়া, গৌরবর্ণ সুপুরুষ ‘নায়ক’ এবং হিন্দু(কখনও কখনও প্রায় ঘোষিত ভাবে)। কিরীটি রায়ের বর্ণনা-

প্রায় সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা, মাথা-ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ব্যাকব্রাশ করা।^৪

জয়ন্ত-মাণিক জুটির। জয়ন্তের বর্ণনাও তাই।

ব্যোমকেশ-

গায়ের রঙ ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,- মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে। (সত্যান্বেষী)^৫

ফেলুদা, শারীরিক বর্ণনা প্রায় অনুরূপ, এছাড়াও-

...আমি কিন্তু জানি ওই বয়সে ফেলুদার মতো বুদ্ধি খুব কম লোকের হয়।...তা ছাড়া ও ভাল ক্রিকেট জানে, প্রায় একশো রকম ইনডোর গেম বা ঘরে বসে খেলা জানে, তাসের ম্যাজিক জানে, একটু একটু হিপ্পনটিজম জানে, ডান হাত আর বাঁ হাত দুহাতেই লিখতে জানে। আর ও যখন স্কুলে পড়ত তখনই ওর মেমরি এত ভাল ছিল যে ও দুবার রিডিং পড়েই পুরো ‘দেবতার গ্রাস’ মুখস্ত করেছিল।

কিন্তু ফেলুদার যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য ক্ষমতা, সেটি হল- ও বিলিতি বই পড়ে আর নিজের বুদ্ধিতে দারুণ ডিটেক্টিভের কাজ শিখে নিয়েছে। ...ও হল যাকে বলে শেখের ডিটেক্টিভ। (বাদশাহী আংটি)^৬

এই বিলিতি বই এবং ‘নিজের বুদ্ধি’ এই শব্দটি ফেলুদার স্রষ্টার পক্ষেও খাটে। আমরা যখন গল্প নিয়ে আলোচনা করবো তখন আমাদের মন্তব্য ব্যাখ্যা করবো। প্রায় বাংলা সাহিত্যের সব গোয়েন্দাই এমনি ‘অসাধারণ- নায়ক’।

শুধুমাত্র দৈহিক বর্ণনায় মামাবাবু এবং কাকাবাবু তা নয়। কাকাবাবু প্রতিবন্ধী! কিন্তু কাকাবাবুর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি ‘সুপুরুষ নায়ক’ই; সাধারণ নন, বাস্তবের প্রতিবন্ধীসুলভ তো একেবারেই নন। আর মামাবাবু অলস, খর্বাকার, স্থূলকায়, ‘আরাম-খাদ্য-ঘুমপ্রিয়-আদর্শ বাঙালি মধ্যবিত্ত’। অবশ্যই ‘গোয়েন্দার’র রূপবর্ণনাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভেঙেছেন, বিদেশীদের ছাঁদে নয় বরং বাঙালির মতোই তার রূপ। এর কৃতিত্ব অবশ্যই প্রেমেন্দ্র মিত্রের। কিন্তু মামাবাবুর এই বর্ণনা এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়া

প্রতিক্রিয়ার আলস্য বর্ণনা, সবই সমস্যা এবং সমাধানের ঘটনার আগে ও পরে। তার দৈহিক স্থূলতা বা আরামপ্রিয়তা কিছুই তার অভিযানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। অনায়াসে পাহাড় চড়া, দড়ি বেয়ে অতল খাদে নামা, সুড়ঙ্গে প্রবেশ ইত্যাদি সে গল্পের প্রয়োজনে করে থাকে। যেটা বাস্তবে অকল্পনীয়, আখ্যানে বলেই সম্ভব! সুতরাং গল্পগুলি প্রায় সবই ‘পপুলার’, ‘ম্যানিপুলেটিভ’, ‘হেটেরোনরম্যাটিভ’(যেখানে হেটেরোসেক্সুয়ালিটিকেই একমাত্র, সঠিক, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, মানবিক ধরণ হিসেবে প্রচার করা হয়।) ধরণ ও ধারণাকেই প্রসারিত করে। ‘নায়কের’ ধারণাকেই আদর্শায়িত করা হয়।

এমনকি মেয়ে গোয়েন্দা চরিত্রগুলিও তাই। উদাহরণ আমরা গল্পগুলি আলোচনার সময় দেবো; আপাতত বলে রাখি- মেয়ে গোয়েন্দারাও ‘পুরুষালি’(এই শব্দটিকে, লেখকরা গুণ বলে মনে করেছেন; ‘মেয়েলি’ তাদের কাছে নেতিবাচক)। একই সঙ্গে মেয়েদের যে ‘চিরন্তন নারীকল্প’ তারও অনুসারী। নারীত্বের সৌন্দর্যের মিশ্রণ তার মধ্যে সচেতনভাবে করা আছে। এরা ‘নারীত্ব’ এবং পৌরুষত্বের মিশ্রণ। একগামিতা, সতীত্বের পরাকাষ্ঠা, সৌন্দর্যের চিরন্তনতায় ভূষিতা, আদর্শ কন্যা-স্ত্রী-মাতা, সংস্কৃতি-জাতীয়তাবাদ-ঐতিহ্য-হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ অনুগামিনী, ‘সীমাবদ্ধ স্বাধীনতায়ুক্ত আধুনিকা’, মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং পেশার সঙ্গে যুক্ত। এগুলোই বর্ণিত হয় প্রায় প্রচারের ধরণে, বাকি আর যা কিছু সেগুলিকে ‘আদারাইজ/অপর’ বা ‘হীন’ করে ব্যাখ্যা হয়। আমরা আগের অধ্যায়ে যখন মেয়েদের লেখা অন্যান্য উপন্যাস নিয়ে কথা বলেছি সেখানে বিস্তৃত ভাবে মেয়ে চরিত্রদের নির্মাণ ও তার রাজনীতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এখানে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দেবারতি মুখোপাধ্যায়, প্রীতম বসু প্রত্যেকে সেই ভাবনারই উত্তরাধিকার বহন করেছেন। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্র গুলিও ঠিক তাই।

উল্লেখ করেছি, যে এর সূত্রপাত ইউরোপের হাত ধরে বাংলা উপন্যাসে হয়েছে। সাম্প্রতিককালে আমাদের আশেপাশে জনপ্রিয় সিনেমা এবং সিরিয়ালের ধারায় তিনটি ধরণের খুবই বাড়বাড়ন্ত- এক, হিন্দুপ্রধান জাতীয়তাবাদী ইতিহাস (কল্পইতিহাস) নির্ভর আখ্যান; দুই, হিন্দু দেবদেবী নির্ভর আখ্যান এবং তিন, গোয়েন্দা গল্প। কিন্তু এই সময়ে তাদের সূত্রপাত নয় বিশেষ বিশেষ সময়ে এগুলি বারবার

নির্মিত হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা, আলোচনা করেছি। জাতীয়তাবাদের প্রসার যখনই ঘটাতে চাওয়া হয় তখনই এই ধরণগুলি, *স্কুল হাতে ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে ব্যবহৃত-ব্যবহৃত- হতে থাকে।* (আদিম দেবতারা, মহাপৃথিবী)^৭

(৩)

বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধদের ব্যবহার করে লেখা গোয়েন্দা গল্পে ‘বিশেষ আত্মপরিচয়ের’ প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ভারতবর্ষে হয়েছিল, একথা খোদ ভারতবর্ষেই, ভারতবাসীর কাছে, উনিশ শতকে রীতিমত তথ্য প্রমাণ দিয়ে হাজির করতে হয়েছিলো। তার শেষ ছাপ-চিহ্ন গুলি নিয়ে গবেষণা করার দরকার হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রচলিত, আমাদের পূর্বে উল্লিখিত দেশগুলিতে(পূর্বের পার্বত্যঞ্চলগুলি, চীন জাপান, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, সুমাত্রা, জাভা শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি) তার প্রাধান্য একটু বেশি।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী ভাবে যুক্ত করা হত বা হয় ‘হলুদ চামড়া, ছোটো চোখ, চ্যাপ্টা নাক’ এর মানুষগুলির দৈহিক, নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি। বৌদ্ধ বলতেই সাধারণ মানসে যে ছবিটি ফুটে ওঠা, তা এরকম। আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি- কবে কখন কেন কীভাবে এই ছবিটি আমাদের মনে ছাপ সৃষ্টি করেছে? অথচ বাস্তবে ধর্মের সঙ্গে চেহারার ছাপ মেলানো কষ্টকর! হিন্দু মানে টিকি-তিলক, মুসলমান মানে টুপি-দাড়ি, বৌদ্ধদের ‘হলুদ চামড়া, ছোটো চোখ, চ্যাপ্টা নাক’ ইত্যাদি হিসেবে চিহ্নিত করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা যে বিভেদের রাজনীতি প্রসূত তা বলার অপেক্ষা রাখেনা, অথচ আমরা জানি চেহারা আর ধর্মের মধ্যে যোগ নেই, অন্তত না থাকাটাই কাজিতও।

আখ্যানে এই ‘বিশেষ বৌদ্ধরা’ কখনো ‘বেনেভোলেন্ট’ লামা বা ব্যক্তি; কখনো ভীষণ নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। ‘বেনেভোলেন্ট লামার’ চরিত্রায়ণ অনেকখানি রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তা আগে বলেছি। গোয়েন্দা গল্পেও এদের উপস্থিতি এই দুধরণেরই; শেষোক্ত ধরণটির উপস্থিতিই বেশি; জনপ্রিয়। আমরা এই ধরণের আখ্যান নিয়েই আলোচনা করবো। বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসগুলি

আলোচনার আগে আমরা চলে যাবো ইউরোপে এর স্বরূপ সন্ধানে। বলা বাহুল্য এই আলোচনাটি আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে ভীষণ রকম প্রযোজ্য। একে বাদ দিয়ে আমরা বাংলা সাহিত্য আলোচনায় অগ্রসর হতে পারবো না। তাই আমরা সবিনয়ে জানাচ্ছি, পাঠকের একটু বিবেচনা নির্ভর ধৈর্য প্রয়োজন।

(৪)

ইউরোপের উদ্ভূত দুটি শব্দবন্ধের সঙ্গে এর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক- ‘ইয়েলো পেরিল’/ ‘ইয়েলো টেরর’/ ‘ইয়েলো স্পেকটর’ এবং চাইনাম্যান। বিশ শতকেই প্রথমটির বাংলা করা হয় ‘পীতাতঙ্ক’ এবং দ্বিতীয়টির ‘চীনেম্যান’। বাংলা সাহিত্যে সরাসরি এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও খেয়াল করবো, এই উপন্যাসগুলিতে, বাংলা, অ্যাকাডেমিক, ‘চৈনিক’(জ্ঞানী, শ্রমণ, পর্যটক, কবি) শব্দটি, আস্তে আস্তে, চীনেম্যান, চীনা, চীনেটা হয়ে উঠছে; অবজ্ঞা, সন্দেহ, হীনতা, অপরতাকে- উচ্চারণে জীইয়ে রেখে। আমরা একটু পরে সেই আলোচনায় যাচ্ছি আপাতত, ইউরোপে পীতাতঙ্কের স্বরূপ আলোচনা করবো। যা মূলত ইতিহাস এবং তথ্য নির্ভর।

আঠারো শতাব্দীর শেষে এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে এর সূত্রপাত হয়েছিল। পীতাতঙ্কের সূত্রপাত মোটামুটিভাবে ধরা হয় গ্রেকো-পার্সিয়ান(৪৯৯ খ্রীঃ পূঃ- ৪৪৯ খ্রীঃপূঃ) যুদ্ধের সময় থেকেই। এশিয়ার লোকেদের কল্পনা করা হতে থাকে ‘বনমানুষ, না-মানুষ, আদিম-বর্বর, শিশুসুলভ, নিষ্ঠুর-পাগল, এবং যাদুশক্তির’ অধিকারী হিসেবে।^৮

এই ‘জেনোফোবিয়া’ই(‘অচেনা’- সম্পর্কে আতঙ্ক; বিশেষত ‘বিদেশ’ সম্পর্কে আশঙ্কা এবং ভয়) উনিশ শতকে পীতাতঙ্কের প্রায় ভিত্তিহীন উন্মেষ ঘটায়। পীতাতঙ্ক হল মূলত শ্বেতাঙ্গদের চিন জাপান সম্পর্কে আতঙ্ক। যারা কালো বা বাদামী, রেড-ইণ্ডিয়ান তারা তো শ্বেতাঙ্গদের কাছে ঘৃণ্যই, এই দেশের মানুষদের গাত্রবর্ণকে তারাই নাম দেয় ‘পীতাভ’ বলে, কারণ তাদেরও, ফর্সা গায়ের রঙ সুতরাং শ্বেতাঙ্গ শুধু তারাই, আর এরা হল ‘পীতাভ’। শুধু গাত্রবর্ণ নয় এর সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে ধর্মভীতিও। খ্রীষ্টধর্ম দ্রুতপ্রসারী বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, ফলে পীতাতঙ্কের সঙ্গে ছিল, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও বিদ্বেষ। তার

সঙ্গে সংস্কৃতি-দর্শন-সাহিত্য-স্থাপত্য-ছবি-সাহিত্য-সামরিক শক্তি হিসেবে প্রথমে জাপান পরে চীনের উত্থান তাদের আতঙ্কিত করে তোলে। সেখান থেকেই গোটা ‘পীতাতঙ্ক’-ভাবনার নির্মাণ এবং বিস্তার; সুচিন্তিত সুপারিকল্পিতভাবে।

যা তারা, তাদের উপনিবেশগুলিতেও ছড়িয়ে দেয়; এমন কি খোদ এশিয়ার মধ্যেও এশিয়ানদের সম্পর্কে বৈষম্য এবং বিদ্বেষই, পীতাতঙ্কের আরেক প্রবণতা। যার প্রভাব এখনো গভীর, সূত্রপাত বহু আগে। ‘জেনোফোবিয়া’র সঙ্গে পুঁজিবাদী আধুনিক অর্থনীতির ও রাজনীতির যোগ গভীর। মূলত যুদ্ধের নামে, দেশের সীমান্ত রক্ষার নামে এবং মাধ্যমে যে বিপুল পরিমাণ ব্যবসা তার মূল ভিত্তিই ‘জেনোফোবিয়া’। দেশবাসীকে যত বেশি তার প্রতিবেশী, বিদেশ সম্পর্কে আতঙ্কে রাখা যাবে তত তাদের আয়করের টাকা, মৌলিক চাহিদায় নয়, প্রতিরক্ষার নামে, যুদ্ধ-ব্যবসার নামে লাগানো যাবে।

ইউরোপ এবং আমেরিকার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- ১৮৮১ সালে ‘ট্রিটি অফ সেন্টপিটার্সবার্গ’ হয় রাশিয়া এবং চীনের কিং বংশের মধ্যে। তাতে ঠিক হয়, দাঙ্গান(১৮৬২-৭৭) বিপ্লবের সময় রাশিয়া ১৮৭১ সালে, ইলি নদীর পূর্ববর্তী অংশের অববাহিকার দখলিকৃত জমিগুলি তারা আবার চীনকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এই জমি ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই এবং দাঙ্গান (বিদ্রোহের) রিভোল্টের ফলস্বরূপ পাশ্চাত্য জনপ্রিয় মাধ্যমগুলিতে তারা, শ্বেতাঙ্গ এবং পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং চীন বা এশিয়া বিরোধী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়।^৯ যার মূল বক্তব্য ছিল পূর্ব মহাদেশ সম্পর্কে আতঙ্ক তৈরি করা। এতে বলা হয় পূর্বের দিকগুলির উন্নতি বা উন্মেষ যত ঘটবে তত পশ্চিমী শ্বেতাঙ্গজনগণের পক্ষে তা ক্ষতিকারক। ভিত্তিহীন এবং ব্যাপকভাবে প্রচার করা হতে থাকে যে এশিয়া মহাদেশ, পশ্চিমকে অধিকার করতে এবং ধ্বংস করতে উদ্যত, তার ফলে শ্বেতাঙ্গদের(যারা কী না সব থেকে উন্নততর জাতি, তাদেরই প্রচারে! নিজেরাই এই আখ্যানের নির্মাণকর্তা) দমিত বা বিজিত হতে হবে এই ‘হীন, হলুদ চামড়ার, না-মানুষ, নিষ্ঠুর, যাদুশক্তির অধিকারী, ছোটো চোখ এবং চ্যাপ্টা নাকের’ জাতির দ্বারা। যা

পাশ্চাত্যের কাছে, শ্বেতাঙ্গদের কাছে, অত্যন্ত অপমানজনক, অবমাননাকর লজ্জাজনক এবং ভয়ানক পরিণতি। কারণ পৃথিবীতে তারাই তো শ্রেষ্ঠ! ফলে কী করে এই হীনজাতির পদানত হবে!

আরেকটু বদল ঘটে রাজনীতিতে, যখন,- দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের পর লিঙ্কন এবং কিং রাজবংশের মধ্যে ‘বার্লিনগেন সন্ধি’ ১৮৬৮ সালে স্বাক্ষরিত হয়। তাতে আমেরিকা চীনকে ‘মোস্ট ফেভারড নেশন’ এর স্বীকৃতি দেয়। কারণ নতুন দেশ নির্মাণ, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদির আবহে তাদের সস্তা, কর্মঠ শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ছিল। ফলে চীনের শ্রমিকদের অবাধ আইনি প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় ক্যালিফোর্নিয়া এবং সমগ্র আমেরিকাতেই। কিন্তু এই সময় সামগ্রিকভাবে আমেরিকাতে মন্দার সূচনা হয়। এবং জনপ্রিয় ভাবনায় এর জন্য চীনের অনুপ্রবেশকেই দায়ী করে তোলা হয়। খেয়াল করে দেখবো এই সমস্ত আখ্যান আমাদের আশেপাশেও বিভিন্ন সময় তৈরি হয়েছে, হয়ে চলেছে, ভারতীয় রাজনীতিতেও। সেখানে মনে করানো হতে থাকে, চৈনিকদের জন্যই শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের চাকরির সুযোগ ব্যাহত হচ্ছে। শ্বেতাঙ্গরা নিজের দেশেই বঞ্চিত হচ্ছে। ১৮৭০ সালে নিউইয়র্ক ট্রিবিউনের সম্পাদক হোরাসি গ্রিলি একটি ‘ক্সেনোফোবিক’, জাতি-বৈষম্যমূলক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখেন। যাতে বলে হয়-

The Chinese are uncivilized, unclean, and filthy beyond all conception, without any of the higher domestic or social relations; lustful and sensual in their dispositions; every female is a prostitute of the basest order, the first word of English they learn are terms of obscenity or profanity, and beyond this they care to learn no more. Clannish in nature, they will not associate except with their own people...the Chinese quarter of the city is by-word for filth and sin. Pagan religion they know not the virtues of honesty, integrity or good faith, and in Court they never scruple to commit the most flagrant perjury.(New York Daily Tribune, September 29, 1854. page 4)^{১০}

এই খবর প্রকাশের পরেই(ফলস্বরূপ) ১৮৭১ সালে লস এঞ্জেলসে ৫০০ জন শ্বেতাঙ্গ মিলে ‘চাইনা টাউন ঘেটোতে’ ২০জন চৈনিক-শ্রমিকদের হত্যা করে, মবলিঞ্চিং, গণহত্যা... ^{১১}

এই পীতাতঙ্কের সূত্রপাত তারও আগে থেকে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে সোনার খনিগুলি আমেরিকায় আবিষ্কৃত হতে থাকে। ১৮৪৮-১৮৫৫ ‘ক্যালিফোর্নিয়া গোল্ড রাশ’এর সময়, প্রথম ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলরোড(১৮৬৩-৬৯) তৈরির সময় মূলত চৈনিক অভিযোজন বাড়তে থাকে, সস্তা শ্রমিক হিসেবে। প্রথমদিকে যখন সোনা সহজলভ্য ছিল তখন শ্বেতাঙ্গরা চৈনিকদের কোনোরকমে সহ্য করে নিচ্ছিল বটে, কারণ পরিশ্রমসাপ্য কাজগুলি তাদের দিয়ে করানো যাচ্ছিল। কিন্তু পরের দিকে তারা নগরের প্রান্তের কাজ কমে আসায় নগরের দিকে অভিযোজিত হতে থাকে, সেখানে বসবাস শুরু করে; বিভিন্ন দৈহিক শ্রম নির্ভর কাজে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই সময় থেকেই শ্বেতাঙ্গ জনগণের তাদের প্রতি জাতি-বিদ্বেষমূলক ক্ষোভের সূত্রপাত হয়।^{১২} তারপরের ঘটনা আগেই বলেছি।

১৮৭৫ সালে ‘পেজ অ্যাক্ট’ আইন হয় তাতে প্রথমে চৈনিক মহিলাদের প্রবেশাধিকার রদ করা হয়। মিশ্রবংশধর, বা সংকর-জাতি বিষয়ে আতঙ্কই তার কারণ। এবং তাতে কারণ হিসেবে বলা হয়- পূর্ব এশিয়ার মহিলাদের জন্যই গণিকাবৃত্তি আমেরিকায় বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ ‘প্রাচ্যের মেয়ে মাদ্রেই গণিকা’। তারপরেও ১৮৮২ ‘চাইনিজ এক্সক্লুশন অ্যাক্ট’ তৈরি করা হয়। তাতে ১৮৬৮ সালের সন্ধিকে পুনর্বিবেচনা করে, সমস্ত চীনেদের প্রবেশাধিকার রদ করে দেওয়া হয়। তারপরেও বহুবার এই আইন বদলেছে আমরা সেগুলি আর ব্যাখ্যা করছি না।^{১৩} আশা করছি গোটা ইউরোপ আমেরিকার পীতাতঙ্কের স্বরূপ এর দ্বারা বিশ্লেষিত হয়েছে।



উপরের ছবিতে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের ‘সিম্বল’ আঙ্কেল স্যাম চৈনিকদের লাথি মারতে মারতে বের করে দিচ্ছে নিজেদের দেশের বাইরে।

ইতিমধ্যে চীনের পরিস্থিতি আরো গোটা পৃথিবী জুড়ে এই বৈষম্যমূলক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ১৯০০ সালে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন ঘটে চীনের ‘বক্সার আন্দোলন’(১৮৯৯-১৯০১)^{৪৪}এর মাধ্যমে। চীনের ‘সোসাইটি অফ দ্য রাইটিয়াস এবং হারমোনিয়াস ফিস্ট’ নামক একটি মার্শাল আর্টের দল এই আন্দোলনের ডাক দেয়। চীনে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশে শ্বেতাঙ্গদের এবং খ্রীস্টান মিশনারিদের প্রতি এবং স্বজাতির ধর্মান্তরিত মানুষদের প্রতি তারা মূলত বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদেশের জাহাজ কিং বংশের দাণ্ডা কেবল আক্রমণ করলে, ১৯০০ সালে রাজকুমার যাইই বেজিং এ ঢুকে বক্সারদের, শ্বেতাঙ্গ নিধনের অনুমতি দেন। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ, ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়া, আমেরিকা, ইটালি, অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরি, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, স্পেন, জাপান মিলে ‘এইট নেশন অ্যালায়েন্স’ গঠন করে। তাদের লক্ষ্য ছিল ওই দেশের স্বজাতি ও স্বধর্মের মানুষদের রক্ষা করা। এই দুইপক্ষের হিংসাত্মক সংঘর্ষ চলতে থাকে বহুদিন ধরেই। এই গোটা সময় জুড়ে ইউরোপ এবং আমেরিকায় ‘পীতাতঙ্কের’র প্রচার চলতে থাকে গণমাধ্যমগুলিতে ব্যাপকভাবে।

রাশিয়ান গণমাধ্যম, পীতাতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মযুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গিকে যুক্ত করে দেয়। তারা একে ‘সাংস্কৃতিক যুদ্ধ’ আখ্যা দিয়ে, নাম দেয়, ‘শ্বেতাঙ্গ ধর্মপ্রাণ রাশিয়া’ এবং ‘হলুদ পেগান চীন’ এর যুদ্ধ।^{১৫} বক্সার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ধর্ম, খ্রীষ্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধে, উপনিবেশের ক্ষমতা বিস্তারের অন্যতম পথ বিজিতদের ধর্মান্তরিত করা। আমাদের দেশেও উনিশ শতকে মিশনারিদের বিরোধিতা করার ইতিহাস আছে। আর পেগান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মের একটি শাখা। ফলে ধর্মযুদ্ধের তকমা, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচারে আরোও বেশি করে সাহায্য করছিলো, এই আখ্যান (ন্যারেটিভ)। সেখানে জাতি-বর্ণ-ধর্মীয় বিদ্বেষকে বহুলভাবে প্রচার করা হয়। এদিকে মধ্য ইউরোপে ঘোষিতভাবে এশিয়া বিরোধী জাতিবিদ্বেষ সাংগঠনিক বিরোধিতার চেহারা গ্রহণ করে। চীনের কালচারাল রেভোলিউশন(১৯৬৬-৭৫)এর সময় এবং তার পরেও প্রায় বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাগুলিকে এরই সম্প্রসারণ হিসেবে আখ্যা দেওয়া শুরু হতে থাকে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ডানপন্থী এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দল বিভাজনেও এই বিরোধের ছায়া আমরা খেয়াল করতে পারবো। আমরা এই পরবর্তীকালের বিশ্লেষণে খুব বেশি যাবোনা; গবেষণার বিষয় এবং আমাদের উপন্যাস নির্বাচনের সীমাবদ্ধতার জন্য।

(৫)

পীতাতঙ্কের ছবি: প্রাচ্য, বুদ্ধ, ড্রাগন

এতো গেল তথ্য ইতিহাসের কথা। আমরা এতক্ষণ ধরে খুব সংক্ষেপে ঘটনাগুলিমাাত্র উল্লেখ করলাম কারণ এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিলো সাহিত্য শিল্পকলায়। কে কাকে প্রভাবিত করেছিল স্পষ্ট বলা যায়না! কারণ শিল্প-কলা-সাহিত্যের মাধ্যমেই জনমানসে এগুলির পক্ষে জনমতকে পালটে দেওয়ার বা তৈরি করার চেষ্টা চলছিল। কখনো সচেতন ভাবে পরের দিকে অভ্যাসের বশে প্রাকচেতনে।



পীতাতঙ্কের স্বরূপকে ইউরোপ এবং আমেরিকার জনগণের কাছে পরিচিত করতে বহু চিত্র কার্টুন আঁকা এবং প্রচার করা হয়েছে বহুদিন ধরেই। সাহিত্যে ভয়ঙ্কর সব ইমেজারি, চরিত্র তৈরি করা হয়েছে; সিনেমা বা ওডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম আসার পর পীতাতঙ্ক চরম প্রতিষ্ঠা পায়। ইন্টারনেটে খুঁজে দেখলেই সময়, কাল, শিল্পী, ঐতিহাসিক ঘটনা(আমরা ওপরে তার বেশ খানিকটা বর্ণনা করেছি) সম্বলিত তথ্যগুলি সহ সেই ছবি, বা কার্টুনগুলি দেখা যাবে।

এখানে দুটি ছবি আমরা ব্যবহার করেছি, প্রথমটিতে নিষ্ঠুর চৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বীভৎস রূপ, শ্বেতাঙ্গ নিরীহ নারী পদদলিত, একই সঙ্গে সভ্যতা ধ্বংসকারী এবং মেয়েদের প্রতি নির্মম। দ্বিতীয় ছবির বিষয়বস্তু, চৈনিকরা বাড়তে থাকলে, শ্বেতাঙ্গদের সমস্ত হীন-নীচু কাজ করতে হবে, রিক্সাচালানো অর্থাৎ আর অর্থনীতি তাদের হাতে গেলে শ্বেতাঙ্গরা ভিখারিতে পরিণত হবে! আর কুৎসিত চৈনিকরা শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের অধিকার করে বাকিদের দাসে পরিণত করবে!

পীতাতঙ্ক-বিষয়ক যে ছবিটি(বা বড় অর্থে ইমেজারিটি) জনমানসে প্রথম ছাপ ফেলে তার নির্মাণ জার্মানিতে। ১৮৮০ সালে দ্বিতীয় কাইসার উইলহেলম একদিন স্বপ্ন(এটি যে নির্মিত তাতে সন্দেহ নেই, ভাবেন এবং তা প্রচার করেন) দেখেন- বুদ্ধ ড্রাগনে চড়ে ইউরোপ দখল করতে আসছে। এবং তার ভীষণ আতঙ্ক হয় এইভাবে যে ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের মতো শ্রেষ্ঠ জাতি ‘সব দিক থেকে হীন’ এশিয়ানদের হাতে ধ্বংস হবে!^{১৬}

পীতাতঙ্কের কারণ ছিলো ত্রিবিধ- ইউরোপ মনে করছিল পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলি অর্থনৈতিক এবং জনতাত্ত্বিক দিক থেকে তাদের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের উন্নতি শিল্পের দিক থেকে ইউরোপের দমনকে(ডমিনিয়ামকে) ক্ষমতাচ্যুত করবে, এবং হলুদ চামড়াদের সংখ্যাধিক্য এবং প্রতিপত্তি শ্বেতাঙ্গদের লুপ্ত করে দেবে; এবং এই দেশগুলির রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি গোটা পৃথিবীর ওপর শ্বেতাঙ্গ, ইউরোপীয়দের প্রতিপত্তিকে ভবিষ্যতে শেষ করে দেবে। বলা বাহুল্য বাস্তবের সঙ্গে এই ব্যাপক আতঙ্কের বিশেষ মিল ছিলো না। কিন্তু ইউরোপের জোটের জন্য, জাতীয়তাবাদের জন্য, দমন ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করতে ও বজায় রাখতে এই ‘জেনোফোবিয়া’কে বানিয়ে তোলার, তাকে জিইয়ে রেখে ক্ষমতার স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যই ‘পীতাতঙ্কের’ ভাবনার নির্মাণ।

সিনো-জাপানিজ যুদ্ধের শেষে ‘মনোসেকি সন্ধি’ (১৭ এপ্রিল, ১৮৯৫ উদ্ধৃত আসল প্রবন্ধে সালটি ভুল আছে; ১৮৭৫ এ নয় সন্ধিটি ১৮৯৫ এ হয়।) র সময় রাশিয়া-জার্মানি-ফ্রান্স, টোকিও কে চূড়ান্ত হুমকি দেয়। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যদেশগুলিকে শক্তি প্রদর্শন করা, তাদের দমিয়ে রাখা। সিনো-

জাপানিজ যুদ্ধের প্রভাবেই দ্বিতীয় কাইসার ‘পীতাতঙ্কের স্বরূপ’ ব্যাখ্যার জন্য, ‘স্বপ্নলব্ধ’-ছবি আঁকিয়েছিলেন।^৭ এই কাল্পনিক ছবিটি পীতাতঙ্কের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবং এই সময়, এই বিষয়ক ছবি-সাহিত্য, রাষ্ট্রের-সরকারের বিপুল সমর্থন এবং প্রচার-প্রশংসা পেত, এখনো পায়।

কেমন ছিল সেই ছবি?



ইউরোপের জাতিগুলি একসঙ্গে একটি পাহাড়ে একত্রিত হয়েছে। যেখানে যোদ্ধাবেশে স্বর্গদূত মাইকেল সামনের উপত্যকার ওপারে নির্দেশ করে তাদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছে। ইউরোপের জাতিগুলির মধ্যে জার্মানিয়া সবার সামনে এগিয়ে, ব্রিটেন একটু পিছিয়ে আছে সংশয়ে, আরো অন্যান্য জাতিগুলি উপস্থিত তাদের পিছনে; এদের প্রতিটি চরিত্র, এক একটি ইউরোপীয় জাতিকে উপস্থাপিত করে। এদের মাথার ওপরে, আকাশে স্পষ্ট ভাসমান ‘ক্রস’। নদী অববাহিকা-নগর এবং উপত্যকার ওপারে প্রাচ্য।

তারমধ্যে থেকে বুদ্ধের ধোঁয়াবৃত-জাজ্বল্যমান বিশাল মূর্তি আবির্ভূত। বুদ্ধ যেসব জায়গা থেকে আবির্ভূত হচ্ছে সেসব জায়গা ধ্বংসস্তূপ, কালো ধোঁয়ায় আবৃত, অগ্নি-পরিবৃত। স্বর্গদূত বুদ্ধের দিকে নির্দেশ করে, ধর্মের, ইউরোপের, শ্বেতাঙ্গ- জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে প্রাচ্যের বিরুদ্ধে ইউরোপকে সংগঠিত, একত্রিত হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। বৃটেন সংশয়াকুল তাই তাকে হাত ধরে উদ্ধৃত করার চেষ্টা চলেছে, শেষের দিকের জাতিগুলি কৌতূহলি তাদেরকেও অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা চলছে। এই পীতাতঙ্কে, বারবার ‘ধর্মযুদ্ধ’ আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। এই ছবিতে তা ভীষণ রকম স্পষ্ট হল। সংঘর্ষ মূলত খ্রীষ্ট আর বুদ্ধের, এই দুই বাইনারি। এই ছবিটি কাইসার রাশিয়ার জারকে পাঠান, মন্তব্যসহ। মন্তব্যটি হল-

The power of Europe represented by their respective Genii called together by the Arch-angel Michael- sent from Heaven- to reunite in resisting the inroad of Buddhism, heathenism, barbarism for the defence of the cross. Stress is laid on the united resistance of all European powers which is just as necessary also against our common internal foes, anarchism, republicanism, nihilism.^{১৮}

যেসব শব্দকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে খেয়াল করবো- ‘অ্যানার্কিজম’, ‘রিপাবলিকানিজম’, এবং ‘নিহিলিজম’। পরে একই সঙ্গে ‘কমিউনিজম’কেও যুক্ত করা হয়। শুধু তাই নয়, তিনি প্রায় প্রতিটি কাগজ এবং ম্যাগাজিনে এটিকে ছাপানোর ব্যবস্থা করেন গোটা ইউরোপ জুড়ে। ১৮৯৮ সালে ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’এ একই ‘দ্য ইয়েলো পেরিল’ নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। এখানেই দেখলাম ছবিটি চর্চিত প্রায় ১৮৭৫ থেকে ১৮৯৮ অব্দি তো বটেই তারপরেও। ১৯০৮ সালে সেঞ্চুরি ম্যাগাজিনকে একটি সাক্ষাৎকারে কাইজার শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ এবং প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমতে সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বলেন-

The future belongs to the white race, never fear. It belongs to the Anglo-Teuton, the man who came from Northern Europe, where you, to whom America belongs, came from- the home of the German. It does not belong the future- to the yellow or to the black or the olive colored.^{১৯}

আশা করছি আমাদের প্রতিপাদ্য আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে।

এই ছবিটির যে জ্বলন্ত শহর ইত্যাদি ভাবনা এগুলি সবই কল্পিত; বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল ছিলোনা। একথা তো আর স্পষ্ট করে বলার দরকার পড়ে না। তাহলে ধরে নিতে হয় ভারতবর্ষ-চীন-জাপান-অর্থাৎ প্রাচ্যে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম আছে সেগুলি সব ধ্বংসস্তুপ। বা তাদের যতটুকু উন্নতি ঘটেছে তা কেবল শ্বেতাঙ্গ সংস্পর্শে- হ্যাঁ দ্বিতীয় ধারণাটি ভারতবর্ষে প্রচার করা হয়। আর অন্যদিকে, আমরা আগেই বলেছি বাংলা সহিত্যে, উনিশ-বিশ শতকে বৌদ্ধ-বিদ্বেষ এবং ‘বৌদ্ধযুগে স্বর্ণযুগ’ এই দুধরণের আখ্যান নির্মাণের চেষ্টাই চলছিল। হ্যাঁ, কোনো একমাত্র ধরণ নেই অনেকগুলি ধরণ আছে, সেগুলিই আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। আমরা ফিরছি ইউরোপের আলোচনায়। খ্রীষ্টধর্মের বিপরীতে বৌদ্ধধর্মকে জোর করে প্রতিপক্ষ বানিয়ে তোলা হয়। এবং লক্ষ করুন- বৌদ্ধধর্মের সঙ্গেই পাশে পাশে কমা দিয়ে ‘অসভ্যতা’, ‘বর্বরতা’ শব্দগুলিকে সুচারুভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে এই ধর্মপালনকারী প্রায় প্রত্যেককে ‘অপর এবং হীন’ প্রতিপন্ন করা হবে।

আমরা আবার একটু ইতিহাসে ফিরবো- রুশ-জাপান(১৯০৪-০৫) যুদ্ধ হয়। তাতে জাপান জয়ী হয়। জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকার ‘পীতাতঙ্ক’ বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলো। তাই জাপান সরকারের তরফ থেকে দুজন প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়, যাদের কাজ ছিলো পীতাতঙ্কের বিরোধী ভাবনাকে সেখানে প্রচার করা। বাস্তবে তা ব্যর্থ হয়। জাপানের জয়ের ফলে পীতাতঙ্ক আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

পীতাতঙ্কের আরেকটি জটিল দিক ছিলো- ফ্রান্স, জার্মানী এবং ব্রিটিশের গণমাধ্যমগুলি রাশিয়াকে ‘এশিয়াটিক’ বা “এশীয়মনোভাবাপন্ন” বলেই প্রচার করতো। সাহিত্যে(আশ্চর্যজনকভাবে বাংলা সাহিত্যেও) আমরা তার প্রমাণ পাবো তা পরে আলোচনা করবো। পীতাতঙ্কের সঙ্গে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র, বামপন্থা, বিপ্লবের প্রতি আস্থা পরবর্তীকালে গোটা ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যুগপৎভাবে তাদের আক্রমণ করা হয়, ‘অপর এবং হীন’ প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। যে রাশিয়া তাদের সঙ্গী ছিল তারই বিরোধিতা করা হয়। তার কারণ

রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান, মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে যোগ। মধ্যপ্রাচ্য মানেই খানিক ইসলামিপ্রাধান্য। ধর্মীয় বিদ্বেষ এই রাজনীতিকে প্রভাবিত করছিল প্রত্যক্ষভাবে, তা বোঝা যায়।

(৬)

এবার ফিরে আসি, সাহিত্য প্রসঙ্গে। জেরেমিয়াহ কার্টিন, এথনোগ্রাফার, লোকতাত্ত্বিক, অনুবাদক ১৮৮৩ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত ব্যুরো অফ আমেরিকান এথনোলজি বিভাগে চাকরি করতেন। এই জাপান-রুশ যুদ্ধের আবহেই- তিনি *দ্য মঙ্গোলস, আ হিস্ট্রি* নামে একটি বই লেখেন। বইটি উৎসর্গ করা হয় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে। রুজভেল্ট এই বইয়ের ভূমিকাও লিখেছিলেন। বইটির মূল বক্তব্য ছিল মঙ্গোলদের ইতিহাস, বিশেষত শক্তি, পরাক্রমের ইতিহাস বর্ণনা করা, আতঙ্কসৃষ্টির মাধ্যমে ইউরোপকে সতর্ক করা। চীন, জাপান খানিকটা রাশিয়া ও মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপ ও আমেরিকা বাসীদের মনে সন্দেহ ও ভীতি তৈরি করা। এখানে শুধু দেশ বা জাতি নয়। ধর্মীয় প্রতিপক্ষেরও উল্লেখ আছে সন্তর্পণে; বৌদ্ধধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম। খেয়াল করতে হবে কাজটি করা হচ্ছে সরাসরি সরকারি মদতে। আমরা বইটি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেবো। প্রথমটি রুজভেল্ট তাঁর ভূমিকায় লিখছেন-

... the Mongol-Tartar invasion, which affected half of Europe far more profoundly than the Crusades. It is this ignorance, of course accentuated among those who are not scholars, which accounts for the possibility of such comically absurd remarks as the one not frequently made at the time of the Japanese-Russian war, that for the first time since Salamis Asia had conquered Europe. As the matter of fact the recent military supremacy of the white or European races is a matter of only some three centuries. For the four preceding centuries, that is, from the beginning of the thirteenth to the seventeenth, the Mongol and Turkish armies generally ad the upper hand in any contest with European foes, appearing in Europe always as invaders and often as conquerors; while no ruler of Europe of their days had to his credit such mighty feats of arms, such wide conquests, as Genghis Khan, as Timour the Limper, as Bajazet, Selim and Amurth, as Baber and Akbar.” page – X-XI, foreword^{২০}

এইকথাগুলি বলার পরই তিনি তাদের সম্পর্কে আরোও বেশ কিছু জাতিবিদ্বেষমূলক, জেনোফোবিক মন্তব্য করেন-

... their creed and ethical culture were about on a par with those of the Comanches and Apaches of the Nineteenth century. They differed from the Comanches and the Apaches in that capacity for military organization which gave them such terrible efficiency; but otherwise they were not much more advanced, and the civilized peoples who fell under their sway experienced a fate as dreadful as would be the case if now a days a civilized people were suddenly conquered by a great horde of Apaches. The ruthless cruelty of the Mongol was practised on a scale greater than ever before or since...to the Europeans who cowered in horror before them, the squat, slit-eyed, brawny horsemen, "with faces like the snouts of dogs", seemed as hideous and fearsome as demons, and as irresistible by ordinary mortals. They conquered China and set on the throne a Mongol dynasty. India also their descendants conquered, and there likewise erected a great Mongol empire." page no. XIII foreword

২১

কার্টিন উনিশটি অধ্যায় জুড়ে প্রায় এইকথাগুলিকেই বারবার বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ বলাতে থাকেন; এশিয়া শক্তি হিসেবে পশ্চিমের বিরোধী শক্তি হিসেবে তৈরি হচ্ছে! সঙ্গে চলে শ্বেতাঙ্গদের মনে আতঙ্ক উৎপাদনের কাজ। শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদী ঐক্য গড়ে তোলা হয়। তাদেরকে 'উন্নত, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র রক্ত, খ্রীষ্টধর্মপ্রাণ, শক্তিশালী, সভ্য, শিক্ষিত' প্রমাণ করা হতে থাকে। গোটা পৃথিবীর 'ভালোর জন্য' তারা নিজেদেরকেই শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে দাবী করতে থাকে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ব্যবহৃত বিশেষণগুলো আরেকবার খেয়াল করবো- *বেঁটে, তীর্যক চক্ষু, পেশিবহুল- ঘোড়সওয়ার, কুকুরের মত ছুঁচলোমুখো* এরকম এবং আরও ভয়ঙ্কর বিদ্বেষমূলক মন্তব্য আমরা এই অধ্যায়ের আলোচনায় বারবার পাবো।

আমাদের উল্লিখিত উপন্যাসেও খেয়াল করে দেখবো এরকম 'বর্ণ-বিদ্বেষমূলক' মন্তব্য পাবো। যার ভিত্তি আমরা আগে আলোচনা করে নিচ্ছি। উৎস খোঁজার চেষ্টা করছি। ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের সময় তারা এভাবেই ভারতীয় উচ্চবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুদের ইসলামধর্ম এবং মোঘলদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে সুপরিকল্পিতভাবে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, আরও যেখানে যেখানে তারা উপনিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, সর্বত্র। আমরা একেবারে প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতকের হিন্দুপ্রধান জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। খেয়াল করে দেখুন প্রত্যক্ষত রাজনৈতিক যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা ফিরে যাই কার্টিনের বইয়ে। তিনি শেষ করছেন পাঠকদের মনে প্রচণ্ড এবং ব্যাপক আতঙ্ক তৈরির মাধ্যমে-

At last toward 1760 the Eleutes themselves were reduced, so that most of the Mongols are to-day subject to China, while the rest are under the control of Russia.

Remarkable as has been the part played by the Mongols in the history the part to be played by them yet may be far greater. How great and how varied it may be and of what character is the secret of the future^{২২}

রুশ জাপান যুদ্ধের পরেই ক্রিস্টিয়ান স্পিয়েলমান “আরিয়ান অ্যান্ড মোঙ্গলস” নামে একটি বই লেখেন।

স্পিয়েলম্যান বলেন-

The new Mongolian storm' that 'the danger now consistently is going against us... The ratio between the Arians and the Mongols, will grow even greater and then shine in the future. After 20 years of studying the history of the far east I'm able to make such a statement... Europe has committed a great error by allowing the Japanese to reinforce the Asiatic Lands that are bordering Russia which is our last defence before the Asians... all the Japanese... who live outside their country should be under strict supervision by the police because they are dangerous spies; this crafty little island is a menace to the whole civilized world^{২৩}

এখানে দুটি জাতির ভাগ করা হয়- আর্য এবং তার বিরোধি মোঙ্গল। মোঙ্গলরা বিধর্মী, অতএব ঘৃণ্য, কারণ তারা খৃষ্ট এবং শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য স্বীকার করে না। এইভাবে অনবরত ম্যানিপুলেশন এবং সিচুয়েশন তৈরি করে আতঙ্ক ম্যানুফ্যাকচার করে, ইউরোপ আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য এবং জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, উজ্জীবিত করে তোলা হয়; আর অন্যান্য দেশ, কৃষ্ণাঙ্গ, পীতাঙ্গ, বাদামী-অঙ্গ, ইসলাম, বৌদ্ধ(বিশেষত এই দুটি ধর্ম) এদেরকে ‘অপর’, ‘হীন’ প্রমাণিত করা হয়। প্রাচ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে বৈষম্য-সৃষ্টির মাধ্যমে লড়িয়ে দেওয়া; পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের বিরুদ্ধে ঐকবদ্ধ করার ডাক দেওয়া-যুগপৎ উদ্দেশ্য-সাধন।

মাইকেল ওডিজি, তাঁর প্রবন্ধে^{২৪} বিশদে ব্যখ্যা করেছেন, শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ প্রচার এবং প্রসারে ‘পীতাতঙ্ক’ কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটামুটি ১৮৮০ থেকেই সাহিত্যে এবং সংবাদ প্রতিবেদনে, আমেরিকার উপর, কাল্পনিক চৈনিক অভিযোজন বা আক্রমণ, নিয়ে কাল্পনিক সব আখ্যান গড়ে উঠতে থাকে। ক্যালিফোর্নিয়ান, ওভারল্যান্ড

মাহুলি ইত্যাদি সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য। ১৮৮২ সালে রবার্ট ওয়ল্টার একটি উপন্যাস লেখেন- A Short and Truthful History of the Taking of California and Oregon by the Chinese in the Year A.D. 1899। এখানে কল্পনা করা হয়েছে, যদি গোটা প্রশান্ত মহাসাগরের নৌসেনা চৈনিক পরিচালিত হয়, তাহলে তার প্রভাব কেমন হবে বা হচ্ছে! এরপর এইচ. জি. ওয়েস্ট এর The Chinese Invasion(১৮৭৩), আটোয়েল হুইটনি- এর Almond-Eyed(১৮৭৮) এর কাহিনি- কীভাবে চৈনিক অনুপ্রবেশকারীরা ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং স্মলপক্স মহামারি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ডবল্যু. ডুনার এর Last Days of the Republic(১৮৮০) এর গল্প চৈনিক অনুপ্রবেশকারীরা কীভাবে আমেরিকার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক সুপ্রতিষ্ঠানগুলিকে একে একে ধ্বংস করে দিচ্ছে।^{২৫}

আমরা রাশিয়ার কথা আগে একবার উল্লেখ করেছি যে, রাশিয়াকে এই ‘পীতাতঙ্কের’ সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার একটি প্রবণতা বহুদিন ধরেই ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রচারে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। বিপ্লব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া তাদের এই আতঙ্কের ভীতকে আরো সুদৃঢ় করে। পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক হেজিমনি বিপ্লবের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তখন পীতাতঙ্ক, বিপ্লবাতঙ্ক প্রায় সমর্থক হয়ে ওঠে।

যদিও বিপ্লব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী রাশিয়া অনেক ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদ, বা ধনতান্ত্রিক অবস্থানে ইউরোপ আমেরিকার ভাবনার শরিক হিসেবেই থেকেছে। কিন্তু পীতাতঙ্ক এবং এশিয়াবিরোধী ভাবনা যত প্রবল। বিপ্লবাতঙ্কও তাই। কিন্তু তার জন্য গোটা রাশিয়া-দেশকে ‘অপর’ করার মনোভাব তত প্রবল নয়। এর ধর্মীয় দিকও আছে, কারণ রাশিয়ার বিপুল সংখ্যক মানুষ খৃষ্টধর্মাবলম্বী এবং শ্বেতাঙ্গ, পুঁজিবাদের শরিকও বিভিন্ন সময়ে। শত্রু ইসলাম এবং বৌদ্ধ বা অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্ম। আমরা যথাসময়ে এর পক্ষে সাহিত্যিক প্রমাণ দাখিল করবো। আমাদের খুব অবাক লাগবে যে ইউরোপ- আমেরিকান সাহিত্যের থেকে তার সরাসরি প্রভাব এসেছে আমাদের বাংলা সাহিত্যেও। পীতাতঙ্ক এবং শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদের ‘জেনোফোবিয়া’ আরেকটি দিক হিটলার এবং নাৎজীদের ‘খাঁটিত্বের’ উত্থান।

পীতাতঙ্কের উপাখ্যান: ডঃ ফু মাধু, পাল্ল ফিক্সন

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এইসব ‘অপর’ দেশগুলির যেসব জায়গায় তাদের উপনিবেশ ছিল তারা সেখানকার উচ্চবিত্ত, এলিট, ধর্মপ্রাণ-ধর্মপ্রধানদের মধ্যে বিনা বাধায় ‘জেনোফোবিয়া-পীতাতঙ্ক’ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। সে দেশের মানুষেরা এই ‘অপর’ করার রাজনীতি নিজেদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে বিচ্ছিন্ন, ইউরোপ-আমেরিকা মুখাপেক্ষি হয়ে পড়ে। যা তাদের প্রতি হওয়া ঔপনিবেশিক-শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যা প্রকারান্তরে ইউরোপ আমেরিকার হেজিমনি গোটা পৃথিবী জুড়ে বিস্তারের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়, বিশ্বায়নপর্বেও এর ভূমিকা সমান কার্যকরী। আমরা আমাদের বক্তব্য প্রমাণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো। সাহিত্যিক প্রমাণের আগে ক্রিস্টোফার ফ্রেলিং, তাঁর বইয়ে, প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কীভাবে শ্বেতাঙ্গ বা ইউরোপ-আমেরিকান জাতীয়তাবাদ বা প্রাধান্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর বিবরণ দিয়েছেন। এবং খোদ প্রাচ্যেই বা এশিয়াতেই বা বাদামী, পীত, কালো অঙ্গের মানুষদের মনেই তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই ‘অপর এবং হীন’ মানসিকতা চাপিয়ে, বৈষম্য বাড়িয়ে দিয়েছে সন্তর্পণে সেকথা বলেছেন।

আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করবো। সেখানে *ওরিয়েন্টালিজম* (১৯৭৮) খ্যাত এডোয়ার্ড সঈদ এর কিছু মন্তব্য তিনি তাঁর বইয়ে উদ্ধৃত করেছেন। সঈদ বলেছেন, মাস মিডিয়া বিশেষত টেলিভিশন সাধারণ মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। বই পড়া বা কোনো বিষয় সম্পর্কে ভাবনা তৈরি করা বা হওয়ার আগেই শিশুকাল থেকে দেখা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ শিশুর তৈরি হয়ে যায় টেলিভিশনের মাধ্যমে, আখ্যানের বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্রগুলি ভিজুয়লাইজ করার মাধ্যমে, আর সেই ছবি গুলির প্রভাব চিরস্থায়ী হয়ে যায়। এশিয়ান বা রেড ইন্ডিয়ান বা কালো প্রমুখদের সম্পর্কে একটি ‘অপর এবং হীন’ দৃষ্টিভঙ্গি মাস মিডিয়ার দ্বারা প্রচারিত হয়। যেমন আমেরিকান-ইন্ডিয়ান বা চাইনিজ দের ভয়ঙ্কর রূপ সেসব আখ্যানে চিত্রিত করা হয়। যখন সঈদ বড় হচ্ছেন তখন টেলিভিশনে, মধ্যযুগ

বিষয়ে যেসব সিনেমা দেখানো হত, ক্রুসেড, আরব্য রজনী, সাম্রাজ্যবাদী সিনেমা সবেতেই এই ধরনের ‘বহিরাগত, অপর’ চরিত্র নির্মাণ করা হত। যার ফলে এদের সম্পর্কে একটি ভয়ের ভাবকে বড় হওয়ার পর, বই পড়ার পরও দূর করা যেকোনো মানুষের পক্ষেই মুশকিল হয়ে পড়ে।

ক্রিস্টোফার ফ্রেলিং সেখানে যোগ করেছেন, শুধু সিনেমা নয় এই ভাবনার অনুসারী পাল্ল ম্যাগাজিন, গান কবিতার লিরিক্স, কমিক্স, সিনেমা, কার্টুন, পোস্টকার্ড, মেলোড্রামা, গানের আসর, প্যান্টোমাইম সব কিছুকে ব্যাপকভাবে প্রচারিত করা হয়। চীন এবং চৈনিকদের প্রতিকৃতি যেভাবে এই প্রচারের দ্বারা সঙ্গদের মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিলো, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

I remember their effect on me[when growing up in Egypt and British Palestine], the Fu Manchu films and Charlie Chan... We didn't interact with Chinese people. So in a certain way these films also created divisions within the non-European world. But the most powerful thing about them is that they established the norm, which became unquestioning. And everything else was deviant, frightening and eccentric. They were and are very strong...

When I was growing up in the early 1940s,... seeing films such as Gunga Din, The Lives of a Bengal Lancer and The Four Feather, there were no comparably powerful images yet being produced in the Egyptian cinema... I don't remember ever seeing any of these films in the framework of colonialism in which I was on the side of the colonized.^{২৬}

Black Skins, White Masks(1952), ফ্রাঞ্জ ফ্যানন(Franz Fanon) তার ফুটনোটে তিনি টারজানের আখ্যান প্রসঙ্গে বলেন, টারজান সেই আখ্যানে যখন সমস্ত কালো মানুষদের প্রতি দুর্ব্যবহার করত, তখন তিনি ছোটবেলায় তার কালো আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়ে শ্বেতাঙ্গ টারজানের সঙ্গেই সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করতেন। তারপর বড় হয়ে তিনি কালো মানুষদের প্রতি দমনকে চিনতে পারেন।

এই ধরনের আখ্যান দেখে প্রভাবিত হয় শুধু শ্বেতাঙ্গ রা নয় এই ‘অপর এবং হীন’ মানুষগুলি নিজেরাও। কখনও সেই ভাব হীনমন্যতার; যার ফলে সে চলনে বলনে রুচিতে ভালো, মন্দতে ঘেন্নায়... সবেতেই পাশ্চাত্য-শ্বেতাঙ্গ মনস্ক হয়ে উঠতে চায়। অথবা তার মনে ক্ষোভ বা ঘৃণার সঞ্চার হয় এদের বিরুদ্ধে যার ফল হয় হিংসাত্মক, বিদ্বেষমূলক। এবং এই হিংসার সুযোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ‘ক্ষমতার কেন্দ্র’

নেওয়ার চেষ্টা করে। সেই সুযোগে তাদের আরও ‘অপর, হীন এবং বর্বর’ প্রমাণ করতে চাওয়া জোরদার হয়। পাঠক, দর্শক, সাধারণ মানুষ এই হেজিমনিকে স্বীকার করে নিতে থাকে, স্বাভাবিক বলে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। খেয়াল করলে দেখবো- ‘অপর’ হয়েও, ‘অপর’দের সঙ্গে, সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া মানে, তা, ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে চ্যুত হওয়া, অমর্যাদার, লজ্জার, অসম্মানের, অপযশের! ‘নায়ক’ সদৃশ হওয়ার অদম্য ইচ্ছা তাদের এই ‘অপরতা’কে আরো প্রবল করে তোলে। ক্ষমতার কেন্দ্রের দিকে হাতছানি, ‘আধিপত্য’(হেজিমনি)কে আরো সুদৃঢ় করে তোলে।

ফেলিং তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর শৈশবেও তিনি এই ধরনের জেনোফোবিক, জাতিবিদ্বেষ মূলক ছবিই দেখেছেন, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, স্যাক্স রোহ্মারের, ফু মাঞ্চু ছাড়াও-

works of G.A. Henty (With the Allies of Peking, 1904), Percy F. Westenman (When East meets West; A Story of the Yellow Peril, 1913),...Biggles flying in the orient and across the Gobi. Flash Gordon serials, with the evil, inscrutable Ming the Merciless (Charles Middleton) were still doing the rounds at Saturday morning scrambles; Charlie Chan (J. Carrol Naish) on television was now working with Inspector Duff of Scotland Yard rather than the Honolulu Police; the mysterious ‘Chinese conjuror’ with his mischievous daughter Tiger Lily and Pekingese called Pong-Ping plus pet dragon Ming were regulars in daily Rupert Bear drawings in the Daily Express (they lived, improbably, in a Pagoda in Nutwood); small-format war comics featured savage ‘Japs’ and, if set in the past, equally savage Chinese Warlords and Pirates; we played a game called Chinese Chequers- with a Fu-Manchu lookalike on the box, complete with long moustache and mandarin robe- and had Chinese conjuring sets, which were supplied with an ornate faux ivory wand; we gave each other Chinese burnes in the playground, bold sneaky Chinamen on the cricket field and joked in pidgin Chinese (Confucius, he say...); and prints of Tretchikoff’s The Chinese Girl (painted in 1951, prints from 1956) with her ‘copper green’ face, lipstick and unfinished torso, were beginning to be sold in Woolworths. I can remember a river cruise up the Thames through London, in the school holidays, during which the amplified commentator pointed out that Lime House ‘ the headquarters of Dr. Fu-Manchu, where he plan to takeover the World.’^{২৭}

শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, সাধারণ মানসে আরো দৃঢ় ছিল বিদ্বেষমূলক ছড়াগুলির প্রভাবও। যেমন-

Chink, Chink, Chinaman, sitting on a rail;

Along comes a white man and cuts off his tail (পুরনো প্রথা অনুযায়ী চৈনিকদের মধ্যে কেউ কেউ 'টিকি' রাখত, আগে ব্যবহৃত ছবিতেও আছে)

or,

Chinky, Chinky, Chinaman, sitting on a fence;

Trying to make a dollar out of fifteen cents.

Chinky, Chinky, Chinaman, eats dead rats;

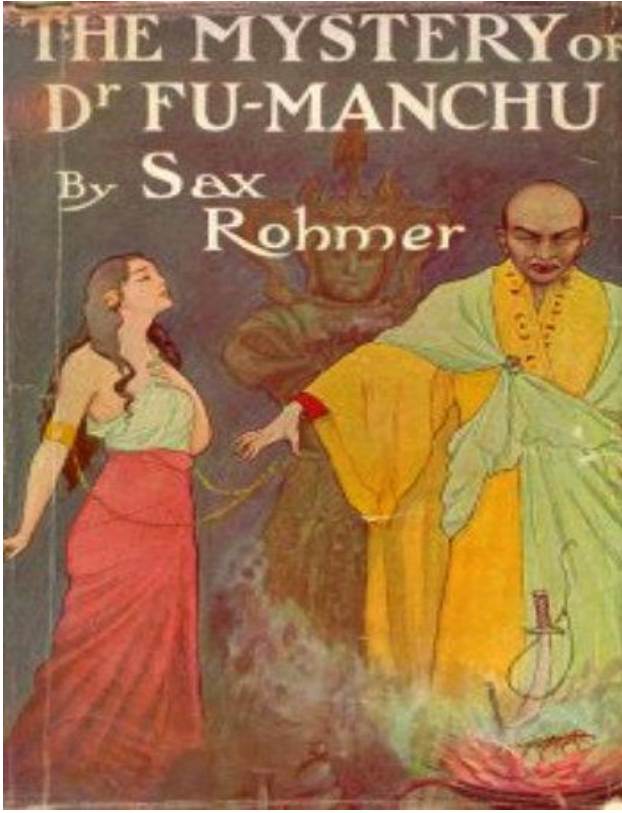
Eats them up like ginger snaps. ২৮

বাংলায়

দাদু বুঝি চিনাম্যান মা, নাম বুঝি চ্যাং চু,

তাই বুঝি গুঁর মুখটা অমন চ্যাপ্টা সুধাংশু। (খাঁদু-দাদু, নজরুল ইসলাম)

গোটা পাশ্চাত্য জুড়ে এই সাহিত্যগুলির যে ব্যাপক প্রভাব সাধারণ জনমানসে পড়েছিল তার ধারণা আমরা উপরের বিশাল উদ্ধৃতি থেকেই বুঝতে পারবো। এর সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যোগ কোথায় নিশ্চয় প্রশ্ন জাগতে পারে। তার উত্তরে আমরা আগেই বলেছি পীতাতঙ্কের সঙ্গে ধর্মের-সাহিত্যের যোগ ভীষণ গভীর এবং সমান্তরাল। এছাড়াও এই সাহিত্য গুলিতে, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নারী পুরুষ, বুদ্ধের মূর্তি এবং অন্যান্য ধর্মীয়সম্পর্কযুক্ত বস্তু, প্যাগোডার উল্লেখ 'ক্রিমিনালাইজ' করার ভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে। যেন বা প্যাগোডা গুলি এই অপরাধী বৌদ্ধদের প্রধান ঘাঁটিস্বরূপ। আমরা খুব অল্পই ইংরাজি সাহিত্যের উদাহরণ দাখিল করবো, কারণ আমাদের মূল ব্যাখ্যার বিষয় এই ধরনের বাংলা উপন্যাস।



ফু মাঞ্চু এই ধরনের সাহিত্যের সব থেকে ভয়ঙ্কর এবং জনপ্রিয় চরিত্র। ফু মাঞ্চু প্রসঙ্গে তার স্রষ্টা স্যাক্স রোমার (Sax Rohmer) বলেন-

A veritable octopus had fastened upon England- a yellow octopus whose head was that of Dr. Fu-Manchu, whose tentacles were dacoity, thuggee, modes of death, seret and swift, which in the darkness plucked men from life and left no clew behind. [Sax Rohmer, The Insidious Dr. Fu-manchu(1913)]^{২৯}

ফু মাঞ্চু -চরিত্র এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

Imagine a person, tall, lean and feline, high shouldered, with a brow like Shakespeare and a face like Satan, a close shaven skull, and long, magnetic eyes of the true cat green. Invest him with all the cruel cunning of an entire Eastern race, accumulated in one giant intellect, with all the resources of science past and present, with all the resources, if you will, of a wealthy government- which, however, already has denied all knowledge of his existence. Imagine that awful being, and you have a mental picture of Dr. Fu Manchu, the Yellow peril incarnet in one man.

[Sax Rohmer, The Insidious dr. Fu- Manchu (New York: McBride Nast & Co.,1911,1913)]^{৩০}

ফু-মাঞ্চু ১৩ টি আখ্যানে নির্মিত, প্রথম গল্প ১৯১৩ সালে The Insidious Dr. Fu-Manchu (or, The Mystery of Dr. Fu-Manchu)এবং শেষ হয় ১৯৫৯ সালে Emperor Fu-Manchu গল্পের মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীকালেও ১৯৭৬ সালে আর ৪টি নতুন গল্প সৃষ্টি করা হয়, আরো গল্প নিয়ে পেপারব্যাক সংকলন প্রকাশ করা হয় The Wrath of the Fu-Manchu নামে। আর্থার হেনরি সার্সফিল্ড ওয়ার্ড এঁর স্রষ্টা তাঁরই ছদ্মনাম স্যাক্স রোমার।^{৩১}

ডাক্তার ফু-মাঞ্চু, এশিয়ান ‘জড়িবিটি’ বিজ্ঞান সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান। যদিও এই অগাধ জ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যাকে সে ইউরোপকে পদানত করার অসং উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে। সি-ফ্যান, দ্য কাউন্সিল অফ সেনেট- এর সভাপতি ডঃ ফু-মাঞ্চু। এই কাউন্সিলের উদ্দেশ্য গোটা পৃথিবীকে চীনের অধীনে নিয়ে আসা।

ফু-মাঞ্চু পরবর্তীকালে এতটাই জনপ্রিয় হয় যে এই ধরনের ভিলেন গোটা পাল্প ম্যাগাজিন এবং চলচ্চিত্রে বিপুল সংখ্যায় তৈরি করা হতে থাকে। হলিউডে এবং ইউরোপ-আমেরিকার সাহিত্যে এখনও তার জনপ্রিয়তা সমান। ফু-মাঞ্চুর আখ্যানের কোনো সমাপ্তি নেই। আখ্যানে বৃদ্ধ হয়ে গিয়েও, ফু মাঞ্চু যৌবনকে রহস্যময় পদ্ধতিতে উদ্ধার করে, এবং আবার তার কাউন্সিলের দায়িত্ব নেয়। ফু-মাঞ্চুর প্রতিপক্ষ শ্বেতাঙ্গ নেল্যান্ড স্মিথ। সে ক্রমাগত, অনবরত, প্রাণপণ চেষ্টা করে ফু-মাঞ্চুর সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে বটে; কিন্তু তাকে কখনই ধরতে পারেনা; ফু মাঞ্চু অধরাই থাকে। এরকম আখ্যান নির্মাণের উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কে জিইয়ে রাখা, এবং একই সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বিচারব্যবস্থা বুদ্ধির ওপর সাধারণের আস্থাকে নির্মাণ করা, যেন তারা এই বানিয়ে তোলা আতঙ্কের মোকাবিলার ক্ষেত্রে তাদের ওপরেই আস্থা রাখে! মিশেল ফুকো এই প্রবণতাকেই উল্লেখ করেছেন তা আমরা আগেই বলেছি।

এম. পি. শিয়েল (M. P. Shiel) ক্রমানুযায়ী এ বিষয়ে আখ্যান নির্মাণ করেন- The Yellow Danger(1898), The Yellow wave (1905) রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে, ‘The Dragon’(1913) যা পরবর্তীকালে সরাসরি (1929) The Yellow peril নামে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও পাল্প ম্যাগাজিনে

ফু মাধুর অনুসরণে যেসব এশিয়ান ভিলেন তৈরি করা হয়, তারা- ডঃ ডেথ, ডঃ শয়তান বা শ্যাটান, উ-ফ্যাং, ডঃ ইয়েন সিন, দ্য অক্টোপাস/ দ্য স্করপিয়ন ইত্যাদি ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়। খেয়াল করবো ডঃ ফু-মাধুর মতই এরাও বেশিরভাগই ডাক্তার। বাংলা সাহিত্যে স্বপনকুমারের ড্রাগন সিরিজের ডঃ সান্যাল এর কথা মনে পড়বে নিশ্চয়! বা ডাক্তার অনুকূল!

ফু-মাধুর আখ্যানেও স্মিথের সহকারী ডঃ ওয়াটসনের অনুসরণে ডঃ পেট্রি (Petrie)। পেট্রি ফু-মাধুর দলের কারমানে(Karmaneh)কে বিয়ে করে। তাদের কন্যাকে আবার ফু-মাধু অপহরণ করে, তার সঙ্গিনী করার অসৎ উদ্দেশ্যে। আখ্যানে সেই মেয়েটিকে উদ্ধার করে ‘উপযুক্ত ব্রিটিশ’ পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়।

উ ফ্যাং এর স্রষ্টা রবার্ট হোগান মাত্র সাতটি ইস্যু প্রকাশ করেছিলেন, কারণ রোহ্মার অভিযোগ আনেন যে চরিত্রটি ফু-মাধুর নকল। এখানেও উ-ফ্যাং এর প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রুপক্ষের অথচ ভালো, মোহরের (Mohara) প্রেমে পড়ে। ডঃ ইয়েন সিন এর প্রতিদ্বন্দ্বী মাইকেল, শত্রুপক্ষের সোনিয় দিমিত্রির প্রেমে পড়ে। এই একই ছকে গল্পগুলো বাঁধা।^{৩২}

এছাড়াও এই আখ্যানগুলিতে, এশিয়ান মহিলাদের ‘লঘু, সম্মোহনী, লোভী, কামময়ী’ হিসেবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে, যেখানে তাদের মান্য জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যমে অর্থাৎ ‘গণিকা’ তকমা দেওয়াও চলছিল। আরেকটি দ্বিতীয় ধরনের চরিত্রায়ণও আছে, সেক্ষেত্রে মেয়ে চরিত্রগুলি ‘ফু-মাধু’ গোত্রীয় ভয়ঙ্কর ভিলেনদের যোগ্য সহচরী, বা তাদের মতোই সমান ভয়ঙ্কর, ক্ষতিকর। শ্বেতাঙ্গরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের ভোগের বা কামনার উপযুক্ত করেই নির্মাণ করেছে। কোনরকম শ্রদ্ধার ভাব বা বোধ ছাড়াই। প্রথম ক্ষেত্রের চিত্রিত মহিলারা রূপকথার নায়িকাদের মতোই অসহায়, সরল, ‘ইনোসেন্ট’, মন্দের খপ্পরে পড়ে যাওয়া। তারা অপেক্ষায় থাকে, ‘শ্বেতাঙ্গ নায়ক’ তাদের উদ্ধার করবে এই আশায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা নিজের দেশের, জাতির লোকের কাছেই সে নিরাপদ নয়, এরকম আখ্যান নির্মাণ ভীষণ জনপ্রিয়। একইরকম প্রবণতা (ট্রিটমেন্ট), এশিয়ান, আফ্রিকান, রেড-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতিদের সম্পদের

ক্ষেত্রেও দেখা যায়। মনে করানো হয় সেইসব সম্পদ বহুযুগ ধরে তারা রক্ষা করে এলেও সেগুলির মূল্য তারা বোঝে না, বা সেগুলি আর তাদের কাছে নিরাপদ নয়; তাই ‘শ্বেতাঙ্গ নায়কদের’ অবশ্য কর্তব্য সেগুলি ‘উদ্ধার’(আসলে চুরি বা ছিনতাই বা প্রতারণা করে, বা নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে) করে আনা। সেক্ষেত্রে নায়ক শ্বেতাঙ্গ, নায়িকা এশিয়ান, শত্রুপক্ষ এশিয়ান। রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়ান্দা-অভিযান-আডভেঞ্চার ধর্মী আখ্যানের বহু ব্যবহৃত এবং স্বীকৃত চমৎকার ছক!

এই ছকে যে কত বিপুল পরিমাণ আখ্যান সাহিত্যে, কমিক্সে, সিনেমায় নির্মিত হয়েছে বা হয়ে চলেছে তা গণনার অতীত।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি কীভাবে সাংবাদিক প্রতিবেদনে এশিয়ান মেয়েরা সকলেই গণিকা, বা ভোগের যোগ্য ইত্যাদি কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এর প্রকাশ কল্পিত আখ্যানে, সিনেমাতেও দেখা যায়। এশিয়া অভিযানে যাওয়ার জন্য শ্বেতাঙ্গদের কাছে এশিয়ার মহিলাদের সহজলভ্য করে দেখানোর প্রয়োজন হচ্ছিল। ট্যাবু-সেক্সুয়ালিটি, গণিকাবৃত্তি, ধর্ষণ, কামাতুরতা, অপহরণ এবং উদ্ধার প্রকল্প, বলিদান, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে অনবরত তুলনায় একপক্ষকে প্রধান, শুভ, ভালো প্রতিপক্ষ করা আর অপরপক্ষকে সব দিক থেকে হীন প্রমাণ করা- এই বিষয়গুলিকে নিয়েই মূলত এই আখ্যান গুলি নির্মিত হত এবং হয়।

জিনা মার্চেডি তাঁর বইয়ে এই ধরনের বহু আখ্যানের উদাহরণ দিয়েছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন আমরা সেগুলির পুনরুল্লেখ করলাম না। আগ্রহী পাঠক বইটি পড়লেই আমাদের যুক্তিকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।^{৩৩}

আখ্যানগুলি বর্ণবাদ, জাতিবাদ, ক্ষমতার রাজনীতি, লিঙ্গ, দেশীয় সবারকমের বৈষম্যকে পাঠক বা দর্শকদের মনে আরো বেশি করে চিরস্থায়ীরূপে খোদাই করে দেয়। জনপ্রিয় নায়ক হলিউড নায়ক, নিকোলাস কেজ, ফু-মাধু চরিত্রে অভিনয়(গ্রিন্ড হাউস, ২০০৭) করেন সাম্প্রতিক একটি সিনেমায়, ট্রান্সপোর্টার সিরিজের একনম্বর সিনেমায়(২০০০) এশিয়ান নায়িকাকে, এশিয়ানদের খপ্পর থেকেই উদ্ধার

করে, শ্বেতাঙ্গ নায়ক (নায়কের ভূমিকায়- জেসন স্ট্যাথাম, নায়িকার ভূমিকায়- স্যু কি), খেয়াল করে দেখুন চৈনিক অভিনেত্রীই এই আখ্যানের অংশ হচ্ছেন, হলিউডের এমনই মোহ! এছাড়াও ইউ.এস. পোস্টাল সার্ভিস ১৯৯৫ সালে মিং দ্য মার্সিলেস এর স্ট্যাম্প প্রকাশ করে, ২০০৮ এ ইয়ান ফ্লেমিং এর বার্ষিকীতে ডঃ নো এর স্ট্যাম্প প্রকাশ করা হয়। আরো বহু উদাহরণ পীতাতঙ্কে ফু-মাধুর মতোই জিইয়ে রাখে, তার আঁচ নিতে থাকে।

(৮)

পীতাতঙ্কের দান হল, সাহিত্যে- শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গমনস্ক জাতির পক্ষে আতঙ্ক জাগানো ‘ভিলেন’ চরিত্র নির্মাণ; সুন্দরী প্রায় গণিকা, প্রবৃত্তি-প্রধান মেয়ে-চরিত্র বা সুন্দরী সতী অবলা নায়িকা যারা ঘনঘন বিপদে পড়ে এবং নায়কের বীরত্বপ্রদর্শনে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে। এছাড়াও আছে ‘নেশাখানার’ বিবরণ, বিশেষত কোকেইনের আড্ডা,বাংলা সাহিত্যে ‘চণ্ডুখোরদের’ কথা আছে। যার ভোক্তা এবং সাপ্লায়ার বিশেষত চৈনিক-জাপানীরা। সাহিত্যের উদাহরণ মনে পড়তে পারে আমাদের। বাংলা উপন্যাসে এই উপাদানটির আমদানীও ইউরোপীয় পীতাতঙ্ক থেকে। এই প্রবণতার উৎস খুঁজতেও আমরা ইতিহাসের আশ্রয় নেবো। আফিম যুদ্ধ। আমরা এখন খানিকটা ইতিহাস বিবৃত করবো, এটি যেকোন এই বিষয়ক ইতিহাস বইয়েই আমরা পেতে পারি-

সাত এবং আটের শতকে মূলত ওয়ুধ হিসেবে তুর্কি ও আরব বণিকেরা আফিমের প্রচলন করেছিল চীনে। চৈনিকরা তখনও নেশার সামগ্রী হিসেবে এর ব্যবহার জানতো না। এদিকে ইংল্যান্ড চীনের বাজারকে ব্যবহার করার বারবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছিল। ১৭৮৭ তে ইংল্যান্ডের দূত ক্যাথকার্ট কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বার্তা নিয়ে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হয় কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়। ১৭৯২ এ ম্যাকার্টনি চীনে একই প্রস্তাব দিলে, চীনের রাজা চিয়েন লুং প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। ১৮১৬ তে লর্ড আর্মহাস্ট পিকিং রাজদরবারে একই উদ্দেশ্যে যায়। সেই চেষ্টাও বিফল হয়। কিন্তু এরই সমান্তরালে ১৭৮০ থেকেই ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বণিকেরা চীনের মধ্যে আফিমের চোরা চালান দিতে থাকে।

আস্তু আস্তু তার নেশায় চীনেরা বুঁদ হয়ে যায়। চীনের মাথু রাজারা তা বহু পরে উপলব্ধি করে ১৮০০ সালে চীনে আফিম প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু আফিমের নেশা তাতে কমল না। ১৮০০ সালে চীনে



আমদানি করা আফিমের পরিমাণ ছিল ২০০০ পেটি, ১৮২০ তে হয় ১০,০০০ পেটি। ১৮৩০ এ ২০,০০০ পেটি, ১৮৩৮ এ ৪০,০০০ পেটি এক একটি পেটিতে ১৪০-১৬০ পাউণ্ড আফিম থাকতো। এই আমদানি করতে গিয়ে চীনের সম্পদের বিপুল পরিমাণ রূপো বিদেশে চলে যায়। তারা অর্থনৈতিক, সামরিক, নৈতিক সব ভাবেই দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। বহুবার চেষ্টা করেও বিদেশীদের আফিম রপ্তানি চীন সরকার বন্ধ করতে পারেনি। ১৮৪০ এ ইংরেজরা প্রচুর সৈন্য নিয়ে চীন আক্রমণ করে, চৈনিকরাও তা প্রতিহিত করে বন্ধপরিকর হয়ে ওঠে। ইম্যানুয়েল স্যু বলেছেন – এইযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে চৈনিকরা আফিমের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ইংল্যান্ড আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদ প্রকাশের জন্য আর চৈনিকদের কাছে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহত করার প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু যুদ্ধে চীন হেরে যায়। ফলে তাদের বহু অপমানজনক শর্তাবলী মেনে নিতে হয়। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে তারা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধেও এই সংঘর্ষ চলতে থাকে।^{৩৪} আমরা জানা ইতিহাসই পুনরুল্লেখ করলাম। আমরা জানি যে আফিমের চক্রান্ত গোটাটাই পাশ্চাত্যের এবং কীভাবে চীন একে প্রতিহত করার চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু সাহিত্যিক আখ্যানে দেখবো, ক্রিমিনালাইজ করা হয় চীনেদের বা বলে ভালো ‘পীতাভ, চাপ্টা নাক, ছোটো চোখের’ অধিকারীদের।

ছবিটি খেয়াল করবো, কত কুৎসিৎভাবে আঁক হয়েছে। ক্রিস্টোফার ফ্রেলিং তাঁর বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে^{৩৫} বিখ্যাত লেখক চার্লস ডিকেন্সের অভিজ্ঞতা এবং গল্পের বিবরণ দিয়েছেন পীতাতঙ্ক প্রসার কীভাবে সাহিত্যে করা হচ্ছিল তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। আমরা সংক্ষেপে সেকথা বলবো আগ্রহীরা বইটি পড়তে পারেন। এই অধ্যায়ে চার্লস ডিকেন্সের *দ্য মিস্ট্রি অফ এডুইন ড্রুড*(১৮৭০); ডি ক্যুয়েগির *‘কনফেশন্স অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ইটার*(১৮২১), কোলরিজের *কুবলা খান* ইত্যাদি লেখায় এবং অন্যান্য সাহিত্যিকদের লেখায় ‘আফিমের-আডডা’র নির্মাণকে দেখিয়েছেন। পরে গোয়েন্দা বা অন্যান্য রহস্য রোমাঞ্চ গল্পে এই ‘আফিম-আডডা’গুলি অপরাধের সঙ্গে জুড়ে, সেটিংস হিসেবে গল্পগুলিতে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফ্রেলিং দেখান বাস্তবে তার মালিক ইংরেজরা ছিল, তার ভোক্তাও ছিল ইংরেজরা। চৈনিকরা থাকতো না তা নয় কিন্তু শুধু চৈনিকদের ঘাঁটি তা কখনই ছিল না; সেখানে ইংরেজ, চৈনিক, লস্কর, বাঙালি বা ভারতীয়দের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু জনপ্রিয় আখ্যানে একে চৈনিকদের ভয়াবহতা বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়। তিনি আরও প্রমাণ করেন চীনের থেকেও বেশি আফিম আমদানি করা হত তুর্কি এবং পার্শ্বিয়া থেকে। আমরা আগেও দেখেছি যে প্রথম দিকে চীনে এরাই আফিম রপ্তানি করতো। এছাড়া ব্রিটেনে আফিম যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একদল বুদ্ধিজীবী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনে আফিম রপ্তানি করে যে নীতি বিরুদ্ধ কাজ করছে সে বিষয়ে সরব হয়। কিন্তু তথাপি বিশেষত পাল্ল ফিক্সন এবং ডিকেন্সের জনপ্রিয় ‘আফিম-আডডা’ চীনের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং তাদের ‘অপরাধপ্রবণ’ করার ভাবনাই বেশিরভাগ দেশের সাহিত্যে গৃহীত হয়, অনুকরণ করা হয়। বাংলা সাহিত্যে তো বটেই। তা সরাসরি ঔপনিবেশিক প্রভাব।

আর্থার কোনান ডয়েল তাঁর শার্লক হোম সিরিজে একে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু চৈনিকদের ছাড়াই। হয়ত আসল ছবিটিই তিনি আঁকতে চেয়েছিলেন, তাঁর ‘দ্য ম্যান উইথ দ্য টুইস্টেড লিপ’ গল্পে এরকম ‘আফিম-আডডা’র কথা আছে। সেখানে ‘আফিমখোর’ কিন্তু ইংরেজরাই এমনকি তাদের মধ্যে একজন ওয়াটসনের বন্ধু। শার্লক নিজেও নেশা করে, তবে কোকেইনের। সেখানে ইংরেজ ছাড়া যার পরিচয়

পাওয়া যায় সে একজন লঙ্কর। এছাড়া আরেকটি গল্পের নাম- দ্য ইয়োলো ফেস। শোনা যায় আর্থার কোনান ডয়েল চেয়েছিলেন গল্পটির নাম হোক- দ্য লিভিড ফেস। হয়ত ‘পীতাতঙ্কের’ সঙ্গে সংযুক্তিটি তিনি জানতেন বলেই। এটি শ্বেতাজ্ঞ এবং কৃষ্ণাজ্ঞের মিলনের একটি মিষ্টি গল্প। বরং বর্ণ-বৈষম্যের বিপরীত কথাই এতে আছে। ফেলিং আরও বলেছেন- এই সময় ‘ইয়ালো পেরিল’ শব্দটিকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতে থাকে। একটি বিখ্যাত সংবাদপত্র, বক্সার বিদ্রোহীরা বৃটিশ নারী পুরুষ শিশু হত্যার একটি ভুল খবর ছাপে। দ্য টাইমস ভ্রান্তভাবে তাদের নিজেদেরই এক সাংবাদিকের শোকসংবাদ ছাপায়। ১৯০০ তে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্সনারি ‘ইয়ালো পেরিল’ এর মানে বলে- a supposed danger of a destructive invasion of Europe by Asia. ‘supposed’ শব্দটি খেয়াল করবো। প্ল্যাট নামে একজন গবেষক আক্ষিপ করেছেন- লন্ডনের ‘চৈনিকটাউন’ এবং আফিম-আড্ডা গুলিকে কোনো লেখকই যত্নের সঙ্গে স্পষ্ট ছবি তুলে ধরেন নি। তিনি এও বলেন আফিম-আড্ডা গুলি ছিল বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মিলনস্থল, তাস খেলা, খাওয়া দাওয়া করা, বই পড়া, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা ভাগ করার আড্ডা ছিল।^{৩৬} এই মেলামেশার চিহ্নগুলিকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তুলে ধরা হয়না।

(৯)

সাহিত্যে চণ্ডুর আড্ডা এবং ‘রহস্যময় বার্মা’

বাংলা সাহিত্যে, বেশিরভাগ লেখকরা ‘আফিম-আড্ডা’র সঙ্গে চৈনিকদের-বৌদ্ধদের অপরাধপ্রবণতাকেই জুড়েছেন। উপরোক্ত ছবির মতোই। পীতাতঙ্কের এই একটি অন্যতম উপাদান যা বাংলা-সাহিত্যে সরাসরি গ্রহীত হয়েছিল। এখনও বাংলা উপন্যাসের উদাহরণে আমরা যাবোনা। কারণ বাংলা উপন্যাস ব্যাখ্যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এখনো আমাদের আলোচনার বাইরে রয়েছে। তা হল রেঙ্গুন বা বার্মার পটভূমি। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের অনেকগুলিতেই বার্মার প্রেক্ষাপটে আখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই বার্মাকে উল্লেখ বা বর্ণনা করা হয়েছে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই বার্মা উপনিবেশের

অন্তর্গত, আর একে ব্যাখ্যা করার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপ নির্মিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিই বাঙালি লেখকেরা অনুসরণ এবং অনুকরণ করেছেন। উপনিবেশের অন্তর্গত বার্মাকে ব্যাখ্যা করার এই বিশেষ শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয় বর্ণ এবং জাতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধের পর বার্মা ব্রিটিশ উপনিবেশের অন্তর্গত হয়। মোট তিনটি ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধ হয়েছিল, ১৮২৫, ১৮৫২ এবং ১৮৮৫ সালে। ১৮৮৬ থেকে ব্রিটিশদের শাসন শুরু হয় চলে ১৯৪৮ অব্দি। বার্মাকে উপনিবেশ ভারতের অংশ হিসেবে স্বীকার করা হয় ১৯১৯ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। ১৯৩৭ এ বার্মা ‘মুকুট উপনিবেশ’ এ পরিণত হয়। বার্মার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন যুদ্ধের ফলে দখল করা হয়েছিল। বার্মাকে ‘স্কটিশ কলোনি’ বলেও অভিহিত করা হত। বিখ্যাত লেখক জর্জ ওরওয়েল ‘ইন্ডিয়ান ইম্পিরিয়াল পুলিশ’ বাহিনীতে ৫ বছর চাকরি করেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই, ‘বার্মিজ ডেজ’(১৯৩৪) অনুপ্রাণিত।

জর্জ ওরওয়েলের ১৯৮৪ তে লেখা অ্যানিমালা ফার্ম, এবং শ্যুটিং এন এলিফেন্ট নামক গল্পে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্ষতিকর দিকগুলিকে চিহ্নিত করেন। তার মতে ব্রিটিশরা এদেশের ঐতিহ্য, স্বতন্ত্রতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে পরিকল্পিতভাবে-

...the sneering yellow faces of young men that met me everywhere, the insults hooted after me when I was at a safe distance, got badly on my nerves. As for the job I was doing, I hated it more bitterly than I can perhaps make clear. In a job like that you see the dirty work of Empire at close quarters. The wretched prisoners huddling in the stinking cages of the lock-ups, the grey cowed faces of the long-term convicts, the scarred buttocks of the men who had been bogged with bamboos- all these oppressed me with an intolerable sense of guilt. But I could get nothing into perspective... With one part of my mind I thought of the British Raj as an unbreakable tyranny, as something clamped down, in saecula saeculorum, upon the will of prostrate people; with another part I thought that the greatest joy in the World would be to drive a bayonet into a Buddhist priest's guts. Feelings like these are the normal by-products of Imperialism; ask any Anglo-Indian official, if you can catch him off duty.

(Orwell, 1936, page 309) ^{৩৭}

উপনিবেশ স্থাপনের আগে ভারতের সঙ্গে দঃ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, ধার্মিক যোগসূত্রে সুদৃঢ়রূপেই ছিল। যেমন কম্বোডিয়ান এবং মালয়েশিয়ান রাজারা চোল রাজাদের উপহার-ভেট পাঠাতেন। মধ্য বার্মার বৌদ্ধ-মন্দিরগুলিতে সংস্কৃত, পালি এবং তামিল লিপি পাওয়া যায়। উপনিবেশের অন্তর্গত হওয়ার পর বার্মার সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত সম্পর্ক এবং আরাকানের নিজস্ব বৌদ্ধ-ঐতিহ্য প্রায় লুপ্ত হতে থাকে। কারণ ইংরেজরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বা উপনিবেশীয় বিভেদ-নীতির প্রচারের জন্য তাতে বাধা সৃষ্টি করে। ১৮৯০ সালে মহাবোধি আন্দোলনের নেতা ধর্মপাল, তিনি বঙ্গদেশের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিতে সুদৃঢ় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন তাঁর বক্তৃতায়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬ সালে বার্মাতে একটি সভাতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে - বার্মিজ এবং ভারতীয় ভাষার সাধারণ শব্দতাত্ত্বিক ব্যাকরণের বিশ্লেষণ করেন। ধর্মীয় দিক থেকেও প্রাচ্যের বিভিন্ন সন্ত এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যে একইভাবে ভারতীয় এবং বার্মিজদের মধ্যে পড়েছিল সেকথাও উল্লেখ করেন। তাদের সম্প্রীতির বিভিন্নদিক উল্লেখ করেন তাঁর আলোচনায়। কিন্তু চিরকাল বাঙালি এবং বার্মিজদের এই ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রক্ষিত হয়নি। আর এই বিভেদনীতির প্রবক্তা ছিল অবশ্যই ব্রিটিশরা। সেকথায় আমরা ধীরে ধীরে যাবো।

উনিশ শতকের কলকাতা ছিল ব্রিটিশদের উপনিবেশের বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম থেকেই বার্মার ওপর সামরিক নজরদারি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হত। বাঙালিরা ব্রিটিশদের আমলা হিসেবে চাকরি করতে যেত বার্মায়। ভারতীয়রা সেখানে মহাজনী ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রশাসন সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্রিটিশদের অধীনে চাকরি করত। সংস্কৃতি, এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তখন বার্মার অবস্থা বাংলার তুলনায় ভালো ছিল। বার্মার শিক্ষাব্যবস্থাকে ‘ব্রিটিশমনস্ক’ ভারতীয়রা উন্নত করে তোলে। বার্মার জাডসন এবং রেঙ্গুন কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ইউ ওটামা নামে বৌদ্ধ শ্রমণ উপনিবেশের সমর্থনে ছিলেন এবং ভারতে লেখা পড়া শিখে, গান্ধীর খাদিবস্ত্রের প্রচার করেন বার্মিজদের মধ্যে। ১৯১১ সালের পর থেকে বছরে এক লক্ষ ভারতীয় বার্মাতে

জলপথে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। এবং শ্রমিক, কুলি-মজুর সৈন্য থেকে শুরু করে আমলা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্র দখল করতে থাকে। ১৮৮০-১৯৪০ সালের মধ্যে বার্মার বড় শহর যেমন- রেঙ্গুন, আকিয়াব, বেসিন, মৌল্মিনে এক থেকে দেড় কোটি ভারতীয় অনুপ্রবেশ করে।

এই অনুপ্রবেশের কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, যে বার্মার অর্থনৈতিক অবস্থা ভারতের তুলনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো ছিলো। সেইকারণেই বৃটিশরা এখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এটি তাদের কাছে ‘গোল্ডেন ল্যান্ড’ হিসেবে সুপরিচিত ছিল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একে ‘সুবর্ণভূমি’ বলেছেন। ফলে সোনার খনির হাতছানিও ছিল বার্মার অনাবিষ্কৃত ভূগোলের মধ্যে। খানিকটা অতিরঞ্জনও ছিল সেই বর্ণনায়, যেমন ওড়িয়া কবি সারঙ্গি ১৯১৮ সালে একটি কবিতায় লেখেন- সেখানে অর্থোপার্জন খুবই সহজ, একটি কলাগাছ কাটার দাম একটাকা, ঘুঁটের মত অর্থ ডাঁই করে রাখা যায়, কৃষিকাজ খুবই কম পরিশ্রমের, বীজ ফেললেই এখানে সহজে বেশি ফসল ফলে, জলের কোন অভাবও নেই, এই ভূমি লক্ষ্মীর কৃপাধন্য।^{৩৮}

ফলে বৃটিশরা বার্মিজদের ক্রমাগত পদানত করতে থাকে ভারতীয়দের সাহায্যে। যদিও ভারতীয় এবং বার্মিজ দুপক্ষই বৃটিশদের দ্বারা বিজিত, তবু ঐক্যের বদলে বৃটিশদের এই বিভেদনীতি ভারতীয় (বাঙালি) এবং বার্মিজদের পরস্পরের শত্রু করে তোলে। যতই বার্মিজরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যায় তাদের সামনে প্রধান বাধা হিসেবে বৃটিশরা উপস্থাপিত করে ভারতীয়দের। আর ‘বৃটিশমনস্ক’ ভারতীয়রা বার্মিজদের প্রত্যক্ষ শত্রু হয়ে ওঠে।

১৯৩০ নাগাদ সর্বত্র বাঙালিদের (অন্যান্যরাও ছিল) উপস্থিতি বার্মিজদের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ এবং ঘৃণা তৈরি করে। বিশেষত সুদখোর অত্যাচারি মহাজনদের বিরুদ্ধে। এবং এর ফলে বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয়-বিদ্বেষী দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হয়। বার্মিজরা বিদেশিদের ‘কালার’ বা ব্ল্যাক বলে সম্বোধন করত। কারণ তাদের মনে হতে থাকে যে তাদের শত্রু আসলে বৃটিশরা নয় ভারতীয়রাই। সুনীতিকুমার ঐক্যের কথা বলেন, কিন্তু তারপর মহাত্মা গান্ধী বলেন- বার্মা কখনও ভারতবর্ষের অংশ ছিলনা। বৃটিশদের সঙ্গে

ভারতীয়রা মিলে বার্মিজদের প্রতি যে অত্যাচার করছে ১৯০২ সালে বার্মা ভ্রমণের পর তিনি তার নিন্দা করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬, ১৯২৪, ১৯২৭ এ তিনবার বার্মা যান, তার মতেও- এই দ্বৈত ঔপনিবেশিকতা যা ব্রিটিশ এবং ভারতীয়রা মিলে তৈরি করেছে, তা রেঙ্গুনের বাণিজ্যলক্ষ্মীর অপমান; স্বেদাগাঁও মন্দির ছাড়া রেঙ্গুনে আর কোনো কিছুকেই বার্মিজ ঐতিহ্যের অনুসারী বলে তাঁর মনে হয় নি।

... এমন হতে পারে, রেঙ্গুন শহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার; বাড়িগুলি তক্ততক্ত করছে; রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্ছে; তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙিন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখতে পাই তখন মনে হয়, এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা, গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয় বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি, রেঙ্গুন শহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের শহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মতো।...কোনো ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখতে পেলুম না। ...সোমবার দিন সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা-কিছু দেখতে পেলুম। ...এখন যা দেখছি তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। ...সমস্ত রেঙ্গুন শহরটা এর কাছে ছোটো হয়ে গেল; বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।

...লোকের কাছে শুনতে পাই এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়, অন্যদেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে থাকে। ...রমণীর লাভণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কর্মতৎপরতাই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠিন পরিশ্রম করে, কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে সুব্যক্ত করে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে... ৩৯

১৯৩০ জাপান, বার্মা আক্রমণ করার পরই ভারতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। এই বছর আগস্টে দৈনিক থুরিয়া/দ্য সান এ ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, আ ওয়ার্ড টু নন-বার্মান্স, যার বক্তব্য ছিল- ভারতীয়রা বার্মার অধিবাসী নয়, বার্মিজরা তাদের আক্রমণ করবেনা এখানে এসে অর্থোপার্জন করার জন্য, যদি তারা নিজেরাই বার্মা পরিত্যাগ করে, তা, তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। ১৯২৯-৩০ এর ভয়ংকর অর্থনৈতিক মন্দায় বার্মিজরা ভারতীয়দেরই দায়ী করে। তার কারণ- এক, অল্প কিছু ক্ষেত্রের চাকরিতেও ভারতীয়দের আধিপত্য; দুই, ভারতীয়দের দ্বারা বার্মিজ মেয়েদের প্রতি হওয়া অত্যাচার-অনাচার, বার্মিজদের জেনোফোবিক করে তোলে। ১৯২৯ সালে ‘থাকিন পার্টি’ তৈরি হয় তাদের শ্লোগান ছিল- বার্মা শুধু বার্মিজদের। ১৯৪১ জাপান আক্রমণ করলে বহু ভারতীয় বার্মা থেকে চট্টগ্রাম, মণিপুর ও আসামে পালিয়ে যায়।

সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়ে, স্যু-উ-দং(১৮৮৯-১৯৭৩) শার্লক হোমসের নকলে সান-সার এর গোয়ান্দা গল্প তৈরি করেন সেগুলি পড়লে বাঙালি বা ভারতীয় এবং বার্মিজদের দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা পাওয়া যায়। বহু গল্পে সান সার এর বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্য বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপের পাল্ল ম্যাগাজিনে পীতাতঙ্কের প্রভাবই লক্ষ্য করা যায় বৌদ্ধ-বার্মিজদের চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে। মায়ানমারকে চিত্রিত করা হয়- স্বর্ণবৌদ্ধ মন্দির, সোনালি বুদ্ধমূর্তি, ছবির মত সুন্দর গ্রাম শোভিত প্রান্তিক ক্ষেত্র হিসেবে। এবং সেখানে ব্যাকুলচিত্তে সুন্দরী যুবতী বার্মিজ মেয়েরা তাদের ইউরোপীয় প্রেমিকদের জন্য অপেক্ষা করে। আপাতভাবে সুন্দর মনে হলেও, কিন্তু, মানুষগুলির প্রতি ছিল ‘অপর, হীন এবং ঘৃণার’ ভাবনা। বার্মিজদের বর্ণনায় পাই- পশুর মত হিংস্র, বর্বর, ঘন জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে তারা থাকে, তারা ইউরোপীয়দের শত্রু। এই ছিল উপনিবেশের শাসকদের ‘ইচ্ছেপূরণের কল্পিত চিত্রায়ণ’; যা বার্মাকে আরো বেশি ‘অপর’ করে তোলে। কী অদ্ভুত! বাঙলা গল্পগুলি এই বৃটিশ-মনস্কতারই প্রতিধ্বনি করে। যদিও বার্মা তাদের প্রতিবেশি, রুটি-রুজি সংস্থানের দেশ, এবং জাতি-বর্ণ-ধর্মগতভাবে বা শোষিত হিসেবেও এক পংক্তিতে অবস্থিত। একানুভূতি বা সহানুভূতির বদলে তারাও হয়ে উঠল শাসক ইউরোপীয়দের হাতিয়ার একে অন্যের বিরুদ্ধে। এখনও তাই।

পাল্ল ম্যাগাজিন গুলির পাঠক ছিল মূলত ছেলেরা, পুরুষ শ্রমিকরা। তারা দৈনন্দিন একঘেঁয়ে শ্রম থেকে স্বস্তি পেত এমন এক আখ্যানের দুনিয়ায় যা তাদের কাছে অপরিচিত, দূরবর্তী, অজানা। এই গল্পগুলির রহস্যময়তা, কল্পলোক, ভয়, উদ্বেগ, অত্যাচারের ভয়ঙ্কর স্বরূপ, ধর্মকাম, যৌনতা এবং অচেনা অজানা, ট্যাবুযুক্ত ভাবনা এবং যৌনতার মিশ্রণ তাদের মধ্যে গল্পগুলিকে আরো জনপ্রিয় করে তোলে। কল্পিত গল্প জনমানসে বাস্তব এবং সত্যের ছবি আঁকতে থাকে। যার রাজনৈতিক সুফল ভোগ করে ক্ষমতার কেন্দ্রীয় শক্তি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বার্মা নিয়ে এধরণের গল্পের উদাহরণ^{৪০}- ১৯২২ সালে দ্য ব্ল্যাক মাস্ক নামক রহস্য-পত্রিকায় প্রকাশিত ড্যাশিয়েল হ্যামেট(Dashiell Hammett) এর- *The Road Home*

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ সেসব গল্পগুলিকে বাড়তি জনপ্রিয়তা দেয়(যেমন ‘সত্য ঘটনা অবলম্বনে’ লেখার প্রবণতা), তাই লেখকরা দাবী করতে থাকেন তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা(থাক বা না থাক, এবং অতিরঞ্জন তো ছিলই)। যেমন এস.বি. এইচ. হার্স্ট(S.B.H. Hurst) লেখেন- *ডেভিল অফ দ্য চিন হিলস(The Devil of the Chin Hills)* (১৯২৮), *দ্য স্পিরিট অফ ফ্রাংস(১৯২৯)*, *দ্য বল অফ ফায়ার(১৯৩১)* ছিল বৃহৎ রুবির খোঁজ নিয়ে লেখা গল্প। গর্ডন ম্যাক্রেগ(Gordon MacCreagh) এর গল্পগুলিও খুব জনপ্রিয় ছিল- *দ্য জেড হান্টার্স(১৯১২)*, *দ্য গোটিং অফ বো না ঘী(The Getting of Boh Na-Ghee, ১৯১৩)*। এখানে বার্মার ওয়া ট্রাইবদের বিবরণ দেওয়া হয়, যে, তারা শত্রুর খুলির বেল্ট পরত। এবং এই গল্পে তারা ইউরোপীয় নায়ক ও তার দলকে আক্রমণ করে। ওটিস আডেলবার্ট ক্লাইন(Otis Adelbert Kline) কিপলিং এর *জঙ্গল বুক(Jungle Book, 1882)* এর অনুকরণে বার্মার পটভূমিতে একটি গল্প লেখেন। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলে সি. এম. ক্রস(C. M. Cross), ডাব্লু. এইচ. মিলার(W. H. Miller), জে. এস. ফ্লেচার(J. S. Fletcher) এঁরা বাঘ শিকার, রুবির খোঁজ এবং বর্বর বার্মিজদের সঙ্গে লড়াই নিয়ে গল্প লেখেন। এডমন্ড হ্যামিলটন(Edmond Hamilton) ১৯৪২ সালে একটি কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখেন, লস্ট সিটি অফ বার্মা নামে, তাতে তিনি আমেরিকা এবং জাপানের প্রতিযোগিতা দেখান ‘ফ্লেম অফ লাইফ’ খুঁজে বের করার জন্য। শুধুমাত্র বার্মিজদের বর্বররূপে চিত্রিত করাই নয়, এঁদের কল্পনার অতিরঞ্জন দেখা যায় উদ্ভিদ, এবং অদ্ভুত জন্তুজানোয়ারের কল্পনাতেও। হুগ রানকিন(Hugh Rankin) ১৯২৯ সালে *আপ ইর্রাবদী ওয়ে(Up Irrawaddy Way)*- নামক গল্পে মানুষখেকো উদ্ভিদ ও মাংসখেকো ছত্রাকের গল্প বলেন। আর্থার যগৎ(Arthur Zagat)এর *মিডনাইট ফ্যাংস(Midnight Fangs, ১৯২৪)*এ মেয়ে-বাঘিনীর গল্প লেখেন। ই. হফম্যান প্রাইস (E. Hoffman Price)এবং ওটিস ক্লাইন(Otis Kline) মিলিতভাবে লেখেন- *স্পটেড স্যাটান(Spotted Satan, ১৯৪০)* সেখানে ‘মানুষ-চিতা’র গল্প লেখেন, এই মানুষ-চিতা সেখানকার কাঠের শ্রমিকদের আক্রমণ করত, শ্বেতাস্র নায়ক তাকে হত্যা করে, সাধারণ মানুষকে নিশ্চিন্ত করে। ১৯৪০ সালে ই. এইচ. প্রাইস(E. H. Price) লেখেন- *বার্মা গানস(Burma Guns)*। ১৯৫২ সালে টড জোন্স(Tod Jones) লেখেন – বার্মিজ

ব্লাড বাথ(*Burmese Blood Bath*); এই গল্প শুরু হয়- *In the heyday of its past, under power mad rulers, Burma was a land to avoid, if you wanted to keep your head.*



এছাড়াও কিছু কিছু গল্প শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য(নির্দিষ্ট করা হত), অশ্লীল আখ্যান বার্মিজ মেয়েদের নিয়ে রচিত হত; যেমন- *Yankee King of Burma's Fox-Hole Girl Army*(1963), *Yank Who Led Burma's Nude Nymph Commandos* (1964) ইত্যাদি। অতএব, বলা যায় এই সমস্ত গল্পগুলিই মায়ানমারকে 'হীন, অশুভ, বিকৃত' ভাবে পৃথিবীর সামনে পরিচিত করে। সেখানকার মানুষদের জাতিবিদ্বেষসূচক নামে ডাকা হয় এই সাহিত্য গুলিতে। দ্য স্পিরিট অফ ফ্রান্স নামক গল্পে একজায়গায় আছে- শ্বেতাঙ্গ একটি মেয়ে 'মহামেডান্স' এবং 'চীনেম্যান'দের সামনে নাচ করছে বলে, শ্বেতাঙ্গরা ভীষণ অপমানিত এবং বিচলিত বোধ করে! কারণ তা গোটা শ্বেতাঙ্গ জাতির অপমান। ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা মান্য সাহিত্যে, মূলধারায় 'অশ্লীলতা' বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত ভাবনাকে অনুকরণ করা হয়। সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত- এ দেখিয়েছেন, কার্জন বার্মায় একটি গণধর্ষনের ঘটনায়, শ্বেতাঙ্গদের শাস্তি

দেন বলে(১৮৯৯), ভারতীয়রা প্রীত হয়। এছাড়াও একজন ভারতীয় চাকরকে হত্যার অপরাধেও এক শ্বেতাঙ্গকে শাস্তি দেন; তখন বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গদের এরকম অপরাধের কোনো শাস্তি হতনা।^{৪১}

উপনিবেশবাদ এবং প্রাচ্যবাদ মিলিয়ে ব্রিটিশ এবং ভারতীয়রা বার্মিজ মেয়েদের চিত্রিত করেন একটু পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে। লর্ড ডাফরিন তাঁর চিঠিতে এদের- সৌন্দর্য, কমণীয়তা এবং স্বেচ্ছাচারের প্রতীক হিসেবে অভিহিত করেন। রুডিয়র্ড কিপলিং ১৮৯০ সালে তাঁর জনপ্রিয় গীতিকা ‘ম্যান্ডালে’ লিখে ফেলেন বার্মিজ মেয়েদের সৌন্দর্যে প্রভাবিত হয়ে। চিত্রকর জেরাল্ড কেলি বার্মা সফর করে ১৯০৮-০৯ সালে, এবং তাঁর ছবিতে বার্মার প্রকৃতি এবং যুবতী বার্মিজ নর্তকীদের আধিক্য দেখা যায়। সমারসেট মম তাঁর পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে বলেন- *gave us the character of the East as we of our generation see it. (cited in Hudson, 1975, page-36)*^{৪২}

শুধু বার্মা নয়, সমস্ত প্রাচ্য সম্পর্কেই এই ধারণা তৈরি করা হচ্ছে।

গান্ধী, নেহেরু, কুন্তলা কুমারী সবত প্রভৃতি ভারতীয়রাও বার্মিজ মেয়েদের সৌন্দর্য, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদিকেই চিত্রিত করেন তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু আসল অবস্থাটা ছিল বিপরীত, মরিচীকাসম। আসলে ব্রিটিশ এবং ভারতীয়রা বার্মিজ মেয়েদের খুবই অপছন্দ করত, তাদের বিবাহ নিয়মের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে, তাদের যৌন-শোষণ করত। তাদের মনোভাবের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাবো সারঙ্গীর লেখায়-

Burmese women are full of all manner of seductive tricks. They make you fall for them and then they loot everything you own. (Sarangi, 2010, page- 121)^{৪৩}

অথচ পুরুষদের দৈহিক বর্ণনা সবসময়েই ইউরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় সাহিত্যেই ভীষণ হীন, বর্ণ-জাতিবিদ্বেষ যুক্ত। তাই বর্ণনাগুলি এমন যেন এশিয়ান নারীদের এই সৌন্দর্য, শ্বেতাঙ্গদের, ভোগের জন্য, কারণ তারা উন্নত! খেয়াল করলেই দেখবো ‘পীতাতঙ্কের’ বর্ণনায় আমরা দেখাছি ইউরোপীয়রা চীনে মেয়েদেরও এই একই ভাবে চিত্রিত করেছে।

আমরা আগেই বলেছি যে পরিস্থিতি ছিল আসলে বিপরীত; বৃটিশ এবং ভারতীয় উভয়ের দ্বারাই বার্মিজ মেয়েরা বিশেষত যৌন-হেনস্থার শিকার হত।

আমরা এবার দেখবো বাংলা উপন্যাসে তার প্রভাব কীভাবে পড়েছে। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত এবং পথের দাবী উপন্যাসে তার কিছু ছবি আমরা পাবো। আমরা বার্মিজ মেয়েদের স্বাধীনতা বিষয়ে ইউরোপীয়ান এবং ভারতীয় এলিট দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছি। আর এও বলেছি যে বাস্তবে তার চেহারা ছিল ভিন্ন। ইউরোপীয়ান এবং ভারতীয়রা, উল্টে তাদের স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে তাদের অর্থনৈতিক এবং যৌন শোষণ করেছে।

দলে দলে ব্রহ্ম নর-নারী রেশমের পোশাক পরিয়া তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, সুতরাং আনন্দ উৎসবে তাহাদের সংখ্যাই অধিক...। ইহাদের রঙ অধিকাংশই খুব ফরসা; মেঘের মত চুলের বোঝা তো শতকরা নব্বুই জন রমণীর হাঁটুর নীচে পড়ে। খোপায় ফুল, কানে ফুল, গলায় ফুলের মালা- ঘোমটার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পালাইবার আগ্রাহাতিশয্যে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই- দ্বিধা-সঙ্কোচলেশহীন-যেন ঝরনার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে চলিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নিজেদের দেশের তুলনায় মনে মনে তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, এই ত চাই!^{৪৪}

খেয়াল করে দেখুন, ‘নারী-স্বাধীনতা’র কথা বলে এখানে যা আছে, তা নারীদের ‘চিরন্তন উপভোগ্য সৌন্দর্যের’ কথা!

এরপরেই আছে বাঙালি যুবক চারু তার বার্মিজ প্রণয়ীকে কীভাবে ঠকায় সেই প্রসঙ্গ। এটিই ছিল ‘দ্বৈত উপনিবেশ’ শাসিত বার্মার মেয়েদের অবস্থা। কথকের(শ্রীকান্তের) পর্যবেক্ষণ-

সেই দিন তাঁহার বার্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী এবং ভদ্র...।^{৪৫}

অথচ বার্মার মেয়েদের সম্পর্কে চারুর দাদার মন্তব্য-

বার্মা বেটিদের আবার কষ্ট! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না- না আছে এঁটোকাটার বিচার, না আছে একটা জাতজন্ম। বেটিরা সব নেন্দ্রী খায়, মশাই নেন্দ্রী খায়!... একটা যাবে, আরেকটা পাকড়াবে- ছোটজাত ব্যাটার।^{৪৬}

চারু যেভাবে তার বার্মা স্ত্রীকে লুণ্ঠ করে, তাকে ব্যঙ্গ এবং অপমান করে বাংলায় ফিরে যায়, শ্রীকান্ত তার বর্ণনা দিয়েছে, অথচ বার্মিজ মেয়েটির ভালোবাসা ছিলো খাঁটি

বাস্কাটা কথঞ্চিৎ মার্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়- একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আনিব তা আমিই জানি। ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে,...এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙ্গালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙ্গলা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সাত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, মোটে পাঁচশ টাকা তামাক কিনতে দিলি- আর যে তোর কিছু নেই- পেট ভরল না- অমনি তো বাড়িটাও বিক্রি করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত বুঝতাম একটা দাঁও মারা গেল। এ যে কিছুই হল না রে!...মেয়েটির হাতে সাবেক-কালের একটি ভাল চুনির আংটি ছিল, সেইটির উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই!... মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল...। আমি কেবল সেই সকলের হাসি তামাশার পাত্রী বোকা মেয়েটার অপারিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত শুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।^{৪৭}

এগুলি সবই পীতাতঙ্কের বিস্তৃত সাহিত্যিক স্বরূপ। বার্মা প্রসঙ্গে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক এমনটাই ছিল। ভারতীয়দেরও তাই। আয়রনি হল, বৃটিশরা ভারতীয়দের সম্পর্কে বা বাঙালিদের সম্পর্কেও একই একই মত পোষণ করত। কিন্তু একশ্রেণির বাঙালির অন্ধ প্রভুভক্তি এই অনুসারী সাহিত্য ধারার জন্ম দেয়। এবার আমরা সরাসরি আমাদের আলোচ্য পাঠ বা উপন্যাস গুলির আলোচনায় যাবো।

রহস্য-লহরী সিরিজ মূলত অনুবাদের মাধ্যমে এই ধরণটিকে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত করিয়ে দেয়। নিশ্চিতভাবে বটতলা বা অন্যান্য ছোটো প্রকাশনাও ছিল, কিন্তু তার প্রমাণ, দাখিল করা, আরও কঠিন শ্রমসাধ্য, কারণ এতদিনবাদে সেগুলি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তারপর প্রধানত মৌচাক এবং অন্যান্য পত্রিকা এই ধারাটিকে একরকমের মৌলিকতা দেয়। মান্য লেখকেরা এই গল্পগুলির রচয়িতা ছিলেন তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। এরপর আসে দেবসাহিত্য কুটিরের ভূমিকা; তাদের প্রকাশিত বই এবং সম্পাদিত কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং প্রহেলিকা ইত্যাদি সিরিজ। এখন আনন্দমেলা এবং অন্যান্য পূজাবার্ষিকী বা স্বতন্ত্র প্রকাশিত বইয়ে, অন্যান্য ছোটো বড় প্রকাশনা সংস্থা বাংলা সাহিত্যের এই ধারাটির বাহক। মানের প্রশ্ন, পাঠকের বিবেচনা বুদ্ধি, লেখক পাঠক দায়িত্ববোধ অবশ্যই খুব জরুরি।

এই অধ্যায়ে মূলত দেখেছি, পীতাতঙ্ক, বুদ্ধ-বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষের সঙ্গে যুক্ত একটি প্রকল্প। প্রাচ্যসম্পর্কে একটি ‘জেনোফোবিক’ ভ্রান্ত ধারণাকে গোটা পৃথিবীতে জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে।

‘শ্বেতাঙ্গমনস্ক’ বাঙালিরা তাকেই প্রাচ্যে প্রচার করছে। পরের অধ্যায়ে আমরা এই ধরনের বাংলা-উপন্যাসগুলি আলোচনা করবো।

তথ্যসূত্র

- ১। Peter Barry, *Beginning Theory*, An Introduction to Literary and Cultural Theory, Third Edition, Viva Books, New Delhi, 2017, Page No. 188-189
- ২। Michael Niemann, *The Politics of Crime Fiction is Seeking Resolution in Fiction an Inherently Conservative Choice?*, Coffeetown Press, May 31, 2018
<https://crimereads.com/the-politics-of-crime-fiction/>
- ৩। Michael Niemann, *The Politics of Crime Fiction is Seeking Resolution in Fiction an Inherently Conservative Choice?*, Coffeetown Press, May 31, 2018
<https://crimereads.com/the-politics-of-crime-fiction/>
- ৪। নীহাররঞ্জন রায়, *কিরীটি অমনিবাস*, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ ৩
- ৫। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *ব্যোমকেশ সমগ্র*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৩, পৃ ৫
- ৬। সত্যজিত রায়, *ফেলুদা সমগ্র*, ১ম খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ২১
- ৭। জীবনানন্দ দাশ, *মহাপৃথিবী*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃ ৩২
- ৮। John W. Dower, *Patterns of a Race War (1986). in Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear*, John Kuo Wei Tchen and Dylan Yeats (eds), Verso, London, 2014, Page No. 285- 86
- ৯। Alex Marshall, *The Russian General Staff and Asia, 1800-1917*, (chapter: China, Europe and the ‘Yellow Peril’) Routledge, 2006Page No. 71-72
- ১০। Gregory Lee, *Chinese Migrants and The “Inundation” Metaphor: risk. Representation, Repression: Constructing and Manipulating Fear of the Chinese other*. EastAsiaNet Workshop “Framing Risk: Hazard Perception as a Crucial Factor in Imagining East Asia”, Jun 2007, Lund, Sweden, halshs- 00188544
- ১১। John Johnson, *How Los Angeles Covered Up the Massacre of 17 Chinese*, LA Weekly. 10 March, 2011. Retrieved 18 March 2020.
- ১২। Andrew Gyory, *Closing the Gate: Race, Politics, and the Chinese Exclusion Act*, Chapel Hill: University Of North Carolina Press. 1998, Page 10
- ১৩। Andrew Gyory, (1998), *Closing the Gate: Race, Politics, and the Chinese Exclusion Act*, Chapel Hill: University Of North Carolina Press. Page 15-53

- ၁၈။ Michael Odijie, *The Fear of 'yellow Peril' and the emergence of European Federalist Movement*, The International History Review, 2018, Vol. 40, No. 2, 358-375, Page No. 362
- ၁၉။ Forman, Ross G. *Peking Plots: Fictionalizing the Boxer Rebellion of 1900. Victorian Literature and Culture*, vol. 27, no. 1, 1999, JSTOR, www.jstor.org/stable/25058437. Accessed 18 Mar. 2020, Page No 19–48
- ၂၀။ Michael Odijie, *The Fear of 'yellow Peril' and the emergence of European Federalist Movement*, The International History Review, 2018, Vol. 40, No. 2, 358-375, Page No. 362
- ၂၁။ Michael Odijie, *The Fear of 'yellow Peril' and the emergence of European Federalist Movement*, The International History Review, 2018, Vol. 40, No. 2, 358-375, Page No. 360-62
- ၂၂။ Frank B. Tipton, *A History of Modern Germany Since 1815*, Continuum, London 2003, Page-223
- ၂၃။ Benjamin Welton, *The Yellow Peril: Asian Invasion in the Racist Literature of Yesteryear*, Article, The Airship, Surveying Literature, Art & Culture. Page No. 2
- ၂၄။ Jeremiah Curtin, *The Mongols a History*, with a Foreword by Theodore Roosevelt, Little, Brown, and Company, Boston, 1908
- ၂၅။ Jeremiah Curtin, *The Mongols a History*, with a Foreword by Theodore Roosevelt, Little, Brown, and Company, Boston, 1908
- ၂၆။ Jeremiah Curtin, *The Mongols a History*, with a Foreword by Theodore Roosevelt, Little, Brown, and Company, Boston, 1908, Page No, 412
- ၂၇။ Robert M. Zecker, *Race and America's Immigrant Press; How the Slovaks were Taught to Think Like white people*, the Continuum International Publishing Group, 2011, Page 165-166
- ၂၈။ Michael Odijie, *The Fear of 'yellow Peril' and the emergence of European Federalist Movement*, The International History Review, 2018, Vol. 40, No. 2, 358-375
- ၂၉။ Stanford M. Lyman, *The Yellow Peril Mystique: Origins and Vicissitudes of a Racist Discourse*, Springer, International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol.13, No.4, Summer 2000 (pp. 683-747), Page No. 690
- ၃၀။ Christopher Frayling. *The Yellow Peril: Dr. Fu Manchu & The Rise of Chinophobia*, Thames & Hudson, UK, 2014, Page No. 6
- ၃၁။ Christopher Frayling. *The Yellow Peril: Dr. Fu Manchu & The Rise of Chinophobia*, Thames & Hudson, UK, 2014, Page No. 13
- ၃၂။ Christopher Frayling. *The Yellow Peril: Dr. Fu Manchu & The Rise of Chinophobia*, Thames & Hudson, UK, 2014, Page No. 34

- ২৯। John Kuo Wei Tchen and Dylan Yeats (eds), *Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear*, Verso, London, 2014, Page No. 1
- ৩০। John Kuo Wei Tchen and Dylan Yeats (eds), *Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear*, Verso, London, 2014, Page No.7
- ৩১। Robert Sampson, *Yesterday's faces: A Study of Series Characters In The Early Pulp Magazines*, vol 3, Bowling Green State University, USA, 1987, page no.4
- ৩২। Robert Sampson, *Yesterday's faces: A Study of Series Characters In The Early Pulp Magazines*, vol 3, Bowling Green State University, USA, 1987
- ৩৩। Gina Marchetti, *Romance and the "Yellow Peril": Race, Sex, and Discursive Strangles in Hollywood Fiction*, University of California Press, London, 1993
- ৩৪। সিদ্ধার্থ গুহ রায়, *আধুনিক পূর্ব এশিয়া, চীন জাপানের ইতিহাস, প্রগতিশীল পাবলিশার্স, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১২ পৃ৪০-৬৯*
- ৩৫। Christopher Frayling. *The Yellow Peril: Dr. Fu Manchu & The Rise of Chinophobia*, Thames & Hudson, UK, 2014
- ৩৬। Christopher Frayling. *The Yellow Peril: Dr. Fu Manchu & The Rise of Chinophobia*, Thames & Hudson, UK, 2014
- ৩৭। Devleena Ghosh, *Burma- Bengal crossings: Intercolonial Connections in Pre-Independence India*, Routledge, Asian Studies Review, 2016, Vol. 40, Page No. 156-172
- ৩৮। Devleena Ghosh, *Burma- Bengal crossings: Intercolonial Connections in Pre-Independence India*, Routledge, Asian Studies Review, 2016, Vol. 40, Page No. 156-172
- ৩৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষুদিরাম দাশ, ভবতোষ দত্ত প্রমুখ (সম্পাঃ)রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৯, পৃ ১৫৬- ১৫৮
- ৪০। Andrew Selth, *Colonial-era Pulp Fiction portrays 'Technicolor' Myanmar*, article, NIKKEI, Asian Review, July 11, 2016
- ৪১। সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ ৮৭*
- ৪২। Devleena Ghosh, *Burma- Bengal crossings: Intercolonial Connections in Pre-Independence India*, Routledge, Asian Studies Review, 2016, Vol. 40, Page No. 164
- ৪৩। J. Sarangi(1918,2010), *Rangoon song*, In J.K. Nayak & P. Bhaumik(eds.) *Memories, images, imagination: An anthology of Bangla and Oriya writings on colonial Burma* (pp-119-127), Calcutta, Department of Comparative Literature, Jadavpur University.
- ৪৪। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র রায় (সম্পাঃ), *শরৎ রচনাবলী*, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৩৮২, পৃ ১০৩

৪৫। তদেব, পৃ ১২০

৪৬। তদেব, পৃ ১২১

৪৭। তদেব, পৃ ১২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

পীতাতঙ্ক এবং বাংলা উপন্যাসের উত্তরাধিকার

০এই অধ্যায়ে, আগের অধ্যায়ে, পীতাতঙ্ক-প্রকল্প আলোচনার নিরিখে, তার প্রভাব বাংলা উপন্যাসের ওপর আলোচিত হয়েছে। সবার আগে স্মরণ করতে হয় দীনেন্দ্র কুমার রায়ের নাম। তাঁর অনূদিত রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা গল্প সেকালে ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। দীনেন্দ্র কুমার রায়ের এই গল্পগুলি পীতাতঙ্কের ইউরোপীয় ধারাকে সরাসরি বাংলা সাহিত্যে বাঙালি পাঠকদের মধ্যে গৃহীত, অভিযোজিত এবং অভ্যস্ত করে তোলেন। দীনেন্দ্রকুমারের বেশিরভাগ গল্পের ‘গোয়েন্দা-নায়ক’, ব্লেক, তার সঙ্গী স্মিথ, সঙ্গী না বলে তাকে অধস্তনকর্মী বলাই সমীচীন কারণ স্মিথ ব্লেককে সম্বোধন করত ‘কর্তা’(স্যার এর বাংলা) বলে। ইনিও শার্লক হোমসের অনুকরণে বেকার স্ট্রীটের বাসিন্দা। ব্লেক এর পরিচয় ইউরোপে হ্যারি ব্লিথ(Harry Blyth) বা হাল মেরেডেথ(Hal Meredith) এর “দ্য মিসিং মিলিওনিয়ার” গল্পে পাওয়া যায়। এছাড়াও পীয়ের কুইরোল(Pierre Quiroule) এর “দ্য মিস্ট্রি অফ কোভেরসম স্কোয়ার”(The Mystery of Caversham Square) ইত্যাদি গল্পে পাওয়া যায়। জনপ্রিয় ম্যাগাজিন-সাহিত্যে গোয়েন্দা ব্লেক লন্ডনে ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। বোঝাই যায়, জাহাজ-বোঝাই এই ধরনের বই, শিক্ষিত বাঙালির মন কেড়েছিল, তাই দীনেন্দ্রকুমার রায়, বাংলা ভাষাতেও তাকে জনপ্রিয় করার ভার নেন।

যদিও দীনেন্দ্রকুমার তাঁর উপন্যাসগুলিতে কোথাও, কোথা থেকে তিনি অনুবাদ করছেন সেকথা বলেন নি। আমরা তাঁর কয়েকটি উপন্যাস ব্যাখ্যা করে মূল প্রবণতাগুলি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু মুশকিল হল, দীনেন্দ্র কুমার রায়ের অধিকাংশ উপন্যাসই এখন আর তেমন সহজলভ্য নয়। দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) ১৮৯৮ সালে তিনি বরোদায় অরবিন্দের বাংলা শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯০০ সালে সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হন। এই সময়েই তিনি

বসুমতী কার্যালয় থেকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, উপন্যাস এবং গল্প বিষয়ক ‘নন্দন-কানন’ মাসিক পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। এর প্রকাশকাল ১৩০৭সাল। নন্দন-কানন সিরিজ বা রহস্য-লহরী সিরিজে ব্লককে নিয়ে প্রায় ২১৭ টি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নিবেদনে তিনি লেখেন-

বঙ্গদেশে এখন মাসিক পত্রিকার অভাব নাই; বঙ্গদর্শনের যুগের সহিত তুলনা করিলে, সেকালে আর একালে কি প্রভেদ! এখন সহরে মফস্বলে সর্বত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা শ্রেণীর, নানা আকার বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকার অস্তিত্ব বর্তমানে দেখা যায়; কিন্তু এ কথা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, ইংলণ্ডের Monthly Magazine of Fiction প্রভৃতির ন্যায় সর্ব সাধারণের পাঠোপযোগী সুন্দর গল্পপূর্ণ মাসিক পত্রিকার এদেশে আজও প্রচলন নাই; আমাদের বঙ্গসাহিত্যের ইহা একটি প্রধান অভাব। সেই অভাব দূর করিবার জন্য, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে, অভিনব শতাব্দীর আবির্ভাবের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ আমরা ‘নন্দন-কানন’ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। ...১ লা জানুয়ারি, ১৯০১ সাল।^১

ভারতী, দাসী, সাধনা, প্রদীপ, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী প্রভৃতিতে তাঁর লেখা বিপুল পরিমাণে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত লেখাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল- বাসন্তী(গল্পসমষ্টি, ১৮৯৮), হামিদা (গুজরাটে থাকাকালীন লেখেন), ঐতিহাসিক উপন্যাস(১৮৯৯), পট (ডিটেস্টিভ গল্পসমষ্টি, ১৯০১) ইত্যাদি; অজয়সিংহের কুঠি (১৯০২), এর নিবেদন অংশে আছে-

ফরাসী দেশ এখন ‘ডিটেস্টিভ’ উপন্যাসে শীর্ষস্থানে বিরাজিত। ফরাসী সাহিত্যে সেই সকল উপন্যাসের কতখানি প্রভাব, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; তবে সেই উপন্যাসগুলি বড়ই সুপাঠ্য; তাহাদেরই একখানির আখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া বর্তমান উপন্যাস রচিত হইয়াছে।^২

এছাড়াও সচিত্র আরব্য উপন্যাস(১৯০২), নেপোলিয়ন বোনাপার্ট(১৯০৩), পল্লীচিত্র(১৯০৪), চীনের ড্রাগন(ডিটেস্টিভ গল্প, ১৯১৪), পল্লীকথা(১৯১৭), তালপাতার সিপাই(সচিত্র উপকথা, ১৯২৩), অরবিন্দ প্রসঙ্গ(১৯২৪) ইত্যাদি রচনা করেন।

উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে আমরা জানতে পারছি তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা কতটা প্রভাবিত এবং পরিচালিত ছিলেন। আমরা এতক্ষণ পাশ্চাত্যের একটি বিশেষ আখ্যান নির্মাণের রাজনীতি নিয়ে, তার কতকগুলি প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সেগুলো ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছেছিল উপনিবেশের কালে। এবং ইংরাজিতে পড়েই বাঙালি পাঠক-লেখক-অনুবাদকেরা, ক্ষান্ত হন

নি; দীনেন্দ্রকুমার রায় ও অন্যান্যরা সেগুলি সরাসরি অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এনেছেন। কখনও অনুবাদ না করে, প্রবণতা গুলিকে গ্রহণ করে নিয়ে একই প্রবণতার মৌলিক আখ্যান তৈরি করেছেন। সাধারণ বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এই গল্পগুলির জনপ্রিয়তার কিছু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে-

যদি কাজ করিতে হয়, তা হইলে যে এই ভাবেই সমাজ ও দেশের সেবা করিতে পারি; কর্তব্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য, ধর্মের ও মনুষ্যত্বের জন্য- এই ভাবেই নিশি-দিন বিপদ ও মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করি। কৃতান্তোপম আততায়ী-হস্তে নিপতিতা বিপ্লবী যুবতী বিপদ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াও কি ভাবে স্বীয় মান-সম্মত রক্ষা করিয়া নারী জাতির নমস্যা হইতেছেন,- তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যদি এদেশের রমণী-সমাজের নয়ন-সমক্ষে উদ্ঘাটিত করা যায়,- তবে তাহা কোন যুক্তিতে নিন্দিত হইবে? 'রহস্য-লহরী' বালক, যুবক বৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জনের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গ-অন্তঃপুরে 'রহস্য-লহরী' একটি নতুন রসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছে। ইহা বালিসের তলে লুকাইয়া রাখিয়া গোপনে পাঠ করিতে হয় না। বিদ্যালয়ের তরুণ বয়স্ক ছাত্রও অসঙ্কোচে তাহার পিতার নিকট হইতে 'রহস্য-লহরী' চাহিয়া লইয়া পাঠ করিতে পারে। ...বঙ্গের মাতৃগণ, ভগিনীগণ, কন্যাগণ,- শিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাগণ কি পুরুষগণের ন্যায় ইহাকে তাঁহাদের অবসর-সহচরীরূপে গ্রহণ করিবেন না?^৩

পিশাচ পুরহিত উপন্যাসের নিবেদন অংশে দীনেন্দ্রকুমার রায় লিখছেন-

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে গল্পপুস্তক ও উপন্যাসের অভাব নাই; বঙ্গের সুলভ মুদ্রাযন্ত্র হইতে অল্পমূল্যের চটি উপন্যাস যে কত বাহির হইতেছে, বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের লাইব্রেরীয়ান মহাশয় ভিন্ন অন্যের তাহা ধারণা করা কঠিন, আবার যে উপন্যাস যত অধিক অপাঠ্য, তাহার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরও ততোধিক! বাঙ্গালা দেশের এখন উপন্যাস ও কেশতৈল, উভয়েরই অবস্থা একরকম; যাহার কোনো উপলক্ষ্য নাই, সে নভেল লেখে না হয় মনভুলানো নাম দিয়া একটা কেশতৈল বাহির করে উভয়েরই, উদ্দেশ্য মস্তিষ্কচর্ষণ! দেখিয়া শুনিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজ উপন্যাসের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে প্রতিমাসে যে রাশি রাশি উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে কয়খানি উপন্যাস সরলমতি বালক বালিকাগণের হস্তে বা শুদ্ধান্তবাসিনী মহিলাবর্গের করকমলে অসঙ্কোচে প্রদান করিতে পারা যায়? বিকৃত প্রেমের গল্প, উৎকট গোয়েন্দা-কাহিনী, ভীষণ হত্যারহস্য ও রোমাঞ্চকর 'মিস্তি' এখন উপন্যাসের প্রধান উপসর্গ। শিক্ষিত পাঠক সমাজ আর এসকল চর্বির্ভর চর্বির্ভর পক্ষপাতী নহেন। আমি 'জাল মোহান্তে' যে নতুন আদর্শের অনুসরণ করিয়াছিলাম 'পিশাচ পুরহিত'ও সেই আদর্শে রচিত।

...বাঙ্গালী আজ পৃথিবীর চতুঃপ্রান্তে কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয়ে পাশ্চাত্য জগৎ পর্য্যন্ত মুগ্ধ; বাঙ্গালী ভবিষ্যৎপুণে পৃথিবীর কর্মশীল জাতিসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা আকাশকুসুম বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সমগ্র পৃথিবী যদি এখন উপন্যাসে বাঙ্গালীর কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়, তবে তাহা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব বলিয়া কেহ নাসিকা কুণ্ঠিত করিতে সাহস করিবেন না।

‘পিশাচ পুরহিত’ের পরিকল্পনার জন্য আমি যে কল্পনাকুশল প্রতিভাবান্ ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের নিকট ঋণী, তিনি বর্তমান যুগে গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের উপন্যাসানুরাগী পাঠকবৃন্দের নিকট সুপরিচিত, সর্বত্রই তাঁহার আশাতিরিক্ত সমাদর; সুতরাং ‘পিশাচ পুরহিত’ও যে আশ্রয় ভারতের সর্বত্র সাহিত্যরসজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকসমাজে সমাদৃত হইবে, ইহা দুরাশা না হইতেও পারে; কারণ জাতি ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতি দেশভেদে বিভিন্ন হইলেও মানবের হৃদয়বৃত্তি সর্বত্রই এক সাধারণ নিয়মের অধীন। (মেহেরপুর নদীয়া, শ্রীপঞ্চমী, মাঘ, ১৩১৭, দীনেন্দ্রকুমার রায়)^৪

ন্যায় কর্তব্য, ধর্ম মনুষ্যত্ব বলতে, কোন-প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে, আলোচনায় ক্রমশ তা স্পষ্ট হবে। এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে বিদেশের প্রভাব, এই বিশেষ সংস্কৃতির ওপর অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা আগে বলেছিলাম বটে, যে বিদেশী পাল্ল-ফিক্সনের অস্বাভাবিকতা, বিকৃতি বাংলা উপন্যাসে তেমন পাবো না। কিন্তু তা মান্য সাহিত্য বিষয়ে মন্তব্য। বটতলার সাহিত্যে বা চটি-সাহিত্যে ইয়েলো পেরিল বা এশিয়া সম্পর্কে ‘যৌনতা’ এবং ‘বিকৃতি’(শব্দটি আপেক্ষিক, অবশ্যই প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়) নির্ভর গল্প ভরপুর ছিল। কিন্তু সেগুলি বেশীরভাগই হারিয়ে গেছে, বা খুঁজে পাওয়া বেশ শ্রমসাধ্য। আর আমাদের বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ আলোচনায় সেগুলো আসার কথা নয়। আমরা প্রবণতা এবং চিহ্নগুলি উল্লেখ করে রাখলাম মাত্র। তবে নীহাররঞ্জন গুপ্ত এবং অন্যান্যদের লেখায়(ড্রাগন সিরিজ), এর কিছু কিছু প্রবণতা(দস্যুদের সহচরীদের বর্ণনায়, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে) ব্যবহৃত; তবে তুলনায় পরিশীলিত। রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা সংস্কৃতির সঙ্গে যৌনতা নিয়ে আলাদা গবেষণা করা যেতে পারে। একমাত্র ব্যতিক্রম সত্যজিতের ফেলুদা। সত্যজিত রায় এই সমস্ত প্রবণতা এবং চিহ্নগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি সচেতন ভাবে বেশ কিছু প্রবণতা বাদ দিয়েছেন। যেমন- পীতাতঙ্কের প্রবণতা; আমরা যথাসময়ে আলোচনা করবো। হয়ত, সত্যজিত এই চ্যালেঞ্জটি নিয়েছিলেন যে যৌনতা ছাড়া কীভাবে টানটান গোয়েন্দা গল্প সৃষ্টি করা যায়? শার্লক হোমস দ্বারা প্রভাবিত হলেও কোনো আইরিশ অ্যাডলারের সুযোগ তিনি তৈরিই করেন নি? এবং জটায়ুর আখ্যানের ধরণ- যা বাংলা সাহিত্যে সত্যজিতের আগে থেকে সমান্তরালেও চলছিল তাকে ফেলুদার মাধ্যমে ক্রমাগত বিকল্প করা তো আছেই। কখনও এই বিষয়ে আলাদা আলোচনা করার অবকাশ রইল। আবারও উল্লেখমাত্র করে রাখলাম আমরা।

আমাদের এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে, এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মানুষ প্রসঙ্গে, বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত দেশ প্রসঙ্গে, বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বস্তু-বিষয় সম্পর্কে, এই পর্যায়ে লিখিত উপন্যাসগুলি যে মতের প্রতিধ্বনি করছে, তা ইউরোপের দৃষ্টিভঙ্গিই, এবং তা ‘পীতাতঙ্কের’ সঙ্গে যুক্ত।

যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে, তার আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত; তাকেই ঔপনিবেশিক প্রভাবের ফলে ‘হীন, অপর, লঘু, অচেনা’ করে দেওয়া হচ্ছে সচেতন বা অচেতনভাবে। এবং ভারতবর্ষের ভূখণ্ড এই ‘ইউরোপীয় জেনোফোবিয়ার’ দ্বারা চালিত হয়ে তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ, ঘৃণা, বৈষম্যমূলক ঘৃণায়, হিংসায় জড়িয়ে পড়ে ‘ইউরোপীয় এবং শ্বেতাঙ্গ’ স্বার্থকেই চরিতার্থ করছে। যা কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক- সমস্ত দিক থেকেই তার ঐতিহ্যকে হীন করে, তাকে ইউরোপ-আমেরিকার মুখাপেক্ষী এবং নির্ভরশীল করে তুলেছে। শুধুমাত্র প্রতিবেশি নয় দেশের মধ্যেও ধর্ম-বর্ণ-জাতি সম্পর্কে ‘অপর’ এর মনোভাব আমাদের ঐক্যের পথেও অন্তরায় হয়ে রাষ্ট্রের বা ক্ষমতার হাতকেই আরো মজবুত করে তোলে।

এই অধ্যায়ে যে ভাবনার পরিচয় আমরা পাবো তা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শরচ্চন্দ্র দাশ, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ প্রমুখের গবেষণা, রবীন্দ্রনাথের ভাবনার প্রায় বিপরীতধর্মী। যে বৌদ্ধধর্ম(সংস্কৃত, যাকে সংস্কার করা হয়েছে), বা বুদ্ধকে মুখ করে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের ঐক্যের এবং জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পীতাতঙ্কের প্রতিধ্বনি হয়ে এই উপন্যাসগুলির মাধ্যমে বিপরীত একটি ভাবনাকে বাঙালি পাঠকের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলল বা তুলেছে। একথার জন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই, যে, রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যার তুলনায় এই উপন্যাসগুলির পাঠক সংখ্যা এবং প্রভাব অনেক বেশি।

পাঠক অভিজাত, মান্য সাহিত্যের, নাগরিক পাঠক এই ভাবনার দ্বারা পরিচালিত। তার কারণও আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, বুদ্ধ বা খেরবাদী বৌদ্ধধর্মকে এখানে সরাসরি আক্রমণ করা হচ্ছেনা। আক্রান্ত হচ্ছে, সাধারণ, প্রান্তিক বৌদ্ধরা(এরা সকলেই সাহিত্যে টাইপ

চরিত্র), এবং তাদের ধর্মচর্চার ধরণ। যেন বা হিন্দু-নাগরিক-মান্য-কেন্দ্রীয়-পুরুষতান্ত্রিক-অভিজাত শ্রেণি সিদ্ধান্ত নেবে যে কেমন করে প্রান্তিক মানুষেরা বৌদ্ধধর্ম পালন করবেন! ফলে প্রতিক্ষেত্রে তাদের মূর্তি, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় রীতি-নীতি, পোশাক, বর্ণ, দেহ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমস্ত কিছু নিজিতে মাপা হবে, তুলনা করা হবে, এবং প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রান্তিক মানুষেরা ‘হীন, অপর, একরৈখিক, সীমাবদ্ধ’ খোপে পড়ে হেরে যেতে থাকবে। হিন্দু-নাগরিক-মান্য-কেন্দ্রীয়-পুরুষতান্ত্রিক-অভিজাত-হেটেরোনরম্যাটিভ শ্রেণির সংস্কৃতি জিতে যাবে। এর জনপ্রিয়তা কারণ খুব সহজ। বেশির ভাগ লেখক এবং পাঠক এই শ্রেণির বা এই ভাবনার দ্বারাই পরিচালিত। তারাও এই মান্যতাকেই পণ্য করে বিক্রি করেন। মহৎ সাহিত্য- সমাজের এবং মানবিকতার প্রতি ঐক্যের রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধ থাকার মানসিকতা তাদের নেই। নেই, গবেষণা, গভীর ইতিহাসের, মননশীলতার ছাপ, নেই সংবেদনশীল মন। সাহিত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়, নৈতিক শিক্ষার জন্য তো নয়ই, সেকথা স্বীকার করি কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন সাহিত্য রচনার দায় অন্তত নেওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলি পণ্য নিঃসন্দেহে ব্যান হওয়ার যোগ্য, কিন্তু তা হলেও আমরা আমাদের সাহিত্যে, মানসিকতায়, কথাবার্তায়, ব্যবহারে যে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভলির ভাবনাকে বহন এবং প্রচার করে থাকি তা আরও বেশি ক্ষতিকর। মানসিকতা বদলালে পণ্য বিক্রি হবে না, আর মানসিকতা না বদলালে পণ্য ব্যানে কোনো লাভ নেই! তবে মানসিকতা বদলানো রাজনৈতিক-দায়িত্ব আর পরিশ্রমের কাজ, আমাদের, বেশিরভাগের কাছে সেই বিকল্প কখনই গ্রহণযোগ্য নয়!

কিন্তু পণ্যের বাজার বিজ্ঞাপণ বোঝে! বিজ্ঞাপণই সাহিত্যের মান নির্ণয় করে। যত বাজারীকরণ হবে দায়িত্ব তত কমবে, বিজ্ঞাপণই পণ্যের মান এবং বিক্রি নির্ধারণ করবে। চাহিদা এবং বিক্রি দুটিকেই ম্যানিপুলেট বা নির্মাণ করা হবে এবং হচ্ছে। বিক্রিই মান নির্ধারণ করলে, জীবনানন্দের নাম শোনারই কথা ছিল না প্রায়। এবং আরও অন্যান্য বহুজনের নাম করা যায়। সাহিত্যের সঙ্গে যত বেশি দর্শন- ইতিহাস- রাজনীতির(দেশীয় এবং মানবিক, ব্যক্তিগত নয়) যোগ ক্ষীণ হবে তত এই প্রবণতা বৃদ্ধি

পাবে। রাজনীতিহীনতার এবং নিরপেক্ষতার দাবী আসলে রাজনীতির সবচেয়ে হীন দিক। আর পাঠকের মধ্যে বিবেচনার থেকে ‘ইচ্ছেপূরণ’; ভাবনার খোরাকের বদলে অভ্যাস যত বৃদ্ধি পাবে তত সাহিত্যের মান এবং ধরণ নিম্নমুখী হবে। বিশ শতকের গোড়ার দিকের এই ধরণের উপন্যাস গুলির মান আর আমাদের সাম্প্রতিককালের ‘আমরাই নতুন, অভিনব’ বলে দাবী করা ধরণগুলির মান এক নয়। আমাদের আলোচনাতেই এই অধোগামীতা স্পষ্ট হবে। যদিও ব্যতিক্রম আছে।

আমরা আগেই বলেছি এই ধরণের উপন্যাসগুলি সবসময় ক্ষমতা-রাষ্ট্র-শাসক-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে নির্মিত হয়(যতই ব্যঙ্গ করা হোক, ওটা প্রলেপ মাত্র)। ফলে উপনিবেশের যুগে এই উপন্যাসগুলি ইংরেজদের শাসনব্যবস্থাকে তাদের ক্ষমতার এবং প্রতিরক্ষা টুলস (অ্যাপারটাস, স্টেট অ্যাপারেটাস বা চিহ্ন) কে দৃঢ় ভিত্তি দেয়, মানুষের মনে প্রশ্নহীন নির্ভরতা এবং বিশ্বাস গড়ে তোলে। আশঙ্কা তৈরি এবং সেখান থেকে মুক্তি, অনবরত সমস্যা ও তার সমাধান জনমানসের রাষ্ট্র সম্পর্কে ক্ষোভকেও প্রশমিত করে। সুরক্ষার প্রশ্নই তাদের কাছে বড় করে তোলে, যার সমাধান একমাত্র রাষ্ট্রের হাতে। ফলে উপনিবেশের শাসক বা উওর-উপনিবেশ পর্বের শাসক সকলেই এই ধরণের গল্পগুলিকে প্রচারে বিশেষ সাহায্য করে। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদেরই স্বার্থসিদ্ধি হয়। এবং বাজারেরও সর্বদা বিক্রিত জনপ্রিয় সংরূপ, এই পণ্যের বিক্রি পরীক্ষিতভাবে সফল। পাঠকের, দর্শকের(সিনেমা বা সিরিয়ালে) সমস্যা এবং সমাধান দুইই একই গল্পে হাজির। পরে সেই ভাবনাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চাপ নেই। গভীর, ভাবনা-চিন্তার খোরাক ধর্মী, দেশ-কাল-সমাজ-মানুষের সম্পর্কে গভীর, জটিল গুরুতর বোধ তাদের সংশয়ে রাখে, চিন্তা করতে বাধ্য করে... এর চেয়ে আখ্যানে সমস্যা তৈরি পাঠকের কৌতূহল নির্মাণ এবং ‘নায়ক’ বা ‘গোয়েন্দা’র সমাধানে সংশয়মুক্তি। এ অনেক সহজ! আবার বলছি সব আখ্যান সমান নয়। উৎকৃষ্ট রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা আখ্যান গোটা পৃথিবীজুড়ে বর্তমান। আমরা একবারও বলছি না এই সংরূপটির কোনো লঘুতা আছে। বরং উলটো কথাই বলতে চাইছি। যা বারবার বলতে চাইছি- জনপ্রিয়তা, বেশি বিক্রি, সাহিত্য সম্পর্কে প্রশ্নহীন আনুগত্য তৈরি করতে পারে না। যেকোন সাহিত্য

প্রশ্নযোগ্য, বিবেচনাধীন, সমালোচনার আওতায় হবে এটাই কাম্য। আমরা অত্যন্ত প্রচলিত ধরণগুলির কথাই বলছি, বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ধরণ উপস্থিত। কিন্তু তা বেশি মাত্রায় অনুকরণ বা অনুসরণ করা হয় নি। আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসগুলির আলোচনায় সরাসরি চলে যাবো।

(১)

আমরা মূলত, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের *জাল মোহান্ত*(১৯০৯), *পীতাতঙ্কের প্রতিকার*(১৯২৩), *চীনের চালবাজি*(১৯২৭) নিয়ে আলোচনা করবো।

জাল মোহান্ত র ভূমিকায় খেয়াল করবো কীভাবে কোন প্রবণতার দ্বারা দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর উপন্যাসটি প্রচার করছেন বা বিজ্ঞাপিত করছেন-

...সাধারণত প্রেমের উপন্যাস ও ডিটেক্টিভ উপন্যাসগুলিই এত দিন বাঙ্গালদেশে বঙ্গীয় পাঠক সমাজের সাহিত্য-রস-লিপ্সা পরিতৃপ্ত করিয়াছে; কিন্তু অধুনা বঙ্গদেশে যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছে- তাহাতে লঘু সাহিত্যের পাঠকগণ আর প্রেমের গল্প বা গোয়েন্দার কাহিনীতে সন্তুষ্ট নহেন; এই স্বদেশীয় যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহের ছায়ায় ছায়ায় সরকারের পোষা গোয়েন্দার অভাব নাই, এ অবস্থায় কৃত্রিম গোয়েন্দার উপন্যাসে আর কাহার রুচি থাকিবে? প্রেমের উপন্যাসেরও আর কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নাই; হাসি, বাঁশী, চুসুন, বনপথে চারি চক্ষুর মিলন, বিরহ, দীর্ঘশ্বাস, এবং 'সখি আমায় ধর ধর'- ভাব বাঙ্গালায় পুরাতন হইয়া গিয়াছে, থিয়েটারে ও যাত্রায় পর্যন্ত তাহাদের গৌরব নাই!- এখন নূতন কিছু চাই।

কিন্তু নূতন কিছু শক্ত। এখন আধ্যাত্মিকতার বড় আদর; ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও যোগসাধনা এখন জড়বাদী ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মেসমেরিজম হিপনটিজম, উইলফোর্স লইয়া পাস্চাত্য জাতি উন্মত্তপ্রায়, কিন্তু তাহা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকরণমাত্র; এই উপন্যাসে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

যে সুবিখ্যাত পাস্চাত্য ঔপন্যাসিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তিনি যখন বিষয়-বৈচিত্র্যে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় লক্ষ লক্ষ পাঠককে মুগ্ধ করিয়াছেন, তখন আশা আছে বুদ্ধদেবের জন্মভূমিতে এই গ্রন্থ পাঠক সমাজে উপেক্ষিত হইবে না।^৫

দীনেন্দ্র কুমার রায়, ডিটেক্টিভ ব্লেকের গল্প-লেখক(অনুবাদক) হিসেবেই বেশি জনপ্রিয় কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি আধ্যাত্মিকতার ওপরে জোর দিচ্ছেন; এবং সেই আধ্যাত্মিকতা যা ইউরোপীয়দের মধ্যে জনপ্রিয়। আর সেই আধ্যাত্মিকতার আধার বৌদ্ধধর্ম। এই উপন্যাসটিও অনুবাদ বা অনুকরণ কিন্তু অনুবাদকের নাম জানান নি। সম্ভবত বাঙালি চরিত্রগুলিকে আখ্যানের সঙ্গে যুক্ত করাই লেখকের কৃতিত্ব;

বাকি আখ্যানটি তিনি অনুকরণ করেছেন। এই উপন্যাসে বৌদ্ধধর্মের ওপর আধ্যাত্মিক ভক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

জাল মোহান্ত, একটি চিঠি। কথককে তার বন্ধু নলিনী কারফরমা, চীন এবং জাপানের প্রেক্ষাপটে তার ‘অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি’ চিঠি লিখে জানান। সেই চিঠিই এই উপন্যাস। ‘বৌদ্ধপুথি উদ্ধার’ বিষয়ে পরবর্তীকালে আমরা অগুপ্তি রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা উপন্যাস পাবো। এই উপন্যাসটি তাদের মধ্যে অগ্রজ। আমরা আগেও বলেছি, ডঃ ফু-মাধু র জনপ্রিয়তার পর এই ধরনের চরিত্রগুলির পেশায় ডাক্তার হওয়া প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল! এখানেও জাপানী ডাক্তার অকুমা-র সহকারি হিসেবে নলিনী চীনের বেনজুরু মঠে অভিযান চালায় এবং সেখান থেকে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পুথি উদ্ধার(চুরি, কারণ পুথিটি মঠের বৌদ্ধদের সম্পত্তি) করে। এবং সেই মঠের অধিবাসীরা তা পুনরুদ্ধার এবং প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের তাড়া করে বেড়ায়, নলিনী এবং তার ‘জাপানি’ স্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়-এভাবেই উপন্যাস শেষ হয়। আমরা পুথিটির যে বর্ণনা পাবো-

...পালি ভাষায় লিখিত একখানি অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিলেন। মশালের আলোকে দেখিলাম এই পাণ্ডুলিপির কাগজ এত পুরাতন যে, তাহার বর্ণ পীতভ হইয়া গিয়াছে, এবং খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে; বোধ হইল পুস্তকখানি দ্বিসহস্রাব্দিক বর্ষের পুরাতন!^৬

এই অভিযানের উদ্দেশ্য কি?

অকুমা বলিলেন, “সেখান হইতে আমি যাহা যাহা লইয়া আসিয়াছি, কোটি মুদ্রা বিনিময়েও তাহা লাভ করা যায় না। নিউ ইয়র্কের বিজ্ঞান-সভায় এই সকল ঔষধাদি সম্বন্ধে যথাযোগ্য আলোচনা করিতে পারিব, সেই সকল ঔষধের গুণে এই কংগ্রেসে সমাগত সভ্যজগতের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতে পারিব, এই আশায় আমি নিউ ইয়র্ক যাত্রা করিয়াছি। বেনজুরু মঠে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার সাহায্যে চিকিৎসা জগতে কি যুগান্তর উপস্থিত হইবে, কিছু দিন পরে তুমি তাহা জানিতে পারিবে; সমগ্র সভ্য জগৎ আমাদের সেই বিপুল পরিশ্রমের ফল বুঝিতে পারিবে।^৭

আমরা একটু যদি খেয়াল করি তাহলে এখানে একটি চুরিকে ন্যায়সঙ্গত (লেজিটিমাইজ) এবং মহিমান্বিত করে ‘উদ্ধার’ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। যারা এই সম্পত্তি বা পুথির আসল মালিক তাদের অপরাধী (‘ক্রিমিনালাইজ’) করা হচ্ছে। এখানে চীনদেশ এবং মঠের অধিবাসীরা ‘ভিলেন’; ‘নায়ক’ জাপানী অকুমা

এবং বাঙালি নলিনী। অকুমা নিউ ইয়র্কে যে পুথি নিয়ে অর্থ-খ্যাতি-গৌরব উপার্জন করবে, তাতে তার কোনো অবদানই নেই, সেটিকে চুরি করে বিদেশে খ্যাতি অর্জনের বাসনা ছাড়া। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত বিভিন্ন জিনিস যা আসলে উপনিবেশ গুলি থেকে চুরি করে বা ছিনিয়ে নিয়ে আসা সেই সংক্রান্ত ‘রসিকতা’টির কথা মনে পড়বে!

এই ধরনের অভিযানে, সবসময়েই মনে করা হয়, যে, সেই মূল্যবান সামগ্রী বা সম্পত্তির মূল্য তার মালিক বা রক্ষাকর্তারা বোঝেনা, বা তার ‘যোগ্য’ লোক নয়! ফলে ‘মান্য, নাগরিক, অভিজাত’- ‘নায়ক’ এর যেন কর্তব্য অন্য জায়গা থেকে অন্য ভাবনা থেকে সেখানে প্রবেশ করে সেগুলি চুরি করে ‘মান্য জগতে’ (এখানে সেটি নিউ ইয়র্ক) খ্যাতি লাভ করা। যদিও উপনিবেশিক প্রভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই জায়গা ইউরোপ বা আমেরিকাই। এই নায়কেরা যে জায়গা (স্থান-নাম বা দেশ) থেকে আসে, প্রায় সবসময়েই সেই দুটি পরিবেশের/দেশের/ স্থানের তুলনা করা হয় এবং প্রতিক্ষেত্রেই নায়কের স্বভূমিকে গৌরবান্বিত করা হয়। ফলে অভিযানের কাহিনি গুলিও নিঃসন্দেহে ‘জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমের’ ভাবনার প্রচার এবং প্রসার ঘটায় অন্যকে বা ‘অপর’কে হীন প্রমাণ করে। দৃষ্টিভঙ্গি সব ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট পক্ষ মেনে চলে, তাকে প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার করতে চায়। তাই যেকোনো জাতি, যখনই তার মাহাত্ম্য প্রচার করতে চেয়েছে, তাদের সাহিত্যে ‘অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযান’ কাহিনি লেখার চল তত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে বাকিদের ‘অপর বা বিজিত বা পরাজিত’ করার শ্লাঘা বৃদ্ধি পায়। প্রায় সমস্ত রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা-অভিযান কাহিনি আসলে ‘ইচ্ছেপূরণে’ (উইস ফুলফিলমেন্ট)র আখ্যান।

আমরা আগেই দেখেছি যে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তার অধিকৃত ‘উপনিবেশ’ এবং প্রাচ্য সম্পর্কে কী ধরনের মনোভাব তার সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে প্রচার করছিল। এই ধরনের গল্পগুলি তাদের নিজের দেশের যুবকদের অভিযানে অনুপ্রাণিত করতেও ব্যবহৃত হত। তাদের কাছে প্রলোভন তৈরি করা হত- সহজে বিপুল পরিমাণ অর্থ সম্পত্তি উপার্জনের, এবং দায়িত্বহীন ভাবে সেই দেশের মেয়েদের সৌন্দর্য্য

ভোগের প্রলোভন। আমরা এই বিষয়ক উদাহরণ আগেই দিয়েছি। যেন বা রূপকথার ‘সহজ’ ফর্মুলা- অভিযান এবং অর্ধেক বা পুরো রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ। ইচ্ছেপূরণের গল্প। ক্ষমতার ছকটি বিভিন্ন সময় নতুন নতুন রূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের মনে পড়বে কিছুদিন আগেও ৩৭০ ধারা কাশ্মীর থেকে তুলে নেওয়ার সময় অনেক সাধারণ মানুষ পর্যন্ত ফ্যানাটিক হয়ে তাকে সমর্থন করেছিল- কারণ তারা ভেবেছিল কাশ্মীরে জমি কিনবে এবং কাশ্মীরি মেয়েদের ‘বিয়ে’ করবে!

বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে যে মতগুলি সাহিত্যে দেখা গেছে তা দুধরণের- এক, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আমরা যেমন দেখেছি, এবং ইউরোপীয় পীতাতঙ্কের অনুসরণে, এই বৌদ্ধরা কখনও দেশদ্রোহী, নিষ্ঠুর, যুদ্ধপ্রিয়, অস্ত্র-পারদর্শী, ভীষণ, ধূর্ত-চালাক, ব্যভিচারি, অপরাধী, লোভী ইত্যাদি। দুই, রবীন্দ্রনাথের ধারা(শরদিন্দু ইত্যাদি) অনুযায়ী অহিংসার-মূর্তি, দূরদর্শী, মানবিক, পণ্ডিত, শুভাকাজ্জী হিসেবে চিত্রিত করা।

আমরা এই অধ্যায়ে প্রথম ধারার কথাই পাবো, এবং এই ‘জেনোফোবিক’ ধারাই বাংলা সাহিত্যে(পৃথিবীর সাহিত্যেও) বেশি জনপ্রিয়। আমরা বলেছি, অভিযান- অ্যাডভেঞ্চার- রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা গল্পে, রূপকথার গল্পের একটি প্যাটার্ন কাজ করে।

(২)

ভ্লাদিমির প্রপ তাঁর ‘মর্ফোলজি অফ দ্য ফোক্টেল’ বইয়ে রাশিয়ান রূপকথার, আখ্যানতত্ত্ব বিচারের জন্য ৩১ টি ফাংশান এবং ৭ জন ‘ড্রামাটিস পার্সোনা’র কথা বলেন।^৮ ভ্লাদিমির প্রপের এবং পরবর্তী আখ্যানতাত্ত্বিকদের, রূপকথা বিচারের তত্ত্ব দিয়ে এই গল্পগুলিকে ব্যাখ্যা করা যায়। রূপকথার সঙ্গে এই গল্পগুলির বিশেষ পার্থক্য নেই, উভয়েই ‘ইচ্ছেপূরণের’, দুষ্টির দমনের বা প্রতিরোধের, ‘নায়ক’এর শ্রেষ্ঠত্বের গল্প; কখনও কখনও ‘নায়িকা’ বা সম্পত্তি লাভ(অর্ধেকরাজত্ব- ‘ট্রিফি’ বা পুরস্কার স্বরূপ) ঘটে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ‘নায়িকা’ তার, ‘চিরন্তন সৌন্দর্য্য নারীসুলভ গুণাবলী’ নিয়ে বিপদে পড়তে থাকে আর ‘নায়ক’ তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু এই সংরূপ এবং আখ্যানতত্ত্ব দিয়ে গল্পগুলি বিচার করা একটি

পৃথক আলোচনা-পরিসরের দাবী রাখে। এখানে আমরা প্রপের ফাংশান এবং তত্ত্বের উল্লেখটুকু করবো। তাতেই আমাদের বক্তব্যের খানিকটা সূত্র মিলবে। প্রপ যে ‘ড্রামাটিস পার্সোনা’ দের কথা বলেছিলেন সেগুলির বেশিরভাগ গুলিতে অনুসৃত হতে আমরা দেখি।

তাঁর মতে সাত ধরনের চরিত্র(ড্রামাটিস পার্সোনা) থাকে সাধারণত- দ্য ভিলেন(দুর্জন), দ্য ডিম্প্যাচার (প্রেরক), দ্য হেল্পার(সহকারি), দ্য প্রিন্সেস অর প্রাইজ(নায়িকা বা পুরস্কার), দ্য ডোনার(দাতা, সাহায্য বা সাহায্যকারী জাদু দ্রব্য দেয়), দ্য হিরো(নায়ক), দ্য ফলস হিরো (নকল নায়ক, বা ছদ্মবেশী)। বেশিরভাগ গল্পে বাকিগুলি থাকলেও ‘ফলস হিরো’ তেমন নাও পাওয়া যেতে পারে। ‘জাল মোহান্তে’ আমরা ‘ফলস হিরো’র ধারণার নতুনভাবে প্রয়োগ খেয়াল করবো। বাকিগুলি যে এই ধরনের আখ্যানে থাকে, তা সহজেই বোধগম্য।

আমরা ফিরবো জাল মোহান্ত প্রসঙ্গে। সেখানকার আরো কিছু মন্তব্য এবং উদ্ধৃতিতে আমরা প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরবো। আমরা আগেই বলেছি এখানে অভিযানের উদ্দেশ্য ‘চুরি’ মানে ‘উদ্ধার’! সেখানে বৌদ্ধধর্মকেও জুড়ে দেওয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে মত-

ডাক্তার অকুমা যে ধর্মসম্প্রদায়ের গুপ্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য আগ্রহবান হইয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ে অন্ততঃ দুই কোটী লোক আছে; এদেশে এমন কোনো নগর, এমন কোনও গ্রাম নাই, যেখানে এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক দেখা যায় না; কেবল এ দেশে নহে, জাপান, হিন্দুস্থান, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বহু দূরদেশেও এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোক অনেক আছে। ইহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিলে ইহারা একেবারে মরিয়া হইয়া উঠে। ডাক্তার অকুমা ইহাদেরই একজন প্রধান মোহান্তকে কৌশলক্রমে বহু দূরে নির্বাসিত করিয়া তাহার ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক মর্চে তাহার স্থান অধিকার করিতে চান।^৯

শেষের দুটি বাক্য খেয়াল করুন। ‘ইহাদের ধর্ম’ এবং ‘ইহারা’ শব্দদুটিই ‘অপরতা-বাচক’। উচাং মঠের মোহান্তের(কিন্তু যেহেতু এই ধর্মকে বিশেষ মান্যতা দেওয়া যাবে না, তাই এই মোহান্ত ধার্মিক নয়, অর্থলোলুপ) ছদ্মবেশ ধারণ করে, এই অভিযান চালানো হয় বলে গল্পের নাম, ‘জাল মোহান্ত’। নলিনী বৌদ্ধমঠের ‘দস্যু’দের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ‘ভগবান’ কে স্মরণ করে।^{১০} আমরা আগেই বলেছি

এসব ক্ষেত্রে ‘নায়কের’ ধর্মকে গ্লোরিফাই করা থাকে। এক্ষেত্রেও তাই। ‘নায়ক’এর ধর্মের প্রতি আস্থা এবং তার ধর্ম যে শ্রেষ্ঠ একথা পরোক্ষভাবে আখ্যানে নিহিত থাকে।

আমাদের দ্বিতীয় উদাহরণ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা ‘চীনের চালবাজি’(১৩৩৪/১৯২৭)। এটিও অনুবাদ। ডিটেক্টিভ, ব্লেক এবং প্রতিপক্ষ চীনের রাজপুত্র আউ-লিং। আউ-লিংকে নিয়ে একাধিক উপন্যাস আছে। যথারীতি এই উপন্যাসগুলিতেও আউ-লিং বারবার পরাজিত হয়ে নতুন শক্তি হিসেবে ফিরে আসে, ব্লেক, তাকে, চূড়ান্ত পরাজিত করতে পারে না। দীর্ঘকাল থেকে সাফল্যের সঙ্গে অনুসৃত পীতাতঙ্কে জীইয়ে রাখার ফর্মুলা- আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আউ-লিং সম্পর্কে সূচনায় কথক (লেখকের স্বরও এক) বলছেন-

এই উভয় ব্যক্তিই ‘রহস্য-লহরী’র অধিকাংশ পাঠকপাঠিকাগণের পরিচিত; এক নব্যচীনের সর্বপ্রধান নায়ক, মাধুরাজবংশের গৌরবস্বরূপ, কুটরাজনীতিজ্ঞ ও অসাধারণ চতুর কর্মবীর সুবিখ্যাত প্রিন্স আউ-লিং। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সেক্রেটারী সান।

প্রিন্স আউ-লিং সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ মিঃ ব্লেকের হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও তাঁহার আজীবনের সুদৃঢ়সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই; তাঁহার জীবনের ব্রত উদযাপিত হয় নাই, এই জাহাজে বসিয়াও তিনি এসিয়া হইতে শ্বেতাঙ্গে জাতির নির্বাসনের উপায় উদ্ভাবন-চিন্তায় বিভোর। এই সংকল্প কার্যো পরিণত করিবার জন্য তিনি জীবনপণ করিয়াছিলেন তাহা পাঠকপাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে।

...সেই সময়ে তিনি দেশীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত ছিলেন। ... তাঁহার স্কন্ধে সোনার জরীর ফিতার সহিত স্বর্ণনির্মিত একটি পতঙ্গ আবদ্ধ। তিনি যে চীন সাম্রাজ্যের ‘পীতপতঙ্গ সম্প্রদায়’ নামক গুপ্তরাজনীতিক সম্প্রদায়ের অধিনায়ক- এই পতঙ্গটি তাঁহার সেই পদগৌরবের পরিচায়ক। ‘চীনের চক্র’ নামক উপন্যাসে এই পীতপতঙ্গ সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভবিষ্যতে ‘চীনের পীতপতঙ্গ’ নামক উপন্যাসে এই গুপ্ত সম্প্রদায়-সংক্রান্ত অনেক রহস্যপূর্ণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইবে।^{১১}

এই কল্পিত আখ্যানেও, চৈনিকদের অনুপ্রবেশ নিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকার যে নির্মিত-ইতিহাসের(ম্যানুপুলেটিভ হিস্টরি) কথা আমরা বলেছি তা অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সরাসরি বঙ্গদেশেও পৌঁছে যাচ্ছে। এবং বঙ্গবাসীর ভাবনাকেও প্রভাবিত করছে। শাসকের শত্রুকে, শাসিতেরও শত্রু করে তোলা হচ্ছে। এই উপন্যাসেই আছে-

কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশের গবর্মেণ্ট অন্যান্য গবর্মেণ্টের সহিত একমত হইয়া চীনাম্যানদের এই অধিকার প্রদান করে; কিন্তু আমরা ইহা আপত্তিজ্ঞ মনে করি নাই; কারণ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে এরূপ বিস্তীর্ণ অরণ্য ও প্রান্তর অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে যে, তাহা বৈদেশিকদের ব্যবহার করিতে দেওয়া আমরা আপত্তিজনক মনে করি নাই। আমাদের দেশের জনসাধারণ ভয়ানক অলস; তাহাদের শিল্পানুরাগ

নাই; কৃষিকর্ম করিতেও ভয় পায়। সকলেই চাকরীর জন্য লালায়িত। আদিম অধিবাসীগুলি উৎসাহহীন, অজ্ঞ, শ্রমবিমুখ; পশুশিকার করিয়া ও বনুফল মূল খাইয়া জীবনধারণ করে। অথচ শত শত ক্রোশ বিস্তীর্ণ ভূভাগ অরণ্যাবৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, প্রান্তরগুলি কৃষিকর্মের অভাবে অনুর্বর মরুভূমি। এইজন্য প্রেসিডেন্ট মোরেজ চীনাম্যানদের উৎসাহী ও কর্মঠ জাতি জানিয়া আমাদের দেশে প্রবাসাধিকার দানের প্রস্তাব করেন। ... ওদিকে ইউনাইটেড স্টেটস আমাদের প্রস্তাবের মর্ম অবগত হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় চীনাম্যানদের প্রবেশের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করিল। সেই আন্দোলনের জন্য এবং অন্যান্য কারণে প্রেসিডেন্ট এক নূতন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন; এই ব্যবস্থায় চীনাম্যানদের ইকুয়েডর রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল এবং বহুসংখ্যক চীনাম্যানকে ইকুয়েডর হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ হইল। ইউনাইটেড স্টেটস এর জিদ্দি বজায় রহিল।^{১২}

এই বিতাড়নের ইতিহাসের পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছি তা সরাসরি বাংলা উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আশা করা যায় আমরা অবান্তর আলোচনা আগে করিনি। এই পর্যায়ে আসবো বলেই আগেই ইতিহাস বিবৃত করেছি, অতি-সংক্ষেপে। এবং এই ইতিহাসকে ব্যবহার করা হয়েছে পীতাতঙ্কে প্রমাণ করতেই। ইউরোপীয় পাল্ল ম্যাগাজিনগুলির উদ্দেশ্যও ছিল তাই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারি মদতও থাকত তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

আমরা আবার আখ্যানের অংশ থেকে আমাদের মতের সপক্ষে উদাহরণ দেবো-

যে জাতি কলম্বিয়ায় বা ইকুয়েডরে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া এই খালে ওপর আধিপত্য করিতে পারিবে, ভবিষ্যতে সেই জাতি দক্ষিণ আমেরিকার ভাগ্যসূত্র পরিচালিত করিতে সমর্থ্য হইবে। সুতরাং চীন যদি ছলে বলে কৌশলে দক্ষিণ আমেরিকায় 'সূচ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল হইয়া বাহির হয়' তাহা হইলে আউ-লিং এর চিরপোষিত আশা সফল হইবে, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ইউনাইটেড স্টেটস এর প্রাধান্য স্থাপনের আশা বিফল হইবে। চীন সাগর ডিঙ্গাইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশের পথে স্থায়ীভাবে আড্ডা বাঁধে, এবং পথরোধ করিয়া অসি আক্ষালন করে, তাহা হইলে পীতাজ জাতি কেবল যে, দক্ষিণ আমেরিকার ভাগ্য-বিধাতা হইবে এরূপ নহে, তাহাদের অসির ভয়ে ইউনাইটেড স্টেটসকেও তটস্থ হইতে হইবে। আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ জাতির গৌরব লান করিইয়া চীনের পীতপতাকা সগৌরবে উড্ডীন হইবে। প্রাচী শক্তি সঞ্চয় করিয়া জীবনের যুদ্ধে পাশ্চাত্যকে পরাজিত করিবে। শ্বেতাঙ্গ জাতির পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিপদ আর কী হইবে? মিঃ ব্লেক সিনর মেনডোজা প্রদত্ত কার্যভার গ্রহণ করিলে সম্ভবতঃ আউ-লিং এর সহিত তাঁহার সংঘর্ষণ পুনর্ব্বার অনিবার্য হইয়া উঠিবে। দক্ষিণ আমেরিকায় চীনের অভ্যুদয় যে মহাপরাক্রান্ত কূটনীতিজ্ঞ আউ-লিং এর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি ও গভীর রাজনীতিজ্ঞতার ফল- এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সুতরাং আউ-লিং এর গুপ্ত সংকল্প ব্যর্থ করিতে পারিলে তিনি শ্বেতাঙ্গ জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতির পীতাতঙ্ক প্রশমিত করিবার এরূপ সুযোগ ত্যাগ করা মিঃ ব্লেক সঙ্গত মনে করিলেন না।^{১৩}

উপরের অংশটি খেয়াল করে পড়লেই বুঝতে পারবো কথক এবং লেখকের পক্ষপাত কার দিকে।

নিশ্চয়ই পীতাজ, এশিয়ান, 'প্রাচী শক্তি'র পক্ষে নয়। বরং উপনিবেশের শাসক, মিঃ ব্লেক, শ্বেতাঙ্গ জাতি,

তাদের স্বার্থের পক্ষপাতী। অথচ লেখকের বা পাঠকদের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এশিয়া, প্রাচ্য এবং কালো-বাদামী-পীত গাত্রবর্ণ(যা শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদের কাছে ঘৃণার)।

গল্পটি এরকম- আউ-লিং এর দলের লোকেরা গোপনে দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস ও শক্তি সঞ্চয় করে সেই দেশ দখলের পরিকল্পনা করে, উদ্ভিদবিদ মিঃ বেকার এবং তার ‘কালো’ চাকর লোনি এই রহস্য জানতে পারে, বেকারের সাপের কামড়ে মৃত্যু হলে, লোনি অনেক বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে, আরেক শ্বেতাঙ্গ, ধূর্ত রাইমারের কাছে প্রতারিত হয়। সেখান থেকে মুক্ত হয়ে ব্লেকের কাছে পৌঁছয়। লোনি প্রাণবিপন্ন করে ব্লেকের সাহায্য করে, ব্লেক আউ-লিং এর পরিকল্পনাকে ধ্বংস করে। এই উপন্যাসে যে শুধুমাত্র পীতাঙ্গদের ‘হীন, অপর’ করা আছে তাই নয়। কালোদের সম্পর্কেও অত্যন্ত হীন, প্রতারক মনোভাবের পরিচয় আছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই বিদেশী প্রেক্ষাপটে বিদেশী গল্প এবং ভাবনাকে লেখক কীভাবে দেশীয় ভাবনায় রূপান্তরিত করছেন তা খেয়াল করবার মতো-

লোনি মিঃ বেকারের পরিচারকরূপে দীর্ঘকাল তাঁহার পরিচর্যা করিয়াছিল; সুতরাং মিঃ ব্লেকের খানসামাগিরি করিতে তাহার কোন অসুবিধা হইল না। বস্তুতঃ, কৃষ্ণাঙ্গেরা শ্বেতাঙ্গের খানসামাগিরিতে কিরূপ দক্ষতা লাভ করিয়া থাকে- তাহা আমরা কোম্পানীর আমল হইতে এদেশেও নিত্য দেখিতে পাইতেছি।^{১৪}

বলার অপেক্ষা রাখে না শেষ লাইনের স্বর লেখকের। যেন ‘কালো’ মানুষের পক্ষে এ অপেক্ষা গর্বের আর সম্মানের আর কীই বা হতে পারে! এরকম মন্তব্য আমরা এই উপন্যাসে আরও বহু জায়গায় পাবো। যেমন-

মুহূর্তপরে লোনি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া, প্রেসিডেন্ট মোরোজের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা ঘষিতে লাগিল।- ইহাই তাহার প্রণিপাত! সে কৃষ্ণাঙ্গ অসভ্য ‘নেটিভ’ হইলেও বুঝিতে পারিয়াছিল রাষ্ট্রপতির সম্মুখে সে আনীত হইয়াছে।^{১৫}

আরেক জায়গায় আছে-

সাহেব-লোক বিপদে পড়িলে বা কার্যোদ্ধার করিতে হইলে কালো আদমীদের ভাই, বন্ধু, দাদা, বাবা বলিয়া পিঠ চাপড়াইতে কসুর করে না- ...কালো আদমীরা সেই মৌখিক আদরে গলিয়া যায়, এবং তাহাদের মনো-রঞ্জনের জন্য প্রাণ বিসর্জনেও কুণ্ঠিত হয় না।^{১৬}

ঠিক এই বিশেষণগুলি বা মনোভাব শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের সম্পর্কেও পোষণ করত। শোষিতপক্ষ হিসেবে কালো-বাদামী-পীত একই পক্ষে থাকার কথা! আমাদের আরেকবার এডওয়ার্ড সাঈদের স্মৃতিচারণ(আগে উল্লেখ করেছি) মনে পড়বে। আর মানবিক পক্ষ হিসেবে না-গাত্রবর্ণ, না-ধর্মীয়(সেকুলার) ইত্যাদি যেকোন বৈষম্যের বিরুদ্ধে থাকার কথা।

উপন্যাসে, আরও শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ এবং পীতাতঙ্ক বিষয়ে মন্তব্য আছে,-

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার বিশ্বাস চীনাম্যানদের এই দলপতি অসাধ্যসাধন-ক্ষম। শ্বেতাঙ্গ জাতির এরূপ ভীষণ শত্রু সমস্ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। এসিয়াখণ্ড হইতে শ্বেতাঙ্গের উচ্ছেদই তাঁহার জীবনের ব্রত। এখন তিনি আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকাকে চীনের সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই সংকল্পে বাধা দান করিতে না পারিলে, আজ তাঁহার চেষ্টা সফল হইলে, আপনাদের যে পরাজয় হইবে- তাহা সমগ্র শ্বেতাঙ্গ জাতির পরাজয়।- ইহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহা ভাবিলে হৃদয় অবসন্ন হয়।”^{১৭}

আরেক জায়গায় আছে-

... এই সকল পীতাজ সৈন্য উপযুক্ত সেনানায়ক কর্তৃক পরিচালিত হইলে একদিন শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহকে বিপন্ন করিবে। বলে বা কৌশলে তাহাদিগকে পরাভূত করা অসম্ভব হইবে। এই পীতাজের দল একদিন রুশিয়ার গর্ব খর্ব করিয়াছিল- একথা তাঁহার স্মরণ হইল। জাপানীরা শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের নিকট বীরের সম্মান লাভ করিয়াছিল; কিন্তু চীনও যে শৌর্য্যে বীর্য্যে জাপানী সৈন্য অপেক্ষা হীন নহে- আজ তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।^{১৮}

এখানেও রুশ-জাপান যুদ্ধের ইতিহাস ব্যবহৃত। কিন্তু অন্যগুলির কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সম্পূর্ণরূপে কল্পিত। অথচ ভরপুর ‘জেনোফোবিক’ মন্তব্যকে সাধারণীকরণ করার ক্রমাগত প্রচেষ্টা আছে। হলিউড প্রতিবছর পাশ্চাত্যের সব চেয়ে নিরাপদ শহর গুলিকে নিয়ে ধ্বংস এবং তার থেকে পরিত্রাণ- মূলক প্লট নিয়ে সিনেমা তৈরি করে। এর উৎসও দেখা যাবে অতীতের পীতাতঙ্ক এবং অন্যান্য ‘জেনোফোবিয়া’ এবং শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ থেকেই। আর বলিউড ‘মুম্বাই’ বা অন্য মেট্রোপলিটনগুলিতে বিপদাশঙ্কাকে ব্যবহার করে, জেনোফোবিক(বিশেষত পাকিস্তান বিরোধী) ‘জাতীয়তাবাদী’ সিনেমা বানায়।

লেখক যে ব্লেকের আখ্যানগুলিতে মুগ্ধ হয়েই, তাকে বাঙালি পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ‘নায়ক’ ব্লেকের মতামত, স্বাভাবিকভাবেই লেখকের বা লেখক সহমত

পোষণ করেন। এবং এই ভাবনা, বৃটিশের অধীন ভারতবর্ষে প্রচার করতে এতটুকু দ্বিধা হয় নি একথা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। সেই ব্লেকের মনোভাব কেমন?

বিশেষতঃ পৃথিবীতে শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাক- ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা।^{১৯}

‘কালো’ লোনি তার প্রতারক রাইমারকে শাস্তি দিতে চাইলে ব্লেক রাইমারকে ছেড়ে দেয়, তার গর্হিত অপরাধ সত্ত্বেও। ব্লেকের যুক্তি-

কিন্তু তোমার অপরাধ অমার্জনীয় হইলেও আমি তোমাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিতে অসম্মত। একজন কৃষ্ণাঙ্গ যে একজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করিবে- ইহা আমার অসহ্য।^{২০}

লোনির প্রাণপাতকারী বলিদানের প্রতিদান হিসেবে শ্বেতাঙ্গ ব্লেক এবং প্রেসিডেন্ট মোরেজ

তাহাকে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্রাদি, আয়না, পুতির মালা, চুড়ি, চিরুণী প্রভৃতি উপহার দান করিয়া তাহার স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের বিবেচনায় এরূপ মূল্যবান সম্পত্তি জগতে আর কিছুই নাই।^{২১}

এই প্রতারণা শাসকের ক্ষমতার চিহ্নকে, তার দমনকে, তার অসাধুতা, অসততাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা লক্ষ করলাম রাইমার শ্বেতাঙ্গ বলে তার অপরাধ লঘু হয়ে গেল! পরাধীন ভারতবর্ষেও বহুদিন পর্যন্ত একই অপরাধের জন্য শ্বেতাঙ্গদের এবং ভারতীয়দের লঘু-গুরু শাস্তির বিধান ছিল। তা আমরা জানি। আখ্যানে যদিও, এরকমই দেখা যায় যে, যে জাতিকে, অভিযানমূলক গল্পে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে সেই জাতির অন্তর্গত অপরাধী খুব কমই থাকে আখ্যানে। থাকলেই সে একক ব্যক্তিমাত্র, তাকে একক হিসেবেই অপরাধী করা হয়। তার জন্য গোটা জাতিকে অপরাধী বা ক্রিমিনালাইজ করা হয় না। কিন্তু কালো, বাদামী, পীত বা অন্যান্য দেশ বা ভূখণ্ডকে সামগ্রিকভাবে অপরাধী-প্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বা দাগিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিবরণ-আচরণ সর্বদাই একরৈখিক, সরল(ইনোসেন্ট অর্থে নয়, ফ্ল্যাট বা টাইপ অর্থে), খোপযুক্ত, থাকবন্দী(এক্ষেত্রে তা প্রাচ্য; এশিয়, বার্মিজ, চীনে বা জাপানি)। আর শ্বেতাঙ্গ পক্ষের বর্ণনা বহুমাত্রিক, জটিল(রাউন্ড, ইণ্ডিভিজুয়াল), বহুমুখী, মান্যধারার পক্ষপাতী।

আমরা আবার ফিরে যাবো বাংলা উপন্যাসে। এই উপন্যাসটির নামই *পীতাতঙ্কের প্রতিকার* লেখক (বা অনুবাদক) দীনেন্দ্রকুমার রায়। উপন্যাসটির পুরো নাম- *পীতাতঙ্কের প্রতিকার: বিপ্লববাদের বিলোপ-কাহিনী*।

পীতাতঙ্কের মতোই, রাশিয়ায় বিপ্লবের পর, পুঁজিবাদী-ধনতান্ত্রিক ইউরোপ-আমেরিকার বিপ্লবাতঙ্ক শুরু হয়। আমরা আগেই বলেছি, যে, শুরু থেকেই তারা রাশিয়াকে খুব বেশি তাদের সঙ্গী বলে মনে করতো না। বরং ‘এশীয়মনোভাবাপন্ন’ বলেই আখ্যায়িত করতো। ফলে তাদের জনপ্রিয় আখ্যানে রাশিয়ানদের অপরাধী, গুপ্তচর হিসেবে চিত্রিত করা, বিপ্লব-বিরোধী প্রচারের আধিক্য দেখা যায়। এই উপন্যাসে তারই স্বরূপ আমরা দেখতে পাবো। এখানে পীতাতঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপ্লবাতঙ্ক, পীত ‘অপরাধী’দের সঙ্গে রাশিয়ান ‘অপরাধী’। ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে যখন কম্যুনিস্ট পার্টির উত্থান(১৯২৫, কানপুর) হচ্ছে, সমাজতন্ত্র-বিপ্লবের স্বপ্ন মানুষকে নতুন রাজনৈতিক দিশা দিচ্ছে তখন বাংলা ভাষায় এই উপন্যাসগুলিও সরাসরি বাঙ্গালির ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। উপনিবেশের আধিপত্য আরো দৃঢ় হচ্ছে। যার বিনাশ স্বাধীনতা পাওয়ার পরও হচ্ছেনা বা হয় নি তা আমরা জানি।

আমরা উপন্যাসটির আলোচনায় ফিরে যাবো। এই উপন্যাসে ‘নায়ক’ ডিটেক্টিভ ওয়াটার আর তার প্রতিপক্ষ ‘ডাক্তার লু’ এবং তার রাশিয়ান সহকারি পল। ‘ডাক্তার’ এর সচেতন ব্যবহার, ফু-মাধু, ওয়াকার সকলেই সকলেই একই খাঁচে তৈরি। স্যাক্স রোহ্মারের সৃষ্ট, ফু-মাধু, গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এই সংরূপটিকে, গোটা পৃথিবী জুড়েই। বৃটিশ রেকর্ড থেকে রাশিয়ান পলের, অপরাধলিপি বের করে। তাতে পল সম্পর্কে বৃটিশ নথিতে আছে-

দুর্দান্ত স্বভাব। শত্রুর প্রাণসঙ্ঘারে প্রবৃত্তি প্রবল। আগ্নেয়াস্ত্র সর্বদা সঙ্গে রাখে। ...একাধিক পত্নী রাখে। বৃটিশ জাতির প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইংরাজের নামে যেন ক্ষেপিয়া উঠে। প্রকান্ত বিপ্লববাদী।” (anarchist)... “আরও পাঁচ ছয়টি উপনাম, বিপ্লববাদী, রাজদ্রোহ-প্রচারক, রুসিয়ান গুপ্তচর; ভীষণ প্রকৃতি...বোমা প্রস্তুতে ওস্তাদ... চুরি, ঘরে আগুন দেওয়া, একাধিক পত্নীর সহিত স্বামীভাবে বাস-ইত্যাদি অপরাধে কারাদণ্ড হয়।... সে দলপতি ডাক্তার লুর বিশ্বস্ত সহযোগী এবং ভয়ঙ্কর বৃটিশ-বিদ্বেষী”^{২২}

বিপ্লবকে, রাষ্ট্রবিরোধিতা, বৃটিশ-বিরোধিতাকে অন্যায়্য অপরাধ বলে দাবী করা হচ্ছে! ডাক্তার লু র
বিবরণ

তাহার অচঞ্চল গম্ভীর মূর্তির দিকে চাহিলে মনে হইত তাহা প্রাচীন যুগের পীতাম্ব গজদন্ত-ক্ষোদিত কোন নরপিশাচের মূর্তি।^{২৩}

আমরা আগেই বলেছি রাশিয়াকে এশিয়াদরদী বলে হীন বা ঘৃণা করার চাল ইউরোপ এবং আমেরিকায়
বহুদিন ধরেই চলছিল। এখানে পীতাম্বের সহকারি হিসেবে রাশিয়াকে জুড়ে দিয়ে ডাক্তার লু র সংলাপ
বানানো হয়, এরকম-

দেশে আমরা আফিং ছাড়িয়াছি, সনাতন টিকী বিসর্জন করিয়াছি, স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। আমরা তোমাদের দেশের সকল প্রধান ব্যক্তিকে
হত্যা করিলে তোমরা নিঃসহায় ও নিরুপায় হইয়া রুসিয়ার পদানত হইতে বাধ্য হইবে। রুসিয়া প্রাচ্য মহাদেশেরই অংশ, এবং প্রাচ্যে রুসিয়াই
এখন সর্বপ্রধান শক্তি বলিয়া পরিগণিত। রুসিয়ার সাহায্যেই মহাচীন তাহার পূর্ব-প্রাধান্য অর্জন করিবে।^{২৪}

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর, এই প্রচার ইউরোপ আমেরিকায় দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে বাড়তে থাকে,
যাতে দেশবাসী কোনোভাবেই বিপ্লবের পক্ষপাতী না হয়ে পড়ে। আর তারা এই মনোভাব
উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে দেয়। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের মতো সাহিত্যিকরা তাদের মনোভাবকেই আরো
মনোরঞ্জক করে প্রাচ্যে বসেই, প্রাচ্যেই ছড়িয়ে দিতে থাকে, প্রাচ্যের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহকে।

এখানের গল্প- ডাক্তার লু এবং পলের পরিচালিত হো-মিং সম্প্রদায় বৃটিশ জাতির এবং ডিটেস্টড
ওয়াকারের অনিষ্ট করতে চায়, ওয়াকারের তৎপরতায় তারা পরাস্ত হয়। এখানে আরেকটি চীনে চরিত্র
হো-লি এবং তার ছেলে হো টিং, ওয়াকারকে নিজের, চীনে জাতির বিরুদ্ধেই সাহায্য করে। কিন্তু
সহকারি হিসেবেও তাকে কোনো মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বলা বাহুল্য এই চরিত্রটিও চিত্রিত হয়েছে অত্যন্ত
হীন হিসেবে। হো-লি র আদেশে, তার পুত্র, তার মাকে হত্যা করে, হো-লির একাধিক পত্নী, হো-লি
ভয়ঙ্কর নারীবিরোধী, মেয়েদের বাধ্য রাখার একমাত্র উপায় হিসেবে সে প্রহারকেই গণ্য করে, তার কথার
অবাধ্য হলে পত্নীদের সে ঝাঁটা দিয়ে পেটায়, কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়ায় সে ক্ষুব্ধ হয়, বিজ্ঞ অথচ
লোভী, অসৎ, খল, ছল, ধূর্ত।^{২৫}

এবং অবশ্যই হো-লি ধর্মবিশ্বাসে একজন বৌদ্ধ! একথাও প্রায় দাগিয়ে দেওয়া আছে। হো-লি ব্রিটিশদের সঙ্গে দরদাম করে তাদের সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়-

ভগবান তথাগতের যদি এইরূপ ইচ্ছা হয়- তাহা হইলে কে তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিবে? আপনার নিকট ঐ টাকা পাইলে আমি তদ্বারা দেবতার পূজা দিব।^{২৬}

বলা বাহুল্য এরকম ভক্ত হলে দেবতার বা ধর্মের গৌরব বাড়ে না। অন্যদিকে নায়কের গৌরবের সঙ্গে তার ধর্মের গৌরব বাড়াচ্ছে কিন্তু শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের, সঙ্গে তাদের ধর্মীয় পরিচয়কে যুক্ত করা হচ্ছে না। তার অপরাধী হলে, একক; আর ‘নায়ক’ হলে সমগ্র জাতি ধর্মের দেশের প্রতিনিধি! একথা আমরা আগেই বলেছি। নায়ক ডিটেস্টেবল ওয়াকারের ধর্মের যে পরিচয় আমরা পাই, সচেতনভাবেই তা আখ্যানে আছে। তা খেয়াল করলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে-

ওয়াকার ধার্মিক খৃষ্টান, তাহার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। সে নিহত চীনাম্যানের বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিখানি টানিয়া লইয়া অক্ষুট স্বরে বলিল, ‘ইহাকে লইয়া চারিজনকে সাবাড় করিলাম! হে করুণাময় পরমেশ্বর আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর। আমি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য এই সকল অপকর্ম্য করিতা বাধ্য হইয়াছি। তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ, আমি স্বেচ্ছায় নরহত্যা করিনা, তাহা তুমি জান।’^{২৭}

আখ্যানের এই বৈষম্যমূলক দয়া-মূর্তি আমাদের প্রভাবিত করে না। আমরা প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশের অধীনে কাটিয়ে তাদের অত্যাচারের বিভীষিকার কথা স্মরণ করতে পারবো নিঃসন্দেহে, আর এখানে ইতিহাস থেকে তাদের অত্যাচারের এবং হত্যালীলার বিবরণ দিয়ে আমাদের অধ্যায়কে ভারাক্রান্ত করছি না। যদিও আমরা মনে করি না, ধর্মীয় পরিচয় অপরাধের কারণ হতে পারে; বরং ধর্মের অতিরিক্ত আরোপ বৈষম্যের, অত্যাচারের, অপরাধের কারণ নিঃসন্দেহে।

হো-লি কে এত হীন হিসেবে চিত্রিত করায়, কৈফিয়ত হিসেবে দীনেন্দ্রকুমার রায়, কথকের স্বরের মধ্যে দিয়েই মন্তব্য করেছেন-

অভিজ্ঞ ইউরোপীয় গ্রন্থকার একজন বিজ্ঞ ও শাস্ত্রবিদ চীনাম্যানের পারিবারিক জীবনের এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; এ সম্বন্ধে আমাদের মত অনভিজ্ঞ বিদেশীর কোন মন্তব্য প্রকাশ অনধিকার-চর্চা।^{২৮}

বলাবাহুল্য এই মন্তব্যটি তার রাজনৈতিক অবস্থানকে সুনিশ্চিত করে।

ডঃ লু র মুখ দিয়ে পীতাতঙ্ক যেভাবে ছড়ানো হয়েছে, তা-

...পৃথিবীতে চীনের অপ্রতিহত প্রাধান্য পুনঃ-সংস্থাপিত করিব। চীন সাম্রাজ্যকে জগদ্ব্যাপী গৌরবের অধিকারী করিতে হইবে; সমগ্র সভ্য জগত চীনের পদতলে মস্তক অবনত করিবে। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইবে?— অস্ত্রবলে, বাণিজ্যবলে, রাজনীতিক বুদ্ধিকৌশলে তাহা সম্ভব নয়; কেবল আমার অদ্বুত আবিষ্কারের ফলে তাহা সত্যে পরিণত হইবে এক দিন। আমি এই বিষের সাহায্যে জগতে বৃটেনের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইব।...কেহ জানিতে পারিবে না, ইতিহাসে আমার নাম স্বর্ণক্ষরে লিখিত হইবে না; কিন্তু আমারই চেষ্টায় চীন বৃটেনকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার ন্যায় জগজ্জয়ী শক্তি, প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য অর্জন করিবে। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে চীনের ভ্রাগনাক্ষিত অপরাজেয় বিজয়-কেতন উড্ডীন হইবে। তোমাদের দেশের বিখ্যাত, দেশপূজ্য অধিবাসীবর্গ, তোমাদের রাজনীতিকগণ, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসমূহ, তোমাদের খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ, আইনজ্ঞ ব্যবহারীজীবেরা, এমন কি, সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ— যাহারা এদেশের গৌরব, যে সকল কোটীপতি মিলওয়াল ও ব্যাংকার তোমাদের দেশের অর্থশক্তি নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, যে সকল বীরেন্দ্রকেশরী বাহুবলে, অস্ত্রবলে তোমাদের দেশকে ক্ষাত্র-শক্তির আদর্শে পরিণত করিয়াছে তাহাদের সকলেরই উন্নত মস্তক আমার প্রদত্ত উগ্র, অব্যর্থ, অনিবার্য্য বিষে অতি অল্প দিনেই ধূলায় লুটাইবে।^{২৯}

উদ্ধৃতিটিতে ভ্রাগন চড়ে বুদ্ধের পাশ্চাত্য দখল করতে আসা, এবং মাইকেলের সচেতন বাণীর ছবি স্পষ্ট।

ডাক্তার লুর, যে, ‘ভয়ঙ্কর’ পরিকল্পনা তার মধ্যে দিয়েও কীভাবে বৃটিশ জাতির ‘গুণকীর্তন ও মহিমাগান’ আছে তা খেয়াল করবার মতো। যত বেশি তাদের ভালো বিশেষণে যুক্ত করা আছে তত তার বিপরীত বিশেষণ গুলি ‘এশিয়ান’ আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও প্রায় প্রতি ছত্রে একথা আছে যে, বিপ্লব কতটা খারাপ, সভ্যতা বিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী তো বটেই এবং মোটেই প্রশংসাযোগ্য নয়! বৃটিশদের মতো ‘শ্রেষ্ঠ এবং সভ্য’ জাতির মান্যতা ও পরামর্শ অনুযায়ী গোটা পৃথিবী চলবে তা পৃথিবীর ভালোর জন্যই কাম্য! শত্রু-চরিত্র, শত্রুর সংলাপ সবই ক্ষমতার প্রতি পক্ষপাতী লেখকেরই রচিত। ফলে শত্রু যত বেশি ‘নায়ক’কে প্রবল মনে করবে, তার সংলাপে যত প্রাবল্য প্রকাশিত হবে, ততই ‘নায়ক’ মহিমাম্বিত হবে।

যেমন-

রাজশক্তির প্রতি মুষ্টিমেয় বিভীষিকাবাদী বিদেশী প্রজার এই অবজ্ঞা, এইরূপ স্পর্দ্ধা অসহ্য।”^{৩০}

মিঃ পিয়ারসন পীতাতঙ্কের বিরুদ্ধে বলছে-

ওরে কাপুরুষ, ওরে ইতর কশাই, ওরে গুপ্ত-নরহত্যা! রাফস, পিশাচরাও তোর অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ...এদেশে বিভীষিকাবাদীদের চিহ্নমাত্র রাখিব না, ব্রিটিশ সরকার কাহারও প্রতি এক বিন্দু দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ... যে বিরাট শক্তি পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বজ্র মুষ্টিতে সগৌরবে পরিচালিত করিতেছে-সেই অপ্রতিহত শক্তি মুষ্টিমেয় বিভীষিকাবাদীদের পৈশাচিক ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে শতবর্ষের বর্ষার বর্ষণে ক্ষয়িতপ্রায় শিথিলমূল জীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় ধ্বসিয়া পড়িবে? ^{৩১}

বিভীষিকাবাদী হল, বিপ্লববাদীরা। এর দ্বারা এই বার্তা কি পৌঁছায়না, যে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতের পরাধীনতার জন্য ব্রিটিশের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত?

বলাবাহুল্য এই 'ইচ্ছেপূরণ'ই উপন্যাসের শেষে ঘটে। আর বাস্তবে বিশশতক থেকেই পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে উপনিবেশগুলি বিরোধিতায়, প্রতিবাদ, বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতা অর্জন করে।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের *চীনের নবনায়ক* (সংস্করণ, ১৩৬৫/১৯৫৮, প্রথম প্রকাশ জানা যায়নি) আমাদের এই পর্যায়ের শেষ উপন্যাস। এখানেও ব্লেক এবং আউ-লিং এর গল্প। আউ-লিং এবার ষড়যন্ত্র করে চায়ের মধ্যে সূক্ষ্ম বিষ মিশিয়ে ব্রিটিশ প্রধানদের হত্যা করার। এবং অবশ্যই ব্লেক তার পরিকল্পনা ব্যর্থ করে, কিন্তু চূড়ান্ত পরাজিত করতে পারে না। সূচনায় আছে-

আজ মহাচীনের দেশে দেশে দিকে দিকে অগণ্য অধিবাসীগণের মধ্যে যে প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইতেছে, যে নবজীবনের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকা তাহার দুর্জয় শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া কি পরিমাণে বিচলিত হইয়াছে।- তাহাদের পীতাতঙ্কেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। তাই ইউরোপ ও আমেরিকার মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহ এই ক্রম বর্দ্ধমান, সজ্জবদ্ধ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অহিফেন প্রভাব-মুক্ত, কষ্টসহিষ্ণু, নবজাগ্রত পীত জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য বিপুল উদ্যম ও অক্লান্ত চেষ্টা দেখিয়া সুদৃঢ় ভবিষ্যতে ভীষণ সজ্জবর্ষণের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ^{৩২}

বলা বাহুল্য আউ-লিং ব্রিটিশদের ক্ষতিসাধন করতে চায়। এবং নিজের জাতির মধ্যে থেকে, এশিয়া থেকে শ্বেতাঙ্গভক্তি দূর করতেও সে বদ্ধপরিকর, তার উদ্দেশ্য এবং কাজের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া আছে-

যে সকল বর্ণজ্ঞানহীন মূঢ় জনসাধারণ বিশ্বাস করিত- দৈহিক বলে ইউরোপীয়গণ তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ- তাহাদিগের সেই ধারণা দূর করিবার জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ কাল্পনিক চিত্র তাহাদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। (তদেব, পৃ ৫)

বৌদ্ধধর্মের বিকৃতিই আউ-লিং এর মাধ্যমে করানো হয়েছে। আউ-লিং প্রসঙ্গে আছে-

চীনদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্যও তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ যে কনফুসির অনুশাসনের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং খৃষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র- ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁহাকে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। (তদেব, পৃ ৬)

এহেন আউ-লিং নিঃসন্দেহে আখ্যানে বৌদ্ধ! আমরা আরেকবার মনে করিয়ে দেবো পীতাতঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যোগসূত্র খুবই গভীর। এবং তা সবসুদ্বই বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে, বাঙ্গালির ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছিল, যাচ্ছে। এই ‘ভীষণ পরিকল্পনা’ নিয়ে সে কীভাবে বুদ্ধের পূজা করে তার বিবরণ আছে- ‘পীত পতঙ্গ সম্প্রদায়ের’ গুপ্ত আড্ডায়

এই কক্ষের এক প্রান্তে একটি অনুচ্চ বেদীর উপর একটি অনতিবৃহৎ বুদ্ধমূর্তি সংস্থাপিত ছিল। এই বিগ্রহ-মূর্তি সঙ্গে না লইয়া আউ-লিং কোথাও যাইতেন না; দেশ-বিদেশে ইহা সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এই মূর্তির অদূরে ধূপাধারে অগ্নি, তাহা হইতে ধূপের সৌরভ উদ্গত হইয়া সেই কক্ষ পূর্ণ করিয়াছিল। ধূমরাশিতে কক্ষটি সমাচ্ছন্ন। কক্ষের অন্য প্রান্তে আর একটি বেদীর উপর কতকগুলি অস্ত্র থরে থরে সজ্জিত। চীনের ব্যবস্থাসূত্র প্রণেতা ঋষি কনফুসির স্বহস্ত লিখিত পুঁথিগুলিও সেই বেদীর উপর সংরক্ষিত হইয়াছিল। বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে একখানি পীতবর্ণ আসন প্রসারিত, এই আসনে উপবেশন করিয়া নব্য চীনের অসীম শক্তিসম্পন্ন অধিনায়ক শ্বেতাঙ্গ জাতির ধ্বংসের জন্য অহিংসার অবতার- তাঁহার ইষ্টদেবতা বুদ্ধদেবের নিকট কি বর প্রার্থনা করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। প্রেমাবতার যিশুর সেবকমণ্ডলী আজ জগতে হিংসা ও ভেদনীতির বিষ ছড়াইয়া স্বার্থপরতা, বিলাসিতা ও ঐশ্বর্যলাভের ন্যায় ধর্ম ও বিবেকের মস্তকে পাদুকাঘাত করিতেছে; মুখে সদাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করিয়া কার্যতঃ তাঁহার প্রচারিত ধর্মের অপমান করিতেছে; নিরুপায়, আত্মরক্ষায় অসমর্থ দুর্বলকে নিপীড়িত করিবার জন্য তাঁহার করুণা ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছে; আর তাহাদের প্রভাব খর্ব্ব ও দর্প চূর্ণ করিবার আশায় চীনের এই নব-নায়ক অহিংসার প্রচারক, সমদর্শিতার অবতার ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন! কাহার দ্বারা ঈষ্টদেবতার অধিক অপমান হইতেছে-কে বলিবে? (তদেব, পৃ ৫১)

এবং এই আখ্যানে যে, ‘ধর্মযুদ্ধের’ পরিসর তৈরি করেছেন, সেখানে (আগেই বলেছি পীতাতঙ্কের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধের সম্পর্ক) জয়ী খৃষ্টান-শ্বেতাঙ্গ জাতি। চৈনিকদের প্রতি জাতিবিদ্বেষমূলক মন্তব্য আছে, সেগুলি হল- তাদের মেয়েদের ‘কিছুত কিমাকার চেহারা’ (তদেব, পৃ ৫৯),

হাজার বৎসর ইংরাজী শিখিয়াও কোনো চীনাম্যান খাঁটি ইংরাজের কণ্ঠস্বর লাভ করিতে পারে না, গর্দভ কি কখন সিংহের মত গর্জন করিতে পারে? (তদেব, পৃ ১৫৪)

ইত্যাদি। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের *চীনের ড্রাগন*, *চীনের জুজু*, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধতায় লেখা উপন্যাস *ইংল্যাণ্ডে রুষ দস্যু*, ইত্যাদি আরও বহু উপন্যাসে এই ধরনের ভাবনাই প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আর তালিকা লম্বা করবো না।

(৩)

চীনের নবনায়ক উপন্যাসের শেষপাতায়, আরেকটি বহু জনপ্রিয় প্রায় একপ্রবণতা যুক্ত একটি উপন্যাসের বিজ্ঞাপন ছিল- শশধর দত্ত প্রণীত, *চীনের পুতুল*। এটি পীতাতঙ্কধর্মী পাল্ল-ফিক্সনের একেবারে বাংলা সংস্করণ। যদিও অনুবাদ নয়। সেটিংস কলকাতা। চরিত্রগুলি বাঙালি, মাড়োয়ারি এবং চৈনিক। ফেলুদা সিরিজে প্রায় ধারাবাহিকভাবে, মাড়োয়ারি-ভিলেন আসার আগেই এখানে বুনবুনওয়ালা চরিত্রটি সৃষ্ট হচ্ছে। সত্যজিতের ওপর শশধর দত্তের প্রভাব পড়েছিল কি? আমরা ফেলুদা আলোচনা করার সময় এ নিয়ে কথা বলবো। এই উপন্যাসটি সফল চলচ্চিত্রেও গৃহীত হয়েছিল। কারণ উপন্যাসটির নামপত্রেই নামের সঙ্গে ছিল- *চীনের পুতুল* [চলচ্চিত্রে গৃহীত রহস্যোপন্যাস], উৎসর্গ পত্রেও লেখক নিজে লিখেছেন- *আমার চীনের পুতুল (চলচ্চিত্রে রূপায়িত)।*

উপন্যাসে ‘নায়ক’ দিল্লীর পদস্থ আই-বি-অফিসার, মাল্টি মিলিওনিয়ার, উচ্চশিক্ষিত, সুদর্শন-সুগঠিত(এইসব পরিচয়গুলিই উপন্যাসে স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে)হিন্দু, উদার, যুবক ইন্দ্রনাথ বসু; এবং তার সহকারি ‘কলিকাতা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চার সিনিয়র পুলিশ-অফিসার সত্যেন ঘোষাল’। প্রতিপক্ষ চৈনিক নিষ্ঠুর, ডাক্তার জেন, ডাক্তার শব্দটি খেয়াল করবো। ফু-মাধুর তাও ডাক্তারির সঙ্গে যোগের কিছু পরিচয় লেখকেরা দিয়েছেন, কিন্তু ডাক্তার জেনের সঙ্গে ডাক্তারির কোনো চিহ্নকেই যোগ করা হয় নি। শুধু ‘চৈনিক ডাক্তার’ ইউরোপের তৈরি বিভীষিকাময় ‘ভিলেন’দের সমধর্মী। ইন্দ্রনাথ(প্রধান চরিত্র) এবং সত্যেন ঘোষাল কলকাতা শহরে আফিম এবং কোকেনের ব্যবসা এবং সেই সংক্রান্ত খুনের সমাধান করে। সমান্তরালে আছে ইন্দ্রনাথ এবং চৈনিক নর্তকী মিথুনের প্রেম। এই উপন্যাসেও যৌনতার পরিসর অল্প-বিস্তর আছে। আছে আরেকটি চরিত্র, দস্যুদের সহচরী মিস মার্গারেট তার ‘ক্যাবারেট’ নৃত্য ইত্যাদি।

এই মিশ্রণ খুব কম বাঙালি সাহিত্যিক দেখিয়েছেন; কিন্তু ইউরোপে তা ভরপুর আমরা আগেই বলেছি। এই ধরনের বর্ণবৈষম্যের বুনন, একটু অদ্ভুত এবং কুটিল! হীন জাতি-বর্ণের যেকোনো পুরুষ এবং বিগতযৌবনা নারী ‘কুৎসিত’; যুবতী নারী নয়, তারা সুন্দর, এবং সেই সৌন্দর্য ‘মান্য-নাগরিক’ পুরুষের উপভোগ্য। বেশিরভাগ এই ধরনের উপন্যাসে বা আখ্যানে(সিনেমাতেও) আদিবাসী নারী, ‘অপর জাতি-ধর্মের-বর্ণের’ যুবতী নারীর চিত্রণ এমনই।

উপন্যাসের গল্পে ফিরি, প্রতিপক্ষ প্রথম দিকে মনে হয় ডাক্তার জেন, কিন্তু দেখা যায় আসল ‘শয়তান’ ‘চীনের পুতুল নৃত্য-সম্প্রদায়ের’ প্রধান ‘চ্যাংসা’ নামক চৈনিক। তাই এই উপন্যাসের নাম- চীনের পুতুল। সে প্রথম দিকে অত্যন্ত ‘ধার্মিক বৌদ্ধের’ মুখোশ পরে থাকে। ইন্দ্রনাথ, শয়তান চৈনিক চ্যাংসার কবল থেকে, তার চৈনিক সুন্দরী প্রেমিকা মিংচুকে উদ্ধার করে! এবার পীতাতঙ্কের চিহ্নগুলি খেয়াল করবো। ‘প্রবল শয়তান’ চ্যাংসার বৌদ্ধ পরিচয়টি তার প্রতিটি সংলাপে প্রায় ফুটিয়ে তোলা হয়। আমরা আগেই বলেছি যদি ভক্ত এমন হয় তাহলে ধর্মের বা দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়না বরং উল্টোটাই হয়।

ইউরোপীয় প্রভাব চোখে পড়ে, চ্যাংসার স্বর রচনায়, সে স্পষ্ট বাংলা বলতে পারে না। আড়ষ্ট উচ্চারণ কারণ ইউরোপে দেখানো হয় স্প্যানিশ এবং চীনে জাপানিরা বেশিরভাগই ‘ড’, ‘ট’ উচ্চারণ করতে পারেনা ‘দ’ এবং ‘ত’ বলে। ফলে বাংলা উচ্চারণেও এই প্রবণতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। অদ্ভুতভাবে নায়িকা মিংচু সঠিক উচ্চারণ করে , এবং তাকে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য একজন বাঙালি দাসীর প্রভাবকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে! ‘বৌদ্ধ চ্যাংসা’ র সংলাপ-

...তথাগত বুদ্ধ অপলাধীকে যোগ্য ছাতি দিন! মানুষ মানুষকে হত্যা করেছে, ছুনলেও আমাল ছালা দেহ কাঁপতে থাকে।^{৩৩}

...তাহার বাম দিকে একটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধ-মূর্তি দেখা যাইতেছিল। চ্যাংসা-সর্দার অর্ধমুদিত চক্ষুতে বসিয়া মালা জপ করিতেছিল... (তদেব,

পৃ ২৭)

খাদ্যবিষয়ক-

ভারতী বলেন যে, তুমি যে চীনা মেয়েকে বিবাহ করতে চলেছ, তা তুমি তার সঙ্গে পচা ইঁদুর, আরঙলা, ব্যাঙ প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্যগুলি কিরূপে গলাধঃকরণ করতে পারবে, সেই দৃষ্টান্তায় তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন। (তদেব, পৃ ৮৭)

একজন চীনা-বয় খাদ্য পরিবেশন করিতেছিল। ...পরিবেশক গর্বিত-স্বরে কহিল, “আলচুন্লা (আরশোলা) অতি উপাদেয় আহাল্য্য ছিল। একবাল যদি আহাল কলেন, তা’হলে ছালা জীবনে আল ভুলতে পালবেন না।”

আত্মীয় ভদ্রলোক কহিল, “ওরে বাবা, তোর চন্দ্রপুরুষের দোহাই ও-নাম আর মুখে আনিস নি। এখনি আমি হড় হড় ক’রে বমি ক’রে ফেলব।”

(তদেব, পৃ ১২৭)

যেহেতু চিত্রনাট্য হয়েছিল তাই জনপ্রিয়তার সমস্ত উপাদান এতে ভালো করেই মিশ্রিত। শশধর দত্ত(১৯০১-১৯৬২) খুবই বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তাঁর দস্যু-মোহন সিরিজ বিখ্যাত ছিল; এই সিরিজে জানা যায় প্রায় ২০০ টি গল্প ছিল। দস্যু মোহন রবিনহুডের আদলে সুপারম্যান! প্রতিপক্ষ মিঃ বেকার, মিঃ সান্যাল; প্রেমিকা রমা। দস্যু-মোহনেরও গল্প চলচিত্রে রূপায়িত হয়। মোহনের মতই তিনি আরেকটি চরিত্র তৈরি করেছিলেন জানা যায়, কুমার। তবে কুমারকে নিয়ে গল্পের সংখ্যা বেশী নয়। এছাড়াও তিনি ঘি ও আঙুন, আঙুন ও মেয়ে, স্বর্গাদপী গরীয়সী, শ্রীকান্তের শেষপর্ব, শেষ উত্তর ইত্যাদি রচনা করেছিলেন।

(৪)

আমরা আলোচনা করবো হেমেন্দ্র কুমার রায়ের(১৮৮৮-১৯৬৩)- পদ্মরাগ বুদ্ধ(১৯৩৮) নিয়ে। মৌলিক উপন্যাস। কিন্তু পাশ্চাত্য এবং ঔপনিবেশিক ভাবনা-সম্বলিত। জয়ন্ত-মানিকের, পদ্মরাগ(মরকত রত্ন নির্মিত) বুদ্ধমূর্তির রহস্য উদ্ঘাটন ও উদ্ধারের জন্য ফরাসী অধিকৃত কম্বোডিয়া অভিযান, এবং জয়ী হয়ে প্রত্যাগমন। তাদের শত্রু চ্যান এবং ইন, বর্মী। পাশ্চাত্য পীতাতঙ্কপ্রসারী সাহিত্যে এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তকে ‘অপর’ করে বর্ণনা করা হয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্য- চীন, জাপান, ভারত, বার্মা ছাড়াও কম্বোডিয়া, সিয়াম ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে রোমাঞ্চকর কাহিনি-বর্ণনাও আছে, বলাবাহুল্য ধরণগুলি সমস্তই এক। পীতাতঙ্ককে, সাহিত্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, যে যে চিহ্ন এবং উপাদানগুলি পাশ্চাত্যে সচেতনভাবে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি এশিয়ার ভারত উপনিবেশের সাহিত্যিকরা বিনা প্রশ্নে আনুগত্যের সঙ্গে

ব্যবহার করেছেন, খোদ এশিয়ার একটি বাদামী বর্ণের দেশ হয়েও! হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এই উপন্যাসও তার মধ্যে অন্যতম। আমরা উপন্যাসে পীতাতঙ্কের প্রভাবের উল্লেখ করবো, বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে-

জয়ন্ত বললে-...প্রথমত, বুদ্ধের প্রতি একটা অতি-ভক্তি থাকা সম্ভব কেবল গোঁড়া বৌদ্ধের। কিন্তু কলকাতায় এমন ভীষণ প্রকৃতির বৌদ্ধ আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, কাশীধামে কাক মরলে কামরূপে কেউ হাহাকার করে না। কলকাতার অজানা জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া সাধারণ বুদ্ধমূর্তি, তার জন্য কলকাতার কোনও বৌদ্ধের এতটা নাড়ির টান হবে কেন?^{৩৪}

শুধু তাই নয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ কতটা উপনিবেশের তৈরি তারও ভয়ঙ্কর নমুনা আছে-

কলকাতার অধিকাংশ মেসবাড়ির- বিশেষত যেখানে অবাঙালির বাস- সিঁড়ি হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণাকর স্থান। তার ধাপে ধাপে চোখে পড়ে কুকুরের বিষ্ঠা, মানুষের মূত্র ও যত রাজ্যের দুর্গন্ধ জঞ্জাল এবং তার দেওয়াল হয়, খুঁতু পানের পিক ও অন্যান্য নানা নস্করজনক মলিনতার দ্বারা চিত্রবিচিত্র। শ্বাস ও চক্ষু বন্ধ করে যতটা সম্ভব জড়োসড়ো হয়ে সেখান দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়। (তদেব, পৃ ২৩)

সেখানেই দেখা যাবে, ‘শত্রু বর্মীদের’ বাস! ঐক্যের রাজনীতি থেকে এসব ভাবনা যে বহু দূরবর্তী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুন্দরবাবু হুঙ্কার-

এই মগের বাচ্ছারা! দেশ ছেড়ে তোরা কলকাতায় কী করতে এসেছিস? (তদেব, পৃ ২৬)

কলকাতার বাবুরা, ইংরেজদের অধীনে, বার্মার কী অবস্থা করেছিল তার বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি।

হিন্দুস্বরের প্রাধান্যকে চিনে নেওয়া যাবে সহজেই-

ভাবতে গর্ব হয় যে, এই মন্দির যারা গড়েছে তারা হচ্ছে দ্বিজয়ী হিন্দু-আমাদেরই পূর্বপুরুষ!... আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন মর্তে অবতীর্ণ দেবতা!... তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভারত সন্তান! হিমালয়ের আশ্রয় ছেড়ে, গঙ্গার স্নিগ্ধ স্পর্শ ভুলে, সাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশের নিবিড় অরণ্য ভেদ করে রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী, মা-ছেলে, বর-বউ, কুমার-কুমারী, এইখানে এসে অবশেষে কাম্যলোকের সন্ধান পেলে- আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির ওপর দিয়ে পদচারণ করছি! সে হচ্ছে শত শত যুগ আগেকার কথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে তখনও কোনও বিধর্মী প্রবেশ করতে সাহসী হয়নি। ...ওঙ্কারধামের পাথরে পাথরে তারা যে সংস্কৃত ভাষায় লিপি খুঁদে গেছে,... যাদের শিল্পনিপুণ হাত তাদের গড়েছে তারা প্রথমে ছিল হিন্দু, তারপর বৌদ্ধ...। (তদেব, পৃ ৩২)

এটা যে ইতিহাস নয় তা আমরা জানি! ‘বিধর্মী প্রবেশ’ শব্দটিই ‘জেনোফোবিয়া’র মূল উৎস। হিন্দু পরে বৌদ্ধ এইসব কথাগুলিরও কোনো মানে নেই! এই উপন্যাসের পরতে পরতে হিন্দুত্বের জয়গান করা আছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদের অপমান। বিশেষত, বৌদ্ধধর্মকে, বার্মিজ, কলকাতায় ‘বিশেষ দৈহিক

আকৃতি ও বর্ণনা'যুক্ত লোকেদের 'অপর' হিসেবে অপরাধপ্রবণ- করে তোলা হয়েছে। লেখকের কৈফিয়ৎ আছে পাদটীকাতে-

ওঙ্কারধাম সম্বন্ধে এ উপন্যাসে যা বলা হয়েছে তা লেখকের কপালকল্পিত নয়। অধিকাংশই প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। ইতি লেখক। (তদেব, পৃ ৩৮)

যদিও বুদ্ধ, ধর্ম ও সমাজের মন্ত্র দিয়েই এই উপন্যাস শেষ করা হচ্ছে। কারণ ততদিনে এই বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধপুথি, বৌদ্ধদস্যু, বৌদ্ধ দেশ বা প্রতিবেশ জনপ্রিয় রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনির জনপ্রিয় উপাদান হিসেবে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের আরেকটি উপন্যাস আছে 'প্রদীপ ও অন্ধকার'। সেখানে সমস্যার কারণ জাপানী গুপ্তচরের বিধ্বংসী প্ল্যান- দেশে মারাত্মক রোগের জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া। প্রেক্ষাপট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। শত্রু জাপানীদের গুপ্তচর ডাক্তার চন্দ্রনাথ ('ডাক্তার' খেয়াল করবো)। নায়ক নরেন ও নারায়ণ।

পাশ্চাত্যের পীতাতঙ্ক প্রভাবিত হয়ে, বৌদ্ধধর্মকে যেমন আক্রমণ করা হচ্ছিল তেমনই আক্রমণ করা হয়েছিল- 'তাওবাদ' কেও। অনেক ঐতিহাসিকরাও তাওবাদকে বিকৃত ও হীন করে বই লেখেন, ঐতিহাসিক নীডহ্যাম এই প্রবণতা প্রতিবাদ করেন তাঁর বইয়ে। যেহেতু আমরা বৌদ্ধধর্মেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছি আমাদের আমাদের আলোচনা তাই তাওবাদ সম্পর্কে আমরা বিশেষ আলোচনা করবো না। তবে মনে রাখতে হবে 'পীতাতঙ্কের' আওতায় একই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে চীনের প্রাচীন তাওবাদকেও 'হীন' প্রমাণ করা হয়। এই প্রবণতা যুক্ত ইতিহাস বা গবেষণার বইগুলিও পীতাতঙ্ক প্রভাবিত। শুধু কাল্পনিক সাহিত্য নয় ইতিহাস রচনাও এই প্রকল্পের অন্তর্গত। ইতিহাসকেও ম্যানিপুলেট বা নির্মাণ করা হয়, তা আমরা আগেও দেখেছি।

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন (১৯৩৯) মৌচাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানেও তাওবাদীরা, হল মূল প্রতিপক্ষ। সেখানেও গল্প থামিয়ে তাওবাদীদের সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া আছে যা মূলত পীতাতঙ্ক প্রভাবিত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মত। বিভূতিভূষণের 'মরণের ডঙ্কা বাজে' উপন্যাসটি এর পরের বছরেই 'মৌচাক' এ

প্রকাশিত হয়। ‘তন্ত্র ও তাওবাদ’ প্রবন্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পীতাতঙ্ক প্রভাবিত পাশ্চাত্যের এবং তা প্রভাবিত ভারতবাসীর সাধারণ ধারণার, প্রতিমুখী যুক্তি এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা পরে তার পরিচয় দিয়েছি।

(৫)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কিশোর উপন্যাস- *মরণের ডঙ্কা বাজে*(১৯৪০)। প্রথমে এটি মৌচাক পত্রিকায় ধারাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। গল্প বাংলাদেশ, বার্মা, সিঙ্গাপুর হয়ে দুই বাঙালি যুবক পৌঁছয় চীনের পটভূমিতে; প্রেক্ষাপট চীন-জাপান যুদ্ধের বিপদসংকুল পরিবেশ। এই সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে, যার প্রভাব ভারতবর্ষে এসেও পড়ছে। দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ হয় ১৯৩৭-১৯৪৫। চীন, সোভিয়েত রাশিয়া এবং ইউনাইটেড স্টেটস এর সাহায্য পায়। ১৯৪১ নাগাদ এই যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই অংশ হয়ে দাঁড়ায়। বার্মা এবং চীন আক্রান্ত হয়। এই উপন্যাসে যুদ্ধের ভয়াবহতা, নৃশংসতা, যুদ্ধের ফলে দুর্ভিক্ষের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মার্কোপোলো ব্রিজ অধিকার করে এই যুদ্ধের সূচনা করে জাপানীরা, তারপর একে একে বেজিং, সাজ্জাই, নানকিং ১৯৩৭ সালে দখল করে, এই সময়েই ইতিহাসে কুখ্যাত ‘রেপ অফ নানকিং’ ঘটে। এখানে যুদ্ধের সমস্ত বীভৎসতাকেই দেখানো হয়েছে, ধর্ষণ বাদ দিয়ে(মান্য বাংলা সাহিত্যে ট্যাবু বলেই হয়ত; কিশোর উপন্যাস বলে নিষ্ঠুরতা কমানোর জন্য নয়, কারণ নিষ্ঠুরতা এতে ভরপুর) যদিও অপহরণ দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে একটা কথা না বললেই নয়, হয়ত ‘মান্য মানসিকতা’য় ধর্ষণ নিষ্ঠুরতা হিসেবে গ্রাহ্য নয়; দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্বীকৃত ‘যৌনতা’ হিসেবে। ফলে পাল্ল ফিক্সনে, চটি বইয়ে, চলতি সিনেমায় ‘যৌনতা’ দেখাতেই ধর্ষণ দেখানো হয়! নিষ্ঠুরতা হিসেবে নয়! অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক! যদিও ব্যতিক্রম আছে শিল্পের মানের তারতম্যে। এই উপন্যাসে, উল্লিখিত ঘটনাগুলিই আছে, উপন্যাস শেষ হলেও যুদ্ধ শেষ হয়নি, বিমল এবং সুরেশ্বরের প্রত্যাবর্তনও ঘটেনি, উপন্যাস শেষেও তারা চীনের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে। ফলে গল্পটির

বুনন চমৎকার! শেষপর্যন্ত উপন্যাসটি যুদ্ধবিরোধী বার্তাই দেয়। কিন্তু এই গল্পটির সঙ্গেও রূপকথার, ইচ্ছেপূরণের মিল আছে।

গল্পটি এরকম- ডাক্তার বিমল এবং মেডিক্যাল রিথ্রেনেজেন্ডিভ সুরেশ্বর নিজেদের রোজগারের উদ্দেশ্যে বার্মা হয়ে সিঙ্গাপুর যায়, কিন্তু সেখানে তাদের আশামত কাজ তারা পায়না। বরং তারা চৈনিক, মিঃ আ-চিন এবং মাদ্রাজী মিঃ সুব্বা রাও এর নির্দেশ মতো পূর্বোক্ত যুদ্ধের পটভূমিকায়, চীনে, মেডিকেল টিমের অংশ হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায়। প্রায় নায়িকার ভূমিকায় আছে আমেরিকান দুটি মেয়ে(আমরা আগেই বলেছি এই যুদ্ধে আমেরিকা চীনের সহযোগী ছিল) অ্যালিস এবং মিনি। দুজন নায়ক, দুজন নায়িকা। চীনের প্রেক্ষাপটে, তার জাপানি বোমার আতঙ্ক বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে, মিনি এবং অ্যালিস অপহৃত হলে তাদেরকে এবং বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত চীনা-জাপানি মানুষকে উদ্ধার করে। এর সঙ্গেই উপরি পাওনা, সেই বিদেশি জায়গা গুলির বিভূতিভূষণ-সুলভ ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক (চাঁদের পাহাড় যেমন) নিখুঁত, বিস্তারিত বর্ণনা। পীতাতঙ্কের বিস্তার এখানে গৌণ, মৃদুস্বরে। ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রভাব, এশীয়ান, বিশেষত চীন, জাপান- বার্মিজ আত্মপরিচয়ের প্রতি ‘অপর’ মনোভাব এসব প্রভাব এড়ানো যায়নি, বা হয়ত চেষ্টাও করা হয়নি। কারণ এই ধারণাগুলির এতটাই সাধারণীকরণ এবং সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটেছে যে সেগুলি জনপ্রিয়তার চাবিকাঠিতে পরিণত হয়েছে। সুলেখক ভেদে এই জনপ্রিয়তার চাবি-কাঠি, তার বৈচিত্র্য, শিল্পগুণ পেয়েছে অথবা পায়নি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিত রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং আরও কয়েকজন অঙ্গি এই ধারায় কিছু বৈচিত্র্য থাকলেও তারপর সেগুলি লঘু, বাজারচলতি, জনপ্রিয়-ছকে ফেলার অতিচেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং পরিমাণেও অত্যন্ত বেশি হয়ে ‘মুড়ি-মুড়কি’তে পরিণত হয়েছে(দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘কেশতৈল’ এর উদাহরণ মনে করায়)।

এই উপন্যাসে শত্রুপক্ষ জাপান তো বটেই, ‘চীনেম্যানরাও’; কারণ তাদেরই একটি দল ‘নায়িকা’দ্বয়কে অপহরণ করে। তাদের পরিচিত ছবি নেশার আড্ডা(পীতাতঙ্ক প্রভাবিত), শ্বেতাঙ্গদের দেখে ভয়, অপরাধীমনস্কতা এসব দীনেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাসে যেমন পেয়েছি প্রায় তেমনই।

নেশাখানার বিবরণ ডিকেন্সের ছবির মতই-

ঘরটায় ঢুকেই ওদের মনে হোল, এটা একটা চণ্ডুর আড্ডা। ঘরের মধ্যে চার-পাঁচটা চীনাবাঁশের চেয়ার, একদিকে একটি নিচু বাঁশের তক্তাপোশ। চণ্ডু খাবার নল, ছিটেগুলি গালাবড় পাত্রে, চণ্ডুর আড্ডার সব জিনিসই মজুদ। দেওয়ালে চীনা দেবতার ভীষণ প্রতিকৃতি। ঘরটি লোকশূণ্য, নির্জন। এ ধরনের চণ্ডুর আড্ডা ওরা সিঙ্গাপুরে দেখেছে!...বিমল বুঝতে পারল জায়গাটা শুধু চণ্ডু নয়, নীচ শ্রেণির জুয়াড়ীদের আড্ডাও বটে।^{৩৫} এবং সঙ্গে নারী অপহরণকেও যুক্ত করা হয়েছে।

আর উপন্যাসের দৃষ্টিভঙ্গি, অবশ্যই বিমল এবং সুরেশ্বরের মাধ্যমে চিনে নেওয়া যায়- ‘হিন্দু-অভিজাত-নাগরিক-মান্য-অভ্যন্তর’, অচেনা সম্পর্কে হীন বা অপর মনোভাব। ফলে শ্রেষ্ঠত্ব, বাংলাদেশের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের(নায়িকা দুজন সেখানকারই); ‘অপর’ বিশেষত জাপান, যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনও।

এখানে দুর্ভিক্ষ প্রতিকারে মার্কিন সরকারের দান, ‘নায়িকা’দের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে তাদের দেশের এবং জাতির গৌরবকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে কাল্পনিকভাবে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশকে। কারণ নায়িকাদের, নায়ক তো বাঙালিই! চীনেদের মধ্যেও বেশ কয়েকটি ‘বেনেভোলেন্ট বা উপকারী’ চরিত্র আঁকা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম বৃদ্ধ প্রফেসর লি, মার্কিন আর্থিক সাহায্যে, তিনি পীড়িতদের সেবা করেন। ফলে, মার্কিনদের শ্রেষ্ঠত্ব তার সংলাপেও শোনা যায়, এবং সে, নায়ক-নায়িকার শুভাকাজ্ছী। আমরা বলেছি, শেষে যুদ্ধ শেষ হয়না বা বিমল-সুরেশ্বরের(নায়ক-নায়িকারা এত নিষ্ঠুরতা, বোমাবাজি সত্ত্বেও অক্ষত থাকে) স্বদেশে প্রত্যাগমন ঘটেনা। তা সত্ত্বেও উপন্যাসটি মিলনান্তক এবং ‘ইচ্ছেপূরনের’ গল্প, স্থিতিবস্থাকে এতটুকু বিচলিত করে না। হ্যাঁ, অবশ্যই যুদ্ধবিরোধী বার্তা , এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। আমরা এবার উপন্যাস থেকে উদ্ধৃতি দেবো। পীতাতঙ্কের ক্ষেত্রে জাপানীবিরোধের কথা আগেই বলেছি, রুশ-জাপান যুদ্ধ থেকে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পরমাণু বিস্ফোরণকে লেজিটিমাইজ(বৈধ করে দেওয়া, সহজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা) করা পর্যন্ত; পীতাতঙ্কের

বিস্তার। ঐতিহাসিকরা দেখাচ্ছেন, পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণের বীভৎসতা বেশিরভাগ শ্বেতাঙ্গের মনে দাগ কাটেনি, কারণ তারা একে উচিত কাজ বলেই মনে করেছিল। পীতাতঙ্কের সাহিত্য-সিনেমা-পোস্টার-ছড়া... সব কিছু তাদের এই স্বপ্নই দেখাচ্ছিল। এখানেই ‘জেনোফবিয়ার’ সাফল্য। আমাদের দেশের সঙ্গেও মেলানো যেতে পারে, পাকিস্তানের যেকোন দূর্দশায়, শিশুমৃত্যুতে পর্যন্ত ‘সোশাল মিডিয়ার’ উল্লাস! এতো আমাদের চেনা।

এই পীতাতঙ্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পরাধীন ভারতবর্ষেও কার্যকরী ছিল। ‘সা রে গা মা পা ধা নি/বোম ফেলেছে জাপানি’ ইত্যাদি ছড়ার মধ্যেও তার প্রমাণ আছে, ইতিহাসের নথিতে, সাহিত্যেও আছে। এখনও আছে (কথায় কথায় চীনের জিনিস ঢুকে যাওয়া, প্রতিরোধ করা ইত্যাদি নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে তৈরি করে দেওয়া চলছে এখনও)। এমনি সাম্প্রতিক করোনা ভাইরাস নিয়ে, তা আরেকবার জোরদার মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। এখানে জাপানি সৈনিক বিমলকে ভয় দেখায়, প্রায় আউ-লিং, ডাক্তার ওয়াটার ইত্যাদির মতোই-

সাংহাই কি, সারা এশিয়া আমরা দখল করবো-তোমাদের ভারতবর্ষ তো বটেই। দেখে নিও তুমি- (তদেব, পৃ ১২৫)

চীনা, বার্মা, জাপানি এথনিসিটির খাদ্যাভাসের প্রতিও আছে ঘৃণার মনোভাব (এরকম উদাহরণ এই উপন্যাসে প্রচুর)

(১) বিমল বললে- এ আবার কি চিজ বাবা? ইঁদুর ভাজা-টাজা নয় তো?

সুরেশ্বর বললে- ইঁদুর নয়, কুমড়োর বিচি, তা স্পষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে ইঁদুর খাওয়া অভ্যাস করতে হবে, নইলে হরিমটর খেয়ে থাকতে হবে চীন দেশে। (তদেব, পৃ ৮২)

(২) সমুদ্রপাড়ায় আক্রান্ত দুটি বাঙালী যাত্রীর পক্ষে চীনা ভাত তরকারি খাওয়া প্রায় অসম্ভব। (তদেব, পৃ ৮৪)

(৩) সুরেশ্বর নিম্নস্বরে বললে- খেও না বিমল। ইঁদুর ভাজা কিম্বা আরসুলা চচ্চড়ি বোধ হয়। (তদেব, পৃ ৯০)

(৪)... বাঙালী মেয়েদের পাঁয়জোড়ের মত দেখতে শুয়োরের চর্বিতে ভাজা এক প্রকার কি খাবার। সুরেশ্বর ও বিমল শেযোক্ত খাবার ঠেলে রেখে দিলে, সে কি এক ধরনের বিশ্রী গন্ধ খাবারে। (তদেব, পৃ ৯৯)

(৫) বিমল বললে- খাবার কি আছে?

-ভাজা মাছ, রুটি, মাখন আর ব্যাঙের-

থাক থাক, রুটি মাখন ভাজা মাছ নিয়ে এসো- (তদেব, পৃ ১০৪)

দৈহিক বিবরণ-

লোকটা সম্ভবত চীনা ম্যান। বয়স আন্দাজ ত্রিশ, সার্কাসের পালোয়ানের মত জোয়ান-... মুখখানা দেখতে খুব কুশ্রী নয়, কিন্তু কঠিন ও নিষ্ঠুর। ওর হাতে অস্ত্রখানা বিমল লক্ষ্য করে দেখলে ঠিক ছোরা নয়, মালয় উপদ্বীপে যাকে ‘ক্রিস্’ বলে তাই। (এই জলদস্যু হত্যার নিদর্শন হিসেবে, মৃতের কান জমায়) (তদেব, পৃ ৮৫-৮৬)

ধর্ম সম্পর্কে-

তাওইজম সম্পর্কে(‘ভ্রাগনের দুঃস্বপ্ন’ এর কিছুদিন আগেই, একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেকথা আগে আমরা বলেছি।)-

ওরা একটা পাহাড়ের ওপর চীনা মঠ দেখতে গেল। ... মন্দিরের মধ্যে টেওস্ট ধর্মজ দেবমূর্তি। এদের মধ্যে একটি মূর্তি দেখে সুরেশ্বর চমকে দাঁড়িয়ে গেল। কোন্ চীনা দেবতার মূর্তি। জ্রুটি-কুটিল, কঠিন, রক্ষ মুখ। হাতে অস্ত্র, দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত আক্রোশপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী যেন ধ্বংস করতে উদ্যত। ...দেখেছো মূর্তিটা? মুখচোখের কি ভয়ানক নিষ্ঠুর ভাব দেখেছো?... ওটি টেওস্ট রণ দেবতার মূর্তি। হঠাৎ সুরেশ্বর বলল চল এখান থেকে চলে যাই। ...উঃ কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম চীনাদেবতার মূর্তিটা দেখে!...আমরা যেন এই দেবতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে গিয়েছি।

সব সময় সব জায়গায় যেতে নেই। আমরা সন্ধ্যাবেলা ঐ চীনে মন্দিরে গিয়ে ভাল কাজ করি নি। (তদেব, পৃ ৭৭-৭৮)

এতক্ষণ আমরা যেসব মূর্তির কথা পেয়েছি তা বুদ্ধ-মূর্তি। এরপর থেকেই আমরা এরকম ভীষণদর্শন মূর্তির কথা পেতে থাকবো। তা বৌদ্ধধর্মের অপর শাখাগুলি সম্পর্কে ‘ঘৃণা-অপরতা-হীনতা’কে জাগিয়ে তোলার চমৎকার পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। একইরকম ‘যোদ্ধা’প্রতিম বিশাল শিবমূর্তি আমরা ‘পদ্মরাগ বুদ্ধ’তে পাবো। কিন্তু সেখানে শিবের মূর্তিতে ‘বীরত্বকে, প্রলয়-ধ্বংসের মহিমাকে বর্ণনা করা হয়েছে। সাহিত্যে কালিমূর্তি বা অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি -‘বৌদ্ধমূর্তি’ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে প্রায় কখনই বলা হয় নি।

(যদিও উপন্যাস, শেষ হয় ফা-চিন্, নামক চিরকুমারী দেবীর মন্দিরে, যিনি নব-দম্পতিদের আশীর্বাদ করেন বলে কথিত, সেখানেই অ্যালিস এবং বিমল, হাত ধরে নবোদ্যমে কাজ শুরু করে।)

তাওইজম সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার ‘তন্ত্র এবং তাওবাদ’ প্রবন্ধে ভারতীয় তন্ত্রের সঙ্গে তার মিল বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি নীডহ্যামের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, আমরা সেই উক্তিটি তুলে দিচ্ছি-

It is necessary to say that, for some reason or another, Taoist thought has been almost completely misunderstood by most European writers and translators. Taoist religion has been neglected and Taoist magic has been written off wholesale as superstition, Taoist philosophy has been interpreted as pure religious mysticism and poetry. The scientific or ‘proto’-scientific side of Taoist thought has been very largely overlooked, and the political position of the Taoists still more so.^{৩৬}

বোঝাই যাচ্ছে বিভূতভূষণের এই বর্ণনা সেই ইউরোপীয়ান লেখক, অনুবাদকদের দ্বারাই প্রভাবিত যারা একে ভুল, অপর, হীন হিসেবে ব্যাখ্যা করে এসেছেন। নীডহ্যাম, দেবীপ্রসাদ প্রমুখরা ব্যতিক্রম। শশীভূষণ দাশগুপ্ত, নিম্নবর্ণের ধর্মাচরণকে ‘অপর’ করে তোলার অভিজাত-দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন; তা ব্যাখ্যা তৃতীয় অধ্যায়ে করেছি। উপন্যাসের উদাহরণে ফিরে যাবো-

আ-চিন এবং সুঝা রাও বিমল, সুরেশ্বরকে প্রস্তাব দিয়ে বলে-

আপনারা বুদ্ধের দেশের লোক, আমরা আপনাদের মন্ত্রশিষ্য। আমাদের সাহায্য করুন।^{৩৭}

আমরা বৌদ্ধধর্ম কীভাবে পালন করা হবে তাও বাংলা দেওয়ার চেষ্টা ‘ক্ষমতার কেন্দ্র’ অবস্থান থেকে করা হয়, যা পছন্দ নয় তাকেই ‘অপর, গৌণ’ করা হয়। অপরাধীর সঙ্গে অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রের ক্ষেত্রে ধর্মকেও জুড়ে দেওয়া হয়।

চীনা জলদস্যু প্রসঙ্গে-

...এতক্ষণে তারও অশেষ দুর্দশা হচ্ছে এই পীতবর্ণ বর্বরদের হাতে। বুদ্ধদেবের ধর্মকে এরা বেশ আয়ত্ত করেছে বটে! লোকটা সময়ের মূল্য

বোঝে, কারণ কথা শেষ করেই বুদ্ধশিষ্যের এই বিচিত্র নমুনাটি চকচকে ক্রিস্থানা হাতে করে এগিয়ে এল- (তদেব, পৃ ৮৬)

এছাড়াও

বিমলের চোখের সামনে বর্বর জাপানী সৈন্যেরা নিরীহ গ্রামবাসীদের টেনে টেনে ঘর থেকে বার করতে লাগলো, এবং বিনা দোষে বেওনেটের কিংবা বন্দুকের কুঁদোর ঘায়ে তার মধ্যে সাত আটজনকে একদম মেরে ফেললে। ...তবে নারী ও শিশুকণ্ঠের চীৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, ওদিকের জাপানী সৈন্যেরা ঠিক বুদ্ধদেবের বাণী আবৃত্তি করছে না। (তদেব, পৃ ১০৪)

চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল(তা সহানুভূতিই একানুভূতি নয়, তা উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে!)

মন্তব্য যে একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু তা খুব কম-

তারপর ওরা জ্বীলোকটির কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। আহা যেন মূর্তিমতী দারিদ্র্যের ছবি! ভারতবর্ষীয় লোকে তবু মান করে, গায় মাথায় তেল দেয়, ওরা তাও করে না- গায়ে খড়ি উড়ছে, মাথা রক্ষ, শরীর অম্মাভাবে শীর্ণ ও জ্যোতিহীন। হতভাগ্য মহা চীন, হতভাগ্য ভারতবর্ষ! দুজনেই দরিদ্র্য, কেউ খেতে পায় না,- গুরু শিষ্য দুজনের অবস্থাই সমান। ...চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া, আবসিনিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, এদের মধ্যে দেশের সীমা এখানে মুছে গিয়েছে। (তদেব, পৃ ৮৮)

চীনের পটভূমি, চীনের ওপর বোমাবর্ষণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতি দূর্দশা দূর্ভিক্ষ সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষপাতিত্ব ঘটে বাঙালি এবং ব্রিটিশ ও মার্কিন(নায়িকা, অর্থসাহায্য)দের প্রতি।

(৫)

আলোচনা করবো নীহাররঞ্জন গুপ্তের(১৯১১-১৯৮৬ খ্রিঃ) কিরীটীকে নিয়ে উপন্যাস *কিরীটীর আবির্ভাব* নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কালোভ্রমরের কাহিনি নির্মিত হয়। কালো ভ্রমরও বারবার চেষ্টাতেও অপরাজিত। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ড যান সেখানেই আগাথা ক্রিস্টির লেখার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে এবং দেশে ফিরে তিনি কিরীটী এবং কালোভ্রমরের কাহিনি তৈরি করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি অন্যান্য এই ধরনের আখ্যান, পাল্ল-ফিক্সনের সঙ্গে পরিচিত হন, তারই প্রভাব পড়ে কাহিনি গুলিতে। আমাদের আলোচ্য, এই গল্পগুলি, কীরকম জনপ্রিয় ছিল তা বাঙালি পাঠক মাত্রেই জানেন। পাল্ল ফিক্সনের মতোই তার চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা। এবং আমাদের আলোচনার যে সিদ্ধান্ত তাতে বলতে পারি, যে তার ‘পীতাতঙ্ক’ প্রভাবিত অংশগুলি- রবীন্দ্রবিরোধী, ঐক্যবিরোধী, এশিয়াবিরোধী, জাতি-বর্ণ-আত্মপরিচয় বৈষম্যমূলক এবং ভারতীয়-ঐক্যের বিরোধীও। ভারতবর্ষেই উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শনের বিরোধী তো বটেই। বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্পর্কে ভারতবর্ষেই ‘হীন ও অপরতার’ ধারণার প্রচারক। কিরীটী-কাহিনি প্রসঙ্গে, প্রমথনাথ বিশী ‘কিরীটী-তত্ত্বে’ লিখেছেন-

বাঙালী পাঠকের আগ্রহ কালোভ্রমরের কাহিনী পর্বে পর্বে নানাভাবে কখনো দেশে কখনও বিদেশে টেনে নিয়ে গেছে। বিশেষ ভাবে বর্মার রেঙ্গুন শহর, কলকাতার চীনাপাড়া- আমাদের কাছ স্বল্প-পরিচয়ের অবকাশে একটা রহস্য-কুহেলীর আবরণ টেনে কাহিনীর শীতল ভয়াল পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। কিশোর মনে ইরাবতী নদীর তীরে মিয়াং-এর পরিত্যক্ত জীর্ণ বৌদ্ধ প্যাগোডা, তার সন্নিহিতে ভগ্নমূর্তি, ড্রাগনের মুখে ঝোলানো বাল্য গুপ্ত ধনাগারের চাবি, গুপ্তধনের সঙ্কেতবাহী লিপিতে দুর্বোধ্য ইশারা-^{৩৮}

স্পষ্ট বোঝা যায় চিহ্নগুলি কি সাবলীলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছিল। যেভাবে তাদের এই দেশ, ধর্ম-জাতি, বর্ণের সঙ্গে পরিচিত করানো হচ্ছিল তা পীতাতঙ্ক-প্রসারী একথা আমরা বহুবার বলেছি। তারসঙ্গে আছে এই সংস্কৃতির কিশোর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ। শিশুর মানসিকতা গঠনের প্রথম পর্যায়েই তাদেরকে এই মানসিকতার অনুসারী করে তোলা হচ্ছিল, এখনও হচ্ছে আরও ব্যাপকভাবে। বাংলা সাহিত্যে এই সংস্কৃতি আস্তে আস্তে adopt adapt এর স্তর পেরিয়ে, adept এর পর্যায়ে পৌঁছেছে।

‘কলকাতার চীনেপাড়া’ র যে বর্ণনা এঁরা করছেন তার ধরণ বিদেশীই। চর্মচক্ষুতে বাস্তবে তা দেখা যায়না। কারণ ধরণটিই বিদেশী। কলকাতায় বসেই কলকাতার পাঠকরা বই পড়ে চৈনিকপাড়াকে বিদেশী-চক্ষুতে, পীতাতঙ্কের ফিল্টারে দেখতে শুরু করেছিল। ফিরে আসি, উপন্যাসে। এই আখ্যানে একটি নেপালি চরিত্র আছে, স্বাভাবিকভাবেই সে টাইপ চরিত্র, এবং নায়কের প্রতি শুধু ভালোই করে, চাকর, নামও ‘জংলী’! যতরকমভাবে ‘হীন’ প্রমাণ করা যায় তার বর্ণনায় শ্রেষ্ঠ! এখানেও সমস্যার কেন্দ্রে, ড্রাগন এবং বুদ্ধমূর্তি। চীনেপাড়ায়, চীনে জুতোর(হংকং সু ফ্যাক্টরী) দোকানে অপরাধীদের আড্ডা। যখনই চৈনিকদের প্রসঙ্গ এসেছে বেশিরভাগেই সেখানে সম্বোধন ‘চীনেটা’! সেখানে-

... একটা কুৎসিত চীনা বুড়ীর চেষ্টা মুখ দেখা গেল।...সেই বিশী বুড়িটার কুৎসিত মুখে ততোধিক কুৎসিত এক টুকরো হাসি জেগে উঠল।

(তদেব, পৃ ৩২)

চৈনিক লোকের বর্ণনা- ছোট কুৎসিত চোখ (তদেব, পৃ ৩৪)

গোটা চৈনিকপাড়াকে অপরাধপ্রবণ বর্ণনা করে সাধারণীকরণ করা হচ্ছে জনমানসে-

কিরীটী বললে, একটা কথা ভাবছি, চীনাপাড়িতে হট করে গিয়ে আগেই ওঠা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আটঘাট বেঁধে কাজে নামতে হবে।

(তদেব, পৃ ৪১)

এই বর্ণনা পাল্ল-ফিক্সনের ‘চাইনিজ ঘেটো’র বর্ণনার অনুরূপ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাংলা ভাষাকে(এই অঞ্চলের, বাংলা ভাষা বলে কিছু আলাদা নাম ছিল না, তা আমরা জানি) পাখিদের ভাষা (বয়াংসি) বলা হয়েছিল, কিরীটীর গল্পে ‘কুৎসিত চীনা বুড়ী’র ভাষা ‘কিচির-মিচির’। যে যুক্তিতে আমরা বাংলা ভাষাকে ‘হীন’ করার প্রতিবাদ করি, একই যুক্তিতে এটিও ঔদ্ধত্যের, ক্ষমতার প্রাধান্যের, অহঙ্কারের চিহ্ন বহন করে। এছাড়াও বার্মা বলার পরিবর্তে, ‘মগের মুল্লুক’(তদেব, পৃ ৬০) বলা তো আছেই।

আরোও স্পষ্ট করি, পীতাতঙ্কের প্রভাব। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটী বিষয়ক একটি গল্পের নাম- ‘হলুদ শয়তান’। এই গল্পেই কিরীটীর কৃষ্ণার(স্ত্রী, পরবর্তীকালে) সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। শত্রু ‘রক্তমুখী ড্রাগন’ নামে পরিচিত ‘চীনের হলুদ শয়তান ডাঃ ওয়াং’ (তদেব, পৃ ২২), যার কর্মক্ষেত্র এই গল্পে ভারতবর্ষ। ডাক্তার শব্দটি আবারও খেয়াল করবো। পাশ্চাত্যের ‘পীতাতঙ্ক’কে এদেশের মানুষের মনে বাস্তব করে, যেন বা তাদেরই সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট। কিরীটী র মতে সে কেমন? ডঃ ফু মাধুর মতই যেন-

যতই তার কথা ভাবছি মনে হচ্ছে, লোকটা রসায়ন-শাস্ত্রে পণ্ডিত, ইংরেজীতে পণ্ডিত, বাঁদর দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে, বিশালাকায় পিঁপড়ের মত জীবকে বিষাক্ত গন্ধে মাতোয়ারা করে মানুষের রক্তপানে লোলুপ করতে পারে। হয়ত কোনো ক্ষুদ্র জীবকে ঘরের মধ্যে পাঠিয়ে তাকে বিষাক্ত গন্ধে উন্মত্ত করে ফেলে, এবং তারই কামড়ে নিদ্রিত মানুষকে অচেতন্য করে দিতে পারে। (তদেব, পৃ ২১)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ড্রাগন নামেও একটি উপন্যাস লেখেন। আমরা আর তাঁর উপন্যাস নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। আশা করা যায়, যথেষ্ট প্রমাণ আমরা দিয়েছি। স্বপনকুমারের ড্রাগন-সিরিজের প্রভাব খেয়াল করবো। ‘ড্রাগন’ বিষয়টিই পাশ্চাত্যের পীতাতঙ্কের প্রসারের অন্যতম চিহ্ন। বাংলায় এই ধরনের সাহিত্যেও তাই ড্রাগনের রমরমা। ড্রাগন সমগ্র, ২য় খণ্ড থেকে আমরা কিছু উদাহরণ দেবো। দীপকও তাকে বারবার পরাজিত করে কিন্তু ড্রাগন অধরাই। ড্রাগনের পরিচয় দিচ্ছেন মিঃ সেন-

ড্রাগন দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়ার একটি বিখ্যাত দল। তাদের দলে প্রচুর লোক আছে- তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। এদের দলপতি একজন বার্মিজ- তার নাম, ইউ নাম। তবে লোকটা যে কোন দেশের তা সহজে বোঝা যায় না। কারণ পিতা বার্মিজ, মাতা ভারতীয়। তবে নিজেকে সে বার্মিজ বলেই পরিচয় দেয় (স্বাভাবিক ভাবেই হীন এবং নিষ্ঠুর চরিত্র বার্মিজ হতেই হবে!)...বর্মা, থাইল্যান্ড, বাটাভিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হংকং পর্যন্ত তাদের দলের কাজকর্ম চলে। আজ পর্যন্ত এরা কত যে নরহত্যা করেছে, তা গুণে বলা যায় না। শিকারী নেকড়ে মতোই এরা হিংস্র মানুষের প্রাণের কোনও মূল্য দেয় না।^{৩৯}

যেসব অঞ্চলকে ‘অপরাধপ্রবণ’ করে, ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেগুলি সবই এশিয়ায় পার্বত্য(আসাম, বার্মা ইত্যাদি) অঞ্চলগুলি, সেখানে বিশেষ একধরনের চেহারার মানুষের বাস! ফলে ক্রিমিনালাইজ করা সহজ! এছাড়াও কলকাতা শহরের মধ্যেই সেই বিশেষ ধরনের মানুষদের বাস্তব ভিত্তি ছাড়াই অপরাধপ্রবণ করে তোলা হচ্ছে। কল্পিত চরিত্রদের সাহায্যে, একটি কল্পিত আখ্যানে, যার পাঠক এবং লেখক কলকাতা-নগরকেন্দ্রিক, সেখানে সাধারণীকরণ করা হচ্ছে এমন সব মন্তব্যগুলিকে-

কোলকাতা শহরের চীনেপাড়া একটি কুখ্যাত অঞ্চল সন্দেহ নেই। চিরদিন এই অঞ্চলে গুণ্ড-বদমাশের উপদ্রব আছে। পুলিশের কালো খাতায় এই অঞ্চলটার নাম লেখা আছে। তবু এই অঞ্চলেই যে কি ভয়াবহ রক্তাক্তের বিষাক্ত বাষ্প ফেনিয়ে উঠতে পারে, তা কেউ কল্পনা করতে পারেনা। ... ঘরের কোণে ঝুলছিল একটা পর্দা। সেটার রঙ ঘন হলুদে। তার উপরে বিরাট লাল রঙের ড্রাগনের ছবি আঁকা। (তদেব, পৃ ২৬-২৭)

বলাবাহুল্য দস্যুদের আড্ডাও চীনেপাড়ায়। দলপতির মুখোশ ব্যবহার সবই পীতাতঙ্ক-বিস্তারি পাল্ল ফিক্সন প্রভাবিত।

এবার, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টি- মামাবাবু প্রসঙ্গ। আমরা বার্মার পরিচয় এই গল্পগুলিতেও কিছু কিছু পেয়েছি। মামাবাবু সিরিজের সূত্রপাতই বার্মা থেকে। মামাবাবু ইংরেজদের অধীনস্থ কর্মচারী হিসেবে বার্মাতে চাকরি করে। আমরা মূলত কুহকের দেশে নিয়ে আলোচনা করবো। বিশ শতকের তিনের দশকের প্রথম দিকে মাসিক ‘মৌচাক’ পত্রিকায় এই উপন্যাসটিও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

কুহকের দেশে বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে; ১৯৬৩ সালে প্রকাশ ভবন থেকে প্রকাশিত হয়। কুহকের দেশ- ‘রহস্যময়’ বার্মা। আমরা এতক্ষণ যাদের নিয়ে আলোচনা করলাম তাদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনির বুনন, চরিত্র নির্মাণ ইত্যাদি অত্যন্ত চমৎকার। অভিযানের গল্পগুলিতে, ইতিহাস, ভূগোল-নিষ্ঠতা, প্রাকৃতিক পরিচয় এক অন্যতম পাওনা। গল্প বার্মা চীনের(তিব্বত) এর সীমানায় দারুদের দেশের ‘রেডিয়াম-খনির’ রহস্যভেদ এবং আবিষ্কার। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান, মন্তব্য-বক্তব্য সম্পর্কে আমরা অল্প-বিস্তর জানি। কিন্তু মামাবাবু সিরিজ ‘জনপ্রিয়তা-নিষ্ঠ’ এবং বাস্তব সময়ের প্রভাব তার মধ্যে আছে। কারণ তখন কলোনী-ভারত এবং বার্মার সম্পর্ক তেমনই ছিল। বাস্তবের প্রকাশই তিনি ঘটিয়েছেন। সেখানেও একটি উপকারী বার্মিজ চরিত্র, মামাবাবুর সহকারি(চাকর নয় সেই অর্থে, ‘বোকা’, ‘মূর্থ’, ‘হাস্যস্পদ’ করে আঁকা হয়নি) মণ্ডপো। আর এই গল্পে প্রতিপক্ষ চীনেদস্যু লাওচেন। ভাগ্নে, কথক এই আখ্যানকে বলেছে- ‘রহস্যময়, ভয়ঙ্কর ভ্রমণকাহিনী’^{৪০} লাওচেনের বর্ণনাতেও ব্যবহার করা হয়েছে- ‘হল্‌দে মুখ’ (তদেব, পৃ ৬৮), ‘ট্যারা চীনে-চোখ’ (তদেব, পৃ ১৩২) ইত্যাদি। এখানে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই, কিন্তু অধিবাসীরা যে বৌদ্ধ তার ইঙ্গিত আছে। কারণ মামাবাবু, লি-সিন, মণ্ডপো বৌদ্ধ শ্রমণের ছদ্মবেশে সেই অধিবাসীদের বিশ্বাসভাজন হয়, এবং রহস্যভেদ করে- সেকথা বলা আছে।

মামাবাবু সিরিজের আরেকটি উপন্যাস *ড্রাগনের নিঃশ্বাস* নামগুলি খেয়াল করবো। ১৯৪৮ সালে সিগনেট প্রেস থেকে সত্যজিত রায়ের অঙ্কিত প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়। প্রায় একই ধরনের আখ্যান। এখানের প্রেক্ষাপট সায়ামের জঙ্গল, শত্রু জাপানী। আর ড্রাগন, জাপানীদের তৈরি একটি আগুন-উদগারি মেশিন (প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেই সত্যিকারের ড্রাগন আনেন নি; বহু পরবর্তী একজন লেখিকা সত্যিকারের ড্রাগন নিয়ে আসবেন! আমরা যাবো সেই আলোচনায়)। এখানে একজন রাশিয়ান সাহেব (ডিনিঙ্কি, ব্রিটিশ ডিক্সনের ছদ্মবেশে) আছে, যাকে ব্যবহার করা হয় জাপানি শত্রু হিরোতার সাসপেন্সকে ধরে রাখার জন্য, প্রথমে মনে হয় রাশিয়ান ব্যক্তিই আসল শত্রু কিন্তু প্রতিপক্ষ আসলে হিরোতা। রাশিয়ান

সাহেব, ফরাসী সরকারের (তখন সায়াম, কম্বোডিয়া ফরাসী অধিকারে ছিল) গুপ্তচর হিসেবে, মামাবাবুর মতো একই উদ্দেশ্যে আসে, এবং জাপানিদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলে। তবে প্রধান চরিত্র মামাবাবুই, রাশিয়ান এখানে বন্ধু-ভূমিকায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিবেচনা তাকে পীতাতঙ্কের অনুসারী করলেও অনুকরণকারী করে নি। তাঁর শৈলীর ছাপ উপন্যাসগুলিতে স্পষ্ট। কিন্তু মামাবাবুর শত্রু, ব্রিটিশদের শত্রুই, তাদের স্বার্থেই মামাবাবু কাজ করে। -

মামাবাবুর নাম শুধু বার্মায় নয়, সায়াম ও ইন্দো-চায়নার শ্বেতাঙ্গমহলেও বেশ ভালো রকম পরিচিত। (তদেব, পৃ ৮৮) এই লাইনটির মধ্যে দিয়ে মামাবাবুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ মহলে পরিচিত মানেই, যথেষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তি- এই যুক্তিতে।

(৬)

ভারত-চীন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেও এই ধরনের উপন্যাসের বাজার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কাকাবাবু সিরিজের- কাকাবাবু ও বজ্রলামা, প্রকাশকাল অনেকপরে, ১৯৯০, খুবই জনপ্রিয় উপন্যাস। গল্পে সন্ত আর কাকাবাবু মিলে রিমবিক মঠের বজ্রলামার ষড়যন্ত্র ফাঁস করে। এখানে তিব্বতী রিফিউজিদের ‘অপরাধপ্রবণ’/ ক্রিমিনালাইজ করে দেখানো হয়। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নির্দেশে কাকাবাবুর এই ‘কেস’ সম্পর্কে আগ্রহের কথা আছে। বজ্রলামা, রাষ্ট্রপতির নির্দেশ না মেনে দলাই লামার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে যায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ আবার পুরনো পদ্ধতিতে তাদের প্রায় রাষ্ট্রবিরোধি ছকেই ফেলে। এখানে বজ্রলামার সম্মোহনের এবং তিনশ বছরের প্রাচীন লামার রহস্য ভেদ করা হয়। আবারও আয়ুর্বর্ধক জড়িবিটের প্রসঙ্গ যুক্ত হচ্ছে আখ্যান নির্মাণে। এখানে বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি উপাদানও অপরাধীদের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

আমরা আগে adopt adapt adept এর ক্রমের কথা বলেছি। দেখা যাচ্ছে বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের সংরূপের ক্ষেত্রে পীতাতঙ্কের উপাদান গুলি আর অনূদিত, অনুপ্রাণিত না হয়ে সরাসরি অভিযোজিত হয়ে যাচ্ছে। হয়ত একই লেখকেরা অন্য সংরূপের, লেখায়, ভাবনায় এর উলটো কথাই বলেন বা

ভাবেন। কিন্তু তাঁরা যখনই, এই ধরনের গল্প-আখ্যান তৈরি করেন, তখনই উপাদানগুলি সেই একইরকমভাবে ব্যবহৃত হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। কখনও সচেতনভাবে, কখনও অভ্যাসের বশে।

বজ্রলামা তিব্বতি রিফিউজি, ভারত সরকারের অনুগৃহীত, ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ-তান্ত্রিক এবং অপরাধী। তার আত্মপরিচয় যেভাবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়-

লামাজি বললেন, পৃথিবীতে একমাত্র বৌদ্ধরাই হাজার হাজার বছরের ইতিহাস রক্ষা করেছে। ভগবান বুদ্ধের জন্মের পর থেকেই লিখিত ইতিহাসের শুরু তা জানেন না? আমাদের এইসব গুফায় প্রত্যেক বছরের ঘটনা লিখে রাখা হয়।^{৪১}

রাষ্ট্রের বিপক্ষে কীভাবে হাজির করা হচ্ছে সেই আবেগপূর্ণ কথোপকথন খেয়াল করবার মতোই। আগের গল্পগুলিতে ছিল ব্রিটিশ সরকার, এখন স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার। সর্বদাই রাষ্ট্রের, শাসকের, ক্ষমতার প্রাধান্য; গোয়েন্দা তার পক্ষের লোক। আমরা আগেই বলেছি, যতই তার পুলিশ বা পুলিশি ব্যবস্থাকে নিয়ে মজা করা হোক চূড়ান্তক্ষেত্রে গোয়েন্দা তারই মুখাপেক্ষী, সহকারি, তার চাহিদাকেই পূর্ণ করে, অপরাধী শাস্তিও পায় প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায়। অবশ্যই শেষে গিয়ে প্রামাণিত হয় যে রাষ্ট্রের সন্দেহই ঠিক! ফলে নজরদারি আবশ্যিক, রিফিউজিরা অপরাধপ্রবণ এবং কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়! বৌদ্ধধর্মকেও ‘অপর’ করা আছে-

কাকাবাবু বললেন, “রাষ্ট্রপতি আগেই সরকারিভাবে অ্যাকশন (কোনো অপরাধ আদৌ আছে কী না তা জানার আগেই একথা বলা হচ্ছে) নিতে চান না। আপনাদের (‘অপর’) ধর্মস্থানে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি হোক, তাও তিনি চান না। সেইজন্যেই তিনি প্রথমে আমাকে প্রাইভেটলি খোঁজ নিতে বলেছেন। আপনারা তিব্বতিরা ভারতের অতিথি। ভারতের রাষ্ট্রপতির এই অনুরোধটুকু মানবেন না?”

...চিঠিখানা কাকাবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লামাজি বললেন, “আপনাদের রাষ্ট্রপতির অনুরোধ মানতে আমরা বাধ্য নই! আমরা একমাত্র দলাই লামার আদেশ মানি। (তদেব, পৃ ৫১৫)

নির্দিষ্ট পাঠক(টার্গেট অডিয়েন্স) সত্যিই স্পর্ধায়, অকৃতজ্ঞতায় বিস্মিত হবে! আর এটাই এই আখ্যানের উদ্দেশ্য। প্রাচীন লামার রহস্য আরেকটি ‘অনামী গুহায়’ ভেদ হয়। সেখানে বজ্রলামা যে আলখাল্লা পরে আসে সেখানেও (আগের গল্পগুলির উপাদান নিশ্চয় মনে থাকবে)- *বিরাট করে একটা ড্রাগন আঁকা* (তদেব, পৃ ৫২১-২২)। বজ্রলামা বলে, প্রাচীন লামা (আসলে নেই) আছে, কারণ-

ইনি ভগবান বুদ্ধের পুনর্জন্মের পর মৈত্রেয়কে দেখে চিনতে পারবেন। সেইদিন ঘনি়ে এসেছে। (তদেব, পৃ ৫২২)

গুহার বর্ণনা-

একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড এক বুদ্ধমূর্তি, প্রায় দশ ফুট লম্বা তো হবেই। সেই মূর্তির দু'পাশে জ্বলছে বড় বড় প্রদীপ। সেই প্রদীপের আলোতে এত বড় ঘরে অন্ধকার কাটেনি, অদ্ভুত এক আলো-আঁধারি সব দিকে। (তদেব, পৃ ৫২৩)

এখানে বজ্রলামা ছাড়াও আরেকজন অপরাধী আছে- ফিলিপ তামাং, প্রান্তিক পাহাড়ী লোক। এবার উপন্যাসের একদম শেষের দিকে কাকাবাবুর (বাইনারি, ফ্ল্যাট এবং টাইপ চরিত্র বাদে এরা আর কিছুই নয়!)মন্তব্য, যেভাবে, এই ধরনের গল্পগুলিকে, মান্য, নাগরিক সাহিত্যে গড়ে তোলা হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ-

লামারা অত্যন্ত শান্ত ও ভালোমানুষ হয়। তুমি লামাদের মধ্যে একটা কলঙ্ক! (তদেব, পৃ ৫৫৬)

এই ধরনের উপন্যাসে কখনও বৌদ্ধ, প্রান্তিক মানুষ প্রধান চরিত্র নয়। ভালো-মন্দ মেশানো, জটিল চরিত্রে তাদের দেখা যায়না। পাহাড়ী, বা বৌদ্ধ বা প্রান্তিক মানুষেরা 'খুব ভালো' এই আখ্যান-প্রবণতা সৃষ্টিই হয়েছে তাকে ভেঙে, কখনো কখনো 'ভিলেন' বানিয়ে, চমক তৈরি করা হবে বলে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গোগোল সিরিজের 'কাইরং মঠে গোগোলের কাণ্ড' গল্পের চমকই হল প্রথমে মনে হবে লামা অপরাধী, শেষে দেখা যাবে তিনি 'খুব ভালো' লোক! যদিও আসল অপরাধী 'তিব্বতী একটি উপজাতি'ই। সেখানে কোনো চমক নেই! এই গল্পটির ১৪২৩ এর আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকিতে সচিত্র উপস্থাপন ঘটেছে। ১৪২০ র আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকিতে প্রকাশিত হিমাদ্রীকিশোর দাশগুপ্তের 'বরফদেশের ছায়ামানুষ' এও প্রায় এক আখ্যান। যত এগুলির সংখ্যা বেড়েছে, মান, দায়িত্ব, শিল্পগুণ তত পাল্লা দিয়ে কমেছে। আমরা আর বেশি উদাহরণ দিচ্ছি না। আরেকটি উপন্যাস নিয়ে এই পর্যায়ে কথা বলব- 'হেরুক' ২০১০ এ প্রকাশিত সৌমিত্র বিশ্বাসের লেখা।

এই উপন্যাসগুলি জনপ্রিয় আখ্যানের সূত্র মেনে তৈরি। জনপ্রিয় মানেই খারাপ, তা বলছি না। কিন্তু জনপ্রিয় মানেই উন্নত মানের সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়না। হেরুকে যাওয়ার আগে আমাদের অত্যন্ত

জনপ্রিয় দুই গোয়েন্দা গল্পের সাহিত্যিক সত্যজিত রায় এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখ বাকি রয়ে গেছে। তাদের কথা বলবো সংক্ষেপে।

আপাতত আসি ব্যোমকেশ প্রসঙ্গে- বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম শরদিন্দুর উপন্যাসে, ছোটোগল্পে ভরপুর আছে, আমরা আগের অধ্যায়ে সে নিয়ে অনেক কথা বলেছি। ব্যোমকেশের গল্পে বুদ্ধ-বৌদ্ধ-বৌদ্ধধর্ম নেই একথা ঠিক, কিন্তু পীতাতঙ্কের উপকরণগুলি কি নেই? ব্যোমকেশের সব থেকে ‘মহিমাধর’ শত্রু নিশ্চয় অনুকূল ডাক্তার? যিনি দুটি গল্পে উপস্থিত। ডাক্তার শব্দটি খেয়াল করার মতো। সে প্রথম গল্পে কোকেনের ব্যবসা করত হোমিওপ্যাথি ডাক্তারির আড়ালে। তার বাসস্থান ছিল- ‘অপরাধপ্রবণ চীনে-বসতের’ র কাছে। তাই তার ব্যবসা ফুলেফেঁপেই উঠেছিল। একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

যাঁহারা কলিকাতা শহরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো জানেন না যে এই শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার এক দিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্য দিকে খোলার বস্তি এবং তৃতীয় দিকে তির্যক্চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্যস্থলে যে ব-দ্বীপটি সৃষ্টি হইয়াছে, দিনের কর্ম-কোলাহলে তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে ইহার কোনও অসাধারণত্ব বা অস্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই এই পল্লীতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে।^{৪২}

একদিকে বস্তি, লোকের পরিচয় নেই; ভাটিয়া মাড়োয়ারীরা দুঃস্থ; তাহলে অপরাধপ্রবণ কারা? শব্দবন্ধটি খেয়াল করুন- ‘তির্যক্চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ’; আমাদের অভ্যাসেই আমরা অপরাধী চিনে ফেলছি! কী আশ্চর্য!

অনুকূল ডাক্তার কেমন? অবশ্যই বিদ্বান, নইলে প্রতিপক্ষ হিসেবে জমবে কেন! ফু মাধুগের মত অতখানি না হলেও-

বয়স চল্লিশের ভিতরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও উপাধি তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় বোধ হইত। (তদেব, পৃ ২৬)

সেই, শয়তান, খুনী এবং কোকেন ব্যবসায়ী। ২০১৫ সালে দিবাকর ব্যানার্জী একটি চমৎকার সিনেমা বানিয়েছেন- ডিটেক্টিভ ব্যোমকেশ বক্সী, নামে। সেখানে অনুকূল ডাক্তার মূল প্রতিপক্ষ আর তার চিহ্নগুলি পীতাতঙ্ক প্রভাবিত, তবে বুনন দারুণ। আসলে তার উপাদান শরদিন্দুর গল্পেই পরোক্ষ মজুত ছিল।

শরদিন্দু বড়মাপের গোয়েন্দাগল্পকার ছিলেন নিঃসন্দেহে। তিনি একটি নিজস্ব ধারা এবং রীতির নির্মাণ করেছিলেন বলেই, ওই একবারই, আর পীতাতঙ্কের বা ধর্মীয়-জাতিগত-প্রান্ত বৈষম্যের প্রবণতা আর তার ব্যোমকেশ-সিরিজে প্রায় চোখে পড়ে না। তবে বেশিরভাগ গোয়েন্দা গল্পে রাষ্ট্রকেই, তার নজরদারিকে প্রতিষ্ঠা করা হয় আরও জোরের সঙ্গে সেকথা আমরা আগেই বলেছি, যদিও তার প্রকারভেদ আছে একথাও স্মরণযোগ্য।

সত্যজিতের লেখায়- ফেলুদা-সিরিজে গ্যাংটকে গুণ্ডাগোল, যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডতে, হত্যাপুরী বা শঙ্কুর একশৃঙ্গ অভিযানে লামা বা বৌদ্ধ প্যাগোডার, প্রজ্ঞাপারমিতার পুথি, যমন্তকের মূর্তি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। ভালো অথবা মন্দ! এই বাইনারিতে নেই। খানিকটা রবীন্দ্রপ্রভাব, সত্যজিতের সাহিত্যিক হিসেবে মান, এবং বিবেচনার কথাই মনে হয়। হত্যাপুরীতে সমস্যা বৌদ্ধধর্মের ‘প্রজ্ঞা-পারমিতা’ পুথি নিয়ে কিন্তু ‘জেনোফেবিক’ বৈষম্যমূলক কোনো মন্তব্য নেই। সেখানে প্রতিপক্ষ নাগরিক-সমতলের লোক, বাঙালি এবং মাড়োয়ারি হিঙ্গরানি (সে ঠিক অভিযুক্ত নয়, ‘স্মাগলার’)। বৌদ্ধদের বা প্রান্তিক কাউকে অপরাধপ্রবণ করার চেষ্টা নেই। যাঁরা দোষী তিনি বাঙালি, যিনি মূল্য(আর্থিক মূল্য নয়, ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক মূল্য) না বুঝে স্মাগল করতে চান তিনি মাড়োয়ারি। যিনি সোনা, গুপ্তধন ছাড়াই ‘সোনার কেল্লা’র মত আখ্যান নির্মাণ করতে পারেন, তার পক্ষেই এই দায়িত্বজ্ঞান, রুচি, রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য পক্ষ নেওয়া সম্ভব। অথচ তারপরে কেউই এমন আখ্যান নির্মাণ করতে পারলেন না। যেখানে সোনাদানা-সম্পত্তি পুথি নেই, অথচ চমৎকার টানটান উত্তেজনার, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গোয়েন্দা গল্প! এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে রাখি আমাদের আরেকটি মত, আমি আগে কখনও শুনিনি তাই উল্লেখ প্রয়োজন। একটু অপ্রাসঙ্গিক! ফেলুদার বেশিরভাগ গল্পে অপরাধী এবং অপরাধপ্রবণ যারা তারা মাড়োয়ারি। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভিলেন, দুটি আখ্যানে যিনি উপস্থিত সেই ‘মহিমাধর’ মগনলাল মেঘরাজকে মনে পড়বে। ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি উচ্চবিত্ত পরিবার তাদের ‘যত্নে রাখা সম্পদ’ গুলিকে, মাড়োয়ারি ভিলেন (কখনো নিজে কখনো অন্য কারো মাধ্যমে) ভুল বুঝিয়ে স্মাগল করতে চায়। বিশেষত নগর কলকাতায় সেই সময়

উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বদল ঘটছিল। বাঙালি চাকরির দিকে ঝুঁকতে থাকায় ও অন্যান্য কারণে অর্থনীতি(ব্যবসা, দোকান-পাট), বড় বড় বসত-বাড়ি(ভবানীপুর অন্যান্য অঞ্চল যা উচ্চবিত্ত বাঙালির অধিকারে ছিল) আস্তে আস্তে মাড়োয়ারীদের দখলে চলে যাচ্ছিল। সেই বাস্তব আখ্যান গল্পে আসা অসঙ্গত নয়। বাঙালি তাঁর অর্জিত সম্পদ-সংস্কৃতিকে অর্থের বিনিময়ে জলাঞ্জলি দিচ্ছিল এ বোধ করি তার অসহ্য ছিল। ফেলুদার বিভিন্ন মন্তব্যে এ বিষয়ে শ্রদ্ধার ভাব স্পষ্ট, যেমন গ্যাংটকে গণ্ডগোলে সে নিশিকান্তবাবু কে শেষে বলে-

আপনিও যে একটা ছোটখাটো ক্রিমিন্যাল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ... যাই হোক- ঠাকুরদাদার সংগ্রহ করা কোনও তিব্বতি জিনিস আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রি করবেন না।^{৪৩}

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমাদের মন্তব্যকে আরো তথ্য, সূত্র ইত্যাদি দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে, সেটা অন্য কোনো প্রবন্ধে দেখানোর ইচ্ছে রইল।

গ্যাংটকে গণ্ডগোল(রচনাকাল ১৯৭০) গল্পটি আমাদের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য। এখানে সমস্যা যমন্তক-মূর্তি নিয়ে। মূর্তিটির বর্ণনা, তপেশের জবানিতে-

টিবেট ইজ ফুল অফ গডস। ... যে মূর্তিটা ভদ্রলোক বার করে আমাদের সামনে ধরলেন সেটার চেহারা ভয়ঙ্কর। ন'টা মুখের প্রত্যেকটাতেই একটা হিংস্র ভাব- প্রায় রাক্ষসের মতো। (তদেব, পৃ ১৩৫)

কাঠমাণ্ডুতে হিন্দু কালভৈরবের মূর্তি দেখে বর্ণনা-

...দেখি পোঁছে গেছি কালভৈরবের মূর্তির সামনে।

বাপ্রে কী ভয়াবহ মূর্তি! দিনের বেলা দেখেই গা শিউরে ওঠে, আর রাত্তিরে যখন লোক থাকে না তখন দেখলে না জানি কী হবে। এর কাছেই কোথায় যেন আবার একটা শ্বেতভৈরবের মূর্তি আছে, সেটাও একসময় দেখতে যেতে হবে। (তদেব, পৃ ১০১)

নেপালি, তিব্বতি ইত্যাদি ছোটো ছোটো চরিত্ররা আছে, কিন্তু চোখ-বর্ণ-নাক-খাদ্য-ধর্ম নিয়ে কোন বৈষম্যমূলক মন্তব্য নেই। গ্যাংটকে গণ্ডগোল উপন্যাসে- টিবেটান ইন্সটিটিউটে, তিব্বতি ভদ্রলোকের পরিচয়-' একজন ঢোলা সিকিমি পোশাক আর চশমা পরা ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা তাকে ভীষণ ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল 'ডক্টর গুপ্ত আছেন কি? (তদেব, পৃ ১৩৩)

এত বিনয় আমরা আগের কোনো ‘নায়কে’র থেকে পাইনি। অতি-ভক্তিও নেই, ফেলুদা লামা-দর্শনে আগ্রহী নয় বরং লামা-নাচ দেখতে আগ্রহী (তদেব, পৃ ১৩৮) বৌদ্ধ-গুম্ফার বর্ণনা দিচ্ছে তোপ্সে-

দু-একজন ভীষণ বুড়ো লামাকে দেখলাম ঘরের দরজায় চৌকাঠে বসে আপন মনে প্রেয়ার হুইল ঘুরিয়া চলেছে, তাদের মুখের চামড়া এত কুঁচকোনো যে দেখলে মনে হয় অন্তত একশো বছর বয়স হবেই। এদের বেশির ভাগেরই গোঁফ-দাড়ি কামানো, কিন্তু এক-একজনের দেখলাম নাকের নীচে গোঁফ না থাকলেও ঠোঁটের দুপাশে সরু ঝোলা গোঁফ রয়েছে- যেমন কোনও কোনও চিনেদের থাকে। ...

আশেপাশে গ্রহরী জাতীয় কেউ নেই দেখে আমরা দুজনে চৌকাঠ পেরিয়ে হল ঘরে ঢুকলাম। স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা ঘর। অদ্ভুত একটা ধূপের গন্ধ ভরে রয়েছে তাতে। কিন্তু অন্ধকার হলে কী হবে- তারমধ্যেই রঙীন সাজসজ্জার ঝলসানি ফুটে বেরোচ্ছে- তিন-তলা উঁচু শিলিং থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা আশ্চর্য কাজ করা সব সিল্কের নিশান। ঘরের দুদিকে রঙিন কাপড়ে ঢাকা লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা রয়েছে। তার পিছন দিকে সবচেয়ে অন্ধকার অংশটায় লম্বা বেদীতে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মূর্তি, তার কোনটা বুদ্ধ আর কোনটা বুদ্ধ নয় সেটা আমার পক্ষে বোঝা ভারী মুশকিল। (তদেব, পৃ ১৫০)

বিবরণেই স্পষ্ট আগের বিবরণগুলির চেয়ে এটি কত আলাদা। আর এই মানুষগুলির সঙ্গে গুম্ফার সঙ্গে অপরাধের কোন সংস্রব নেই। অপরাধী শশধর দত্ত মানে বোস! আমরা ইচ্ছে করেই এমন লিখলাম। লেখক শশধর দত্ত সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা একটি প্রশ্ন তুলেছিলাম। তার উত্তর- নিঃসন্দেহে সত্যজিত তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু প্রভাবিত হন নি। কারণ শশধর দত্তের লেখা যে জটায়ুর উপন্যাসের মতই! তোপ্সে, অপরাধী শশধর বোসের কথা বলতে গিয়ে স্লিপ অফ টাং হয়ে শশধর দত্ত বলে। ফেলুদা বলে ‘তোর মুণ্ডু’। আমরা জানি সাহিত্য সংলাপে স্লিপ অফ টাং সত্যিই তো আর স্লিপ অফ টাং নয়!

ফেলুদা সিরিজের ফেলুদা অতিভক্তি বর্জিত। ফেলুদা এই গল্পেও বাচ্চাদের বৌদ্ধশ্রমণের শিক্ষা দেওয়া দেখে বলেছে- বড় হয়ে, লামাটোমা হবে! (তদেব, পৃ ১৪৯) এগুলিকে আমরা ধরছি না। কারণ ফেলুদার ধর্মের প্রতি পক্ষপাত নেই। লক্ষনৌ, কৈলাস, বেনারস, কদারনাথ, কাঠমাণ্ডু, পুরী, গ্যাংটক ইত্যাদি স্থানে, যেখানে ধর্ম-ধর্মীয় পক্ষপাত আসা প্রায় অনিবার্য ছিল, সত্যজিত সেগুলিকে ব্যবহার করেছেন, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যের জন্য আদর্শ ভ্রমণস্থান হিসেবে! মহলি বাবা, বিরিঞ্চি বাবা ও অন্যান্য ধর্মীয়-ব্যক্তিদের চিত্রণ নেতিবাচক হিসেবেই। এমনটা বাংলা সাহিত্যে

বিরল। নিঃসন্দেহে সত্যজিত রায় কৃতিত্বের অধিকারী। অথচ তাঁর পরবর্তী লেখকেরা তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হলেও এই গুণটি আয়ত্ত করতে পারে নি, বা সমতুল্য এড়িয়ে গেছেন।

যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডতেও নেপালী নারী পুরুষ আছে- জপযন্ত্রের ভেতরে ড্রাগের ব্যবসার কারচুপি আছে, কিন্তু অপরাধী- মগনলাল মেঘরাজ। তপেশের মন্তব্য উল্লেখ করেই আমরা ফেলুদা- বিষয়ক আলোচনা শেষ করবো-

একই শহরে স্বয়ম্ভূনাথের মতো বৌদ্ধভূপ আর পশুপতিনাথের মতো হিন্দু মন্দির- এ এক কাঠমাণ্ডতেই সম্ভব। পশুপতিতে ‘তপেশ তুমি দৃশ্য দেখো’ বলে আমাদের ফেলে রেখে মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে ফোঁটা-টোটা কেটে এলেন লালমোহনবাবু। (তদেব, পৃ ১০৯)

কোথাও কিশোর কথক বা কিশোর পাঠকদের ধর্মীয় পাঠ পড়িয়ে নেওয়া বা পক্ষপাতিত্বে ঠেলে দেবার চেষ্টা নেই।

(৭)

হেরুক প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশ-কুড়ি পত্রিকায়, পরে আনন্দ থেকে ‘নভেলা’ হিসেবে প্রকাশিত হয়। আমরা আমাদের উপন্যাসের ধারা আলোচনায় এই ‘নভেলা’ টিকেও রাখছি। এতে নাগরিক এবং প্রান্তিক স্পষ্ট দুটি ধারাকে রাখা হয়েছে; অবশ্যই নাগরিক, অভিজাত, পৌত্তলিক, মান্য-হিন্দু ধর্মের প্রতি, পক্ষপাত বেশি। তাকেই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা।

হেরুকে এর গল্প- কালিম্পং এর একটি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দল, একটি অভিজাত বাঙালি পরিবারের বিভিন্ন ক্ষতিসাধন করে, একটি ‘হরি-হরি-হরি-বাহনোদ্রব’ মূর্তি এবং সাধনসঙ্গিনী হরণের উদ্দেশ্যে। গল্প অনুযায়ী এই পরিবারটি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু শান্তিনিকেতন ও রাবীন্দ্রিক প্রভাবে তাদের পরিবর্তন ঘটে! হ্যাঁ নিঃসন্দেহে অদ্ভুত যুক্তি! আমরা আগের অধ্যায়ে যে রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি তার প্রভাব অন্যরকম হওয়ার কথা! যা হোক! গল্প এমনই। তারপর, সেই মান্য-অভিজাত-নাগরিক-মান্য-হিন্দু (বিশেষ সীমাবদ্ধ ধরণের, হিন্দু) পরিবার, একসঙ্গে হলে ‘নায়কে’র (নিঁখুত কেন্দ্রীয় চরিত্র, তার মাহাত্ম্যই প্রচারিত হয়, তাই ‘নায়ক’, রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠ) ‘চুটকুলি’ (যাকে পি জে বলা হয়)তে হাসে,

পুজো করে, সংস্কার- কুসংস্কারকেই ‘ধর্ম’ মনে করে। এই উপন্যাসটির সম্পর্কে শেষ পাতায় বলা হয়েছে-

হেরক শুধুমাত্র রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি বা ভিন্নতর জীবনদর্শনের আখ্যান নয়, রোমাঞ্চের পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতীক বা সিম্বলজি নিয়ে লেখা এমন এক উপন্যাস যা এখনও অবধি বাংলাভাষায় বিরল^{৪৪}

‘ভিন্নতর জীবনদর্শন’ কে আমরা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, হীন, লঘুই মনে করছি। এবং ‘বিরল’ তা সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করছি! উপন্যাসে, এসব নিয়ে সঠিক তথ্য দেওয়া হচ্ছে এটি একটি ভ্রান্তি। আমরা আগেই বলেছি ধর্ম-দর্শন নিয়ে জ্ঞান বাড়ানোর জন্য এই উপন্যাসগুলির চর্চা একেবারেই অনুচিত। তাকে সত্য মানতে গেলেও বিভ্রাট ঘটে!

উপন্যাস থেকে এবার আমরা কিছু উদ্ধৃতি দেবো-

উপন্যাসের ‘সমস্যা’, ‘জটিলতা’, ইত্যাদির আগেই, এই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য যেসব মন্তব্য আছে- প্রান্তিক বৌদ্ধদের সম্পর্কে তা একটু দেখে নিই- ‘মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের লোক’, একাধিকবার ‘জঙ্গি’ (এই শব্দটি এই সময়ের বিশেষ দান, বিশেষত মুসলমানদের সম্পর্কে ব্যবহৃত জনমানসে, এখানে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সম্পর্কে, শব্দটিকে সাধারণীকরণের চেষ্টা আছে) শব্দের ব্যবহার।

এখানে মূল দস্যু (ভিলেন) সঞ্জয় ওরফে, স্যাঞ্জে। এটিই উপন্যাসের মূল জটিলতা; যে আসল অপরাধী কে? উত্তর- অবশ্যই ‘প্রান্তিক, সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন, তিব্বতী, বৌদ্ধ, রাজনীতিবিদ ব্যক্তি’! এতদূর আলোচনার পর এই ধরণটি খুবই চেনা, এবং সংশয়াতীত। পারিপার্শ্বিক রাজনীতি, বৌদ্ধদেশগুলির উত্থান-আগ্রাসনের বিভিন্ন সত্য-মিথ্যা সংবাদ-প্রতিবেদন আবার এই রীতিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে, এবং তা মুদ্রণ, বাজার প্রভৃতি কারণে আরও বিপুল সংখ্যায় ফিরে আসে, এখনও চলছে। বই-বাজারে তন্ত্র-মন্ত্র-বৌদ্ধ-বুদ্ধ-মূর্তি ইত্যাদি এখন ‘হট কেক’। সবচেয়ে অদ্ভুত এরা প্রত্যেকেই দাবী করেন, তারাই বিরলতম, অভিনব, নতুন, অভূতপূর্ব!

আবার ফিরে আসি, স্যাঞ্জ (ভিলেনের) বিষয়ে, এই গল্প মতে, বুদ্ধই(তিব্বতি স্যাঞ্জ শব্দের অর্থ- বুদ্ধ) ব্যক্তি হল মূল অপরাধী(খুনী, অপহরণকারী, বিশ্বাসঘাতক, ধর্ষক, বক-ধার্মিক, মিথ্যাবাদী)! এবং এখানে স্যাঞ্জেরও সম্পূর্ণ শাস্তি হয় না।

সঞ্জই সব দেখাশোনা করেন। নাম শুনে যাই মনে হোক, উনি আসলে তিব্বতি। নামটা ইংরাজি উচ্চারণে লিখলে দাঁড়ায় স্যানগে। কিন্তু সেটার আসল উচ্চারণ নাকি ‘স্যাঞ্জ’, তিব্বতিতে তার মানে বুদ্ধ। (তদেব, পৃ ১২)

টিবেটান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউশন এর তথ্য একটু উদ্ধৃত করবো-

The Tibetan word for Buddha is Sang Gyay (pronounced ‘song gyay’). When we look at the etymology for this word, we see that it is closely related to the word for enlightenment. Sang man “awakened”(as from the sleep of ignorance) or “purified”(as in purified of all obscurations). So the two syllables combine to mean “one such as Shakyamuni Buddha, who has purified all the obscurations (Sang) and who has developed fully all the qualities of enlightenment (gyay). (web page- Tibetan Language Institution: Buddha)

আমরা এখানে কোনো ধর্মেরই পক্ষপাতিত্ব করছি না। পরস্পরের রাজনৈতিক অবস্থানগুলি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। এবার এই ‘বুদ্ধ’ নামের অর্থকে, ভিলেন-চরিত্রায়ণ করে যেসব কল্পিত বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে তা লেখক বা অন্য কেউই নিজের ধর্ম, হিন্দু ধর্মের দেবতা ও মনীষীদের নিয়ে করেন না। বরং ‘নায়কদের’ নামেই দৈব অনুষ্ণ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়, কিরীটি, ব্যোমকেশ ইত্যাদি। মেয়ে-গোয়েন্দাদের নামকরণে এই প্রবণতা আরও সুস্পষ্ট, আমরা একটু পরেই আলোচনা করবো। এখানেই বৈষম্য স্পষ্ট হয়। এখানে সমান্তরালভাবে শিব, রাধাকৃষ্ণের মন্দির, পূজা ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে। সেগুলি খুবই পক্ষপাতাসূচক ভাবে। সকলেই এই ‘সীমাবদ্ধ’ ধর্মে বিশ্বাসী। সেকথাও উপন্যাসে চাউর করে দেওয়া আছে। নায়কের মুখে যখন তখন বিভিন্ন ধর্মীয় ধারণার পরিচয় দেওয়া হয়, তার জ্ঞানের পরিচয় দিতে, কখনও-

হিন্দুধর্ম মতে মানুষের শরীরে সাতটা চক্র আছে। ওই সাতটাকে ভেদ করে উঠতে পারলেই অমরত্ব। (তদেব, পৃ ২৫)

কোন হিন্দুধর্মে?

কখনও-

সেই মহাযানের কনসেপ্ট হল, পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধ আছেন এবং প্রত্যেকেরই একজন স্ত্রী আছেন...

(তদেব, পৃ ৩১)

সিধুজ্যাঠার অনুকরণে একটি চরিত্র আছে রাজীববাবু নামে। তার মাধ্যমেও বৌদ্ধধর্মের ‘অভিপ্রেত’ বিবরণ দেওয়া হয়-

বৌদ্ধ মানেই কিন্তু গৌতম বুদ্ধ নয়। ... বৌদ্ধদের প্রচুর অদ্ভুত নামের দেবদেবী আছেন। ‘হে’ মানে শূন্যতা, ‘রু’ মানে বিচারবুদ্ধির লয় আর ‘ক’ মানে অজ্ঞেয়। এঁর উপাসন করলে যেমন নির্বাণ লাভ করা যায়, তেমনই কাউকে বশীভূত করতে চাইলেও এঁর পূজা দরকার। (তদেব, পৃ ৫২-৫৩)

‘অদ্ভুত’ শব্দপ্রয়োগের মাধ্যমেই ‘অপরতা’ র প্রক্রিয়াটি চোখ পড়ার কথা, যদিও এমন প্রমাণ আরও আছে। বশীকরণের মন্তব্যটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিমূলক। কথক বৌদ্ধ-তন্ত্রের বর্ণনা দিচ্ছে তা আরও ভয়ঙ্কর-

সাধারণভাবে স্বয়ম্ভূচক্রের জন্য বজ্রকুল থেকেই নারী সংগ্রহ করতে হয়। ...সাধনার উপযুক্ত শক্তিকে আবার বলপ্রয়োগ করে আনতে হয়। স্বয়মাগতা নারী যতটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তার চেয়ে সহস্রগুণ শক্তি দিতে পারে বলপূর্বক সংগৃহীত নারী। (তদেব, পৃ ১২৬)

বৌদ্ধ বজ্রযানী তান্ত্রিক মানেই ধর্ষক বা ধর্ষকামী! এই ভাবনা প্রচার করা, এবং তার সাধারণীকরণ ঘটানো কতখানি ভয়ঙ্কর! এই ধর্ম-বিদ্বেষী মন্তব্যের দায় কার? এই ধর্ষনকামী, কোন আচারের বিবরণের সত্যিই কোনো তথ্যসূত্র আছে কী না আমাদের জানা নেই! আর আমরা উদ্ধৃতি বাড়াচ্ছি না। তবে একথা নিশ্চিত এই উপন্যাসগুলি পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ পাঠকের মনে ‘অপরতার’ ভাব জন্মানো স্বাভাবিক। বাঙালী মধ্যবিত্ত তার অবসরে এসব প্রান্তিক অঞ্চলে ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ এ যায়, এই ‘অপরতা’ কে সম্বল করেই, প্রান্তের প্রতি অকারণ সন্দেহ, মানুষগুলির প্রতি নির্দিষ্ট মনোভাব(অতিভালো অথবা অতিমন্দ, এর বাইরে আর কিছু নয়। হয় তারা তাকে সাহায্য করবে নইলে তার ক্ষতি করবে।)কে মানসে, দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়ে যায়। তাতে এই জনপ্রিয়, কিশোরপাঠ্য, দায়িত্বহীন আখ্যানগুলির দায় কম নয়।

(৮)

আমরা আলোচনা করবো মেয়ে গোয়েন্দাদের নিয়ে। প্রবণতা, উপাদান আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা করলাম সেগুলিই আছে। শুধু মাত্রা ভেদ আছে। আমরা আলাদা করে আলোচনা করছি কারণ, জনপ্রিয়-সাহিত্যে, মেয়েদের, আত্মপরিচয় যেভাবে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই নিয়ে আমাদের দু-চার কথা আলাদা করে বলবার প্রয়োজন আছে, তাই। চতুর্থ অধ্যায়েও আমরা অনুরূপা দেবী, দীপ্তি ত্রিপাঠী, বাণী বসু, সেলিনা হোসেনের উপন্যাস নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করেছি। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মেয়ে-গোয়েন্দা, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণা। আমাদের সব গল্প-উপন্যাস আলোচ্য নয়। যেগুলিতে বুদ্ধ-বৌদ্ধ বিষয়ক উপাদান আছে, সেগুলিই।

কৃষ্ণাকে নিয়ে যে আখ্যানগুলি পাওয়া যায়- *কারাগারে কৃষ্ণা*, *মায়াবী ও কৃষ্ণা*, *কৃষ্ণার অভিযান*, *কৃষ্ণার পরিচয়*, *বনে-জঙ্গলে কৃষ্ণা*, *মুক্তি-পথে কৃষ্ণা*, *কৃষ্ণার জয়যাত্রা*, *গুপ্ত ঘাতক*, *হত্যার প্রতিশোধ*, *গ্রহের ফের*, *কলঙ্কী চাঁদ* কৃষ্ণা-সিরিজে, ডিটেক্টিভ ব্যোমকেশ নামে একটি প্রৌঢ় চরিত্র ছিল, কৃষ্ণার সহকারি হিসেবে। স্বাভাবিক নিয়মে কৃষ্ণার শ্রেষ্ঠত্বই চোখে পড়ে। শরদিন্দুর সিরিজে, অন্তত নামকরণে তার প্রভাব আছে কী না নিশ্চিত বলা যায় না। মেয়ে-গোয়েন্দাদের মধ্যে ‘ফেমিনিটি’ এবং ‘ম্যাসকিউলিনিটি’র মিশ্রণ ঘটানো খুবই জরুরি হয়ে পড়ে(মানে, তারাই এই ধরণটি বানিয়ে তুলেছেন, কারণ তারা নারীত্বের এই ধারণাতেই বিশ্বাস করেন) আখ্যান নির্মাণের ক্ষেত্রে। আমরা লেখিকাদের আখ্যান রচয়িতা হিসেবে, তাদের ‘রাজনৈতিক অবস্থান’ নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে বেশ কিছু কথা বলেছি। গোয়েন্দা গল্পের লেখিকারাও মোটামুটি সেই ধরণেরই। যেন বা মেয়ে-গোয়েন্দারা, পুরুষদের অধিকারের ক্ষেত্রে ‘অনধিকারে প্রবেশ’ করেছে, তাই তাদের মধ্যে ‘নারীত্ব-সৌন্দর্য’ এর প্রকাশ আরও বেশি চোখে পড়ে! এছাড়াও আছে একগামীতা, সতীত্ব, নারীর চিরন্তনতার-আদর্শ (কন্যা-স্ত্রী-মাতা রূপেই বিকাশ; কৃষ্ণা ব্যতিক্রম), সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য, সীমাবদ্ধ-স্বাধীনতা যুক্ত আধুনিকা(সংস্কারযুক্ত, কুসংস্কারবিযুক্ত)। মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণি-পরিবার এবং পেশার সঙ্গে যুক্ত।

কৃষ্ণা সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ- কৃষ্ণার পরিচয়। সেখানে কৃষ্ণার আত্মপ্রকাশ ঘটে আখ্যানের একদম শেষ অংশে। যদিও তার আগে একাধিক গল্পে কৃষ্ণার আগমন ঘটেছে। শুভ্রা, কৃষ্ণার, পরিচয় দিয়েছে-

এই কৃষ্ণা... ও বলে, বিয়ে করবে না... শয়তানীর ব্যুহ ভেদ করে শয়তানদের ও বার করবে! ও করবে দুঃশাসনদের মুখোস খুলে তাদের স্বরূপ জানিয়ে, তাদের খর্ব্ব করে, সমাজের কল্যাণ! সে কাজেই হবে কৃষ্ণার অভিযান!^{৪৫}

এখানে কৃষ্ণা নামের সঙ্গে দ্রৌপদীর আত্মপরিচয় যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে কৃষ্ণা, তার হয়ে প্রতিবাদের জন্য, পুরুষের ওপর নির্ভরশীলা নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণা এই ‘আধুনিকতার’ কৃতিত্ব অবশ্যই প্রভাবতী দেবীর।

কৃষ্ণার সহকারি (বলা ভালো, একা কৃষ্ণার দায়িত্বে যিনি) তার মামা, প্রণবেশ। কৃষ্ণার বাবা, বার্মায় কর্মরত ছিলেন, সেখানেই তার মা, পরে তার বাবা, খুন হয়। কৃষ্ণা, বিষয়ক কতকগুলি গল্প এই হত্যা, হত্যার কারণ এবং হত্যার প্রতিশোধ প্রসঙ্গে। সেই গল্পগুলিতেই বার্মা, বার্মিজ, বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধদের প্রসঙ্গ আছে, আমরা যে ধরণটির কথা আগে আলোচনা করেছি সেই একই নিয়মে। বার্মাতে বুদ্ধের পাদুকা, মূর্তি ও অন্যান্য নথি নিয়ে কৃষ্ণার বাবা পালিয়ে আসে, বৃটিশদের হাতে তুলে দেবে বলে। তাই তাকে ও তার স্ত্রীকে খুন হতে হয়, মোটামুটি এই হল আখ্যানের মূল খাঁচা। তার সঙ্গে আরও কিছু গল্প যুক্ত হয়েছে। বাস্তবেও দেখা যায়, বৃটিশ মিউজিয়ামের বেশিরভাগ জিনিসই উপনিবেশ থেকে চুরি করা, দেশীয় ‘বাবুরাই’ প্রভুভক্তির বশে সেগুলি ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে প্রশংসিত হয়েছে। লুঠের প্রসঙ্গে নাদির শাহ, তৈমুর লং (মুসলমান বলেই) এর নাম যত শোনা যায়, ইংরেজদের নাম তত শোনা যায়না বা শোনানো হয় না।

কৃষ্ণার বাবা, বার্মাতে চাকরি করতে যাওয়া বৃটিশদের অনুগত, বৃটিশ মনস্ক ব্যক্তি। খানিককটা মামাবাবুর মতোই, তবে পার্থক্য আছে; দুটি চরিত্র নির্মাণ পৃথক। গুপ্ত-ঘাতক গল্পে সে নিজেই নিজের পরিচয় দেয়-

চেষ্টার ফলে আমি শীঘ্রই বার্মায় চলে আসতে পারলুম। আজ বর্মী ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও সেদিন বর্মী ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই আমার পক্ষে আসা অসম্ভব হয় নি। ...

বিদেশে বাঙালি যে কতখানি যশ, মান, খ্যাতি লাভ করতে পারে, তা তুমি নিজেই দেখেছ কৃষ্ণা! আমার ছেলে নেই, তুমি মেয়ে হলেও তোমায় গড়ে তুলেছি ছেলের মতো- আমি আশাও করি আমার যা কিছু অসমাপ্ত কাজ তুমি শেষ করবে, আমার মুখ তুমি উজ্জ্বল রাখবে। ...

শুধু রেঙ্গুনে নয়, বাসিনে, ম্যাঙালে পরপর কয়েকটি ভয়ানক ডাকাতি হয়...

অনুসন্ধানে জানা গেল এ সব একজন বার্মিজ-দস্যুর কাজ। তার নাম ইউ-ইউন, সে নাকি বনোদি বংশের ছেলে।

...কিছুদিন পরে আমি তার একখানা পত্র পেলুম। সে জানিয়েছে-কিছুদিন আগে আমি ভামোর জঙ্গলে তাদের দলকে বিপর্যস্ত করে যে বুদ্ধ-মূর্তি পেয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে দিয়েছি, সেই বুদ্ধ-মূর্তি অপবিত্র করার অপরাধে সে আমায় কঠিন শাস্তি দেবে। ...

হ্যাঁ, আরও একটা কথা- সেই বুদ্ধ-মূর্তির কাছে এক জোড়া খড়ম ছিল, সেটা আমি কলকাতার মিউজিয়ামে দেব বলে আমার কাছেই রেখেছি।

৪৬

আমরা জাল-মোহান্ত ইত্যাদির প্রসঙ্গে এই প্রবণতাগুলির উল্লেখ করেছি। আর পুনরাবৃত্তি করছি না।

কারাগারে কৃষ্ণা র প্রেক্ষাপট আসাম (ঔপনিবেশিককাল)। মঙ্গোলিয়ান খাঁচের এক ব্যক্তিকে দেখে প্রণবেশ সংশয়ে বলে, ‘বার্মিজ কিম্বা অসমীয়া’। তখন কৃষ্ণার মন্তব্য-

যাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না, মামা। আমাদের কাছে সবই সমান। মোট কথা বাংলার আমদানী নয়।^{৪৮}

কিন্তু কৃষ্ণাকে দয়াময়ী সহিষ্ণু হিসেবে দেখানো প্রভাবতী দেবীর কৃতিত্ব, হয়ত নারী বলেই ‘দয়াশীলা’ গুণটি আরোপিত। তা সত্ত্বেও বলা যায় কৃষ্ণার সহিষ্ণুতা, অপরাধীদের সম্পর্কেও দয়া এবং করুণার ভাব তাকে মানবিক করে তুলেছে। গল্পগুলিতেও অপরাধীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অবস্থা এবং পরিস্থিতির ফেরে অপরাধী হয়ে উঠেছে- এরকম একটি প্রকল্পই প্রভাবতী দেবী সযত্নে গড়ে তুলেছেন। এও তার ‘আধুনিক’ মনস্কতার কৃতিত্ব। পীতাতঙ্ক এবং কৃষ্ণার সহিষ্ণুতা দুই পাবো এই উদ্ধৃতিতে-

প্রণবেশ বলিলেন- কিন্তু ওই চিনেম্যানগুলোকে আমি মোটেই দেখতে পারি না। ওদের ওই হলদে রঙ, খাবড়া মুখ আর খাঁদা নাক; তার ওপর চ্যাং-চ্যাং করে কথা! আবার খাওয়াও কি রকম জঘন্য দ্যাখো- আরগুলো, ব্যাং আর যা কিছু দুনিয়ার আবর্জনা-কিছুই ওরা বাদ দেয় না। সমরবাবুর মুখে গুনলুম বার্মিজদের খাওয়া নাকি অমনি, তারা নাকি আবার ‘লাঙ্গি’ খায়, সে লাঙ্গি আবার এমন বিদ্যুটে জিনিস যা-

কৃষ্ণা গম্ভীরভাবে বলিল, “যাদের দেশে যা খায় তা নিয়ে সমালোচনা করা উচিত নয় মামা। এই বাংলাদেশে তোমরা আবার এমন অনেক জিনিস খাও, যা দেখে ওরাও আশ্চর্য হয়, তোমারই মতো ঘৃণায় শিউরে ওঠে!”^{৪৮} (হত্যার প্রতিশোধ)

কৃষ্ণার মধ্যে দিয়ে তার রাজনৈতিক অবস্থানও স্পষ্ট, ক্ষমতার, শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদের পক্ষে-

কৃষ্ণা বলেছিল, “চোখে না দেখলেও কাজের পরিচয় পাওয়া যায় বইকি মামা! এই দেখ না, তার প্রমাণ হিটলার, মুসোলিনি, চার্চিল এবং আরও কত জগদ্বরেণ্য লোক- যাঁরা এক সময় ছিলেন অথবা এখনও আছেন। আমরা তাঁদের চোখে দেখিনি, অথচ তাঁদের কাজের পরিচয় অন্তর দিয়ে পেয়েছি।”^{৪৯}পৃ ১৫১ (কলঙ্কী চাঁদ)

আমরা আগেই বলেছি ঔপনিবেশিক আমল থেকেই বৃটিশ প্রভাবে ও তৎপরতায় ভারতবর্ষের আশেপাশের প্রতিবেশি দেশগুলির সঙ্গে(এবং দেশের মধ্যেও), শত্রুতা ও ঘৃণার মনোভাবকে কীভাবে তৈরি করা হয়েছে ও জাগিয়ে রাখা হয়েছে; এবং দেশের মধ্যেও এই বৈষম্য, কেন্দ্র বনাম প্রান্ত, মান্য বনাম অপর, তারসঙ্গে ভাষা বিষয়ে অপরতার ভাব বৈষম্যকে আরও স্পষ্ট করেছে। এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে ধর্ম-জাত-অঞ্চল-ভাষার বৈষম্য তার সূত্রপাত ঔপনিবেশিককালেই, আমাদের মধ্যে ধীরে ধীরে, চারিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ আমরা সেগুলি আইডেন্টিফাই না করে তাকেই আমাদের সাহিত্য, গান, ছড়া, সংস্কৃতির মধ্যে সচেতন বা অচেতন(অচেতনতার দায়ও আমাদের)ভাবে, দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে জীইয়ে রেখেছি। রবীন্দ্রনাথের(ও অন্যান্য যাঁরা ঐক্যের কথা বলেছেন) যথার্থ উত্তরাধিকার আমরা বহন করিনি।

গল্পগুলির সেটিংস কলকাতা, বার্মা, আসাম ইত্যাদি স্থান। আমাদের নির্বাচিত গল্পে কৃষ্ণার প্রতিপক্ষ-প্রথমজন তার বাবা-মা র হত্যাকারী, বার্মিজ ইউউইন। দ্বিতীয়জন, দস্যু বার্মিজ, কুৎসিত, এক চক্ষু(নিষ্ঠুরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে, জাল মোহান্তেও প্রায় একই বিবরণ), আ-চিন(কারাগারে কৃষ্ণা)। ইউউইন চরিত্রটি মহিমান্বিত অপরাধী হিসেবে দেখানো হয়েছে। অবশ্যই সেও বৌদ্ধ এই পরিচয়টিও জুড়ে দেওয়া আছে। ইউউইন তবে দেখতে ইউরোপীয়দের মতো। কারণ তার মা ইউরোপীয়; অথচ ‘স্বভাবে তার পিতার মতোই, যে বার্মিজ’, ইউউইন নিজেকে বার্মিজ বলেই মনে করে, একথাও স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। যদিও বাস্তবে উল্টোটাই হত একথাও আমরা আগে বলেছি।

ইউউইন সমাগত সকলের পানে তাকাইয়া বলিল, “আমি দেবতার জিনিস উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি এই আমার পরম সৌভাগ্য। ...

এই প্রতিলিপি আজ প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বের। এই বর্মারই তৎকালীন রাজা লি-ব এই প্রতিলিপি তৈরি করেছিলেন। দেড় হাজার বৎসর পরে আমাদের পরম শত্রু বাঙালি পুলিশসাহেব মিঃ চৌধুরি ভামোর জঙ্গলে কিভাবে গিয়ে ভগ্নপ্রায় ফায়া-গর্ভ থেকে এই প্রতিলিপি নিয়ে আসে এবং কলকাতা মিউজিয়ামে দেবে বলে নিয়ে গিয়েছিল। আমি যে কষ্টে এ জিনিসগুলি হস্তগত করেছি তা বলতে পারি না। ...

এই মালা। ভগবান তথাগতের এই জিনিসপত্র প্রভৃতির আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আমার বন্ধু মহীদলকে। ...এগুলিও আমাদের এই ফায়ার রাখতে হবে, সেজন্যে আমি ফুঙ্গিদের হাতে এগুলি দেব। বিধর্মী এগুলি স্পর্শ করলেও, ফুঙ্গিরা এদের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনবেন, কথা দিয়েছে।

(হত্যার প্রতিশোধ)^{৫০}

ইউউইন ধরা পড়ে আত্মহত্যা করে। কারাগারে কৃষ্ণা গল্পের প্রতিপক্ষ আ-চিন শেষ পর্যন্ত অধরাই থাকে।

আমরা আগেই বলেছি প্রান্তের মানুষের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মনোভাব, বাইনারি(ভালো অথবা মন্দ)। কোনো জটিল চরিত্রে এদের চিত্রণ মান্য সাহিত্যে, সিনেমায়, সিরিয়ালে একেবারেই নেই। অসমিয়াদের সম্পর্কে এই উপন্যাসে মন্তব্য-

...এদের তোমরা জানো না। এরা একদিক দিয়ে সরল হলেও, অন্যদিক দিয়ে অত্যন্ত বদরাগী। সোজা কথায় যাকে বলে প্রতিহিংসাপরায়ণ। এদের মধ্যে দলাদলি খুব বেশী।...আমাদের দেশের তুলনায় এরা অনেক সরল। এদের সঙ্গে ব্যবহার করলে জানতে পারবে, এরা যেমন প্রতিহিংসা নিতে জানে, তেমনি উপকারীর উপকারও কোনোদিন ভোলে না, প্রাণ দিয়েও এরা এদের উপকারীকে বাঁচায়। (কারাগারে কৃষ্ণা,

পৃ ২৫)

কারাগারে কৃষ্ণার শেষে পরবর্তী উপন্যাস, মায়াবী কৃষ্ণার বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয়েছে সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মেয়ে-গোয়েন্দাদের নির্মাণে যে ‘টিপিকাল’ ধরণটির কথা বলছিলাম তার প্রমাণ, বাক্যে বাক্যে পাবো-

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা এক বাক্যে প্রশংসা করেছেনঃ

মাঝে-মাঝে পুলিশের সাহায্য নিতে হলেও কৃষ্ণার বাহাদুরী আছে। ভদ্রঘরের চরিত্রবর্তী(শব্দদুটি লক্ষণীয়) এই মেয়েটি নিজের উপস্থিতি-বুদ্ধির জোরে প্রয়োজনবোধে ছদ্মবেশে, অভিনেত্রীর মন নিয়ে যে অসাধ্যসাধন করেছে... স্বৈরাচারী দুর্বৃত্ত নরপশুদের কবল থেকে নিজের নারীধর্ম(শব্দটি উল্লেখ্য) বজায় রেখে, ছলে-বলে-কৌশলে আত্মরক্ষার ও নির্যাতনিতা মেয়েদের উদ্ধারের জন্য যে-সব নতুন-নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছে, তা শুধু তার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উপযুক্ত পিতার (মাতা?) লালনের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

অবশ্য একথা সত্য যে,

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, সংসারে এমন মানুষ আছে, যে তোমার কোনো অপকার করেনি, অথচ তাকে দেখলেই তোমার আপাদমস্তক জ্বলে যাবে। আবার কাউকে দেখা মাত্র লজ্জিত বিনয়ে বিগলিত হয়ে, বিনা কারণেই তার আদেশ পালন করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে- কৃষ্ণা হচ্ছে এই শেষ শ্রেণির মানুষ। (এই বাক্যের অর্থ এবং তার প্রকাশ নিয়ে আমরা বিস্মিত!)

রক্তবীজ-ধ্বংসকারিণী মহিষমর্দিনী আদ্যাশক্তির অংশসম্ভূতা প্রত্যেক নারীই যে মহাশক্তির অধিকারিণী- তা তাঁদের বোঝাতে হবে, মাতৃজাতির
লাঞ্ছিতকারী দস্যু দলন করে। (দেবীত্ব আরোপ, সম্মানীয় অর্থেই দেবীত্ব উন্নীত করে দেওয়ার প্রক্রিয়া)

আপনাদের ঘরের মেয়ে ‘কৃষ্ণা’ তা কাজে পরিণত করবার ইঙ্গিত দেবে তার ধারাবাহিক জীবনেতিহাসের পাতায় পাতায়!

তার এবারের ঘটনার পথ আরও কণ্টকাকীর্ণ... গতি উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল... কিন্তু লক্ষ্যস্থান, দেবভোগ্য সুন্দর প্রেম-নিকেতন!

দ্বিতীয় গ্রন্থ বাংলার যে-কোনো দোকান থেকে সংগ্রহ ক’রে প’ড়ে দেখুন। (কারাগারে কৃষ্ণা, পৃ বিজ্ঞাপন ১-২)

আমরা যেসব শব্দগুলি, বা যে যুক্তিগুলি তুলে ধরেছি সেটি পুরুষ গোয়েন্দা বা চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বা এসব দাগিয়ে দিয়ে বলার বা ন্যায়সঙ্গত করে তোলার প্রয়োজন পড়ে না। মেয়ে-গোয়েন্দাদের, ‘পুরুষপ্রতিম’ এবং ‘দেবী’ রূপে গড়ে তোলা খুব চেনা ছক। আমরা আগেই বলেছি, মেয়েদের লেখক হয়ে ওঠার এবং কোনো মেয়েকে কেন্দ্র চরিত্র রেখে, আখ্যান গড়ে তোলার ইতিহাস পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লড়াইয়ের ইতিহাস। অবশ্যই প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর উপন্যাস, যে ‘বাংলার যে-কোনো দোকানে’ পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে তাঁর দক্ষতা, লড়াইয়ের কৃতিত্বই চোখে পড়ে, নিঃসন্দেহে। কিন্তু পরবর্তীকালেও, সীমাবদ্ধতা, পরাধীনতা পার হয়েও যখন সুযোগ এসেছে তখনও এই স্টিরিওটাইপকে সমাজের সঙ্গে প্রগতিশীলতার সঙ্গে, আধুনিকতার(মডার্নিটি) সঙ্গে পাল্টানো হয় নি। বরং এই ধরণটিকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে। বার্মা-ভারত সম্পর্কে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর গবেষণা গভীর, তিনি যেভাবে তাকে গল্পে ব্যবহার করেছেন, তা তাঁর একান্ত কৃতিত্ব। পরবর্তী অনেক লেখক এবং লেখিকা প্রভূত প্রিভিলেজ সত্ত্বেও এইরকম দক্ষতা দেখাতে পারেন নি।

(৯)

আমরা আলোচনা করবো সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মেয়ে-গোয়েন্দা মিতিন মাসি কে নিয়ে। আমরা যে ধরণটি নিয়ে কথা বলছি, মিতিন মাসি সিরিজে সেই ধরণের গল্প আছে, দুটি- ‘ঝাউ ঝিয়েন হত্যা রহস্য’ এবং ‘স্যাণ্ডরসাহেবের পুঁথি’। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয়-চরিত্রের নির্মাণ বিষয়ে কিছু কথা আমাদের বলতে হচ্ছে। আপাতভাবে মনে হতে পারে এটা তো গোয়েন্দা-আখ্যানের আলোচনা নয়, এই আলোচনায় এই বিস্তৃত (চরিত্র নির্মাণ পদ্ধতির) ব্যাখ্যার সত্যিই প্রয়োজন আছে কী না! আমাদের বিনীত উত্তর, খুবই জরুরি

প্রয়োজন আছে। কারণ এই চরিত্রগুলিকে মান্য-সর্বজনগ্রাহ্য-জনপ্রিয়ভাবে গড়ে তোলা হয়(কখনো কখনো এই পদ্ধতি খুব ধীর, তাই খুব প্রভাবশালী পদ্ধতিতে, সিরিজের মাধ্যমে, আস্তে আস্তে; কখনো বা একটি গল্পে)। এবং এই নায়ক বা নায়িকার রূপ-গুণ-ইচ্ছা-অনিচ্ছা-রুচিকে কে বলতে বলতে বলতে... বাকি গুলিকে ‘অপর’ ‘হীন’ করে তোলা হয়।

যদি মেয়ে-গোয়েন্দাদের মধ্যে ‘আধুনিকা’ হিসেবে ধরতে হয় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণাই সেক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে সেকথা বলেছেন।^{৬১} আমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু ‘নারীর চিরন্তন’ নির্মাণ কৃষ্ণাকেও সীমাবদ্ধ করেছে। তবু কৃষ্ণা আদর্শ গৃহে সীমাবদ্ধ ‘কন্যা’ নয়, যে ‘গৃহ বজায় রেখে’ তারপর সময় বাঁচিয়ে বাইরে কাজ করবে, বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করবে। স্ত্রী এবং মাতা পরিচয়কে জোর করে কৃষ্ণার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়নি।

এই নির্মাণটি আরও আধুনিক সময়ের নির্মাণ। যেখানে নারী যদি বাইরে যায়, অর্থোপার্জন করে তাহলে তাকে ‘ঘর-পরিবার-পারিবারিক হায়রার্কি বা গঠনতন্ত্র-নারীর আদর্শ-নারীসুলভ সৌন্দর্য এবং আদর্শ’ বজায় রাখতেই হবে। যৌথ সংসার হলেও- এ বিষয়ে নারীর দায়িত্ব বেশি (আগে ছিল একক নারীর দায়িত্ব এখন ‘সীমাবদ্ধ আধুনিক’ হওয়ার চেষ্টায় তাকে পুরুষতন্ত্রের ইচ্ছেমতো স্বাধীনতা দেওয়া হয়)। প্রতি পদে তার সতীত্ব, একনিষ্ঠতা, ঘর ও পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিতে হয়। এতেই তার মহিমা! রক্তমাংসের নারী(বা পুরুষ, আসলে মানুষ) বাস্তবে এতদিক সামলে কোনোমতেই চলতে পারে না। খামতি ঘটেই যায়, কারণ সত্যিই তার তৃতীয় নয়ন, দশটি হাত, অলৌকিক ক্ষমতা কোনটিই নেই। ফলে ‘আদর্শ’ না হয়ে উঠতে পারার জন্য, পুরুষতন্ত্র(মানসিকতা, যার ধারক নারী-পুরুষ উভয়েই) তাকে ধারাবাহিকভাবে অপমান চালিয়ে যেতে পারে! আর তার সমান্তরালভাবে সাহিত্যে-সিরিয়ালে-সিনেমায় এরকম আদর্শ বানিয়ে তুলতে থাকে। মেয়ে লেখকরাও নিজেদের ‘স্বতন্ত্র’তার লড়াই ভুলে, তাতে যোগ দেয় বাজারের প্রয়োজনে, জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায়। বাংলা গোয়েন্দাগল্পের একটি জনপ্রিয় ধারা- কথকের সম্পর্কেই ‘গোয়েন্দারা’ পরিচিত হন কিছু ক্ষেত্রে। এই পদ্ধতিতে ‘নির্দিষ্ট পাঠকের’(টার্গেট

অডিয়েন্স) বয়স (মানসিক বয়স) বেঁধে দেওয়া যায়। মামাবাবু, ফেলুদা, মিতিন মাসী এঁরা সব পাঠকেরও মামাবাবু, দাদা, মাসী, অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের জন্য। ফেলুদার ছায়া অনুযায়ী পরিচিতি মিতিন নামে ডাক নামে হলেও, প্রদোষকুমার মিত্রের মতোই ভারিক্কি ভালো নাম আছে, প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়। ফেলুদার ধরনের মতোই আখ্যানের সমান্তরালে চলতে থাকে, বিস্তৃত ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু ফেলুদা পুরুষ, তার গার্হস্থ্য দায় নেই! তার সঙ্গী ভাইপো এবং বন্ধু জটায়ু। যদিও জটায়ু নিজের ব্যয়ভার নিজেই বহন করে এমন ইঙ্গিত আছে! কিন্তু মেয়ে একাকী কী করে যাবে! বন্ধু(পুরুষ সঙ্গী, বিবাহ বাদে) কখনই তার সঙ্গী নয়! তাহলে? সঙ্গী বোনঝি, স্বামী, সন্তান। স্যাণ্ডরসাহাবের পুথি উপন্যাসেই আছে- মিতিনের মজুরি(পাঁচ লক্ষ টাকা, উচ্চবিত্ত মহলেই তার ঘোরাফেরা) তার স্বামী বারবার তাদের পরিবারের কাশ্মীরভ্রমণে ব্যয় করার কথা বলে! যা হয়ও। তাহলে নারী উপার্জন করতে পারে কিন্তু তা ব্যয় হবে পরিবারের স্বার্থেই, তাকে অতিরিক্তভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। যথেষ্ট প্রফেশনাল হল কি! যদি ‘কেস-সমাধানের’ জন্য গোটা পরিবারকে নিয়ে যেতে হয়! নিজের মজুরীর টাকায়।

ফেলুদার অস্ত্র মগজাস্ত্র, মিতিন-মাসীর তৃতীয় নয়ন (সংস্থার নাম- থার্ড আই বা তৃতীয় নয়ন), স্পষ্ট দেবীত্ব! আমরা ফেলুদার কথা বারবার না বললেও, একাধিক গল্পেই শার্লক হোমস এবং ফেলুদার কথা বলে হয়েছে! প্রভাব স্পষ্ট। জানিনা প্রভাবতী দেবীর লেখা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের পড়া ছিল কী না!

আসি গল্প প্রসঙ্গে, ঝাউ-ঝিয়েন হত্যা রহস্য- কলকাতার চীনে পরিবারকে কেন্দ্র করে! কিন্তু চীনেম্যানদের স্টিরিওটাইপকে (আখ্যানে নির্মিত) স্মরণ করিয়ে তাকে ভাঙার কথা আছে। আবার মৃদু ‘অপরতার’ লক্ষণও চীনেদের বিরুদ্ধে আছে, একটু খুঁটিয়ে পড়লেই তা জানা যায়। যদিও তারা অপরাধী নয় গল্পে।^{৫২} স্যাণ্ডরসাহাবের পুথি- র কাহিনি কলকাতা, কাশ্মীর, কারগিল, লেহ্ পর্যন্ত বিস্তৃত। বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে প্রচলিত উপাদানগুলিকেই ব্যবহার করা হয়েছে! কোথাও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়েছে! কিন্তু তা নিছকই তথ্যের প্রতি অবহেলামাত্র! যেমন-

“গেলুপা শাখা আবার কোথেকে এল?” পার্থ ভুরু কোঁচকাল, “বৌদ্ধদের তো তিনটেই শাখা। হীনযান, মহাযান আর বজ্রযান। প্রথমটা কটরপন্থী, মহাযানরা মাঝামাঝি, আর বজ্রযানরা বোধহয় শুধু জপতপ নয়, তন্ত্রসাধনাও করে...”

তিব্বতে এটা একটু অন্য রকম। ওখানে বৌদ্ধধর্ম পৌঁছয় সেভেস্ত্র সেধুওরিতে। খ্রু সাম মহাযানী ভিক্ষু(এটা কী ধরনের বাক্য বা তথ্য জানিনা! যা 'নায়িকা'র মুখে বসানো হচ্ছে। একেই আমরা 'অপর বা লঘু' করার ধরণ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছি।) তারও তিনশো বছর পরে পদ্মসম্ভব নামের এক বৌদ্ধ ধর্মগুরু যান তিব্বতে। তিনি ছিলেন বজ্রযান সম্প্রদায়ের, তখন থেকেই ওখানকার বৌদ্ধরা নানান শাখায় ভাগ হয়ে যায়...^{৫০}

তথ্যগত ভ্রান্তি^{৫১} স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে। জনপ্রিয়তার থাকবন্দীতে নাম তোলাতে এঁরা যত বেশী বন্ধপরিবর্তন, ততটা তিহাস-গবেষণা, সমাজ, তার মানুষ, তাদের ঐক্য, মানবিকতার দায়বদ্ধ নন। নির্দিষ্ট পাঠক, এদিকে কিশোর নাগরিক ছেলেমেয়েরা যারা বড়ই হচ্ছে 'অপরতা'র ধারণাকে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করে! হেরক এবং মিতিন মাসী সিরিজে বহুবার রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ আছে! প্রসঙ্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কোনো মিল নেই, সেকথা স্পষ্ট বলাই ভালো।

২০১৬ সালে প্রকাশিত দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের ঈশ্বর যখন বন্দী উপন্যাসে আসি। এর প্রচ্ছদে লেখা আছে 'সাড়া জাগানো সর্বাধিক বিক্রিত থ্রিলার, তৃতীয় সংস্করণ। এর ভূমিকায় লেখক বলেছেন-

...গতানুগতিক গোয়ান্দা উপন্যাস নয়, একটা সুপারন্যাচারাল থ্রিলার বলা যেতে পারে, যেখানে ইতিহাস-পুরাণ-বিজ্ঞানের মেলবন্ধনের সাথে সাথে একটা সমবয়সী স্বামী-স্ত্রী, তাঁদের ভালোবাসা, তাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে ঘটা আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক মনে হওয়া কিছু রোমাঞ্চকর সত্য এবং অশুভের বিনাশ করে শুভ শক্তির জয়ের কথা বলা হয়েছে।^{৫২}

ইতিহাস, বিজ্ঞানের সঙ্গে কাল্পনিক পুরাণকে মেলানো যায় না। এটা করতে গেলেই গুণগোল ঘটে। সুতরাং এই দাবীটিই গোলমেলে। রুদ্র এবং প্রিয়মের দাম্পত্যের মাধ্যমে একটি সম-নাগরিক-প্রগতিশীল দাম্পত্যের সংজ্ঞা দিতে চাওয়া হয়েছে। এই থ্রিলারের কেন্দ্রীয় চরিত্র রুদ্র(অবশ্যই অন্যান্য নামের মতোই দেবত্বের ছোঁওয়া আছে নামে।) রুদ্রকে আশ্রয় চেষ্টা করা হয়েছে আধুনিক এবং প্রগতিশীল বানানোর। আমরা একটু দেখে নেবো লেখক কাকে আধুনিক এবং প্রগতিশীলতার চিহ্ন বলে মনে করেন?

উপন্যাসের শুরুর দিকেই রুদ্র বলে-

"...এইরকম বাড়িতেই তো সব ভূতুড়ে ঘটনাগুলো ঘটে। আপনাদের বাড়িতেও কি এরকম কিছু আছে? তার উপর ঐ আঁকাগুলোও কীরকম ছমছমে..." আমি কপট ভয়ের হাসি একটা মেয়েলি ভঙ্গি করলাম। (তদেব, পৃ ২২)

রুদ্র 'মেয়েলি' নয়, এই তার দাবী, সেটা অভিনয় মাত্র! তাহলে সে কী? মেয়েলি ভঙ্গি রুদ্রর মতে নিশ্চয়ই 'অপর লঘু ঘৃণ্য, এবং মেয়েলির বিপরীত নিঃসন্দেহে 'পুরুষালি'? এই হল আধুনিকা, প্রগতিশীল কেন্দ্রীয় চরিত্র রুদ্র! এই রুদ্র বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কিছু সাধারণ জ্ঞান তার ডায়রিতে লেখে, অবশ্যই পাঠকদের জানানোই তার উদ্দেশ্য, কারণ পাঠক নাগরিক-হিন্দু পাঠক (এবং অলস, প্রশ্নহীন আনুগত্যে এগুলি বিশ্বাস করে)-

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় দুশো বছর বাদে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। একটা হল "খেরাভাদা" (বাংলায় খেরবাদ বললেই পারতেন) গোষ্ঠী যারা ছিলেন প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত, আরেকটা হল 'মহাযান' গোষ্ঠী যারা ছিলেন উদারমনস্ক। (তদেব, পৃ ২৮)

এরকম বহু ভ্রান্তিমূলক অসম্পূর্ণ, অর্ধসত্য তথ্য আছে! স্বাভাবিকভাবেই আখ্যানে কেউ ইতিহাস বিজ্ঞান খুঁজবেন না। কিন্তু লেখক ভূমিকায় বলে দিলে খুঁজতে তো হবেই!

ভূমিকাতে লেখক পদ্বসম্ভবকে নিয়ে বলেন-

উপন্যাসটা লিখতে শুরু করার আগে থেকেই একটা ব্যাপার মাথায় ছিল, যেহেতু একটি বিশেষ ধর্মের খুব সংবেদনশীল একজন চরিত্র আমার এই উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন, যতটা সম্ভব তাঁর সম্পর্কে জেনে লেখার চেষ্টা করেছি। (তদেব, পৃ ১)

উপন্যাসে আছে, রুদ্রর বাবা, যিনি বৌদ্ধধর্ম এবং পদ্বসম্ভবকে নিয়ে গবেষণা করছেন তার বক্তব্য -

গল্পটাকে সত্যিও ভাবতে পারিস বা মাইথলজিক্যাল (এই বাক্যটি নিজেই সমস্যাপূর্ণ)। অষ্টম শতকে এক বৌদ্ধ গুরু ছিলেন যিনি বজ্রযান গোষ্ঠীকে মূলত দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দেন। ... তাঁর নাম ছিল পদ্বসম্ভব। ...ইনি নাকি কোন মায়ের গর্ভে জন্মাননি, আট বছরের বালক হিসেবে পদ্বফুলের মধ্যে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন এইরকম। বজ্রযান এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে ইনি এক অন্য আঙ্গিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকটা আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ যেমন আমাদের হিন্দু ধর্মকে হাজার বছরের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে নতুন রূপ দিয়েছিলেন সেইরকম। (তদেব, পৃ ৩০-৩১)

গোটা মনোভাবটিই 'আমাদের' (বিবেকানন্দ, হিন্দুধর্মের) থেকে 'অপর' কে দেখা। তুলনাটি যে একেবারেই 'তুলনা' করার মতো নয়, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। তারপর একে একে এই উপন্যাসে সত্যিকারের (আখ্যানের ভেতরের সত্য, তার সময়কাল একবিংশ শতক) ড্রাগন ইত্যাদিও আসে। এবং ড্রাগনরা নিজেরা মারামারি করে মরে যায়! তারপর যা বার্তা পাওয়া যায়, সেটি ২০১৫ তে প্রকাশিত 'জুরাসিক ওয়ার্ল্ড' সিনেমার মতো। গেম অফ থ্রোনস এর ড্রাগনকে বাংলা-সাহিত্যে আনার চেষ্টা থাকতে পারে! আর আলোচনা করছি না।

আমাদের এই অধ্যায়ের শেষ বই *চৌথুপীর চর্যাপদ*, প্রীতম বসুর লেখা। প্রকাশকাল, ২০১৭; আখ্যানের সময়কাল ২০১৬, প্রায় সমসাময়িক কালকে নিয়েই লেখা। এই অংশে আলোচনা করছি কারণ, কেন্দ্রীয় চরিত্র, একটি মেয়ে, ডঃ যোজনগন্ধা চ্যাটার্জী। এর ধরণও একইরকম! 'জাল মোহান্ত' উপন্যাসে যেমন আমরা পেয়েছিলাম বিদেশীদের কাছে বিক্রীত(প্রকাশিত) এমন এক পুথির কথা যেখানে প্রাচীন চিকিৎসা, অমরত্ব(বা দীর্ঘায়ু) সংক্রান্ত গাছ-গাছড়ার ওষুধের কথা আছে। এখানেও সেরকম একটি পুথিকে নিয়েই কাহিনি গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র সমতলের নাগরিক চরিত্র শুধু তাই নয়, বিলতফেরৎ। তবে এর বাংলাভাষা রচনায় লেখকের কৃতিত্ব আছে। বাং-হিন্দি-রেজি নয়(বাংলা হিন্দি ইংরেজি মেশানো নাগরিক, অভিজাত বুলি, এই ভাষা মূলত ব্যবহৃত হয় যারা এই তিনটির কোনোটাই ভালো করে জানেন না তাদের দ্বারা)। আমাদের আলোচিত কয়েকটি সাম্প্রতিক উপন্যাসের ভাষা এই 'বাং-হিন্দি-রেজি'। তবে একেবারেই যে, এই ধরণকে ব্যবহার করা হয়নি তা নয়। আসলে এখনকার লেখকেরা একে হয়ত জনপ্রিয়তার একটি উপাদান বলে মনে করেন। এই উপন্যাসে বাংলা ভাষার ব্যবহার তুলনামূলকভাবে ভালো। বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ, এই কাহিনির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, তার ভাষাকে আয়ত্ত করে পদ রচনার কৃতিত্বও লেখকের।

কিন্তু! আধুনিক-অভিজাত-নাগরিক-ফর্সা(বিদেশীদের মত ফর্সা!)নায়িকার রূপ বর্ণনা দেখি, ডাক্তারদের জবানিতে-

কিমোর পর থেকে নিজেকে নেড়ি বোষ্টমীর মতো লাগে। ডক্টররাও শুনে হেসে বলেছিলেন- উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু অল বোস্টমিজ, আপনাকে আল্ট্রা-শর্ট ফিমেল হেয়ারকাটের ইয়াং ডেমি মুরের মতো দেখতে লাগে- এত বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, এত শার্প ফিচার, মেমসাহেবের মতো গায়ের রঙ ছাড়াও আপনার এই ইয়াং সুন্দর মুখে একটা জেদ লেপ্টে থাকে, তাই বোষ্টমী বললে আপনার ছবিটা ঠিক পোর্ট্রে করা হয় না।^{৫৬}

রূপকল্পনা করতে পাঠকের কষ্ট হলে তিনি 'ইয়াং ডেমি মুরকে' কল্পনা করে নেবেন বা গুগলে ছবি দেখে নেবেন! অসুস্থ নায়িকা বলে পাঠকের বিশেষ চিন্তা করার দরকার নেই, 'জনপ্রিয় সিনেমার মরণাপন্ন চরিত্র' যেমন একপাতা ডায়লগ বলে সেরকমই, যোজনগন্ধাও যাবতীয় অ্যাডভেঞ্চার করে, রোগমুক্তিও ঘটে স্বাভাবিক(জনপ্রিয় আখ্যানে যেমন হয়)ভাবেই! তবে সেকথায় পরে আসছি। এখানেও গল্প কৃষ্ণা সিরিজ, ঈশ্বর যখন বন্দী র ধরণেই, কেন্দ্রীয় চরিত্রের পিতার অন্তর্ধান এবং গবেষণা বা কাজসংক্রান্ত রহস্য ঘিরেই।

'৪ নং' অংশটি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধের বৈষম্যের একে অপরকে অপমানের একেবারে চূড়ান্ত নিদর্শন, একটু উদাহরণ দিই-

নলিনী রক্ষিতের বৈঠকানায় ঢুকেই হাফি হাবিলদার দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বলল-

'বাপরে!'

ঘরের কোণে পাথরের ভয়ঙ্কর দর্শন এক নগ্ন দেবীমূর্তি। দেবী নিজের মাথা ডান হাতের কর্ণি দিয়ে কেটে বাম হাতে নিজের বুকে ধরে আছেন। গলা দিয়ে রক্তের ফোয়ারা কাটামুণ্ডুতে ঝরে পড়ছে, উনি নিজের রক্ত পান করছেন।

হাফি হাবিলদার দু-হাত মাথার ওপর টানটান করে মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম সারল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় টুপি আঁটতে আঁটতে তিরস্কারের স্বরে বলল-

'আপনার কী আক্কেল মশাই! নিজের ঘরে কেউ ছিন্নমস্তার মূর্তি সাজিয়ে রাখে? কত রাগী দেবতা! পান থেকে চুন খসলে-'

'মূর্তিটা ছিন্নমস্তা না, বজ্রযোগিনী', নলিনী রক্ষিতের নির্বিকার উত্তর। 'কিন্তু আপনি তো মুসলমান, হিন্দুদের মতো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন?' নলিনী রক্ষিত উত্তরের অপেক্ষা না করে এসির রিমোট অন করে যোজনগন্ধাকে সোফা দেখিয়ে বলল বসুন। (তদেব, পৃ ২৬-২৭)

উত্তরের অপেক্ষা না করা, আসলে অপমানের উদ্দেশ্যকেই প্রকট করে। আখ্যান অনুযায়ী নলিনী রক্ষিত 'দুষ্ণ লোক' কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র ডেমি মুর মানে যোজনগন্ধা, তার এসব বৈষম্যের দায় না নেওয়াই

উচিত, প্রচার করা তো একেবারেই অনুচিত। সাহিত্য নীতিকথা লোকশিক্ষার জায়গা নয় ঠিকই, কিন্তু দায়ত্বজ্ঞানহীনতার জায়গাও নয়,-

যোজনগন্ধা সোফায় বসল, হাফি হাবিলদারও তার বিশাল শরীরটা নিয়ে সোফার ওপর ধপ করে যোজনগন্ধার পাশে বসে পড়ল, মুখে আবার বিরক্তি ফিরে এসেছে। বাগডোগরা যাবার আদেশ শুনে ওর মুখটা সেই যে প্যাঁচার মতো পেঁচিয়ে গেছে এখনো তা স্বাভাবিক হয় নি। হাবিলদারের ইউনিফর্ম থেকে বোটকা গন্ধ আসছে। লোকটা শিওর গায়ে সর্ষের তেল মেখে চান করে, তার ওপর পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ গায়ে, একদম ম্যারনেট করা বডি- যোজনগন্ধা নাকে আঙুল ঘষল। (তদেব, পৃ ২৭)

‘গায়ে পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ’- জাতি-ধর্ম বিদ্বেষী, হিন্দু-বাঙালির মুসলমান-বিদ্বেষের চেনা বুলি! আম্রপালী-তেও উল্লেখ করেছে।

গন্ধকালী এবং যোজনগন্ধার গল্প সমান্তরালে চলতে থাকে, পরে জানা যায় গন্ধকালীর পুনর্জন্ম যোজনগন্ধা মানে যোজনগন্ধা জাতিস্মর! যদিও মানসিক অসুস্থতা-বিজ্ঞান দিয়ে ব্যালাস করতে চাওয়া আছে; কিন্তু সমতাবিধান হয় নি। গল্পটিকে বিশ্বাসে যতখানি মানে বের করা যাবে তর্কে অতখানি নয়! আবারও ‘সোনার কেহলা’ মনে পড়ে সেখানে ‘জাতিস্মরকে’ গোটাটাই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এই গল্পটিকে নয়। শুধু বৌদ্ধধর্ম নয় বিভিন্ন জায়গায় রামায়ণ মহাভারতের প্রচলিত গল্পও এসেছে। ধর্মীয় সমন্বয়ের বেশ কিছু সীমাবদ্ধ ভাবনাও প্রচারিত হয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতী লামা, যোজনগন্ধার নানান রোগের চিকিৎসা করে গাছ-গাছড়া-শিকড়-বাকড়ের সাহায্যে। যোজনগন্ধাকে রক্ষা করতে শেষে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাজপুত্র থুড়ি তিব্বতী লামা লবসাঙ চ্যোগিয়াল আসে। লামার ‘পদ্মবীজের মালা’র ওষুধ যোজনগন্ধাকে রোগমুক্ত এবং মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তোলে এই ইঙ্গিতে গল্প শেষ হয়।

যদিও এই যোজনগন্ধাই পরে বলে-

লামাজী আপনি ঠিকই বলেছেন বাঙালি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে চলেছে হিন্দু আর মুসলমান নিয়ে, এই ঝগড়া করতে গিয়ে বাঙালির নিজের শিকড় যা হল বৌদ্ধ ধর্ম, তা খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছে। বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল অনেক কাহিনি লুকিয়ে আছে এই সব পুঁথিগুলির মধ্যে। (তদেব,

পৃ ৪৩৮)

বাঙালির শিকড় শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্ম নয়, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, লৌকিক ইত্যাদি ও সেগুলির মধ্যেও অজস্র ভাগ নিয়ে বাঙালির ধর্ম-দর্শনের চর্চা। সবই গবেষণার বিষয়। 'গৌরবোজ্জ্বল' কাহিনি, খুঁজতে গিয়ে, কুরুক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্র, গণেশের প্লাস্টিক সার্জারি, পুষ্পকবিমান থেকে আকাশযান নির্মাণ, পুনর্জন্ম, সঞ্জিবনী মন্ত্র বা ওষুধ- সব 'আমাদেরই আছিল' এই ভাবনায় পৌঁছানোর গলদটাও আমাদেরই ভবিষ্যৎ কে নষ্ট করবে।

এই লেখা চলতে চলতে এবং গবেষণা মূল্যায়ণ হওয়া পর্যন্ত প্রতিবছর এই ধরনের উপন্যাস গুণিতকহারে বেড়ে চলেছে, সকলেই দাবী করছেন, তাঁর লেখাই অনন্য, স্বতন্ত্র, অসাধারণ, অভূতপূর্ব। যতবেশি ধর্মীয়-বর্ণগত-লিঙ্গগত-নগর এবং প্রান্তিয়, অভিজাত এবং 'গ্রাম্য' ইত্যাদির দ্বিমূল(বাইনারি)বৈষম্য, জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য এই ধরনের লেখায় এই বিশেষ প্রবণতাগুলিকে প্রকট করে তুলবে। বিশ শতকের সময়সীমাকে অতিক্রম করে, বেশ কয়েকটি উপন্যাস আলোচিত হল, প্রবণতাগুলি স্পষ্ট করাই আমাদের উদ্দেশ্য; আর উপন্যাসের সংখ্যা বাড়াবোনা।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাস, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ প্রমুখরা যারা একাধিকবার, দীর্ঘদিন ধরে নেপাল তিব্বত ইত্যাদি জায়গায় গবেষণা করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা এমন নয়। *তিব্বতে সওয়া বছর*^{৫৭} এর বর্ণনায় আছে, লেখক তিব্বতে, সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছেন, গবেষণা করেছেন, তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছেন, ধনী দরিদ্র সকলের কাছে থেকে। এমন অনবদ্য ভ্রমণ-কাহিনি ভারতীয় সাহিত্যে খু কমে লেখা হয়েছে। তুলনায় এই ধরনের সাহিত্যে যে 'সন্দেহ-অপরাধপ্রবণতা-অপরতা'কে যুক্ত করা হয়েছে তা অত্যন্ত হীন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই। তিনি প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকলেরই মানবতাবিরোধী সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করেছেন। তাও তাঁর পদ্ধতি এমন নয়। আরও বহু আগে যখন বিভিন্ন দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা ভারতে আসতেন, মেগাস্তিনিস, হু-য়েন-সাং প্রমুখরা তাঁদের বর্ণনাতেও এমন প্রবণতা পাই না। বিভিন্ন মতের সহাবস্থান, বা মতবিরোধকে তর্ক-প্রতর্কের সঙ্গে আলোচনা করা এরকম ধরণ আমাদের অচেনা

ছিল না। চীনের শক্তিশালী দেশ হয়ে ওঠাই, মূলত 'জেনোফোবিয়ার' মূল ভীতি। তারপর আসে চীনে কম্যুনিজমের উত্থান ও বিকাশ এবং সেই বিষয়ক ভীতি। বর্তমানেও আছে এগুলির সম্মিলিত উত্তরাধিকার(করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষিত)। তারসঙ্গে চীন বর্তমানে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। ফলে শ্বেতাঙ্গদের ভীতি ভারতবর্ষেও সঞ্চারিত হচ্ছে বিশেষ রাজনৈতিক দলগুলির মদতে। নিওলিবারাল অর্থনীতির বিকাশের ধারায় চীন এবং রাশিয়া বা অন্য যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক মডেল, কতখানি গ্রহণযোগ্য তা নিশ্চিত বিচার-বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই তার পথ উপরোক্ত প্রবণতা নয়।

'শুধুমাত্রই বিনোদন। নিরপেক্ষ অবস্থান'- এই আপ্তবাক্যে সাহিত্য পড়া খুব মুশকিল। কারণ আমাদের সমস্ত সাহিত্য(আরো সবকিছু, আমরা সাহিত্য নিয়ে কথা বলছি তাই) কোনো না কোনো 'পক্ষ' থেকেই লেখা, প্রচারিত, প্রকাশিত। পাঠকের বিবেচনার অভাব তাকে কিন্তু পক্ষপাতী করে তুলবেই। অতএব, আমাদের প্রস্তাব পক্ষ যখন নিতেই হবে, তা ইতিহাস-গবেষণা, বিবেচনা নির্ভর, মানবিক হওয়া উচিত। বহু সাধনার ফলে, প্রাপ্ত, উৎকৃষ্ট বাংলা-সাহিত্যধারা, বর্তমানে কোনদিকে যাচ্ছে তা ভেবে দেখার খুবই প্রয়োজন হয়েছে।

আমরা আপাতত আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

তথ্যসূত্রঃ

- ১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃ ২৭-২৮
- ২। তদেব, পৃ ৩৩
- ৩। তদেব, পৃ ৩৪
- ৪। দীনেন্দ্র কুমার রায়, *পিশাচ পুরোহিত*, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, নদীয়া, ১৩১৭, পৃ ১
- ৫। দীনেন্দ্র কুমার রায়, *জাল মোহান্ত*, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬, পৃ ১
- ৬। দীনেন্দ্র কুমার রায়, *জাল মোহান্ত*, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬, পৃ ৩৭২-৭৩
- ৭। দীনেন্দ্র কুমার রায়, *জাল মোহান্ত*, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬, পৃ ৪১২
- ৮। V. Propp, *Morphology of the Folktale*, University of Texas Press, Austin, 2009
- ৯। দীনেন্দ্র কুমার রায়, *জাল মোহান্ত*, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬, পৃ ১২৯
- ১০। তদেব, পৃ ৩৬৩
- ১১। দীনেন্দ্র কুমার রায়, *চীনের চালবাজি*, রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার ১১২ নং সচিত্র উপন্যাস, 'রহস্য-লহরী' কার্যালয়, নদীয়া, ১৩৩৪, পৃ ৩-৪
- ১২। তদেব, পৃ ৭১-৭২
- ১৩। তদেব, পৃ ৭৩-৭৪
- ১৪। তদেব, পৃ ৮১
- ১৫। তদেব, পৃ ১৩
- ১৬। তদেব, পৃ ১০২
- ১৭। তদেব, পৃ ১৩০
- ১৮। তদেব, পৃ ১৩১
- ১৯। তদেব, পৃ ১৪৫
- ২০। তদেব, পৃ ১৫২
- ২১। তদেব, পৃ ১৫২
- ২২। দীনেন্দ্র কুমার রায়, *পীতাতঙ্কের প্রতিকারঃ বিপ্লববাদের বিলোপ-কাহিনী*, রহস্যলহরী উপন্যাসমালার ত্রৈমাসিক সংস্করণ, ষণ্মাসিকের দপ্তরের ষষ্ঠ গ্রন্থ, রহস্য-লহরী পাবলিসিং হাউস, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯২৩, পৃ ৮-৯, ১৭
- ২৩। তদেব, পৃ ১৭
- ২৪। তদেব, পৃ ১৮০
- ২৫। তদেব, পৃ ৪৯, ৭১, ১০৪-১০৫
- ২৬। তদেব, পৃ ১২৭
- ২৭। তদেব, পৃ ১৪২
- ২৮। তদেব, পৃ ৩৩

- ২৯। তদেব, পৃ ১৭৮-১৭৯
- ৩০। তদেব, পৃ ৪০
- ৩১। তদেব, পৃ ১৬৫
- ৩২। দীনেন্দ্র কুমার রায়, *চীনের নবনায়ক*, রহস্য রোমাঞ্চ গ্রন্থ, শিশীর পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, নূতন সং, ১৩৬৫, পৃ ৩
- ৩৩। শশধর দত্ত, *চীনের পুতুল* (চলচ্চিত্রে গৃহীত রহস্যোপন্যাস), পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ ১৫
- ৩৪। হেমেন্দ্র কুমার রায়, গীতা দত্ত (সম্পাদ), *হেমেন্দ্র কুমার রায় রচনাবলী*, ১৯ খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১০, পৃ ১১
- ৩৫। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মরণের ডঙ্কা বাজে*, এম, সি, সরকার এন্ড সন্স লিঃ, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৪০ পৃ ১০৭-১০৮
- ৩৬। J. Needham, *Science and Civilisation in China*, Vol. II, page 34 পৃ ২৩ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সঙ্ঘঃ শরণং গচ্ছামি ইত্যাদি অগ্রস্থিত রচনা।
- ৩৭। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মরণের ডঙ্কা বাজে*, এম, সি, সরকার এন্ড সন্স লিঃ, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৪০ পৃ ৮১
- ৩৮। নীহাররঞ্জন গুপ্ত, *কিরীটি অমনিবাস*, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২১, পৃ 'খ'
- ৩৯। স্বপনকুমার, *ড্রাগন সমগ্র*, ২য় খণ্ড, শ্রীমতী নির্মালা আগরওয়ালা, কলকাতা, ২০০৪, পৃ ১৫
- ৪০। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদ), *মামাবাবু সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ ৩
- ৪১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *কাকাবাবু সমগ্র*, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ৫১৩
- ৪২। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *ব্যোমকেশ সমগ্র*, আনন্দ, ২০১৩, পৃ ২৫
- ৪৩। সত্যজিৎ রায়, *ফেলুদা সমগ্র*, ১ খণ্ড, আনন্দ, ২০১৪, পৃ ১৮১
- ৪৪। সৌমিত্র বিশ্বাস, *হেরুক*, আনন্দ নভেলা, আনন্দ, ২০১০
- ৪৫। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, *কৃষ্ণার পরিচয়*, কৃষ্ণা সিরিজের ৪ নং গ্রন্থ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ ৯৮
- ৪৬। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, *গুপ্ত-ঘাতক*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৪, পৃ ৬
- ৪৭। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, *কারাগারে কৃষ্ণা*, 'কৃষ্ণা সিরিজে'র প্রথম গ্রন্থ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১ম সং, ১৩৫৯, পৃ ১৪
- ৪৮। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, *হত্যার প্রতিশোধ*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৫, পৃ ৫-৬
- ৪৯। প্রহেলিকা সিরিজের ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, খণ্ড ৫, *কলঙ্কী চাঁদ*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৮, পৃ ২

- ৫০। কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, *হত্যার প্রতিশোধ*, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪১৫, পৃ ৩৬- ৩৭
- ৫১। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবন্ধঃ বাংলা শিশুসাহিত্যের অদৃশ্য মানুষ, *আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১২, পৃ ৩৬১-৩৬২
- ৫২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *মিতিনমাসি সমগ্র*, *ঝাও ঝিয়েন হতা রহস্য*, ১ খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩
- ৫৩। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, *মিতিনমাসি সমগ্র*, *সাগুরসাহেবের পুঁথি*, ২ খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ৪৪৬
- ৫৪। https://www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/subdivisions/tibetan_1.shtml

Groups within Tibetan Buddhism

New Kadampa TraditionNyingmapa: Founded by Padmasambhava, this is oldest sect, noted in the West for the teachings of the Tibetan Book of the Dead.

Kagyupa: Founded by Tilopa (988-1069), the Kagyupa tradition is headed by the Karmapa Lama. Important Kagyupa teachers include Naropa, Marpa, and Milarepa.

Sakyapa: Created by Gonchok Gyelpo (1034-1102) and his son Gunga Nyingpo (1092-1158).

Gelugpa: (The Virtuous School) Founded by Tsong Khapa Lobsang Drakpa (also called Je Rinpoche) (1357- 1419), this tradition is headed by the Dalai Lama. (উল্লিখিত গল্পে এই শাখার কথা বলা হয়েছে, তারসঙ্গে পদ্ধতিসম্বন্ধে যুক্ত করা হয়েছে।)

one of the major Buddhist schools in the UK, founded by the Tibetan-born Geshe Kelsang Gyatso. Some Buddhists and non-Buddhists regard the NKT as outside the mainstream tradition.

- ৫৫। দেবারতি মুখোপাধ্যায়, *ঈশ্বর যখন বন্দী*, বিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২৩, পৃ ১
- ৫৬। প্রীতম বসু, *চৌথুপীর চর্যাপদ*, প্রকাশক প্রীতম বসু, কলকাতা, ২০১৭, পৃ ১১-১২

উপসংহার

এই গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনামে রাজনীতি শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির যোগ নিয়ে, অনেক দার্শনিক, সাহিত্যিক, সমালোচক তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। সাহিত্য এবং রাজনীতি(ধর্ম, সংস্কৃতি), আমাদের এই গবেষণার আধার। আমরা এবিষয়ক একটি উদ্ধৃতি দেবো-

Politics is commonly viewed as the practice of power or the embodiment of collective wills and interests and the enactments of collective ideas. Now, such enactments or embodiments imply that you are taken into account as subjects sharing in a common world, making statements and not simply noise, discussing things located in a common world and not in your fantasy. What really deserves the name of politics is the cluster of perception and practices that shape this common worlds. Politics is first of all a way of framing, among sensory data, a specific sphere of experience. It is a partition of the sensible, of visible and sayable, which allows (or does not allow) some specific data to appear; which allows or does not allow some specific subject to designate them and speak about them. It is specific intertwining of ways of being, ways of doing and ways of speaking.

The politics of literature thus means that literature as literature is involved in this partition of the visible and the sayable, in this intertwining of being, doing and saying that frames a polemical common world.^১

ছয়টি পরিচ্ছেদে ব্যাপ্ত আমাদের আলোচনায়, বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে ঠিক কোন কোন প্রবণতায়, বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শন, বৌদ্ধকাল, বৌদ্ধ-উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি ধারাবাহিক রূপরেখা, এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম-রাজনীতির একত্র বিজড়িত অবস্থার প্রতিফলন, এতক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রতি সাহিত্যিকদের আচরণ, আমাদের মূল ঝাঁকের বিষয়। কিন্তু কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত না করেই, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আধিপত্য কীভাবে অন্যান্য ধর্ম বা ‘অপর’ এর পরিচয়কে অধীনস্থ করতে চায়, আমরা মূলত সেই বিশ্লেষণই করেছি। বাংলা উপন্যাসের ধারায় এই আধিপত্য এবং অধীনের ক্ষমতাবিন্যাসের বিচিত্র জটিল পরিসরকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম। ধর্ম-দর্শনের ইতিহাস পাঠ করলে, ভারতবর্ষের বহুমত বহুবেচিত্রের, তাদের মধ্যেও মিলেমিশে যাওয়ার সংস্কৃতি আমাদের বিস্মিত করে। সেখানে বিরোধ, আত্মীকরণ, সহাবস্থান, বিবর্তন ইত্যাদি সমস্ত সচল এবং পরিবর্তনশীল পরিবর্তনের কথা ঐতিহাসিক সত্য এবং তথ্য হিসেবে বিরাজমান। উপন্যাসের আলোচনার

মধ্যে দিয়ে, ধর্মীয় রাজনীতির এই উল্লিখিত পরিসরগুলিকেই স্পষ্ট হচ্ছে, দেখতে পেলাম। কোনো একরৈখিক, থাকবন্দী, সরল বহমানতা তার নয়; আছে বহু বাঁকবদল, জটিল সর্পিল গতি। বহুস্বরকে তার প্রবণতা অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা খুবই প্রয়োজন। এই বহুস্বর যেমন ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করে তেমনি এই স্বতন্ত্র, আলাদা-আলাদা স্বরকে মর্যাদা না দিয়ে, গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, আরেক ‘ম্যানিউপুলেটিভ গোঁজামিল’, ‘আধিপত্য-অনুসারী’ বাজার চলতি ভাবনা। তাকে বারে বারে বাজার, পণ্যের (কখনও কখনও উপন্যাস তার একটি উপাদান) এবং তার বিজ্ঞাপনের জোরে জনপ্রিয় তোলে। আশীষ লাহিড়ী এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, আমাদের দেশে-

...বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম বিচ্ছেদের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি এখনে সমাপ্ত হয়নি। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের মতো মানুষ সেই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। জয় হয়েছে অন্যপক্ষের।

তার ওপর এখন আমাদের দেশে হিন্দুধর্মের সঙ্গে তিন ম-কার (মানি, ম্যানেজমেন্ট আর মিডিয়া) জড়িয়ে যাওয়ায় সমস্যাটা আরও ঘুলিয়ে গেছে। ...

...বাস্তবিক বাদুড়বাগানের বিদ্যাসাগর আর বেলুড়ের বিবেকানন্দ, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ আর পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ, বিপরীতমুখী এইসব পূজ্যপ্রতীক কী করে একটাই মহাপৌরুষের ফ্রেমে বন্দী হতে পারেন তা বুঝে ওঠা দায়। কিন্তু যা মেলেনা তাকে মেলানোর অদ্ভুত প্রতিভা আমাদের। কেননা এখানে বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন সব মিলেমিশে রয়েছে। বস্তুত সেই মিলেমিশে থাকাটাকেই, এ-দেশের অধিকাংশ লোক বিশুদ্ধ ভারতীয়ত্ব মনে করেন। ফলে ঐশ্বরিক ফাঁক বুজে-আসা তো দূরের কথা, তার ব্যাদান বাড়ছে। সব ব্যাদে আছে বলবার মতো লোকের সংখ্যা বাড়ছে; এ-কথার প্রতিবাদ করবার মতো লোকের সংখ্যা কমছে।^২

এই ‘ঘুলিয়ে দেওয়া’ বেড়ে গেছে, তার অপর কারণ, পাঠকের অলসতা। সে গল্প উপন্যাসের মধ্যেই-কাল্পনিক গল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন সব একসঙ্গে পেতে চায়! ‘ফিক্সন’ স্রষ্টারাও জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে, যথেষ্ট ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে গবেষণা না করে চটজলদি সাহিত্য-পণ্য জোগান দিতে থাকে। কতকগুলি ‘জনপ্রিয় ছকে’ ফেলে ‘পণ্য’ নির্মিত হচ্ছে মানের তোয়াক্কা না করেই। অথচ সেগুলিই ‘বেস্ট’ অভিধায় বিক্রি বাড়াচ্ছে। জনপ্রিয় মানেই মান কম, এইরকম একরৈখিক মন্তব্য আমাদের নয়। প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে এই ‘ঘুলিয়ে’ দেওয়ার প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যে যে গোড়া থেকেই ছিল তা আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু তারধরণ ছিল আলাদা। বুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাস, অলৌকিকতা, অবতারতত্ত্ব মিলেমিশে যাচ্ছে, নবীনচন্দ্র সেনের *অমিতাভ*, প্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বুদ্ধবাণী*,

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের বুদ্ধদেব, রামদাস সেন, নিবেদিতা প্রমুখের বিভিন্ন রচনায়। অথচ এঁরা সকলেই কম-বেশি দাবী করেছেন- অলৌকিকতামুক্ত ইতিহাসনিষ্ঠ গ্রন্থ রচনাই তাঁদের উদ্দেশ্য। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে যুক্তির সাহায্যে ভারতবর্ষের নাস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন-

পরবর্তীকালে বুদ্ধের অনুগামীদের মধ্যে অনেকগুলি সুস্পষ্ট দার্শনিক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়। তার মধ্যে প্রধানত চারটি সম্প্রদায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১। বৈভাষিক সম্প্রদায়। এর মতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যক্ষভাবেই বহির্জগতের জ্ঞান হয়।

২। সৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায়। এর মতেও অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বহির্জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। বহির্জগতের মানস-প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করে আমরা তার সত্তা অনুমান করি।

৩। যোগাচার সম্প্রদায়। নামান্তরে, বিজ্ঞানবাদ। বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব নেই; একমাত্র মনই সত্য এবং তথাকথিত বহির্জগৎ আসলে মনগড়া-মনের ধারণা।

৪। মাধ্যমিক সম্প্রদায়। নামান্তরে শূন্যবাদ। বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ কিছুই প্রকৃত সত্তা নেই- সবই শূন্য, শূন্যই চরম সত্য।

বুদ্ধের মূল বাণীর সঙ্গে এইসব বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রতিপাদ্য দার্শনিক তত্ত্বের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় কিনা এ-প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু একটি বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বয়ং বুদ্ধের মতোই এইসব সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা একান্তভাবেই বেদ-বিরোধী বা শ্রুতিবিরোধী ছিলেন; বস্তুত, পরবর্তীকালে শ্রুতির অনুগামী দার্শনিকেরা শ্রুতি-প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সমর্থনে যে-সব যুক্তিতর্ক উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলির খণ্ডনই এই বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির একটি প্রধান প্রচেষ্টা ছিল। অতএব সাবেকী শ্রেণীবিভাগ অনুসরণ করে এগুলিকে নাস্তিক সম্প্রদায় হিসেবে আলোচনা করার বাধা নেই।^১

শুধু আদি বৌদ্ধধর্ম নয়, পরবর্তী প্রস্থানগুলিকেও তিনি নাস্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু প্রথম অধ্যায়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বইয়ের আলোচনায় দেখেছি, বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্মকে আস্তিক প্রমাণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানব’ বুদ্ধকে এবং তার ধর্ম-দর্শনকে গ্রহণ করে, তাকে সংস্কার এবং সম্পাদনা করেছিলেন বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তা আলোচিত হয়েছে। শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনের চিহ্নগুলিও আমরা ব্যাখ্যা করেছি। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ‘আত্মপরিচয়’ নির্মাণে বৌদ্ধ-উপাদানগুলিকে যুক্ত করতে চেয়েছেন সচেতন রাজনৈতিক অভিপ্রায় থেকেই। প্রাচ্যের ঐক্যের, সামগ্রিক উন্নয়নের ধারণার সঙ্গে এর গভীর যোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, সেই মতাদর্শই গোটা প্রকল্প জুড়ে পরিস্ফুট।

এই ‘আত্মপরিচয়’ নির্মাণ সবক্ষেত্রে ‘কবির ধর্ম’ এর মত, গঠনমূলক ছিলনা তা আমরা দেখেছি তৃতীয় অধ্যায়ে উপন্যাসের আলোচনায়। বেশিরভাগ উপন্যাসেই ‘অভিজাত, হিন্দুত্ববাদী, একরৈখিক, আধিপত্যমূলক’ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা, ‘বাঙালি আত্মপরিচয়’ নির্মাণে বৌদ্ধউপাদানগুলিকে আস্তে আস্তে এড়িয়ে গিয়ে, ভ্রান্ত বর্ণনায়, কাল্পনিক গল্পে বাদ দিয়ে দেওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা চলেছে।

আবার বুদ্ধকালের প্রতিবাদী স্বরগুলিকে, শাসক এবং আধিপত্যের বিরুদ্ধে গিয়ে,- সাধারণের ভাষা, মাতৃভাষার স্বীকৃতি, ডিট্রাইবালাইজেশন, ডিফারেন্সেশন বিরোধী প্রসঙ্গ গুলিকে সমকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। সত্যেন সেন সাম্যবাদের প্রশ্নে, বুদ্ধের সমসাময়িক উপজাতিদের গণতান্ত্রিক ভাবনা (বজ্জিদের প্রসঙ্গ), সঙ্ঘের গোষ্ঠীবদ্ধ সংযমী মিতাচারী জীবন-যাপন, যুদ্ধবিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাবনাকে তাঁর উপন্যাস পরিকল্পনায় বিনির্মাণ করেছেন।

ব্যক্তির বা সমষ্টির বিচ্ছিন্নতা, চ্যুতির প্রশ্নেও বুদ্ধের দুঃখবাদ পুনর্নির্মিত হয়েছে রাজনৈতিক ভাবে। আমরা বলেছি এক্ষেত্রেও অগ্রণী রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা শওকত আলি, বিপ্রদাস বড়ুয়া, সন্মাত্রানন্দ, শাহজাদ ফিরদৌস প্রমুখের উপন্যাস বিশ্লেষণ এবং উল্লেখ করেছি। শুধু যে উপন্যাসেই এই ভাবনার প্রভাব পড়েছে তা নয়।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে এবং কবিতায়, নাটকে, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ দর্শনের প্রসঙ্গ বিনির্মাণের বহু উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে। নবারুণ ভট্টাচার্যের *মহাযানের আয়না* গল্পের মূল ভাবনায় আছে, বৌদ্ধদর্শন। চমৎকার সেই গল্পের ভাব। একটু উদ্ধৃতি দেব-

...তুমিও একদিন বুঝতে পারবে উজ্জ্বলী। দুঃখের মূলে আছে আঁকড়ে ধরা, ওই আয়নাও তার বাইরে নয়, আঁকড়ে ধরার মূলে আছে লোভ আর লোভের মূলে আছে অজ্ঞতা। কিন্তু এতে কি কিছু মিথ্যে হয়ে গেল? ক্রেশ! বড় ক্রেশ! সবমিলিয়ে অনন্ত অপার দুঃখ।^৪

জীবনানন্দ দাশ লিখছেন-

...শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়

আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়াসের মতো আমাদেরো প্রাণ

মুক করে রাখে;

(সুচেতনা, পৃ ৫৯)

বধু শুয়েছিল পাশে- শিশুটিও ছিলো;

প্রেম ছিলো, আশা ছিলো- জ্যাংলায়,-তবু সে দেখিল

কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?

অথবা ঘুম হয়নি বহুকাল-

...

জানি- তবু জানি-

নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ-নয় সবখানি;

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়-

আরো এক বিপন্ন বিশ্বায়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে

খেলা করে;

(আট বছর আগের একদিন, পৃ ৭০-৭৩)^৫

ফলে এইধরনের সৃষ্টিগুলি হয়ে উঠেছে সমকাল-ইতিহাস-দর্শনের বীক্ষার ক্ষেত্র, বুননে আছে সংবেদনশীলতা। তা পাঠকের স্মৃতি, অধ্যাবসায়, মনোনিবেশ এবং অংশগ্রহণ দাবী করে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সেলিনা হোসেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেঘমল্লার), বিপ্রদাস বড়ুয়া, অমলেন্দু চক্রবর্তী, নবারুণ ভট্টাচার্য প্রমুখদের পূর্বে- এই বিষয় নিয়ে ছোটগল্প লিখেছেন,- ভিক্ষু সুদর্শন চতুর্বেদ (১৩২৮)। সুকুমার দত্ত সপ্তপুরা (১৯৫৯), বিজয়চন্দ্র মজুমদার কথা নিবন্ধ (৪ টি গল্প) এর কথাও উল্লেখযোগ্য। আমরা যেসব উপন্যাসগুলি আলোচনা করেছি, সেগুলি ছাড়াও আছে- লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর শকদুহিতা, বৌদ্ধকালের প্রেক্ষাপটে কল্পিত। জনৈক উদাসীন রচিত রাজগৃহে ইন্দ্রগুপ্ত (১৯২৪), এবং তারকচন্দ্র রায়ের উপগুপ্ত, উপন্যাসগুলিতে বৌদ্ধধর্মের করুণা মৈত্রীর বার্তাকে তুলে ধরা হয়েছে। প্রেমাক্ষুর আতর্ষীর, মহাস্থবির জাতক (নামকরণেই আত্মসমীক্ষা-মূলক ধারণটিকে ব্যবহার করা হয়েছে)। আমরা মূল অধ্যায়ে এগুলির উল্লেখ করিনি; কারণ এদের প্রবণতাগুলি অন্য উপন্যাসের মতই, সেগুলি উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও ভগীরথ মিশ্রের ঐন্দ্রজালিক (২০১০), আবুল কাসেমের সরহ পা (২০১৩) এবং অতীশ (২০১৫) বিশ শতক সময়সীমার বহু দূরবর্তী। এখানে উপন্যাসগুলি উল্লিখিত হল মাত্র।

এ বিষয়ে, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য সংরূপগুলিকে নিয়ে আলাদা আলাদা গবেষণার ক্ষেত্র রয়েছে। সব প্রবণতা যে আমরা এখানে সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করেছি এমন দাবী করি না। বিষয়টি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত গবেষণার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সে ধারাতেই আমাদের আলোচনার সীমিত পরিসর নির্মিত হয়েছে।

জনপ্রিয় ভাবনায় বলা হয়- বুদ্ধ মেয়েদের সঙ্গে নিতে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধসাহিত্যে, জাতক অবদানের গল্পে প্রচুর নারীবিদ্বেষী গল্প আছে;- তাই বৌদ্ধকাল মেয়েদের জন্য, সম্মানজনক পরিসর তৈরি করতে পারেনি। এই কালকে বেছে নিয়ে অনুরূপাদেবী, বাণী বসু, দীপ্তি ত্রিপাঠী, পুরুষ লেখকদের পাশাপাশি তাঁদের উপন্যাসেও 'চিরন্তন নারীকল্প' বা 'ইটারনাল ফেমিন' এর ভাবনাকেই রূপ দিয়েছেন। বুদ্ধ এবং বৌদ্ধকাল সম্পর্কে এই অভিযোগটির উত্তর দিয়েছেন,- ধর্মানন্দ কোসাম্বী, নলিনাক্ষ দত্ত, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা তাদের গবেষণামূলক সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গেই *খেরীগাথা*- য় মেয়েদের যেভাবে চিত্রিত হতে দেখি, তার তুলনামূলক উদাহরণ দিয়েছি। বৌদ্ধকালে বৌদ্ধধর্ম-দর্শন সমস্ত অর্থনৈতিক শ্রেণি থেকে আসা মেয়েদের স্বতন্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শন চর্চার সমান পরিসরের সুযোগ দিয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করার চল, হিন্দুধর্মের আধিপত্য একরৈখিক অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গির ফল একথা আমরা আগের অধ্যায় গুলিতে স্পষ্ট করেছি। সেখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসে 'ধর্মীয় অপরাধ' হিসেবে বৌদ্ধদের ওপর অপরাধপ্রবণতাকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু আরেকটি ধারায় দেখা যাচ্ছে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম এবং অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে গোটা প্রাচ্যকেই হীন করে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ধর্মভেদের সঙ্গে যুক্ত,- জাতি, বর্ণ, প্রতিকূল অসমতল ভৌগোলিক প্রতিবেশ, এথিনিসিটি, ভাষা ইত্যাদি মানদণ্ড গুলি। এই প্রবণতার বীজ আমরা খুঁজে পেয়েছি; 'শ্বেতাঙ্গ, খৃস্টান, আধিপত্যকামী, সাম্রাজ্যবিস্তারকামী, অভিজাত, অহমিকাপূর্ণ' দৃষ্টিভঙ্গিতে, পাশ্চাত্য নির্মিত 'পীতাতঙ্ক' প্রকল্পের মধ্যে। আমরা দেখিয়েছি, পীতাতঙ্কের সঙ্গে প্রাচ্য এবং বৌদ্ধধর্মকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোটা পৃথিবীতে প্রাচ্য সম্পর্কে 'হীন এবং অপরাধ' মনোভাবকে চারিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বুদ্ধজন্মভূমি ভারতবর্ষে, বাংলা সাহিত্যে, উপনিবেশ, পাশ্চাত্য এবং শ্বেতাঙ্গ-প্রীতি থেকে এই মানসিকতাকে হবহু গ্রহণ করা হয়েছে, অভিযোজিত করা হয়েছে। প্রাচ্যের একটি দেশ হয়ে, প্রাচ্য-বিরোধী একটি প্রকল্পকে বাঙালি লেখকেরা জনপ্রিয় ধারায় রপান্তরিত করেছেন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের বাইরের 'বৌদ্ধ-অধ্যুষিত' স্থানগুলিই নয়; ভারতবর্ষের মধ্যেও বিশেষ জাতি ধর্ম বর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চলের সহবাসীদের, প্রতিবেশিদের, তাঁরা 'অপর এবং অপরাধপ্রবণ' করে তুলেছেন। সমতলের হিন্দুত্ববাদী, কেন্দ্রনির্ভর, অভিজাত- অবস্থান থেকে তাঁরা এই 'সন্দেহ'কে সাহিত্যে শিল্পে নির্মাণ করে গল্প-পণ্যের বিক্রি সুনিশ্চিত করেছেন। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে, এই বহুমুখী ইতিহাস, ইতিহাসের দর্শন, তথ্য, সত্য, বাংলা উপন্যাসের উদাহরণ আলোচনায় বর্ণিত।

বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থেরবাদ ছাড়া বৌদ্ধধর্মের তন্ত্র-মন্ত্র নির্ভর বিভিন্ন শাখা জনপ্রিয় মান্য সাহিত্যে বেশি 'অপর' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, 'অপরাধপ্রবণ এবং সন্দেহের' আধার হয়ে উঠেছে। তা আমরা দেখেছি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ দাশগুপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নেতিবাচকতা, আধিপত্যকামী মানসিকতা ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করে তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলিও আমরা উল্লেখ করেছি। তবুও আমরা খেয়াল করবো, স্বয়ং বুদ্ধ বিষয়ে কুৎসা, সন্দেহ উপন্যাসে তেমনভাবে বর্ণিত হয়নি। বুদ্ধের শেষ-আহার শূকরের মাংস ছিল- এই নিয়ে রাখালদাস তাঁর উপন্যাসে ব্যঙ্গ করেছেন। পরবর্তী অনেক লেখকেরা প্রসঙ্গ ছাড়াই হঠাৎ উপন্যাসে সেটি শূকরের মাংস নয়, ছত্রাক ছিল ইত্যাদি বলে, বুদ্ধকে স্বঘোষিতভাবেই 'কলঙ্কমুক্ত' করতে চেয়েছেন। এছাড়া তেমন নেই। এরকারণ হিসেবে, আমাদের মনে হয়- এক, বুদ্ধজন্মভূমির বাসিন্দা হওয়ায়, আমাদের দেখা বৌদ্ধ-শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, প্রতিবেশ, উপাদান আমাদের মনে একটি সম্বন্ধের উত্তরাধিকার তৈরি করেছে। দুই, বুদ্ধ, বিষ্ণুর অবতার, রামের বংশে তার জন্ম- ইত্যাদি ভাবনা এতটাই জনপ্রিয়, যে ভারতীয়েরা ঘরে ঘরে, তাকে পূজাবেদীতে বিষ্ণু, রামের পাশে বসিয়েছে। তিন, রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ বিষয়ক বহুমুখী প্রকল্পের প্রভাব। তাকে এড়িয়ে যাওয়া বা অস্বীকার করা খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের প্রকল্পের

সম্যক রূপের সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের তেমন পরিচয় নেই। মনে রাখতে হবে, এখনও রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুর' হয়ে আছেন, বেশীরভাগ মানুষের কাছে।

তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র, রাখালদাস, বিবেকানন্দ প্রমুখরা, বুদ্ধ এবং বুদ্ধের কাল সম্পর্কে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিলেন। নারীবিরোধ এবং খাদ্য 'রুচি'র কথা আমরা উল্লেখ করলাম। এছাড়াও, বুদ্ধের অহিংসা ধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের লোকেরা 'কাপুরুষে' পরিণত হয়েছে, শৌর্য বীর্য অস্ত্রধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, বুদ্ধের প্রচারিত 'যুদ্ধবিরোধী' মানসিকতা আসলে 'ভীরুতা'র লক্ষণ; বৌদ্ধধর্মের আগে 'অখণ্ড সনাতন হিন্দু ধর্মই' ছিল, বৌদ্ধধর্ম ধর্মভেদ তৈরি করে, প্রথম ধর্মীয় অনৈক্য সৃষ্টি করে; বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের 'নাস্তিকতা' পাশ্চাত্যের মনমোহন 'আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষ' এই পরিচয়-ভাবনার বিরোধী (বিবেকানন্দ এবং ইন্সনের ভাবনার সঙ্গে মেলানো মুশকিল), বুদ্ধের সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা ছিল না, কিন্তু সমাজ থেকে তারা জাতিভেদপ্রথাকে বিলুপ্ত করতে পারেনি; বুদ্ধ আসলে রাজা এবং ধনবান শ্রেষ্ঠীদের কল্যাণে বিলাসিতায় জীবন-যাপন করতেন- ইত্যাদি বহু ভ্রান্ত অভিযোগ অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে। ধর্মানন্দ কোসাম্বী তাঁর 'ভগবান বুদ্ধ'-তে যুক্তি প্রমাণ গবেষণার দ্বারা এগুলিকে খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনমানসে এই অভিযোগগুলিকে জাগিয়ে রাখার প্রচেষ্টাও বিভিন্ন 'বয়ানে' চলেছে। বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে ব্যবহার করে সাহিত্য রচনা পরিমাণে কম হওয়ার ক্ষেত্রে এর বিশেষ ভূমিকা আছে।

একদিকে 'সম্ভ্রমবোধ' অন্যদিকে 'অপর' এর জনপ্রিয় ভাবনা, এই দুই প্রবণতা ভারতবাসীকে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম-দর্শন সম্পর্কে বহুকাল ধরে দ্বিধাশ্রিত করেছে; দোলচলতায় ফেলেছে। আর এই জটিলতাকেই আমরা বাংলা উপন্যাসের উদাহরণের সাহায্যে পাঠ করতে চেয়েছি। একেই আমরা রাজনৈতিক অভিপ্রায় মতাদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আধিপত্যকামী মানসিকতা এবং 'অধীনস্থ অপর' এর রাজনৈতিক অভিপ্রায়গুলি চিহ্নিত করাই আমাদের এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য; সেক্ষেত্রে আমরা বেছে নিয়েছি বৌদ্ধধর্মকে। এখানে বিশেষ সময় দেশ কাল ভাষা প্রেক্ষিতে এই ধর্মের যে অবস্থান তা সব কাল স্থান

পাত্রের নিরিখে অপরিবর্তনশীল নয় তা আমরা জানি। যখন বৌদ্ধধর্মের অবস্থান আধিপত্য এবং ক্ষমতার কেন্দ্রে তখন, অন্যান্য ধর্ম 'অপর, অধীনস্থ'। আমরা সমকালে রোহিঙ্গাদের প্রসঙ্গটি স্মরণ করতে পারি। ধর্মীয় প্রাধান্যে, লিবারাল বা উদার-ধর্মে কখনই ধর্মীয় সাম্য সম্ভবপর হয়নি, সম্ভব নয়। দেবীপ্রসাদ ফিউচার অফ রিলিজিয়ন প্রবন্ধের সারাংশে বলেছেন-

Religion was brought into being by the class structure of society; throughout the period of the class society religion drew its nourishment therefrom; with the active overthrow of the class structure of society, religion is destined to wither away. Religion, therefore has no future-no more than the class society itself. In the absolute time-scale, however, class society is no more than a mere twinkling of the eye compared to the general history of the existence of human beings on the earth. So also is the life-span of religion.

"Ah! Faustus, now hast thou but one bare hour to live!" ^৬

আমাদের প্রশ্ন জাগতে পারে, যে, অবস্থান, প্রাধান্য, হেজমনির প্রভাবকে কীভাবে জনপ্রিয় সংস্কৃতি প্রতিরোধ করতে পারে? তবে কী সাহিত্য মধ্যপন্থা রাখবে? সাহিত্য কী সবসময় নৈতিক শিক্ষা দেবে? আমরা সব প্রশ্নের উত্তর জানি না। সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি সচেতন লেখক এবং পাঠক, দার্শনিক বীক্ষায় পাঠের মাধ্যমে, দুইপ্রান্তে থেকেও সংযুক্ত হবে। শ্রেণিগত অবস্থান সম্পর্কে, স্পষ্টতা, ক্ষমতা এবং অধীনস্থের বোধ তাদের চালিত করবে। এটুকু বলা যায়, 'পাঠ'-এর দায়িত্ব লেখক নেবেন। তা যদি হিংসা ছড়ায় মানুষের মধ্যে, মানবিকতার খাতিরে তা থেকে বিরত থাকাই হয়ত উচিত। তবু ক্ষমতার চিহ্ন থেকে যায়। সেগুলিকে প্রতিবেশ প্রেক্ষিত অনুযায়ী সমালোচনা করাও পাঠের অন্তর্গত। সেইটি ব্যক্তিগত নিন্দার কুৎসার চেয়ে, উচ্চস্তরের জিনিষ, সাহিত্য সমালোচনার সংরূপের ইতিবাচক আলোচ্য। সাহিত্য সেই সম্ভাবনা গুলি রাখবে, সেই সমালোচনার পরিসর তৈরি করবে। এই দায়িত্ব গুলি সাহিত্য নির্মাণের এবং পাঠের অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে।

জে এন মহাস্তি দর্শন বিষয়ে 'আত্ম এবং অপর' বইটিতে, যা প্রস্তান দিয়েছেন, আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেকথা বলতে পারি। সংস্কৃতির মধ্যে ধর্ম, গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়, জাতীয়তাবোধ- রাজনীতি, সমাজতত্ত্বের আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা করলাম। একে

লেখকেরা কীভাবে হাজির করবেন? কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে,- তিনি তাঁর সাংস্কৃতিক, অবস্থানগত অভিমান দ্বারা আচ্ছন্ন; সচেতনভাবে বা অবচেতনে। ফলে তিনি সাহিত্যরস সৃষ্টির পাশাপাশি ‘অপর’ এর প্রতি বিদেষ তৈরি করছেন বা করে ফেলছেন। সেক্ষেত্রে মহাস্তি বলেছেন, অপর বা বিদেশী সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে, ব্যাখ্যাতা, সংবেদনশীলতা এবং সমানুভূতির (empathy), নীতিও যুক্ত করবেন।

হেগেল এবং কান্টের শিক্ষা- নামক অংশে বলছেন,-

দার্শনিকেরা প্রায়ই যেটা ভুলে যান, তা হলোঃ বিভিন্ন সংস্কৃতির ভেতরে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণটা শুধু ব্যাখ্যাকরণের প্রামাণ্যতার ভেতরেই নেই। ক্ষমতা এবং আধিপত্য থেকেও বাস্তব সংঘাত দেখা দেয়। তাই এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার হেগেলের দ্বন্দ্বিকতার (dialectic) ধারণাটিতে, প্রভু-দাস দ্বন্দ্বিক সম্পর্কে, পরস্পরের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করেই একটি সংস্কৃতি তার আত্ম-সচেতনতা অর্জন করে। হেগেলের এই অন্তর্দৃষ্টির পাশে কান্টের দৃষ্টিকে বসালে একটি ভারসাম্য আনা যায়। কান্ট বলেছেন, প্রকৃতার্থে নীতিনিষ্ঠ সমাজ রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক নয়; তা হলো পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং চিরন্তন শান্তির প্রতি সর্বজনের দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে গঠিত এবং বহুসম্মিত মানবতা। কান্টের মতে, রাজনৈতিক স্তরে এক সংস্কৃতির সঙ্গে আরেক সংস্কৃতির সংঘাত থাকতে পারে; ব্যাখ্যাকারীও আধিপত্য বাসনা থেকে মুক্ত নাও হতে পারে; কিন্তু অন্যের প্রতি একজনের একটি নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে যায়, তা সেই ব্যক্তি যে সংস্কৃতির প্রতিনিধিই হোন-না কেন। নীতিনিষ্ঠ সমাজের ধারণার ভেতরে রয়েছে একটি যথার্থ বিশ্বজনীন, অতিবর্তী সমাজের অবাধ ধারণা- যে সমাজ রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং সাংস্কৃতিক অপরত্বকে সম্মান করে, আর আমাদের নিজস্বতা এবং অপরের বৈদেশিকতার যা কিছু অচেনা অজানা মধ্যে কোনো দুরতিক্রম্য ব্যবধান গড়ে তোলে না।^৭

আশীষ লাহিড়ী, নীড্‌হ্যামের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তাকে আবশ্যিক মনে করেছেন এই প্রসঙ্গে; যদিও বাস্তবিক সমকালীন পরিস্থিতিতে গোটা পৃথিবী জুড়ে, সব দেশেই ‘মুনাফা-সর্বস্বতার’ আত্মকালন চলছে।

তা সত্ত্বেও তিনি বলেছেন- রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্কের কথা। যে নৈতিকতা, শুদ্ধ-পবিত্র অনির্বচনীয়ের অনুসারী, অথচ তা অতিলৌকিক নয়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত।^৮

আমরা আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে কোনো নির্দিষ্ট সমাধানের কথা বলতে চাইনি। ধর্মীয় রাজনীতির জটিল, বিতর্কমূলক, সংশ্লিষ্ট, বহুমুখী ধারাকেই, সীমাবদ্ধ পরিসরে, বাংলা উপন্যাসের উদাহরণের সাহায্যে ‘পাঠ’ করতে চেয়েছি।

তথ্যসূত্র

- ১। Ranciere, Jacques. *The Politics of Literature*, University of Wisconsin Press, SubStance, issue 103 (Vol. 33, No. 1), 2004, pp. 10-24 (Article). DOI: 10.1353/sub.2004.0012
- ২। আশীষ লাহিড়ী, *ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের দক্ষিণাবর্ত*, ঋতাস্কর, কলকাতা, ২০১৫, পৃ ১৬
- ৩। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২, পৃ ১১-১২
- ৪। নবারণ ভট্টাচার্য, *মহাযানের আয়না*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃ ৩৬
- ৫। জীবনানন্দ দাশ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০১১
- ৬। Debiprasad Chattopadhyay, *Religion and Society*, Aakar, Delhi, 1987, Page No. 198
- ৭। জিতেন্দ্র নাথ মহান্তি, *আত্ম এবং অপর*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী, ২০১৮, পৃ ১৩৪-৩৫
- ৮। আশীষ লাহিড়ী, *ভগবানের লেভি, ঈশ্বর না-ঈশ্বর বিজ্ঞান সমাজ*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯, পৃ ৯৮-৯৯

Satyabati Gini 08.07.2021

গ্রন্থপঞ্জি, পত্রপত্রিকা এবং অন্তর্জাল-সূত্র সমূহ

আকর গ্রন্থ

অনুরূপা দেবী, *রামগড়*, এমারেন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা, ১৩২৫

ত্রিবেনি, এমারেন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা

আবুল কাসেম, *সরহ পা*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৩

অতীশ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৫

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *বীরবরণ*, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৮৮৩

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *দেবীকোট*, প্রকাশক শ্রী জয়াদ্রিনাথ সান্যাল, গঙ্গোত্রী পরিষদ, কলকাতা, ১৩৯৭

দেবারতি মুখোপাধ্যায়, *ঈশ্বর যখন বন্দী*, বিভা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৪২৩

দীনেশচন্দ্র সেন, *শ্যামল ও কঙ্কাল*, প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৪৫

দীপ্তি ত্রিপাঠী, *হে অনন্তপুণ্য* (জীবকের বুদ্ধ-স্মৃতি কাহিনী), দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

দীনেন্দ্র কুমার রায়, *পিশাচ পুরোহিত*, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, নদীয়া, ১৩১৭

জাল মোহান্ত, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩১৬

চীনের চালবাজি, রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার ১১২ নং সচিত্র উপন্যাস, 'রহস্য-লহরী' কার্যালয়, নদীয়া,

১৩৩৪

পীতাতঙ্কের প্রতিকারঃ বিপ্লববাদের বিলোপ-কাহিনী, রহস্যলহরী উপন্যাসমালার ত্রৈমাসিক সংস্করণ,

ষণ্মাসিকের দপ্তরের ষষ্ঠ গ্রন্থ, রহস্য-লহরী পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯২৩

চীনের নবনায়ক, রহস্য রোমাঞ্চ গ্রন্থ, শিশীর পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, নূতন সং, ১৩৬৫

নারায়ণ সান্যাল, *দশটি উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৯

আম্রপালী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯

নীহাররঞ্জন গুপ্ত, *কিরীটি অমনিবাস*, ১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২১

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, *কৃষ্ণার পরিচয়*, কৃষ্ণা সিরিজের ৪ নং গ্রন্থ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১৯৮৫

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, গুপ্ত-ঘাতক, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৪

কারাগারে কৃষ্ণা, 'কৃষ্ণা সিরিজে'র প্রথম গ্রন্থ, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা, ১ম সং, ১৩৫৯

কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজ, ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, হত্যার প্রতিশোধ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৫

প্রহেলিকা সিরিজের ৬ ডিটেকটিভ উপন্যাসের সংকলন, খণ্ড ৫, কলঙ্কী চাঁদ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, বইমেলা, ২০০৮

প্রমথভূষণ তর্কভূষণ, *মণিভদ্র*, বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক উপন্যাস, শ্রী গোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত, কলকাতা, ১৩২১

প্রেমেন্দ্র মিত্র, *সুরজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাঃ)*, *মামাবাবু সমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭

প্রেমাক্ষুর আতর্থা, *মহাশুবির জাতক*, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২২

প্রীতম বসু, *চৌথুপীর চর্যাপদ*, প্রকাশক প্রীতম বসু, কলকাতা, ২০১৭

বাণী বসু, *মৈত্রেয় জাতক*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১২

বিপ্রদাস বড়ুয়া, *শ্রামণ গৌতম*, পুস্তকবিপণী, কলকাতা, ২০০২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মরণের ডঙ্কা বাজে*, এম, সি, সরকার এন্ড সন্স লিঃ, কলকাতা, ২য় সং, ১৯৪০

ভগীরথ মিশ্র, *ঐন্দ্রজালিক*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৭

ভিক্ষু শীলভদ্র, *থেরীগাথা*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০৭

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *শশাঙ্ক*, *ধর্মপাল*, *করুণা*, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), রচনাবলী, ২য়

খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮

শওকত আলি, *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৬

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮

ব্যোমকেশ সমগ্র, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৩

শশধর দত্ত, *চীনের পুতুল* (চলচ্চিত্রে গৃহীত রহস্যোপন্যাস), পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩৬৫

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, *অঙ্গুলিমাল*, খোয়াবনামা, ২০১৪

শিবশিস মুখোপাধ্যায়, *কাহ্ন*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৩

সত্যজিৎ রায়, *ফেলুদা সমগ্র*, ১ খণ্ড, আনন্দ, ২০১৪

সত্যেন সেন, বদিউর রহমান (সম্পাদিত), *সত্যেন সেন রচনাবলি*, ৩য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, ২০১৪

সত্যেন সেন রচনাবলি, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ঢাকা, ২০১৪

সমরেশ মজুমদার, *শরণাগত*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪,

সন্মাত্রানন্দ, *নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা*, অতীশ দীপঙ্করের পৃথিবী, ধানসিড়ি, কলকাতা, ২০১৭

সেলিনা হোসেন, *নীল ময়ূরের যৌবন*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০৯

গল্পসংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৩

সৌমিত্র বিশ্বাস, *হেরুক*, আনন্দ নভেলা, আনন্দ, ২০১০

স্বপনকুমার, *ড্রাগন সমগ্র*, ২য় খণ্ড, শ্রীমতী নির্মলা আগরওয়ালা, কলকাতা, ২০০৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *কাঞ্চনমালা*, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩২২

বেণের মেয়ে, গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স, কলকাতা, ১৩২৬

হরিন্দাস পালিত, *চান্দেলী*, ঐতিহাসিক কাহিনী, প্রথম খণ্ড, গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৩২২

হেমেন্দ্রকুমার রায়, গীতা দত্ত (সম্পাদিত), *রচনাবলী*, ১৯ খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা, ২০১০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *নালক*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৮

অমলেন্দু সেনগুপ্ত, *উড়াল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব*, প্রথম সংস্করণ ২০০৬, কলকাতা, প্রতিভাস, ১৯৮৯

জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর, কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৯৭

অমর দত্ত, *উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ*, প্রথেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২য় সং, ২০০১

অমূল্যচন্দ্র সেন, *বুদ্ধকথা*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০১

অবন্তী সান্যাল (সম্পাদঃ) *হাজার বছরের প্রেমের কবিতা*, খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী, নূতনসাহিত্য

ভবন, কলকাতা, ১৩৬৬

অলকা চট্টোপাধ্যায়, *অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান*, অনুষ্টুপ, ২০১৮

চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১০

অরিন্দম চক্রবর্তী, *মননের মধু*, গাঙচিল, ২০১৪

আশা দাশ, *বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৩

আশাপূর্ণা দেবী, *আর এক আশাপূর্ণা*, মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭

আশীষ লাহিড়ী, *রবীন্দ্রনাথঃ মানুষের ধর্ম*, মানুষের বিজ্ঞান, অবভাস, কলকাতা, ২০১৩

ভদ্রলোকি যুক্তিবাদের দক্ষিণাবর্ত, ঋতাক্ষর, কলকাতা, ২০১৫

ভগবানের লেড়ি, ঈশ্বর না-ঈশ্বর বিজ্ঞান সমাজ, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯

ঈশানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক* (খণ্ড ১), ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৯, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩২৩

জাতক (খণ্ড ২), ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৯, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩২৩

জাতক (খণ্ড ৩), চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১৪, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩৩২

জাতক (খণ্ড ৪), চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১১, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩৩৪

জাতক (খণ্ড ৫), পঞ্চম মুদ্রণ ১৪১৪, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩৩৪

জাতক (খণ্ড ৬), ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৯, কলকাতা-৯, করুণা প্রকাশনী, সাল ১৩৩৭

ওয়াংচুক দোরজি নেগি, *ধন্মপদ*, বাংলা অনুবাদ রামকৃষ্ণ দাস, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ১৪১৯

কৃষ্ণকুমার মিত্র, *বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ*, কলকাতা, ব্রাহ্মসমাজ প্রেস, ১৮০৪ শক

কেশবচন্দ্র সেন, *সাহিত্যসাধক চরিতমালা*, (সম্পা.) যোগেশচন্দ্র বাগল, ৯ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪, বঙ্গীয়

সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৫

কৃষ্ণবিহারী সেন, *বুদ্ধচরিত*, নব বিধান পাবলিকেশন কমিটি, 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির', কলকাতা

কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, *অবদানসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ*, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৫

ক্ষেত্র গুপ্ত, *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮

গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ও অন্যান্য*, বিদ্যা, কলকাতা, ২০১১

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *চর্যাগীতির ভূমিকা*, কলকাতা ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১৫

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ডি এম লাইব্রেরী, ১৩৬৭

জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তি, *আত্ম এবং অপর*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নয়াদিল্লি, ২০১৮

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, *কল্লোলের কাল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬০,

জীবনানন্দ দাশ, *মহাপৃথিবী*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৪৪

শ্রেষ্ঠ কবিতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০১১

দেবীপদ ভট্টাচার্য, *বাংলা চরিত সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় দর্শন*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১২

লোকায়ত দর্শন, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৬

সঙ্ঘৎ শরণং গচ্ছামি ইত্যদি অগ্রস্থিত রচনা, সম্পা. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২,

কলকাতা ৮৪, অবভাস, ২০১০

দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, ১ম এবং ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক

পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০২

বৃহৎ বঙ্গ, ১ম এবং ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, *পালিসাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান রসবাহিনী এবং অন্যান্য গ্রন্থ*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ঢাকা, ২০০৭

ধর্মানন্দ কোসাম্বী, *ভগবান বুদ্ধ*, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০১২

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ*, পাভলভ, ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ২০১০

নবারুণ ভট্টাচার্য, *মহাযানের আয়না*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০

নবীনচন্দ্র সেন, সম্পা. সজনীকান্ত দাস আমার জীবন, দ্র. *নবীনচন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্থভাগের শেষাংশ ও পঞ্চম ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬৬

অমিতাভ, সান্যাল এন্ড কোম্পানী, কলকাতা

নরহরি কবিরাজ (সম্পা.), *উনিশশতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক*, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭, কলকাতা, কে.পি.

বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৪

নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭

নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৪, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৫৬

পথিক বসু, *বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৩

পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, জিজ্ঞাসা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২

প্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বুদ্ধবাণী*, কে.পি. মুখার্জি এণ্ড কোং, ১৩১৬

প্রবোধচন্দ্র বাগচী- *বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৪, কলকাতা - ১৭, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ১৩৫৯

প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী- *চর্যাগীতিকোষবৃত্তি*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৬

প্রবোধচন্দ্র সেন, *ধর্মপদ-পরিচয়*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রবন্ধঃ *বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা*, বঙ্কিম রচনাবলী, যোগেশচন্দ্র বাগল, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১৭

বদরুদ্দিন উমর, *ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০১৫

ধর্মরাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১ম সং, ২০০০

বিজিতকুমার দত্ত, বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১৯

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ এবং সম্পাঃ), সাহিত্যদর্পণ, পুস্তক, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ ৩০

বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি, কলকাতা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৯

জনসভার সাহিত্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৬২

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বৌদ্ধদের দেবদেবী, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯

বিধুশেখর ভট্টাচার্য, পালিপ্রকাশ, পালিভাষার সুগম ব্যাকরণ, পাঠ্যাবলী ও শব্দকোষ, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা,

২০১৪

বি আর আশ্বেদকর, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার (বঙ্গানুবাদ), বুদ্ধ এবং তার ধর্ম, আশ্বেদকর গ্রন্থাগার, কলকাতা, ২০০৪

বীতশোক ভট্টাচার্য এবং সুবল সামন্ত(সম্পাঃ), জাঁ-পল সার্ভে, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৬

দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৮

বেলা ভট্টাচার্য(সম্পাঃ), হরপ্রসাদ স্মরণে, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

ভগিনী নিবেদিতা, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও সৌমেন পাল (সম্পাঃ ও টীকা), প্রসঙ্গ বৌদ্ধধর্ম, সিগনেট প্রেস, ২০১৫

ভবতোষ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৭

ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, ১৯৯৬

এম মতিউর রহমান, বৌদ্ধ দর্শনঃ তত্ত্ব ও যুক্তি, ১ম এবং ২য় খণ্ড, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, নাগার্জুনের দর্শন-পরিক্রমা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০১৫

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবন্ধঃ বাংলা শিশুসাহিত্যের অদৃশ্য মানুষ, আত্মহত্যার অধিকার এবং অন্যান্য সনদ, প্রতিভাস,

কলকাতা, ২০১২

মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, *উপন্যাসে অতীত ইতিহাস ও কল্প ইতিহাস*, কলকাতা, খীমা প্রকাশনী, ২০০৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাঃ রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, প্রথম-ষোড়শ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা,

২০০১

জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ৩য় সং, ১৩৬৬

সভ্যতার সংকট, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৩৫১

রক্তকরবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৫

চোখের বালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৫

নটীর পূজা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১১

সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৭

কালান্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৬

ধম্মপদং (প্রবন্ধ), *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, *প্রাচীন সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩১৪

সুজিতকুমার বসু এবং অন্যান্য(সম্পাঃ), *রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা,

১৪১৫

বিসর্জন, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৯

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪১৬

রত্না সিন্হা, *প্রবোধচন্দ্র বাগচী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (অনূদিত), *অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৭

রণব্রত সেন (সম্পাঃ), *শ্রীমদ্ভাগবত*, হরফ, কলকাতা, ১৯৯৮

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, *ভারতবিদ্যা ও মার্কসবাদ*, *রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন ও দামোদর কোসম্বী*, উথক প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪

রামশরণ শর্মা, *প্রাচীন ভারতে বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন*, অরিয়েন্ট লংম্যান, হায়দ্রাবাদ, ১৯৯৮

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, অখণ্ড তৃতীয় সং, দে'জ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮

বুদ্ধ, বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা, পৃ ২

রাজশেখর বসু, *বাল্মীকি রামায়ণ(সারানুবাদ)*, এম সি সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ১৪২০

রামদাস সেন, *Buddhdeva-His Life & Teachings*, Published by Hara Lal Ray, বহরমপুর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *দর্শন দিগ্‌দর্শন*, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮

বৌদ্ধ দর্শন, অনুবাদ মলয় চট্টোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৮

মহামানব বুদ্ধ, অনুবাদ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭

তিব্বতে সওয়া বছর, অনুবাদ মলয় চট্টোপাধ্যায়, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৪১৫

সিংহ সেনাপতি, চিরায়ত প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন ভট্টাচার্য, *আনতোনিও গ্রামশি বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৪

শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, *বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২০০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র রায় (সম্পাঃ), *শরৎ রচনাবলী*, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ,

শরৎ সমিতি, কলকাতা, ১৩৮২, পৃ ১০৩

শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, সম্পা. বারিদবরণ ঘোষ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯০৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বুদ্ধচরিত*, কলকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৩০৮

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাঃ), *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ, ধর্মচিন্তা, রবীন্দ্ররচনা-সংকলন*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস ভাবনা, বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০২

শিল্পচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩

দর্শনচিন্তা, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১

বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বুদ্ধদেব, বসুপ্রেস কলকাতা, ১৩১২

সরলা দেবী চৌধুরানী, জীবনের ঝরাপাতা, প্রথম রূপা সংস্করণ, ডি মেহরা রূপা এন্ড কোম্পানী, ১৯৫০

সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, শাক্যমুনিচরিত ও নির্বোধতত্ত্ব, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির, ৪র্থ সং,

১৮৮১

সিদ্ধার্থ গুহ রায়, আধুনিক পূর্ব এশিয়া, চীন জাপানের ইতিহাস, প্রগতিশীল পাবলিশার্স, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১২

সুব্রত সিন্ধা, আধুনিকতার কাব্যতত্ত্ব ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০২০

সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫০

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫০

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৫

সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৩৯৫

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কাকাবাবু সমগ্র, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫

সুচিত্রা ভট্টাচার্য, মিতিনমাসি সমগ্র, ঝাও ঝিয়েন হতা রহস্য, ১ খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩

স্যাণ্ডরসাহেবের পুঁথি, ২ খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, ২০০৩

সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৬০

সুমিতা চক্রবর্তী, আমার রবীন্দ্রনাথ গ্রহণে বর্জনে, ড. বাংলা ভাষার বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, রত্নাবলী,

কলকাতা, ২০১০

স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩০৯

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, প্রথম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৩৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪১৯

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, সম্পা. সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুমিত্রা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮০

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮১

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮০

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেবের 'নাস্তিকতা', কারিগর, কলকাতা, ২০১৭

পত্রপত্রিকা

আব্দুল কাফি, প্রবন্ধ- স্মৃতি, পরিচিতি আর সময়ের স্বাদ, ২ জুন, ২০১৮, দেশ পত্রিকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, করুণাঘন, বৈশাখ, ১৩৬৪, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বসুধারা পত্রিকা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম': নামের ভুল, বোঝার ভুল, সংভরণ, বিশেষ সংখ্যা, ২০১৯, পৃ ৫২-৫৪

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ৩-৪, পত্রিকাধ্যক্ষ পুলিনবিহারী সেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

কলকাতা পুরশ্রী, ২০ মে ২০১১, নবপর্যায় ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, সার্বশতবর্ষ বিশেষ সংকলন

বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ষোড়শ সংখ্যা, পঁচিশ বৈশাখ ১৪২২, রবীন্দ্র-জন্মসার্বশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এক্ষণে, দ্র: রবীন্দ্রনাথের ইতালি-সফর ও রম্যাঁ রলাঁ, অবন্তীকুমার সান্যাল, বেদ বিপ্লব কীর্তন জনগণ, বিনয় ঘোষ, শারদীয়

সংখ্যা ১৩৪৮, ত্রয়োদশ বর্ষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মাল্য আচার্য (সম্পা)

সহায়ক ইংরাজি বই

Arnold, Edwin. *The Light of Asia*, London, 1979

Barry, Peter. *Beginning Theory, An Introduction to Literary and Cultural Theory*, Third Edition, Viva Books, New Delhi, 2017

Bhattacharya, Sabyasachi.(Compiled and edited), *The Mahatma and The Poet, Letters and Debates between Gandhi and Tagore 1915-1941*, National Book Trust, India, 2015

Bose, Mandakranta (ed.), *Faces of the Feminine in Ancient, medieval, and Modern India*, Oxford University Press, New York, 2000

Butler, Christopher. *Modernism*, Oxford University Press, NY, 2010

Carpenter, Amber D. *Indian Buddhist Philosophy*, Routledge, NY, 2014

Chattopadhyaya, Debiprasad, *Religion and Society*, Aakar, Bangalore, 1987, 2003

(ed.)Taranatha's *History Of Buddhism In India*, K P Bagchi & Company, Calcutta, 1980

Childs, Peter. *Modernism*, Routledge, London, 2000

Conze, Edward, *Buddhist Thought In India*, George Allen & Unwin, London, 1983

Curtin, Jeremiah. *The Mongols a History*, with a Foreword by Theodore Roosevelt, Little, Brown, and Company, Boston, 1908

Dasgupta, Shashibhusan, *Obscure Religious Cults*, Calcutta, Firma KLM Private Limited, 1995.

De, Sushil Kumar. *Bengal Literature in the Nineteenth Century (1757-1857)*, Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1962

Durant, Will, *The History Of Philosophy*, Pocket Books, NY, 2006

Devi, Suniti – *The Life of Princess Yasodhara*, London, E. Mathews & Marrot, 1929,

Dower, John W. *Patterns of a Race War (1986).in Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear*, John Kuo Wei Tchen and Dylan Yeats (eds), Verso, London, 2014

Dutt, Nalinaksha. *Early Monastic Buddhism*, Vol. I, Calcutta Oriental Book Agency, Calcutta. 1941

Aspects of Mahayana Buddhism And Its Relation to Hinayana, Luzac & Co. London, 1930

Early History of the Spread of Buddhism and the Buddhist Schools, Calcutta Oriental Series, No. 14. E. 8, Luzac & Co. London, 1925

Mahayana Buddhism, Forma KLM Private Limited, Calcutta, 1976

Frayling, Christopher. *The Yellow Peril: Dr. Fu Manchu & The Rise of Chinophobia*, Thames & Hudson, UK, 2014

Gandhi, Leela. *Postcolonial Theory*, Oxford University Press, India, 1998

Ghosh, Devleena. *Burma- Bengal crossings: Intercolonial Connections in Pre-Independence India*, Routledge, Asian Studies Review, 2016, Vol. 40

Gyory, Andrew. *Closing the Gate: Race, Politics, and the Chinese Exclusion Act*, Chapel Hill, University Of North Carolina Press. 1998

Hutcheon, Linda. *A Poetics of Postmodernism*, Routledge, London, 2004

Levine, George, *Realism, Ethics and Secularism*, Essays on Victorian Literature and Science, Cambridge University press, New York, 2008

Lukacs Georg, *The Historical Novel*, tr. by Hannah and Stanley Mitchell, boston, 1963

Lyman, Stanford M. “*The Yellow Peril*” *Mystique: Origins and Vicissitudes of a Racist Discourse*, Springer, International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol.13, No.4, Summer 2000

Kalupahana, David J. *A History of Buddhist Philosophy*, Motilal Banarasidass Publishers Pvt Ltd. Delhi, 2006

Kellner, Douglas. *Critical Theory, Marxism and Modernity*, Polity Press, UK, 1989

Marchetti, Gina. *Romance and the “Yellow Peril”: Race, Sex, and Discursive Strangles in Hollywood Fiction*, University of California Press, London, 1993

Marshall, Alex. *The Russian General Staff and Asia, 1800-1917*, (chapter: China, Europe and the ‘Yellow Peril’) Routledge, 2006

Matilal, Bimal Krishna. Jonardon Ganeri (ed.), *Mind, Language and World*, Oxford University Press, New Delhi, 2002

Perception, Clarendon Press, Oxford, 1985

Buddhist Logic and Epistemology, D. Reidel Publishing Company, Holand, 1986

- Ganeri, Jonardon(ed.), *Epistemology, Logic and Grammar in Indian Philosophical Analysis*, Oxford University Press, 2005
- Logic, Language and Reality*, Motilal Banarasidass Publishers Pvt Ltd. Delhi, 2nd ed. 1990
- Marx-Engels on Religion*, selection of works, Published by the Comintern (SH), arranged by Wolfgang Eggers, 2015
- Meszaros Istavan, *Marx's theory of Alienation*, Aakar, 2013
- Mitra, Rajendralal, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1882
- Bodhgaya, The Hermitage of Sakya Muni*, Calcutta, Govt. of Bengal, 1878
- An Introduction to the Lalita Vistara or Memoirs of the Early Life Of Sakya Buddha (1877)*, Calcutta, Baptist Mission Press, 1877
- Lalita Vistara or Memoirs of the Early Life Of Sakya Sinha (1877)*, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1886
- Nayak, J.K. & P. Bhaumik(eds.) *Memories, images, imagination: An anthology of Bangla and Oriya writings on colonial Burma*, Calcutta, Department of Comparative Literature, Jadavpur University
- Needham J, *Science and Civilisation in China*, Vol. II
- Odijie, Michael. *The Fear of 'yellow Peril' and the emergence of European Federalist Movement*, The International History Review, 2018, Vol. 40
- Oldenberg, H. *Buddha: His life, His Doctrine, His order*, Calcutta, William and Norgate, 1882
- Propp, V. *Morphology of the Folktale*, University of Texas Press, Austin, 2009
- Ranciere, Jacques. *Mute Speech*, Columbia University Press, NY, 2011
- Rimmon-Kenan, Shlomith. *Narrative Fiction*, Routledge, London, 2nd ed. 2005
- Sampson, Robert. *Yesterday's faces: A Study of Series Characters In The Early Pulp Magazines*, vol 3, Bowling Green State University, USA, 1987
- Sankrityayan, Rahul and others, *Buddhism: The Marxist Approach*, People's Publishing House, New Delhi, 1970

- Sarangi, J. (1918, 2010), *Rangoon song*, J.K. Nayak & P. Bhaumik(eds.) *Memories, images, imagination: An anthology of Bangla and Oriya writings on colonial Burma*, Department of Comparative Literature, Jadavpur University. Calcutta
- Sartre, Jean-Paul, *What is Literature*, Routledge, 2nd edition, 2001
- Singh, Amar. *The Heart of Buddhist Philosophy-Dinnaga ana Dharmakirti*, Munshiram Manoharlal Publishers private Limited, Delhi, 1984
- Suzuki, D.T. *Outlines of Mahayana Buddhism*, Luzac, London, first publication 1907, Schocken edition, 1963
- Stcherbatsky, Th. *Central Conception of Buddhism*, Matilal, Banarasidas, Madras, 1988
- Storey, John. *Cultural Theory and Popular Culture*, Pearson Longman, Fifth Ed.
- Tagore, Rabindranath, *The English Writings of Rabindranath Tagore*. Volume I, II, III, IV Ed. Sisir Kumar Das, Sahitya Akademi, 2012
- Tchen, John Kuo Wei. and Dylan Yeats (eds), *Yellow Peril! An Archive of Anti-Asian Fear*, Verso, London, 2014
- Thapar, Romila. *Early India*, Penguin Books, India, 2015
- Asoka and the Decline of the Mauriyas*, Oxford India Paperbacks, Delhi, 1998
- The Past as Present*, Aleph, Delhi, 2014
- Tharu Susie and K. Lalitha, *Women Writing in India*, vol. I, II, Oxford University Press, New Delhi, 1995
- Tipton, Frank B. *A History of Modern Germany Since 1815*, Continuum, London 2003
- Tuteja, K. L. and Chakraborty, Kaustav, *Tagore and Naationalism*, Springer, 2017
- Wiliams Raymond, *Marxism and Literature*, Oxford University Press, 2016
- Zecker, Robert M. *Race and America's Immigrant Press; How the Slovaks were Taught to Think Like White people*, the Continuum International Publishing Group, 2011

অন্তর্জাল সূত্র

https://www.bbc.co.uk/religion/religions/buddhism/subdivisions/tibetan_1.shtml

Forman, Ross G. “Peking Plots: Fictionalizing the Boxer Rebellion of 1900.” *Victorian Literature and Culture*, vol. 27, no. 1, 1999, JSTOR, www.jstor.org/stable/25058437. Accessed 18 Mar. 2020, Page No 19–48

Michael Niemann, *The Politics of Crime Fiction is Seeking Resolution in Fiction an Inherently Conservative Choice?*, Coffeetown Press, May 31, 2018, <https://crimereads.com/the-politics-of-crime-fiction/>

মুনমুন দাশগুপ্ত, *নারীর অধিকার রক্ষায় অগ্রণী তিনি*

(<https://www.anandabazar.com/rabibashoriyo/anurupa-devi-was-the-pioneer-of-protecting-women-rights-1.1057551>)

<http://www.amarboi.com/2015/06/prodoshe-prakreetojon-showkat-ali.html>

Benjamin Welton, *The Yellow Peril: Asian Invasion in the Racist Literature of Yesteryear*, Article, *The Airship*, Surveying Literature, Art & Culture.

Lee, Gregory. Chinese Migrants and The “Inundation” Metaphor: risk. Representation, Repression: Constructing and Manipulating Fear of the Chinese other. EastAsiaNet Workshop “Framing Risk: Hazard Perception as a Crucial Factor in Imagining East Asia”, Jun 2007, Lund, Sweden, halshs-00188544

Johnson, John. *How Los Angeles Covered Up the Massacre of 17 Chinese*, *LA Weekly*. 10 march, 2011. Retrieved 18 March 2020.

Selth, Andrew. *Colonial-era Pulp Fiction portrays ‘Technicolor’ Myanmar*, article, NIKKEI, Asian Review, July 11, 2016

Ranciere, Jacques. *The Politics of Literature*, University of Wisconsin Press, SubStance, issue 103 (Vol. 33, No. 1), 2004, pp. 10-24 (Article). DOI: 10.1353/sub.2004.0012

বিচিত্রা: বৈদ্যুতিন রবীন্দ্র-রচনাসম্ভার, <http://bichitra.jdvu.ac.in/>

অপ্রকাশিত

বীথিকা সাহানা, উনিশ-বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধজীবন ও বৌদ্ধযুগঃ ইতিহাস, রাজনীতি, মতাদর্শ, তত্ত্বাবধায়ক

আব্দুল কাফি, এম ফিল গবেষণা সন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)

Satyabati Givi 08.07.2021

Bithika Sahana
08-07-2021